সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য

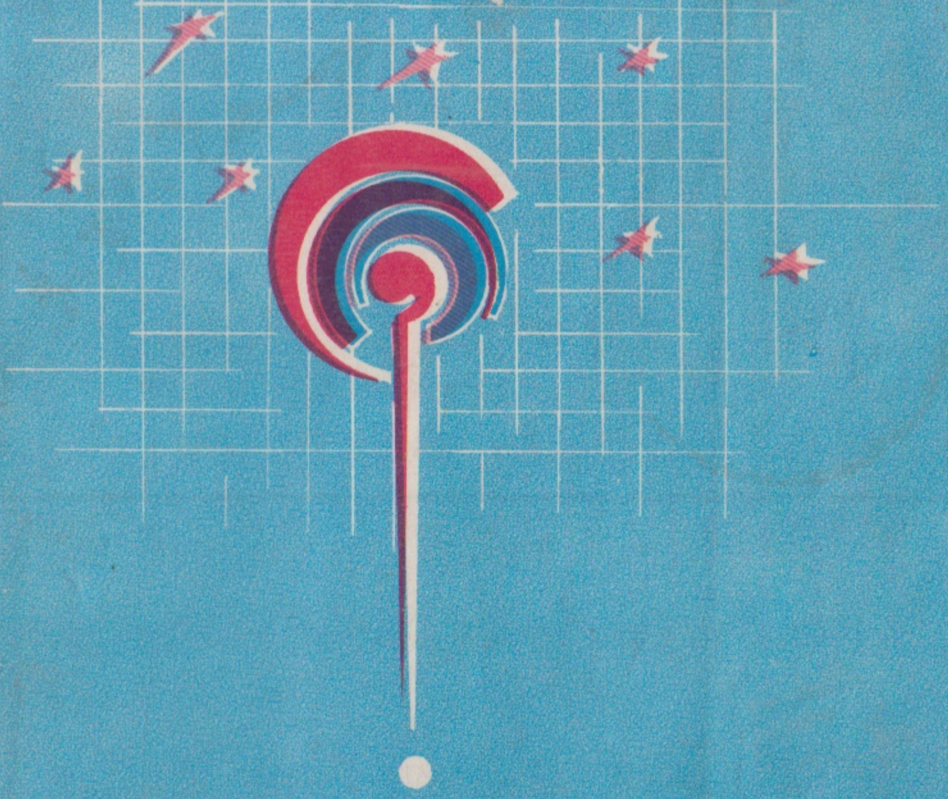

মোঃ আক্‌কাছ উদ্দিন

সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য

মোঃ আককাছ উদ্দিন

রশিদ বুক হাউস
৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ হাবিবুর রহমান ভূইয়া
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
রমনা, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ
২৫ মে ১৯৯৫ ইং
১১ জৈষ্ঠ্য ১৪০২ বাংলা
২৬ জিলহজ্জ ১৪১৫ হিজরী

[গ্রন্থসত্ত্ব ঃ মোছাঃ আনোয়ারা আক্কাছ কর্তৃক সংরক্ষিত]।

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার মুদ্রণ ঃ
মিল্লাত কম্পিউটারস
৩৮/২.খ-বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ সোসাইটি প্রিন্টার্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক ঃ রশিদ বুক হাউজ
৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

যোগাযোগের ঠিকানা
ডাঃ মোঃ আক্কাছ উদ্দিন
থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পিতা মরহুম তাহের উদ্দিন ও পরম শ্রদ্ধা ভাজন মাতা মোছাম্মত সুসীলা বেগম, যাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা শাসন ও প্রেরণার ফলে শিক্ষার আলো পেয়েছি। তাদের মাগফেরাত ও চির শান্তি কামনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হলো!

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

অপ্রাপ্ত বয়স থেকেই ভাবতাম খোদা কি ভাবে এতো মানুষের কথা শুনেন ? কি করে তাদের ন্যায়, অন্যায়ের খবর রাখেন? দু'চোখ হলে এতো কিছু দেখেন কি করে? মানুষ রাতে দিনে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কত কিছুই না করে-এর প্রতিদান দেওয়া এক জনের (আল্লাহর) পক্ষে কি করে সম্ভব? হাশরের মাঠে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে কে পাপি, কে নেকী তা পার্থক্য করে জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রেরণার সময় তাদের শাস্তির অথবা শান্তির অথবা শান্তির উপদান কোত্থেকে দিবেন? এগুলি কি কোন রাজ ভান্ডারে পূর্ব থেকে মওজুদ আছে? এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যে উপাদান দিয়ে তৈরী সেগুলি কোথায় ছিল? এগুলো কি আদি হতে বিরাজিত ছিল? থেকে থাকলে কিভাবে, কোথায় ছিল? অথবা না থেকে থাকলে সেগুলি সৃষ্টি হলোই বা কিভাবে? নূর নামের যে পবিত্র সত্তা দিয়ে এ বিশ্ব জগতের সকল কিছু পয়দা করলেন, সে সত্তাই বা কি জিনিস? মানুষের সুকৃতি (পূন্য) ও দুষ্কৃতির (পাপকর্ম) সওদা নামের যে উপদান মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে, সেগুলির কি কোন অস্তিত্ব আছে?

এ পৃথিবী আখেরাতের কর্মক্ষেত্র বিধায় সেগুলি কি পৃথিবীর থেকে উৎপন্ন হয়ে, কোথায় গোপনে দিয়ে জমা হচ্ছে? গতিশীল গাড়ী কিংবা অন্যান্য মেশিনারীজ যন্ত্র পাতি থেকে কালো ধোঁয়া বের হয় আবার পানির স্রোত থেকে প্রযুক্তির মাধ্যমে উজ্জ্বল সত্তা (বিদ্যুৎ) ও তৈরী করা যায় । এই পৃথিবীর একটি কনাও স্থিতিশীল নয়। আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। সে হিসাবে আমরা ও কর্মের দায়ে গতিশীল থাকি। তাছাড়া আমাদের জীব কোষের অনু -পরমানু গুলো পৃথিবীর আপেক্ষিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এমনিতেই থাকে গতিশীল আবার এর ভিতর দিয়ে মনের আকো কর্ণফুলী নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হলে তার প্রতিটি অনু-পরমানুতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনের আবদার রাখতে গিয়ে গতির পোষাক পড়ে কর্মে লেগে যায়। এতে দেহ প্রচুর জ্বালানী শক্তি ব্যয় করে। গাড়ি যেমন পেট্রোল, ডিজেল খেয়ে গতিশীল হয়, সে তুলনায় পৃথিবীর খাদ্যের উপাদান থেকে মানুষ জ্বালানী শক্তি পায়। মানুষের বিকীর্ণ জ্বালানী শক্তি (কর্মশক্তি) পৃথিবীর আনাচে কানাচে কোথায় ও জমা থাকে না। এগুলো ক্ষনিকেই অদৃশ্য হয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তি কি কালো ধোঁয়ার মতো কিংবা জীবানু তুল্য কোন উপাদান? এগুলির সাথে কি পাপ পূণ্যের কোন সম্পর্ক আছে?

আল্লাহই যে বিশ্বের আদি সত্তা এর প্রমান কি? তিনি কোথা হতে কি ভাবে এই বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তিনি বর্তমানে আমাদের থেকে গুপ্ত থাকার কারণই বা কি? বিশ্ব প্রভূ রাজ বিরাজ কাছে আসলে কিংবা দূর থেকে দেখা দেওয়াতেই বা সমস্যা কিসের? আল্লাহ কি মানুষের মতো পাপ (অন্যায়) ক্ষমা করে দেন? বিবর্তনের মাধ্যমেই কি পৃথিবীতে আদি মানব মানবীর আবির্ভাব হয়েছিল? আদম (আঃ) হাওয়া কি স্বর্গ মূলক থেকে ধরার রাজ্যে নেমে এসেছেন?

ইত্যাদি ...... ইত্যাদি অগণিত জটিল জটিল প্রশ্ন আমার মনে কেন জানি সেই বয়স থেকেই উদয় হতো। কাজে অকাজে পথ চলার সময়ও আমি এ সব নিয়ে ভাবতাম। কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় খুব সীমাবদ্ধ ছিল। সে জন্য এই ছোট খাট বুদ্ধির খুঁটি দিয়ে সাগারের মতো কূলহীন প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল না তবু আমি সাঁতরাতে থাকি কূল পাওয়ার জন্য একসময় খোদার মহিমায় সাঁতরাতে সাতরাতে ঐ সাগরের মাঝেও আমি আলোর ঝিলিক দেখতে পাই। তখন থেকেই আমার হৃদয়ের দরজাটা একটু ফাঁক হয়। এতে সেই অন্ধকার ফুটিয়ে আলোর কিরণ পড়ে। ফলে মনের সংকীর্ণতা ও কিছুটা কেটে যায়। যার মাধ্যেমে আমি আলোর মুখ দেখি তা ছিল আল -কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীছ। কোরআনের শ্বাসত বাণী কোন এক সময় আমাকে মোহিত ও অভিভূত করে এবং রাসূলের (আঃ) হাদীস আমাকে শত শত প্রশ্নের সমাধান দিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি যখন কোরআনের বানী ও রাসূলুল্লাহর হাদীসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখিছি তখন এর মাঝে সৃষ্টি তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য খুজে পেয়ে স্রষ্টার প্রেমাবেগে মুগ্ধ হয়ে যাই। এর ফলে স্রষ্টা মহা মহিয়ানকে কিভাবে যে প্রসংশা ও কৃতজ্ঞতা দেখাব তার ভাষা খুজে পাইনি। কিন্তু আল্লাহর মহিমা ও প্রজ্ঞা এতো অসীম যা অনেক সময় বিজ্ঞানের যুক্তি সীমাও ছাড়িয়ে যায়। এর কারণ হলো বিজ্ঞান বস্তু তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই তার

www.pathagar.com

পরিক্ষা নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত মনে করে বলে ধর্মের যে সব তথ্য বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষন করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোকে দর্শনের আলোকেও বিচার বিবেচনা করে দেখাচ্ছি। এতে মোটা মুটি ভাবে আমার মনের বাসরে যে সব প্রশ্ন দানা বাধা ছিল, সেগুলির ও সম্ভব্য কাছা কাছি সমাধান পেয়েছি। তার পর থেকে এসব জটিল জটিল প্রশ্নের সমাধান গুলো একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু সব মিলিয়ে বই আকারে জন হিতার্থে প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা তখন আমার ছিল না। পরিশেষে অপেক্ষার মধ্যে ও মনের ভিতর একটা আবেগ কাজ করতে থাকে। যখন বয়সের চাকা চল্লিশের দাগ স্পর্শ করতে ছিল তখন পরম করুনাময়ের অসীম কৃপায় লিখার মতো একটা প্রবল স্পৃহা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে কলম নিয়ে বসায়। এই ক্ষুদ্র বই খানি সেই প্রচেষ্টারই ফসল। যার মধ্যে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান রয়েছে।

এ বইটি লেখতে বসে অনেক সময় দেখা গেছে অনেক প্রশ্নের সমাধান বের করতে যেয়ে যখনি আমি জটিল সমস্যায় পড়েছি তখন বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে হাত বাড়াতেই তারা অনেকেই বলেছেন। এতো জটিল প্রশ্নের সমাধান বের করতে যেয়ে কি জানি বিভ্রান্তি হয়ে যান কিনা ? কিন্তু আমার মনে একটা ধারণা ছিল, চিন্তা শক্তির মাধ্যমে কর্ম প্রভাবিত হলেও ঈমান, আকিদা ও দৃঢ় বিশ্বাস চিন্তা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে গোটা কর্মই বিশ্বাসের অনুকূলে ধাবিত হয়। সে জন্য পরম করুনাময় ধর্ম প্রীতির জন্য আমাকে বিভ্রান্ত হওয়ার থেকে দূরে সরে রেখেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছু কিছু অপরিপক্ক তথ্য আমাকে মাঝে মধ্যে খুব সমস্যায় ফেলে দেয়। তন্মধ্যে যেগুলির প্রতিবাদ না করলেই চলে না সে সবের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে কিছু লেখতে হয়েছে। কিন্তু গোটা লেখা গুলো যতটুকু প্রানবন্ত হওয়ার দরকার ছিল তা হয়তো আমি করতে পারিনি। যতটুকু লেখেছি তাও হয়েছে আল্লাহর মহিমায় ও মুরব্বীদের দোয়ার বরকতে। মূলতঃ আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় এতো সব জটিল তথ্য তুলে ধরার কারণ হলো ধর্মের (ইসলামের) ভিত্তিকে মজবুত প্রমান করা এবং যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন ধর্মীয় নীতি মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করেছে তার অসারত্ব প্রকাশ করা। সূচীপত্রে উল্লেখিত দুরুহ জিজ্ঞাসা বিষয়গুলির সমাধান দেওয়ার আমার কাছে কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত চন্দ্র বিজয়ের মতো দুঃসাধ্যের ছিল। তবু স্রষ্টা মহিয়ানকে সকল কাজের সাহায্য কারী হিসাবে প্রার্থনা করে এ গ্রন্থ লিখতে হাত দেই।

আশা করি স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য নামক এই ব্যতীক্রম ধর্ম পুস্তকখানি মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বিভ্রান্তের বেড়াজালে যারা বন্দি তাদের ও আলোর পথ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়ক হচ্ছে।

কিন্তু আমি যা লেখেছি তাও যে একেবারে হাড়ে হাড়ে সত্য এর ও কোন যুক্তিকতা নেই। কারণ এসব বিষয়ের উপর আমার প্রতিষ্টানিক দখল একেবারে নগন্য। সে জন্য আমার ও একই কথা বার বার এসে গেছে। এগুলি আমার অপরিপক্কতার বহিঃ প্রকাশ । সে কারণে জ্ঞানের আপেক্ষিকতায় অস্পষ্টতা ও অনিচ্ছা জনিত ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ব্যাপক ভবে ইসলামী গবেষক দার্শনিক ও চিন্তাবিদগনের সাথে আলোচনা করা এবং তাদের পরামর্শ নেওয়ার মতো সুযোগও আমার হয়নি। সে জন্য অপূর্ণতার মাত্রা কিছু বেশী থাকাও স্বাভাবিক। এর পরও যাদের সাথে দেখা করতে পেরেছি তাদের আন্তরিকতা ভুলার মতো নয়। এ জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ ।

এই বই লেখতে আমার যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও আমি অনেক কিছু প্রকাশ করতে ভুল করেছি। সহৃদয় পাঠক - পাঠিকাগনের মধ্যে থেকে কেউ যদি বইখানা মনোযোগের সাথে পড়ে আমার ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেন কিংবা অতিরিক্ত তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন, তবে সে মোতাবেক পরবর্তি সংস্করণে ব্যবস্থা নেওয়ার আশা রাখি। এ গ্রন্থের শিরোনাম থেকে নিয়ে প্রতিটি লেখা লেখতে গিয়ে আমি অনেক লেখক গবেষক ও চিন্তাবিদগনের প্রমান্য পুস্তকের সাহায্যে নিয়েছি। তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে ঋণী। সে জন্য আমি সকলের দু'কূল জীবনের মঙ্গল কামনা করি।

কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি বিশ্ব মানব কুলের কিছু উপকার হয় তাহলে আমার ত্যাগ ও শ্রম সার্থক ও ফল প্রসূ হয়েছে বলে মনে করব। সেই সাথে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী আমি যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। বিদায় লগ্নে বিশ্ব প্রভুর দরবারে আকুল মিনতি আমার অনিচ্ছা কৃত ত্রুটির প্রভাব থেকে পাঠক কুলকে যেন মুক্ত রাখেন এবং আমাকে ও যেন তার প্রভাব কেটে উঠার তওফিক দেন। খোদা হাফেজ

বিনীত
গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচিধারণা

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
পাপ পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণী ভেদে ধারণা	৭
মানুষের দর্শন আপেক্ষিক ও অপূর্ণ	১৪
বস্তু সম্পর্কে অতীত ধারণা	১৯
বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা	২১
বিকিরণ শক্তি কি ?	২৩
মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কি পাপ পুণ্য ?	২৫
মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ	৩৩
আল-কোরআনের তাৎপর্য ও পাপ পুণ্যের সম্পর্ক	৪৩
বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে কর্মফল	৫৪
মুসলিম দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য	৬০
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিকীর্ণ কর্মশক্তি	৬৬
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ	৭০
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্য সত্তা	৮১
বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ পুণ্যের সম্পর্ক	৮৮
জান্নাত ও পুণ্য সত্তার সম্পর্ক	৯৫
জাহান্নাম ও পাপ কণার সম্পর্ক	১০১
পাপ পুণ্য হয় কোন পথে	১০৫
গতি ও বস্তু	১১১
বস্তু ও প্রতিবস্তু সম্পর্ক	১১৫
প্রতিবস্তু ও পাপ পুণ্য	১২১
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	১২৬
পাপ পুণ্যের কর্তা কে ?	১৩২
বস্তুর উপাদান ও Negative-এর উৎস	১৩৬
গতি ও স্থিতি জগৎ	১৪২
জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইংগিত	১৪৪
পরকালের সময় সম্পর্কে নতুন ভাবনা	১৪৭
জাহান্নামের আযাব	১৫৩
জাহান্নামের অবস্থান ও তার বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ?	১৬০
জান্নাতের সুখ শান্তির বর্ণনা.	১৭৭
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জান্নাতের অবস্থান ও সুখ শান্তির সম্পর্ক	১৮৪
ঈমান ও আমালের রহস্যময় শর্ত	১৯২
পরকালে সময় স্থির কেন ?	১৯৮
পুনরুত্থানের ধারণা	২০১
মৃত্যু কি ?	২০৬
মহাবিশ্বের সূচনা কোথেকে ?	২০৯
শয়তানের অস্তিত্ব	২১৬
আল্লাহই আদি সত্তা	২২৪
আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব ?	২৩২
আল্লাহ কি করে সকল সৃষ্টির খবর রাখেন ?	২৪০
আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থার নমূনা	২৪৮
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব	২৫৫
নূর কি ও তা কিভাবে পয়দা হলো	২৬৪
ধনাত্মক ও ঋনাত্মক সত্তার জন্মতত্ত্ব	২৭৭
আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জু	২৮৫
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ কিভাবে মাফ হয়	২৮৮
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বোরাক ও রফরফ কি ?	২৯৫
বিশ্ব জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে আস্তিক নাস্তিক ও কোরআনের ব্যাখ্যায় পর্যালোচনা	৩০২
বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জড়বাদীদের ধারণা	৩০৫
বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা	৩০৮
ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক ফলাফল	৩১৮
জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তনবাদ	৩২১
কোরআনে বিবর্তনের ইঙ্গিত	৩২৪
বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ভাবনা	৩২৮
আদি মানব মানবীর জন্ম রহস্য কথা	৩৩৪

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাপ পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণী ভেদে ধারণা

মানুষ কল্পনার পাখির ডানায় ভর করে নীল-নীলিমার সুদূর ঠিকানায় বেড়াতে চায়। অজানাকে জয় করা যেন তার মনের খোরাক। সে জন্য কেউ যদি সাঝ-সকালে একটি সাদা বককে শির তাক করে এক পায়ে ডোবার হাটু জলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তখন তার মনে বকটির আগমনের সময়, উড়ে আসার দিক ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা উদয় হয়। সে আরও ভাবতে পারে বকটি কখন থেকে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে? কেন এই ভাবে প্রতীক্ষা করছে? বকটি কোথা হতে উড়ে এসেছে? তার কি কোন সঙ্গী-সাথী নেই? তার পিতা-মাতা কোথায়? তারা কি এখনও জীবিত আছে? ওরা কেন সাথে আসেনি? ঝড় বৃষ্টি আসলে সে একা যাবে কোথায়? বক গোষ্ঠীর প্রথম মাতা-পিতা কোত্থেকে এল? কে তাদেরকে বানাল? তাদের গায়ের রং সাদা হলো কেন? মানুষের স্বভাব জাত প্রবৃত্তি থেকে এরূপ হাজারো ভাবনার উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। নির্বোধ ব্যতীত জ্ঞানীর মাথায় এ রূপ কত যে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভীড় করে তার ইয়ত্যা নেই। এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কেন এতো সব ভাবে? কেনই বা মানুষ প্রত্যেক জিনিসের কিনার খুঁজে? এই পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, নীল আকাশ ইত্যাদি কে বানাল? কেনই বা বানাল? মানুষ কেন হলো? মানুষের শেষ ঠিকানা কোথায়? পাপ, পুণ্য বলতে কিছু আছে কি? অথবা পাপ-পুণ্যের সাথে দুনিয়ার জীবনের কি কোন সম্পর্ক আছে? আমরা যতই ভাবি না কেন শত জিজ্ঞাসার স্পৃহা আমাদেরকে ক্ষান্ত করতে পারে না। কিসে যেন আরও জানতে প্রেরণা দেয়, এই ভাবনা আর প্রেরণা থেকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সব জাগায় একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাই। তখন ভাবি এই সম্বন্ধ কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই এর কোন নিয়ন্তা আছে। তখন মনের হৃদয় পটে ভাসে সেই নিয়ন্তার ইচ্ছার অভিব্যক্তির স্বরূপ। তিনিই এই

www.pathagar.com

সুন্দর পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মের চালক। এখানের সাদা বক, খয়েরী বক, লাল বক তাদের পিতা-মাতা, মায়ের বুকের মতো নীল আকাশ, মাতৃশোভা বর্ধনকারী স্তনযুগলের মতো আকাশের বুকে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র 'মা'-জননীর গর্ভথলীর মতো বেষ্টিত ওজনস্তর, সবি সেই নিয়ন্তার অভিব্যক্তির ফল। এভাবে ভাবতে গিয়ে অজানাকে জানা হয়। যতই জানা যায়, ততই যেন মানুষ সুখী হয়, শান্তি পায়। জানতে জানতে প্রকৃতির শেষ ঠিকানা, আকাশের অনন্ত, মানুষের কথা, সৃষ্টির ঠিকানা, গ্রহ নক্ষত্রের সন্তরণ, মর্তের খবর, পরজীবনের দেনা পাওনার হিসেব নিকাশের খবর, একে একে সবি জানা হয়। জানতে পারলে কাছে যাওয়া যায়। প্রেম করা যায়। এই প্রেম সুখ দেয়, শান্তি দেয়। তাহলে প্রেম কি? প্রেম হলো ঐশী চেতনা বোধ। একে দেখা যায় না, এর কোন গন্ধ নেই, রূপ, রং, আকার আকৃতি কিছুই নেই। তবু এতে স্বাদ আছে, সুখ আছে, আনন্দ আছে। এতে যৌবনের মতো পরম তৃপ্তি আছে, আছে তার রাজ সিংহাসন। এর স্বাদ বুড়োবুড়ির গল্প বলার মতো সুখময়। তার সিংহাসন প্রজাপতির ডানার মতো গতিময়। এর যৌবন চাঁদনি রাতের আকাশের মতো নির্মল। তার আকর্ষণ কিশোরীর ডাগর চোখের দৃষ্টির ন্যায়। প্রেমের সম্পর্ক গভীর হলে, যতই দেখা যায় ততই কাছে যেতে মন চায়। তবু তার স্বাদ যেন ফুরায় না। আরো .... আরো ..... আরো... গভীরে যেতে মন হয় ব্যাকুল। কিন্তু যতই কাছে যাওয়া যায় তখন ও দেখা যায় তার কোন কূল কিনারা নেই। সেতো এক অসীম জগৎ। অফুরন্ত রহস্যের খেলা। এই অসীম জগতের অন্তরালে কার যেন অদৃশ্য কুদরতি হাত প্রসারিত। সেই কুদরতি হাতের কারুকার্যে এপার দুনিয়ার কাজ-কর্ম, কথাবার্তা আচার-আচরণের সাথে ওপার জীবনের রয়েছে নিগুঢ় সম্পর্ক। আত্মার সাথে দেহের যেমন সম্পর্ক, ক্রিয়ার সাথে প্রতিক্রিয়ার যেমন মিল, নাড়ীভুড়ির সাথে খাদ্যের যেমন দুস্তি, বস্তুর সাথে প্রতিবস্তুর যেমন সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তেমনি দুই প্রতিভাস। একটি যেমন দেহ অপরটি হলো তার ছায়া। সেজন্য দুনিয়ার অন্ধরা (মূর্খরা) ওপার জীবনেও থাকবে দৃষ্টিহীন। কিন্তু পরপারের জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে দুই ব্যতীক্রম ধর্মী নিবাস। যার সাথে পৃথিবীর আলো বাতাসের কোন মিল নেই। এই দুনিয়ার প্রকৃতি নামের দ্রুতযানের কামরায় চড়ে

www.pathagar.com

একই সাথে যেমন সুখী দুঃখী শিশু-কিশোর যুবক-বৃদ্ধ, পাপী-তাপী, মুমেন-মুসলমান সহ সকল যাত্রীরা তাদের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে কিন্তু পরপারের জীবনে সুখীর সাথে দুঃখীরা থাকতে পারবে না, একের সাথে অন্যের কোন দিন হবে না দেখা, হবে না কোন দিন মনের ভাব বিনিময়। তাই সুখীর স্থানে আছে শুধু সুখ-শান্তি, আরাম আর আরাম, আনন্দ ভালবাসাময় স্বর্গীয় অনুভূতি। অপর দিকে দুঃখীর স্থানে আছে শুধু দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা। এই দুনিয়াতে কোন প্রাণীই দুঃখ চায় না, কষ্ট চায় না, চায় শান্তি-সুখ ভালবাসা আর আনন্দ। সেজন্য পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই শান্তির সোনার হরিণের খোঁজে, তার অন্বেষায় ঘুর ঘুর করে ঘুরে। পাখিরা যেমন ঝড়ের সময় ঠাঁই খোঁজে, পশুরাও তেমনি ঝড় বৃষ্টির সময় আশ্রয় খোঁজে। মানুষ খোঁজে চির শান্তির যৌবন কসজো চির সুখের আবাস ভূমি। তারা চায় না দুঃখ-কষ্ট, চায় না মৃত্যু, ক্ষুধা, চায় না রোগ-যন্ত্র না চায় অমৃত সুধা, চায় চির যৌবন। কিন্তু এই পৃথিবী নামক গতিশীল প্রকৃতির কামরায় তো সে সুখ, সে যৌবন বসে থাকে না। গাড়ীর গতির সাথে সাথে দেহ ইঞ্জিনের খুটিনাটি যন্ত্রগুলো ও একদিন খটখটে হয়ে যায়। তখন প্রকৃতির জীবাণু যাত্রীরা সেই ফাঁকা জায়গায় চড়ে বসে। এতে করে দেহ যন্ত্রের অস্তিত্বের মাঝে শুরু হয় বিদ্রোহ চলে যুদ্ধ। পরিশেষে ঐ যুদ্ধে সে পরাজয় বরণ করে। তখন মৃত্যুই তাকে শান্তি এনে দেয়; বিশ্রাম এনে দেয়। সেই সাথে যৌবনেরও মৃত্যু ঘটে। আশার তরী অকালেই ডুবে যায়। প্রকৃতি নামের চলন্ত গাড়ীর কামরায় প্রচন্ড ভীড় ঠেলে অবিরাম গতির মধ্যেও যারা হতাশার সাগর পাড়ি দিয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে যেয়ে, জীবনের স্তব্ধতায় সবকিছু থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন তার বেলায় গতির মৃত্যু ঘটে। ফলে সময় তার ক্ষেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে সে অপেক্ষা করতে থাকে নতুন জীবনের জন্য, নতুন বাসস্থানের জন্য। তার প্রতীক্ষা অফুরন্ত যৌবনের জন্য। জীবন চায় সে অসীম। চায় অসীম সুখ-শান্তি ভালবাসা। কিন্তু সেখানের সকল সুখ-শান্তি আনন্দ-ভালবাসা সবি তো দুনিয়ার কর্মের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কর্মফল ভাল হলে জীবন হবে সুখের, আনন্দের আর মন্দ হলে জীবন হবে দুঃখের ও বিস্বাদের। দুনিয়ার ভাল কর্মের থেকে হয় পুণ্য আর মন্দ কর্ম থেকে হয় পাপ। আমরা প্রকৃতির নিয়মের সাথে

www.pathagar.com

একাকার হয়ে পাপ–পুণ্যের আকার, আকৃতি রূপ-শোভা আলো-বাতাস কিছুই দেখতে পারি না।

যে জিনিস দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না; তাকে নিয়েই যত সব সমস্যা। কেউ বলে পাপ–পুণ্য আছে। কেউ বলে পাপ–পুণ্য বলতে কিছুই নেই। কেউ বলে দুনিয়াটাই পাপের জায়গা। মরলেই মুক্তি। যত মন তত মতি, ততই যেন যুক্তির মহড়া। কেউ কারও সাথে হার মানতে চায় না। সত্যকে সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। সেই থেকে অনেক ভাবনার দানাগুলি দিয়ে উৎপত্তি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। সেই ভাবনার জগৎ পাহাড়ের মতো। মানুষের মনের ভাবনার পাহাড়গুলো হলো অসীম হিসেবে তার সীমাবদ্ধতার প্রাচীর। এই প্রাচীর ছেদ করে কেউ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না, মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে যেমন অপূর্ণ তেমনি সৃষ্টির শ্রেণীগত বৈষম্যের জন্যও তার দৈহিক সত্তা সব কিছুতে সহনশীল নয়। আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়। অনুরূপভাবে রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলেও মানুষ অস্বস্তিবোধ করে। আগুন দ্বারা যেমন আগুন আক্রান্ত হয় না তেমনি জীবাণুর দ্বারাও জীবাণু আক্রান্ত হয় না। পরিবেশের অধীনে শ্রেণীগত বৈষম্য এক প্রকার অপূর্ণতা। আমাদের পক্ষে এই অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে হজম করা সম্ভব হয় না। তবু আমরা নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আপেক্ষিকতাকে অবহেলা করে নিজেদের এই অপূর্ণতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে চরম,পূর্ণতা মনে করি। আমরা চিন্তার সাগরের যে যতটুকু অতিক্রম করতে পারি, সে ততটুকু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। মনে করি এর মাঝেই আছে সব সত্য, সব সমস্যা ও সব রহস্যের সমাধান। অথচ জগতের রহস্যের তখনো আমাদের বিন্দু পরিমাণ ও জানা হয়নি। কিন্তু এই সব বিন্দু জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মতবাদ। এই সব মতবাদ থেকে ধর্মীয় বিষয়েও ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের গড়া মতবাদ থেকে পাপ পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণী ভেদে যত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে সবি আপেক্ষিক ও ভুলের জালে আবদ্ধ। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং প্রবৃত্তির লালসা থেকে যে সব ভ্রান্ত মতবাদের উ ৎপত্তি হয়েছে সেগুলি মানুষের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সেখান থেকে সত্যের হাতিয়ার দিয়ে ভুলের জাল ছিড়েঁ

www.pathagar.com

ফেলতে হবে। কিন্তু এই জাল খুব মিহিন ও শক্ত। এতে শয়তানী হাতের কারুকার্য মেশানো। সেজন্য একে ছিঁড়তে হলে আলোর পথ অনুসরণ করতে হবে। কারণ শয়তানের কলিজা অন্ধকার ও বক্রবাহুর সীসাঢালা প্রাচীরের মতো শক্ত। সেই পথের অনুসারদেরও অবস্থা অনুরূপ। তারা জগৎময় অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দেখে না। তাদের কাছে আলেয়ার আলোই পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। অথচ তাদের ধারণা অন্তঃসার শূন্য বিভ্রান্তময়। এদের রয়েছে অনেক দল-উপদল, রয়েছে অনেক শাখা প্রশাখা। তারা একে অন্যের কথা বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকেই নিজেদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করে। বিভ্রান্তির অতল নরকেও তারা বেহেশতের সুখ তালাশ করে। কিন্তু শিকারীর অন্ধকার ফাঁদ থেকে তারা আলোর সন্ধান পায় না। তাই নিম্নে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণীভেদে যে ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তা তুলে ধরা হলো—

(১) এক শ্রেণীর লোক মনে করেন পৃথিবীটাই মহা পাপ ও মহাশাস্তির স্থান। যতোদিন এই জড়-জগতের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক থাকবে ততোকাল তাকে মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এখানেই ফিরে আসতে হবে। তাদের ধারণা মানব আত্মার প্রকৃত মুক্তি তার ধ্বংসে। একে তারা মহা নির্বাণ বলে। পুণ্য যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয় তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

(২) আর একটি দল আছে তারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষগণ ছিল খোদার অতীব প্রিয় ও মনোনীত ব্যক্তি। সেজন্য তারা পাপী হিসেবে দোযখে নিক্ষিপ্ত হলেও খোদা তাদেরকে ঐ বংশের মর্যাদায় বেহেশতে প্রমোশন দিবেন।

(৩) পরকালে বিশ্বাসী একদল লোক মনে করে খোদা তার একমাত্র পুত্রকে শূলিবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এর বিনিময়ে তিনি মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দিবেন। সেজন্য এই পুত্রের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে তাঁর কিছু গুণগান করলেই পরপারে মুক্তি পাওয়া যাবে।

(৪) আর একটি শ্রেণী আছে, যারা পরকালীন জীবনের সব কিছুতে বিশ্বাসী হলেও তারা দুনিয়াতে বিশেষ কিছু গুণ সম্পন্ন ও অতি শক্তিশালী

www.pathagar.com

ব্যক্তিগণকে পরকালের মুক্তির বাহন মনে করে। তারা এ রূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ ও রাসুলের সুন্নতী জীবন ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করে তাদের সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের ধারণা তিনি সন্তুষ্ট হলেই তাকে পরকালে মুক্তি করিয়ে দিবেন।

(৫) আর একটি দল আছে এরা পুনঃজীবন লাভ বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা পাপ ও পুণ্য বলতে কিছুই সেই। তারা মনে করে মানুষের দুনিয়ার জীবন ফুরিয়ে গেলেই তার অবলুপ্তি ঘটে।

(৬) আর একটি দল আছে নির্বোধ শ্রেণীর। এরা নদ-নদীর প্রবাহমান স্রোতের উপর ভাসমান কচুরীপানার মতো। তারা স্রোতের টানে ঢেউ এর ছন্দে ছন্দে নেচে দুলে হেলায় খেলায় জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কোথা হতে এল, কোথায় যাবে, কেন দুনিয়ায় এল, কিছুই জানে না। এদের মনে পাপ-পুণ্য বোধ বলতে কোন ধারণা নেই।

(৭) আমাদের মাঝে পরকালে বিশ্বাসী আর একটি শ্রেণী আছে এরা পাপ, পুণ্যে বিশ্বাসী হলেও দ্বীনের হুকুম আহকাম বেশী মানতে রাজী নয়। ওরা মনে করে অন্যায় ও অসৎ কাজ না করলেই হলো। বিচার তো অন্যায় আর অসৎ কাজেরই হবে, ল না করলেই তো মুক্তি পাওয়া যাবে। মূলত ঃ এরা পুণ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

(৮) সব শেষে ঐশী মতবাদের বিশ্বাসী শুদ্ধি শ্রেণীগণ মনে করেন, এ জগৎ পাপ, পুণ্যের সত্তা তৈরীর প্রকৃত স্থান। এই সত্তা নিজেদের অর্জিত সম্পদ। তাদের বিশ্বাসের মূল তাবিজ হলো ঐশী কিতাব। এদের মধ্যে নিজেদের কোন দর্শন নেই। তারা মনে করেন মানুষের জ্ঞান সসীম। তাই আমাদের দর্শন ভিত্তিক ধারণার উপর জীবন ব্যবস্থা চলতে পারে না।

উপরোল্লিখিত পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে কোনটি নির্ভুল ও সঠিক তা যাচাই বাচাই করার একমাত্র পথ হলো ঐশী কিতাব। পৃথিবীতে খোদা তা'আলা যুগে যুগে নবী, রাসুল (সঃ) গণদের পাঠিয়েছেন, নির্ভুল জীবন বিধান দিয়ে। যাতে মানুষ বিভ্রান্তির বেড়াজাল ভেঙ্গে আলোর পথে আসতে পারে । বর্তমান যমানায় একটি মাত্র ঐশী কিতাব ব্যতীত প্রায় সকল নবীর কাছে প্রেরীত ঐশী কিতাবগুলো সংরক্ষণ

www.pathagar.com

ধারা ঠিক না থাকায় সেগুলোতে অনেক কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে। একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক ঐশী কিতাবটি হলো আল-কোরআন । যারা এখনো আল-কোরআনের আলো পায়নি তারা এখনো বংশানুক্রমেই তাদের মুরব্বিদের ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে আসছে। তাদের রীতিনীতি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তারা একেই শুদ্ধ মনে করে। এমনকি তারা প্রয়োজনে নিজেদের দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনের তাগিদে সেসব ধর্মীয় রীতিনীতি রদ-বদল করে শিথিল ও সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনের মর্জি মতো বানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মর্জি মতো জীবন ব্যবস্থা চালানোতে যেমন কোন স্বার্থকতা নেই তেমনি এটি স্রষ্টার কাছেও গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রকৃত পক্ষেই মানুষের দর্শনভিত্তিক অনুমান বিজ্ঞানের যুক্তিতেই অকাট্য নয়। বিজ্ঞানের কথা হলো মানুষের দর্শন আপেক্ষিক। আল্লাহ বলেন—"তাদের কাছে কোন সত্যিকার কিতাব নেই, তারা শুধু আন্দাজ-অনুমানের পায়রুবী করে চলে। আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পূরণ করে না।" —(আন্ নাজম-২৮)

"যারা জ্ঞানবান লোক,তারা তোমার প্রতি প্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাবকে মনে করে যে, এ-ই হচ্ছে সত্য; এটি মানুষকে পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত আল্লাহর দিকে চালিত করে।" — (সাবা-৬)

"হে মুহাম্মদ। বলে দাও যে,যিনি আসমান ও জমিনের সমস্ত রহস্য জানেন, এ কিতাব তিনিই নাজিল করেছেন।" —(আল ফোরকান-৬)

বাস্তবিক পক্ষে আজ মানুষ যেটি সত্য মনে করে কাল সেটি সত্য না ও হতে পারে। কিংবা আজকে যা ভুল সেটিই আবার পরবর্তিতে মানুষের কাছে সত্য হতে পারে।

তাই পাপ পুণ্য কি এবং কোন পাথে হয় সে কথা মানুষের পক্ষে সত্য করে বলা সম্ভব নয়। আমরা যদি প্রকৃত পক্ষেই আমাদের দর্শনের আপেক্ষিকতা যাচাই বাচাই করে নিজেদের দর্শনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পথ চলতে সক্ষম হই, তাহলেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

www.pathagar.com

মানুষের দর্শন আপেক্ষিক ও অপূর্ণ

মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে এই সুন্দর পৃথিবী একটি পরমাণুর মতোও নয়। অংকের বেলায় যেমন, .০০০০০১ এ রূপ ভগ্নাংশ পরিমাণ সংখ্যাকে বাদ দিলেও অংকের ক্ষেত্রে তেমন ভুল হয় না, তেমনি মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে এই পৃথিবীকে বাদ দিলেও তেমন কোন ভুল হবে না। যে পৃথিবী মহাবিশ্বের তুলনায় একটি নগণ্য পরমাণুর ন্যায়ও নয়, সেই পৃথিবীই আমাদের কাছে কিনারা বিহীন ঝুড়ির মতো অসীম মনে হয়। আদৌ এর আগা গোড়া দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। না পারি জানতে সাগরের তলদেশের খবর, না পারি জানতে অরণ্যের পশু পাখির মনের কথা। এই পৃথিবীর একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে আমরা বাস করি। এখানের পশু পাখির চেয়েও আমাদের সীমাবদ্ধতা অনেক বেশী মনে হয়। এক রাষ্ট্রের পশু পাখি পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই অন্য রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াতে পারে। বি, ডি, আর-বি, এস, এফগণের সামনেই সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে এক দেশের গাছ থেকে অন্য দেশের গাছে আসা যাওয়া করে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে আমরা ততটুকু স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারি না। পাখিরা আকাশে উড়ে তাদের উড়োজাহাজ রকেটের প্রয়োজন হয় না। তারা পৃথিবীর মাধ্যাকার্ষণ শক্তির বাঁধা অতিক্রম করে অনেক উপর দিয়ে প্রকৃতির মাতৃসাগরে সাঁতার কেটে কেটে মনের আনন্দে পরম সুখে বিচরণ করে দিন ভর। কখনো বাতাসের সাথে মিতালী করে তার প্রবাহের অনুকূলে ডানা মেলে শান্তভাবে শুয়ে থাকে। কখনো আবার অভিমান করে তার উল্টো দিকে সাঁতার দেয়। মেঘ মুল্লুকের দেশ, পাহাড়ের চূড়া নিমেষেই তারা ঘুরে-ফিরে আসতে পারে। তাদের চলা ফেরার কোন ভয় নেই, বাঁধা নেই, মানা নেই, নেই কোন পাসপোর্ট ভিসার সমস্যা। কিন্তু তাদের তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধতা প্রচুর মনে হলেও তাদের জানার আগ্রহ নেই, চিন্তার মনিকোটা, ভাবনার ঝুড়ি এসব কিছুই নেই। অথচ আমাদের জানার ব্যগ্রতা আছে, চিন্তার মনিকোটা, ভাবনার ঝুড়ি সবি আছে। আমরা রহস্যের সন্ধান পেলে তার আগা গোড়া খুঁজি, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কিনার না পাওয়া যায় ততক্ষণ শুধু খুঁজতেই থাকি। কখনো ধ্যানের

www.pathagar.com

আসর বসিয়ে নিভৃতে চিন্তার মণিকোটা থেকে বের হয়ে আকাশের অনন্ত ঠিকানা পর্যন্ত, এমন কি পাতালপুরীর রহস্য রাজ্য ঘুরে আসতে পারি। তার পরও আমাদের জ্ঞানের সীসাবদ্ধতা, দেখার অপূর্ণতা সীমাঢালা প্রাচীরের মতো কঠিন মনে হয়। আমরা একে কোন ক্রমেই ভেদ করতে পারি না, তার বাইরে যেতে পারি না। স্থান-কাল, গতি, বস্তু ও ঘটনার সাথে একাকার হয়ে মিশে থাকে বলে আমরা আগে পরের কোন খবর বলতে পারি না। আমার জন্মের পূর্বে বিশ্বজগতের অবস্থা কেমন ছিল তা যেমন আমার পক্ষে এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, তেমনি আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কি ঘটবে তাও এখন বলা যাবে না। আগে পরের ধারণার মাঝে যেমন রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধতা তেমনি বর্তমানের ধারণার মাঝে ও রয়েছে প্রচুর অপূর্ণতা। আমরা কথায় কথায় বলি চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি অথচ এই কথাগুলি আদৌ পুরাপুরি সত্য কি, না তাও তলিয়ে দেখি না। কান দিয়ে যদি শুনাই যেতো তাহলে প্রতি সেকেন্ডে ২০ এর কম ও ২০,০০০ এর বেশী কম্পন সংখ্যার শব্দ কেন শুনতে ও বুঝতে পারি না। কেনই বা অন্য প্রজাতির প্রাণীর শব্দ বুঝতে পারি না। অপর দিকে চোখ দিয়ে যদি দেখাই যেতো তাহলে আমরা অন্ধকারের জিনিস, দূরের জিনিস কেন দেখতে পারি না। সে কারণে দেখতে হলে যেমন আলো থাকা দরকার তেমনি শুনতে হলে শ্রুত শব্দ ও কম্পন সৃষ্টিকারী মাধ্যম থাকা প্রয়োজন। আলো যদি কোন দৃশ্যের প্রতিবিম্ব তুলে নিয়ে আমাদের চোখের পর্দায় না পড়তো তাহলে চোখ অবিকল থাকলেও আমরা দেখতে পারতাম না। সেরূপে পৃথিবীতে যদি কম্পন সৃষ্টি হওয়ার মতো কোন মাধ্যম না থাকতো তাহলেও আমাদের কান থাকা সত্ত্বেও কিছুই শুনতে পারতাম না।

আমরা অনেক না দেখা জিনিসকে হৃদয়ের মণিকোটায় ভাবনার সূক্ষ্ম দানাগুলিকে দিয়ে আলোর প্রতিবিম্বের মতো সাজিয়ে সাজিয়ে তার ছবি এঁকে অনেক অদৃশ্য জিনিসেরও অস্তিত্ব স্বীকার করি। জ্ঞানের পর্দার উপর অনুভূতি নামক সূক্ষ্ম আটারী দিয়ে ধরে তাকেই যুক্তির নিক্তিতে তুলে ওজন করে বিশ্বাস করি। অথচ আমরা যত নিখুঁত ভাবেই দেখি না কেন, জ্ঞান সাগর কূলহীন বলে এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য কোন জিনিসকে নির্ভুল ভাবে দেখতে পারি না। পক্ষান্তরে সসীম হিসেবে অসীম দূর পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করারও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একটি জিনিসের পুরা

www.pathagar.com

অংশ এক সাথে দেখতে পারি না বলে আমরা সে জিনিসটির সম্পূর্ণ অংশ দেখার জন্য একই জিনিসের প্রতি খানিক স্থান পরিবর্তন করে আবার দৃষ্টি দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রথমে যেটুকু অংশ দেখা হয় সেখানেই যদি পর মুহূর্তে কোন কিছু ঘটে, তাহলে সে অবস্থাটি আমাদের জানার বাইরে থাকে। এখানেই আমাদের অপূর্ণতা। সে কারণে আমাদের দেখার বিষয়টি সবক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যা কিছু দেখি সব আপেক্ষিক। বস্তু ও সময়ের সূচনা একই সময় হয়েছে বিধায় বস্তু-কাল এবং গতি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। ফলে আজ যে জিনিসটি সত্য কাল তা সত্য নাও হতে পারে। অপর দিকে আমাদের বাহ্যিক জ্ঞান স্থান-কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও পরিবেশের অধীন। সে জন্য আমাাদের পক্ষে কোন জিনিসের পূর্ণ জ্ঞান নিতে হলে তার অভ্যন্তরের খুটিনাটি জিনিস অবগত না হয়ে তার সম্পর্কে কিছুই জানা-সম্ভব হয় না। বরঞ্চ এই জ্ঞানও একটি বিশেষ সময়ের জন্য কার্যকরী থাকে। যেমন সকাল বেলা পুকুরের পানি ঠান্ডা না গরম তা জানতে হলে পানিতে না নেমে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সকালে ঠান্ডা হলেও দুপুরে কেমন তা জানার জন্য আবারও পানিতে নামতে হয়। কারণ সকালের অভিজ্ঞতার উপর দুপুরের বর্ণনা দিলে তা সত্য নাও হতে পারে। সৃষ্টিকর্তা পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন "আমি প্রত্যেক জীবিত পদার্থকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি" —(২১ : ৩০)

কিন্তু আমরা পানিকে ভেঙ্গে রেণু রেণু করে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মৌল উপাদান পেলেও শত চেষ্টা করেও কোন জীবিত পদার্থ সৃষ্টি করতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা থাকার পিছনে অনন্ত রহস্য বিরাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। রাতের আকাশের অসংখ্য তারার মিটিমিটি দৃশ্য দেখে আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ হলেও সেখানে যে কি ঘটছে তা তো আমরা দেখতে পারি না। হয়তো এমন ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে যা দেখলে হয়ত আমাদের চোখ বিস্বাদে বন্ধ হয়ে যেতো। তখন হয়ত নয়ন মেলে দ্বিতীয় বার আর কিছু দেখার সাহস থাকতো না। কিংবা ভয়ে মন প্রাণ শিহরিয়ে হৃদ কম্পনের গতি বৃদ্ধি হয়ে দেহ কোষের আবরণ ভেদ করে পানির নহর বয়ে চলতো। তাই আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা জগতের অনেক কিছুকে আড়ালে রেখে আমাদেরকে মহান করুণায় বাঁচিয়ে রেখেছে বৈ কি। আমাদের জ্ঞানের ও দৃষ্টির

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতা শুধু প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখে না। সেই সাথে এটি সমাজ জীবনের আইনকে করে দেয় শিথিল ও লাগামহীন। সে কারণে মানুষের দর্শন আইনে পরিণত করা যায় না কিংবা তা সমাজ কাঠামো গড়ার জন্য অপরিহার্য্য মনে করাও ঠিক নয়।

মানুষের মনে রহস্যময় এক কীট সর্বদাই নড়া চড়া করে। সেটি ভাবনার পোকা। এই পোকা সৃষ্টির রহস্য খোঁজে,তার কিনার তালাশ করে।। এক সময় এই পথে ভাবতে ভাবতে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এ থেকে জগতের স্রষ্টার অনুপম দর্শন (মারেফাত) লাভ হয়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন মহা শিল্পীর শিল্পকর্মের উদ্ভাবিত ফর্মূলার নিয়ম নীতি অনুসরণ করা। যারা তাঁর উদ্ভাবিত ফর্মূলা অনুসরণ না করে নিজেই দক্ষ কারিগর সেজে স্রষ্টার সৃষ্টির তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, তারা সৃষ্টি সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এর ফাঁক দিয়ে সামান্য কিছু একটা জ্যোতির ঝলকানি দেখেই বলে দেয় জীবনের উৎপত্তি সাগরের লোনা পানি থেকে। পানি হতে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উৎপত্তি ঠিকই কিন্তু পরম আত্মার উৎপত্তি অন্য কোথাও । বর্তমানের আস্তিক বিজ্ঞানীদের ধারণাও তাই। কিন্তু জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য ভিন্ন পথের ভুল ব্যাখ্যাকারীগণ এবং তার অনুসারীরাও ভুলের মাঝে হাবুডুবু খায়। সে জন্য মানব রচিত জীবন দর্শন মূল্যহীন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই ভুলের দিকটিই আমাদের চোখে পড়ে। অথচ অমঙ্গলদায়ক রিপুটি প্রতিবারই আড়ালে থেকে যায়। অবশেষে এই রিপুটি একদিন প্রবল আকার ধারণ করে সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। তখন চরম বিশৃঙ্খলার প্লাবন শুরু হয়ে যায়। এতে দুর্ভিক্ষ, অনাচার, শোষণ, নির্যাতন মহামারী জীবনকে অকালেই কবরে ঠেলে দেয়। তাই স্রষ্টার জীবন বিধানই অভ্রান্ত ও নির্ভূল। এ পৃথিবীতে জীবন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা গড়ার জন্য মানব রচিত যত তন্ত্র, মন্ত্র দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে মূলতঃ তার সব কটি দর্শনই অপরিপক্ক। সে কারণেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হোতা কার্ল মার্কস ও লেলিনের দর্শন আজ আত্মহত্যা করেছে।

আমাদের দর্শনের আপেক্ষিকতার জন্য আমাদের মাঝে শ্রেণী ভেদে পাপ সম্পর্কে যত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার সব ক'টি বিভ্রান্তিকর। একমাত্র সত্য পথ ও জীবনদর্শন হলো অহীর নির্দেশিত পথ। সেটি এখনও মজবুত সংরক্ষণ ধারায় নির্ভুল ও অভ্রান্ত আছে। আমাদের পক্ষে পাপ পুর্ণ্যের অস্তিত্ব

২

www.pathagar.com

দেখা সম্ভব হয় না বিধায় এই পৃথিবীর বাইরে উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর স্থানে পাপ পুণ্যের সত্তা দিয়ে কোথায় কি তৈরী হচ্ছে তাও জানা সম্ভব হয় না। কারণ আমরা কোন ক্রমেই স্থান কালের উর্ধ্বে বিচরণ করতে পারি না।

আমরা না পারি একদিনের জন্য পৃথিবীর জীবন থেকে অবসর নিয়ে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার স্বাদ গন্ধ ভোগ করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে, না পারি মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম নিয়ে সেখানের তর্জন গর্জন কিংবা সুখ শান্তির খবর পৃথিবীবাসীকে দিয়ে যেতে। যেহেতু আমাদের পক্ষে সেরূপ জগতে পৌছে ফিরে এসে সেখানের আরাম আয়েশ সুখ দুঃখের জ্ঞান নেওয়া সম্ভব হয় না সেজন্য পৃথিবীর বস্তু ও তার গুণাগুণ বিচার বিবেচনা করেই পরজগত ও তার উপাদনের ধারণা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই ঐশী গ্রন্থেও আমাদের স্থান কালের অধীন বস্তু ও তার উপাদনের গুণাগুণের সাথে পরকালীন জীবনের অনেক সাদৃশ্য মূলক উপমা তুলে ধরা হয়েছে।

এককালে বস্তু সম্পর্কে বস্তুবাদীদের নিচক ধারণা মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তুলেছিল। তাদের ধারণা ছিল বস্তুর মৌল উপাদান ও তার গতি চিরন্তন। ফলে তারা এই পৃথিবীকেও চিরন্তন মনে করতো। সেজন্যই তারা পরকালীন জীবন এবং পাপ, পুণ্য আছে বলে বিশ্বাস করতো না। মানুষকে তারা বস্তু উন্নততর বিকাশ বলে ভাবত। অথচ তাদের দর্শনের এই আপেক্ষিকতার জন্য তারা একটি বিরাট সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উৎস হলো বস্তুর সম্পর্কে অতীত ধারণায় পুরাপুরি বিশ্বাস স্থাপন। কালের চাকা ঘুরে বিজ্ঞানেও চরম পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন অনন্ত অসীমের মূল সৃষ্টি রহস্যের কপার্ট উম্মোচন করে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের দেশে। আশার বৈতরণী তিলে তিলে সেই জীবন রহস্যের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে নতুন করে পাল তুলে ঐ জীবন সাগরে। সেই সাগর অনেক গহীন, অনেক প্রশস্ত। তাই যতই কাছে যাই না কেন তবু তার কূল কিনার পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিশ্ব জগত তার সম্প্রসারণ ধারায় প্রচন্ড গতিতে অনন্ত অসীমের দিকে ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়ে চলছে। পৃথিবীর স্বল্প আয়ু দিয়ে এর কিনার পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেখার মাঝে চিরদিনই আপেক্ষিকতা ও অপূর্ণতা থাকবে এটিই সত্য। প্রকৃত পক্ষে সব যদি জানাই যেতো তাঁহলে অনন্ত অসীম বলতে কিছুই থাকতো না। অথচ এই চিরন্তন

www.pathagar.com

সত্যকে যারা অবিশ্বাস করে পাপ পুণ্যের ধার ধারে না তাদের যখন দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির আপেক্ষিকতা তুলে নেওয়া হবে তখন তারা বলবে—

"হে আমাদের প্রভু, আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদেরকে পুরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করব; নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।"-(পারা ২১ সূরা সেজদাহ রুকু ২)

অতএব বস্তু সম্পর্কে অতীত ধারণার ভুল বিশ্বাসটুকু স্মৃতিপট থেকে মুছে পেলে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য বর্তমান বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করার জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে ডাকছে আর করুণ সুরে যেন বলছে, আসো.... হে পথ ভুলা মানব গোষ্ঠী! অন্ধকার পাপের পথ ছেড়ে কল্যাণের পথে এসো। এখানেই তোমাদের মুক্তি।

বস্তু সম্পর্কে অতীত ধারণা

আমাদের চার পাশে যা কিছু দেখি এসবই বস্তু বা পদার্থ। কিন্তু যা দেখি না এবং যার ওজন নেই সেখানে বস্তু বলতে কিছু নেই। পক্ষান্তরে ওজনহীন অস্তিত্ব আছে, অনুভব করা যায় কিন্তু স্থান দখল করে বসে থাকে না সেগুলো হলো শক্তি । সে জন্য পদার্থের বেলায় বলা হয়েছিল সেটি স্থান দখল করবে, ওজন থাকতে হবে এবং এর আদি মৌল ও গতি চিরন্তন হতে হবে। তা না হলে তাকে বস্তু বা পদার্থ বলা যাবে না। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ক্রম ধারায় বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন বস্তু বা পদার্থের মৌল বা যৌগের এক মাত্র ক্ষুদ্রতম কণা হলো অণু। এ ধারণা কিছুকাল বিশ্বাস মূলে আবদ্ধ থাকার খানিক পরেই বিজ্ঞানী জন ডেলটন (Dalton) পদার্থের অণুর ভেতর থেকে পরমাণু আবিষ্কার করেন এবং একেই তিনি বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর কণিকা হিসেবে গণ্য করেন। তার এ মতবাদ কিছু কাল চলতে থাকার পর বিজ্ঞানী জে,জে থমসন ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে পরমাণুর ভেতর আর একটি কণা 'ইলেকট্রন ' আবিষ্কার করে পুর্বের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটান। এর পরে পরেই আবিষ্কারের ক্রম

www.pathagar.com

ধারায় একটার পর একটা নতুন তত্ত্বের সন্ধান মিলতে থাকে। পরিশেষে বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা আরও গভীরে চলে গেল। সাথে সাথে আবিষ্কার হলো আরও দু'টি মৌলিক কণা নিউট্রন ও প্রোটন। বর্তমানে সে আবিষ্কারের ধারায় আরো অনেক কণা আবিস্কার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই Electron ও Proton ইত্যাদি কণার মূর্লে রয়েছে বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎও আবার দু'ধরনের যেমন ঋণাত্মক (Negative) ও ধ্বনাত্মক (Positive)। এগুলো সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায় সর্বদাই উঠা নামা করে। তবে সার্বিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাস ছিল, যে কোন ভর-শক্তি যা আলোর গতিতে চলে সেটি বিকীর্ণ শক্তি এবং যে কোন ভর শক্তি যা আলোর কমগতিতে চলে সেটি পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞানীগণ বস্তুর সংগায় বলেছিলেন শক্তির ঘূর্ণিভূত অবস্থাই পদার্থ। কিন্তু তখন শক্তি পদার্থে এবং পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারলেও তাদের ধারণা ছিল পদার্থ শক্তির মতো কাল্পনিক ছায়ায় রূপ নিতে পারে না। এ বিশ্বাস মূলে আবদ্ধ হয়ে বস্তুবাদী রাজনীতির আবর্তে মানুষ তখন হয়েছিল যান্ত্রিক মেশিন।

কিন্তু এই চিন্তা চেতনার দূষিত বায়ুর পঁচাগন্ধা তন্ত্র মন্ত্র বেশী দিন আর মানুষকে ধোঁকা দিতে পারেনি। যখন বস্তুর আসল মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল তখন বস্তুবাদী ধারণার জগদ্দল পাথরের বোঝা অপসারণ করে বস্তু এমন এক পর্যায়ে এসে গেল, যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই এখন মানুষ কল্পনার রাজ্যের কথা চিন্তা করতে লাগল। এতে পুনুরুজ্জীবিত হলো ধর্মীয় চেতনা। পরিশেষে বস্তু এবং ঘটনা হয়ে গেল একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। স্থান-কাল-গতির সম্পর্কে প্রতিটি ঘটনাই যেন এক একটি বস্তু বা পদার্থ।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বস্তুর ব্যাখ্যা আমাদেরকে এমন এক পয্যায়ে নিয়ে চলেছে যার শেষ যে কোথায় তা নিশ্চিত করে বলাই কঠিন। যেমন বস্তুর এই নতুন ব্যাখ্যাতে মৃত্যুর খবর, পুনরুত্থান, বেহেশত-দোযখের যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাই বলা যায় বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা যেন জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পারমাণবিক বোমার চেয়ে বড় হাতিয়ার।

www.pathagar.com

বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা

শক্তি ও পদার্থের সংগার দ্বন্দ যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন আবিষ্কার হলো নতুন এক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব পদার্থের আবরণ ছেদ করে তাকে করেছে বস্ত্রহীন। ১৯২৪ সালে ডি ব্রগল প্রমাণ করলেন বস্তুর দ্বৈতরূপ আছে। যেমন কণিকা রূপ এবং ঢেউ এর রূপ। অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত রূপ কাঠামোর আকারেও থাকতে পারে। আবার শুধু শুধু ঢেউয়ের ন্যায়ও থাকতে পারে। তাই ঢেউ বা তরঙ্গ যখন নিজের স্বতন্ত্র অবস্থায় অণু বা পরমাণুর দ্বারা শোষিত বা বিকিরিত হয় তখন এই ঢেউ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ লাভ করে। এতে প্রতিটি ঢেউ একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই ঢেউ বা তরঙ্গ গুচ্ছকে বলা-হয় ফোটন। এটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ার পর বস্তু এমন এক পর্যায়ে এসে অবস্থান নিয়েছে, যে বস্তু এতোদিন ছিল আকার তুল্য সেই বস্তুই এখন না ধরা যায়; না দেখা যায়। আধুনিক বস্তুর সংগায় এখন আর বস্তুকে আংশিক স্থান-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। প্রায়ই বস্তুকে আর বস্তু বলে মনে হয় না। বস্তু এখন মনন-অনুভূতির কাছে কাল্পনিক ছায়া মাত্র। যা আকার বিহীন, অদৃশ্য শূন্যে বিলীয়মান, অতিসূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে পরিচিত। এটি একটি বিদ্যুতের কণা কিংবা সম্ভাব্য কোন ঢেউও হতে পারে। সে যাই হউক না কেন; তবু সেটি বস্তু। এই আবিস্কারের পর থেকে বর্তমান ধারণায় আর এক নতুন যুগের সন্ধান নিতে লাগলো। হয়তোবা এই আবিস্কারের সিঁড়ি বেয়ে যাওয়া যাবে অনেক দূর সীমানায়। তখন হয়তো আমরা জানতে পারবে বিকীর্ণ কর্মশক্তির খবর। যা আমাদের মন ও দেহের থেকে বিকীর্ণ হয়। এই পথ ধরে হয়তো আরও জানা যাবে পরকালের কথা। সে আশা কল্পনার বিষয় বস্তু নয়। কারণ যে আলোক শক্তির আচরণকে আমরা দীর্ঘদিন তরঙ্গ রূপে জেনে এসেছি এবং ইলেকট্রনকে কণিকারূপে অথচ বর্তমান বিজ্ঞান এই আলোকের কথাই বলছে যে, সেটি শক্তি গুচ্ছ রূপে আচরণ করে এবং গতিশীল কণিকা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। তাই তরঙ্গ অবস্থা বিশেষে পদার্থ এবং একটি তরঙ্গই একটি স্বতন্ত্র কোয়ান্টাম। এই কোয়ান্টামের অপর নাম ফোটন। বিজ্ঞানের এ সব যুগান্তকারী পরিবর্তন দিনে দিনে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব

www.pathagar.com

করে দিচ্ছে। অনেক অজানা পথকে করছে আবিষ্কার। তাই বিকীর্ণ কর্মশক্তির পথ ধরে পরকালের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আধুনিক বস্তু আজ সেই অজানা রহস্যের দ্বারা প্রান্তে এসে প্রহরীর মতো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে বৈকি? এ পর্যায়ে এসে বস্তু এবং ঘটনা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ মনে হয়। পূর্বেই বলছি এখন আর ঘটনা থেকে বস্তুকে এবং বস্তু থেকে ঘটনাকে আলাদা করা যায় না। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বস্তু এবং ঘটনা একি জিনিস মনে হয়। এখন ঘটনাকে তত্ত্ব কণা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। কার্যতঃ ঘটনার কোন পারিপার্শ্বিক অস্তিত্ব থাকে না। একে না পারা যায় ধরে রাখা, না থাকে তার পদার্থের মতো কোন রূপ। বর্তমান পদার্থের সংগায় যেহেতু পদার্থ আর আগের অবস্থায় নেই সুতরাং এখন আর টনাকেও পদার্থ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। একে পদার্থ না বলে প্রতিবস্তু বা তত্ত্ব কণা বললেও ভুল হবে না। এই মহা বিশ্বের কোথায় যে কি আছে তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি যে হারিয়ে যাচ্ছে এ কথা তো আর জোর দিয়ে বলা যায় না। বস্তুকে ভেঙ্গে যতই ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে ততই যেন একে শক্তিশালী মনে হচ্ছে। আসলেই স্থূল জিনিস এখন বোঝার মতো মনে হয়। এর যেন ঘুম-নিদ্রা খাওয়া-পরা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কিন্তু সেদিক থেকে সূক্ষ্ম সব কিছু শক্তিশালী ও চলা ফেরায় সহজ মনে হয়। তাই আমাদের মনে কল্পনা জাগে আলোর মতো সূক্ষ্ম দেহ হলে কতই না সহজ হতো। এই ভাবনা পরকালের অনন্তের সন্ধানে আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে নতুন পথ তালাশ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । সেজন্য এখন আমরা ভাবতে শুরু করেছি আমরা কোথা হতে এসেছি? কোথায় চলেছি? কেনইবা এই আসা যাওয়া? সারা জীবন খেয়ে কত শক্তি না হজম করে ধোঁয়ার মতো কিংবা আলোর মতো বিকিরণ করেছি! এগুলো কি আমাদের দুনিয়ার উপার্জিত সম্পদ? এর সাথে কি পাপ পুণ্যের কোন সম্পর্ক আছে? আধুনিক বস্তুর সংগা এখন আমাদেরকে নতুন করে বিকীর্ণ কর্মশক্তি সম্পর্কে এতো কিছু ভাবার পথ করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

বিকিরণ শক্তি কি ?

বিকিরণ শক্তি বলতে শূন্যে বিলীয়মান অদৃশ্য শক্তিকেই বুঝায়। যা প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফুর্তভাবে অথবা কাজের মাধ্যমে ব্যয় হয়। সূর্য যেমন তার মওজুদ ভান্ডার থেকে অহরহ শক্তি বিকিরণ করে তেমনি এ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কণা শক্তি শোষণের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত অনুরূপভাবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। সে রূপে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে আমাদের দেহ কোষের পরমাণুর গা ভেদ করে শক্তি বিকিরণ হয়। যে শক্তি একবার বিকীর্ণ হয় এই শক্তি পৃথিবী কিংবা সূর্য কেউ কোন দিন ফিরে পায় না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এই বিকীর্ণ শক্তি শূন্য মাধ্যমে সঞ্চালণের সময় তার কোয়ান্টাম অবস্থা বজায় রাখে। অর্থ্যাৎ শক্তি বিকিরণের সময় সেটি অবিরত ভাবে না হয়ে সবিরাম ভাবে শক্তি গুচ্ছের আকারে বিকিরণ হয়। এই স্বতন্ত্র শক্তি গুচ্ছকে ফোটন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ফোটন তার নিজের তরঙ্গ প্রকৃতি ও স্বতন্ত্রতা সকল সময় বজায় রাখে। যখন বিকীর্ণ শক্তি কোয়ান্টাম হিসেবে নিঃসৃত হয় তখন তার শক্তি পরিবর্তন করে ভিন্ন কম্পাংক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র শক্তির ফোটন রূপ পরিগ্রহ লাভ করে। এতে প্রতিটি ফোটন একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান থাকে। বিকীর্ণ শক্তির বেলায় কতগুলি ঘটনা এর স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ করে। যেমন কৃষ্ণ কায়া বিকিরণ (Black body radiation) শক্তি, আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি , কম্পটনের প্রভাব ইত্যাদি। বিশেষ করে এই স্বতন্ত্র প্রভাবগুলো তাদের গুণগত আচার আচরণকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সত্তা হিসেবেই আলাদা করে রাখে। যেহেতু সূর্য কিংবা পৃথিবী এগুলি ফিরে পায় না, তাই এই বিকীর্ণ সত্তার স্বতন্ত্র কাঠামোর সত্তাগুলি স্বতন্ত্র গতিতে (নিজের নিজের) নিজ আচরণ ও স্বভাবের স্থায়ীত্ব নিয়ে মহাবিশ্বের কোথাও গিয়ে হয়তো জমা হচ্ছে। পক্ষান্তরে শক্তির অবিনশ্বরতা বা ধ্বংসহীনতা যেন একথা বিশ্বাসের পথ আমাদেরকে বাতলিয়ে দেয়। তবে ইলেকট্রনের মতো ফোটনেরও ভগ্নাংশ আছে কি-না তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন। বর্তমান বিশ্ব কোন সময়ই এক জাগায় বসে থাকছে না। বাতাস ভর্তি করার সময় বেলুন যেভাবে ফুলতে থাকে, সেভাবেই এটি অহরহ সম্প্রসারণ হয়ে চলছে। এই সম্প্রসারণের গতি এতো দ্রুত যে, আলোর পক্ষেও তার কিনার পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, এ বিশ্বের সম্প্রসারণ বিকীর্ণ শক্তির দ্বারাই হচ্ছে । কারণ এই সত্যকে অস্বীকার করার মতো বিজ্ঞান সম্মত কোন যুক্তিই আমাদের হাতে এখনো আসেনি। বরং এই

www.pathagar.com

যুক্তির পক্ষে হাজারো উপমা দেয়া সম্ভব। কারণ বিকীর্ণ শক্তির অবিনশ্বরতার জন্য এর একটা অবস্থান স্বীকার করেই নিতে হবে। বিকীর্ণ স্বতন্ত্র শক্তি গুচ্ছ (ফোটন) শূন্য মাধ্যমের মধ্যদিয়েও আলোর গতিতে সঞ্চালিত হয়। এই ফোটন কণা আমাদের দেহ কোষ থেকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে সবিরাম ভাবে একটার পর একটা নিঃসৃত হতে থাকে। এর শক্তির পরিমাণ $E=h\nu$ ।

এখন আসা যাক মূল কথায় । আমি কেন বিকীর্ণ শক্তি নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছি। এর একটি মাত্র কারণ, তাহলো আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে যে শক্তি বিকিরণ করি এগুলোর সাথে কি পাপ পুণ্যের কোন সম্পর্ক আছে? সূর্যের মতো আমরাও যে শক্তি বিকিরণ করি এর একটি মাত্র প্রমাণ হলো আমাদের ক্ষুধা লাগা। যেহেতু কিছু সময় পর পর আমাদেরকে ক্ষুধায় তাড়িত করে আবার খাদ্য খেলে তা নিবারণ হয়ে যায়। সুতরাং ইচ্ছাই হউক আর অনিচ্ছাই হউক আমাদের ক্ষেত্রে শক্তিকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। একবার খেলে যদি আমাদের দেহ হতে শক্তি বিকিরণ না হতো তাহলে ক্ষুধা লাগার প্রশ্নই দেখা দিত না। কিন্তু কর্ম আর অকর্মের মাধ্যমে যে শক্তি আমাদের দেহ থেকে হারিয়ে যায় সেগুলোর গুণগত মানের সাথে আমাদের পাপ-পুণ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি? এ মুহূর্তে হয়ত আমরা এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না। কারণ এ সম্পর্কে আমরা অদ্যাবধি কোন দিন মাথা ঘামাইনি। হয়তবা কোরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণার ফল থেকে যদি একটি নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় তাহলে বলা যেতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়ে কথা বলাই হবে মূর্খতার সমান।

আমরা যদি আমাদের বিকীর্ণ শক্তিগুলোকে শূন্য থেকে ধরে এনে দেখতে পারতাম, তাহলে হয়ত এর উত্তর দিতে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু শূন্য থেকে বিকীর্ণ শক্তিকে ধরে এনে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কারণে এর একটা অনুমান ভিত্তিক তত্ত্ব তালাশ করে এর সত্যতা যুক্তির মাপকাঠিতে ফেলে যাচাই করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'ধরি' কিংবা 'মনে করি' এরূপ ধার করা বাহন গ্রহণ করার নিয়ম প্রচলন থাকতে দেখা যায়। সুতরাং দর্শনের দৃষ্টিতে এরূপ ভাবে এগুতে এগুতে যদি এর কাছাকাছি কোন তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায় তবে বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। তারপর দর্শন, বিজ্ঞান, কোরআনও হাদিসের যুক্তি যদি একই স্তরের হয় তবেই বলা যাবে মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ, পুণ্যের সম্পর্ক নিহিত আছে।

www.pathagar.com

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কি পাপ পুণ্য ?

ভাবি যদি অনেক দূরে যাব, এমন দুরে যেখানে আকাশ মাটির সাথে মিতালী করছে। কিন্তু এমন জায়গা কি কখনো খুঁজে পাব? যদি না পাই তবু হাঁটতেই থাকব আজীবন। এ বিশ্বের অনেক জিনিসের অন্ত আছে, শেষ আছে আবার অনেক জিনিসের কোন অন্ত নেই, শেষ নেই, পরিমাণ নেই। তবু আমরা অন্তহীন জিনিসেরও ঠিকানা খুঁজি। এতে আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা কেটে যায়। হৃদয় তখন সাগরের মতো কূলহীন বিস্তৃতিলাভ করে। এতে সৃষ্টির প্রতি জাগে করুণা। স্রষ্টাকে তখন অনেক অসীম মনে হয়। মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কি পাপ, পুণ্য? এ বিষয়টি এক কূলহীন ভাবনা। এ প্রশ্নের কতটুকু সমাধান পাব এ মুহূর্তে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবু এ পথে এগুতে এগুতে যে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি নেওয়া যাবে সে কথা জোর দিয়েই বলা যায়। পৃথিবীতে সুস্থ দেহ-মন নিয়ে কেউ বসে থাকে না। সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো উঁকি দেওয়া শুরু করলেই মানুষ কর্মক্ষেত্রে সৈনিকের মতো ঝাপিয়ে পড়ে। কেউ বের হয় স্রষ্টার আনুগত্যশীল হয়ে, হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে আবার কেউ বের হয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে জন্য সবার নিয়ত কর্ম এক রকম হয় না। তাই জীবন থেকে কর্মের সুকৃতি কিংবা দুষ্কৃতি মুছে ফেলা যায় না। এ পর্যায়ে জীবনের সাথে কর্মের নিবীড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে জীবনের সাথে কর্মের যেমন সম্পর্ক তেমনি পাপ পুণ্যের সাথে কর্মফলেরও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। দেহ যদি জীবনহীন হয়ে পড়ে তবে সেটি কর্মহীন হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে পাপ পুণ্য ও কর্মফলের দরজায় তালা লেগে যায়। তখন জীবনহীন দেহ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয় না। ফলে সে যেমন খাওয়া দাওয়া করে না তেমনি বিকিরণের দরজায়ও লেগে যায় তালা। সে জন্য এখানে কর্ম ও বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে পাপ, পুণ্য ও কর্মফলের সম্বন্ধের একটা আভাষ পাওয়া যায়। তাই যদি না হবে তবে, পৃথিবীর জীবন কি দিকভ্রান্ত, পালহীন, হালহীন নৌকার আরোহীর মতো কোন তাসের ঘর? এর কি কোন মূল্য নেই? জীবন সমস্যার অথৈ-সাগরে শত ভয়-ভীতি দুঃখ-কষ্টের মাঝেও আশার বৈতরণী আমাদের প্রেরণার উৎস। অনেকের এই যাত্রা পথ হয় উদ্দেশ্যহীন। উদ্দেশ্যেহীন যাত্রীরা ভাবে জীবনের

www.pathagar.com

এখানেই শেষ। তবু তারাও আশার তরী নিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে। তবু কেন একদিন আশার বৈতরণীর পাল ভেঙ্গে জীবন চলে যায় মাটির মূর্তিটিকে মাটির ভুবনে একাকী ফেলে দিয়ে? জানি এর কোন বাস্তব চিত্র তুলে ধরা যাবে না। তবু জীবনের জন্য কার না মায়া হয়। একে সবাই আঁকড়ে রাখতে চায়। এর জন্য প্রেম হয়, আবেগ জাগে। তাই জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ কার না আছে? আসলেই জীবনের শেষ হয়ে যাওয়া কেউ চায় না। সকলেই চায় আপন আপন জীবন সত্তা নিয়ে অমর হয়ে বেঁচে থাকতে। ফলে বেঁচে থাকার জন্য জীবনকে নিয়ে জ্ঞানীর ভাবনার শেষ নেই। তাই তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরতে জ্ঞান শিল্পীরা তুলি নিয়ে থাকেন বসা। তারা জীবনকে আপন করতে চায়, পোষ মানাতে চায়। সেজন্য আগ্রহ ভরে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে, কেন এই পৃথিবীতে আসা হলো? কেনই বা আবার চলে যেতে হয়? আসা যাওয়ার মধ্যেই কি জীবন শেষ হয়ে যায়? পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ নিয়ে কতজনই না ভাবতে ভাবেত অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় জীবনের এখানেই শেষ ইতি ভেবে জীবনকে যথেচ্ছা ভোগ করার জন্য পঙ্গপালের মতো নিয়ম-নীতি মানতে রাজি হয়নি। কিন্তু ঐশী বিধান তো এ কথা স্বীকার করেনি। নদীর যেমন দু'কূল আছে, টাকার যেমন এ পিঠ ওপিঠ থাকে, জল ও স্থল নিয়ে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, শোষণের সাথে যেমন বিকিরণের সম্পর্ক তেমনি এ পাড় জীবনের সাথে ওপাড় জীবনের রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। প্রকৃতির সুষম নীতির পক্ষ থেকে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, এ পাড় জীবন নদীর ঢেউ ওপাড়েই হবে ঠাঁই। জীবন নদীর এপাড়ের কর্ম ওপাড়েই বাঁধবে বাসা। এ কূলের ঢেউ সেকূলকে সাজাবে নিজের মতো করে। এটিই যেন প্রকৃতির কাছে সত্যতার বড় প্রমাণ। এক ঘরের তিন দিক বায়ুরুদ্ধ করে যদি এক দিক খোলা রাখা হয় তাহলে প্রকৃতিগত ভাবেই সে ঘরে বায়ু প্রবেশ করবে না। বায়ু প্রবেশ করার জন্য কম পক্ষে দু'দিক খোলা রাখা প্রয়োজন। যদি দু'দিক খোলা থাকে তবে কখনো ঠান্ডা সুশীতল বায়ু প্রবেশ করে ঘরটিকে তার স্পর্শে শীতল ও প্রাণ উদ্দীপনায় মুগ্ধ করে ঐ বায়ুর দানাগুলো ঘরের কিছু সুগন্ধ তার গায়ে মেখে বের হয়ে যাবে অন্য রাস্তায়, এটিই নিয়ম। তবে ঐ ঘরে সুগন্ধি মূলক উপাদান থাকতে হবে। অথবা কখনো গা পুড়া গরম বাতাস সবেগে প্রবেশ করে ঘরটিতে তুফান তুলে সেই ঘরের

www.pathagar.com

উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাপ, পুণ্যের যদি প্রকৃতিগত অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় তবে এর সঠিক উত্তর দেয়া যাবে। তখন হয়তো দেখা যাবে মূল জিনিসটি একই। কিন্তু ভিন্ন পরিভাষায় তাদের নাম হয়েছে ভিন্ন রকম। মানুষের কর্মজীবনের প্রতিটি কাজকর্ম আচার আচরণ শরীরকে গতিশীল না করে করা যায় না। পক্ষান্তরে মানব মনও কর্মহীন থাকে না। অনেক সময় দেহ বসে থাকলেও মন নিরবে বসে কাজ করে। মনের কাজ ভাবনার মাঝে কেটে যায়। এ সময় মনের শরীর বসে থাকে না। তার মধ্যেও চঞ্চলতা বিরাজ করে। মূলতঃদেহ ও মন উভয়ের কাজের বেলায় তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের সত্তাতে গতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হয়। সার্বিক অর্থে মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজহীন থাকে না। তার ঘুম-নিদ্রা, আহার-বিশ্রাম সবি তার কাজ। অন্য দিকে সকল কাজই মনের উদ্দীপনায় হয়। শরীর যখন মনের উদ্দীপনায় গতিশীল হয়ে তার বাস্তব কর্ম সম্পাদন করার জন্য কর্মে লিপ্ত হয় তখন তার কর্মের মাধ্যমে শক্তি ব্যয় হয়। সেজন্য কিছু সময় পরপর শরীর চায় শক্তি। সে কারণে নির্দিষ্ট সময় বিরতির পর আবার আমাদের খাদ্য খেয়ে নিতে হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ শক্তি আহরণ (খাদ্য থেকে) করে এবং ব্যয় করে। এই চক্র এক দু'দিন নয় যত দিন জীবিত থাকে ততদিনই চলে। কিন্তু যে শক্তি কর্মজীবনের আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকৃতিতে বিলীন হয়, সেই শক্তির গায়ে কি গতির কোন নিজস্ব প্রলেপ পড়ে? গতির প্রলেপের জন্যই কি বিকীর্ণ শক্তির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়? কি করে এর উত্তর জানব। এই শক্তি এতো মিহিন যে, একে না দেখা যায়, না স্পর্শ করা যায়।

ভর-শক্তির নিত্যতা সূত্রের ব্যাখ্যা হলো শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই। শক্তি শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপ নিতে পারে। আমরা যে শক্তি বিকিরণ করি একে যেহেতু পৃথিবী এবং সূর্য ফিরে নেয় না, বাতাস ও গ্রহণ করে না সুতরাং আমাদের দেহের বিকীর্ণ কর্মশক্তি বা জ্বালানিশক্তি ক্ষয় না হয়ে ভিন্ন রূপ নিয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়। এই শক্তি যদি অদৃশ্য হওয়ার সময় আগের অবস্থায় থাকতো তবে সূর্য ফিরে না নিলে ও পৃথিবী তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে নিত। মায়ের গর্ভে সন্তান আসলে সে তো আর কোন দিনই সেখানে বিলীন হয়ে যায় না। গর্ভের সন্তান জীবিত কিংবা মৃত অথবা বিকলাঙ্গ যাই হউক না কেন তাকে মাতৃগর্ভ থেকে কোন না কোন

www.pathagar.com

অসংখ্যক ময়লা আর ধুলি বালি ও সংক্রামক জীবাণু তার শিরায় শিরায় লাগিয়ে ঐ বায়ু দানাগুলোও বের হয়ে যাবে অন্য রাস্তা দিয়ে। কিন্তু এই দু'ধরনের বায়ুকে যদি প্রকৃতির মুক্ত বায়ু গ্রহণ না করে তবে ঐ বায়ুর দানাগুলো যাবে কোথায়? নিশ্চয়ই ঐগুলি নিজেরা ঠাঁই পাওয়ার আশায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়ত কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিবে। এটিই প্রকৃতির বিধান। তা না হলে সেগুলি যাবেই বা কোথায়? সেজন্য জীবনের যেমন একপিঠ থাকতে পারে না সেই সাথে কর্মশক্তি (বিকীর্ণশক্তি) হারিয়ে যেতে পারে না। জীবনের যদি এক পিঠ থাকতো তাহলে প্রকৃতির নিয়মেই তা বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। সেজন্য জীবনের ওপিঠের কথা এখানেই চিন্তা করতে হবে। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে যতদিন সে বেঁচে থাকে ততদিনই সে সম্মুখ রাস্তায় উদরে খাদ্য নেয়। এই উদর ভর্তি খাবারের সার অংশ দিয়েই তার জীবন সচল থাকে। যে শক্তি তাকে সচল রাখে সেই শক্তি জীবকোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়েই ক্রমে ক্রমে নির্গত হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছাড়া এগুলি যাবেই বা কোথায়? কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তিগুলি শূণ্যে বের হয়েই সে হয়ে যায় অসহায়। একে পৃথিবী কিংবা সূর্য আর ফিরে নেয় না। বাতাস ও থাকে ধরে রাখতে পারে না। পানিতে ও সেগুলো মিশে না। আকাশের মেঘ মুলুকেও তাঁকে ঠাঁই দেয়না। তাই সেগুলো খুঁজতে থাকে নিজের ঠিকানা। আলোর বেগে ছুটে চলে নিয়তির তালাশে। যেতে থাকে মহাবিশ্বের অসীম অনন্তের দিকে। তারপর বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টি রহস্যের জ্বালে সেগুলো অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু সেখানে এগুলো দিয়ে যে কি বানানো হচ্ছে তা নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারি না।

মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ, যৌনাঙ্গ ইত্যাদি ও তাদের কথাবার্তা এবং অদৃশ্য মনের মাধ্যমেও দু'ধরনের সত্তা তৈরী হয় বলে জানা যায়। ধর্মের পরিভাষায় এর নাম পাপ এবং পুণ্য। প্রকৃত পক্ষে এ দু'ধরনের সত্তার সাথে বিজ্ঞানের পরিভাষার বিকীর্ণ সত্তার কোন সম্পর্ক আছে কি?

পাপ, পুণ্য যদি স্রষ্টার মওজুদ ভান্ডারের গচ্ছিত কোন সম্পদ হয় তাহলে এর সাথে সম্পর্ক থাকার কথা নয়। যদি পৃথিবীটা পাপ পূণ্য তৈরীর ক্ষেত্র হয় তাহলে এর সাথে সম্পর্ক থাকাটা যুক্তিতে আসতে পারে। আসলেই তো দুনিয়াটা আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। তাই একে যুক্তিহীন বলে

www.pathagar.com

ভাবে পৃথিবীতে বের হয়ে আসতেই হয়। এখানে আসলে পরে সে যদি জীবিত থাকে তাহলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে বরণ করে নেয় কিংবা মৃত হলে তাকে মাটির গর্তে পুঁতে রাখতে হয়। তারপর ঐ গর্তের মাটির সাথে সেটি পচেঁ গলে মিশে যায়। তবু তার অস্তিত্ব ধ্বংস হয় না।এর শেষ থেকেই যায়। প্রাথমিক অবস্থায় একে মাটি গিলে ফেললেও সময়ের আবর্তে মাটি দেহের সত্তাগুলিকে প্রকৃতিতে বমি করে দেয়। কোন ক্রমেই একে হজম করতে পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের উদর যে খাদ্য খায় তার সারাংশ যখন রক্তে মিশে দেহের শক্তির যোগান দেয় তখন এই শক্তিকেও দেহ হজম করে ধরে রাখতে পারে না। এই শক্তি সময়ের ফাঁকে ফাঁকে কর্মের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়। আবার শূন্য ও তাকে হজম করে বিনাশ করে দিতে পারে না। কারণ এ রূপ হওয়া বিজ্ঞানের বিধানে নেই। মাতৃ-গর্ভের সন্তান যেমন জীবিত অথবা মৃত কিংবা বিকলাংগ হতে পারে সেরূপে আমাদের দেহের ও মনের বিকীর্ণ সত্তা উত্তম মানের অথবা মন্দ স্বভাবের কিংবা মৃত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ভাল-মন্দ, মৃত কিংবা জীবিত যাই হউক না কেন সেগুলোর গুণাগুণ যে অক্ষুন্ন থাকবে সেটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সন্তান জীবিত কিংবা মৃত অথবা বিকলাংক ইত্যাদি হওয়ার ব্যাপারে সন্তানের কোন ভূমিকা না থাকলেও মার কিছু বিশেষ আচার-আচরণ ও সংক্রামক ব্যাধি সন্তানের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তার সৌন্দর্য্য বিকৃতি ও ঘটতে পরে। আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি পয়দা হওয়ার ব্যপারে আমাদের সরাসরি হাত না থাকলেও আমাদের আচার আচরণগত গতির কিছু প্রভাব তার গায়ে লাগতে পারে। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তি আমাদের স্বভাব গতির উৎপাদিত সন্তান। এই সন্তান ভাল কিংবা মন্দ প্রকৃতির হওয়ার পিছনে অনেক যুক্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু একে ধরে এনে দেখানো সম্ভব নয়। এই সন্তান জন্ম নিয়ে শূন্য রাজ্যে অদৃশ্য হলেও এরা কারও ধার ধারে না। মহা শূন্যের কোটি কোটি ছায়া পথের সুদূর কোন ঠিকানায় সেগুলো জাগা করে নিয়ে তার জন্মদাতার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দিন গুনতে থাকবে নিরবে, এটিই প্রকৃতির খেলা। শেষ দিবসের বিচার অনুষ্টানের পর তার পিতাকে সে নিজের মাঝে ঠাঁই দিয়েই যে ধন্য হবে। এ বিকীর্ণ সন্তান যদি ভাল স্বভাবের হয় তবে পিতার

www.pathagar.com

জীবন হবে সুখময় আর যদি মন্দ স্বভাবের হয় তাহলে পিতা ভোগ করবে সন্তানের জ্বালাময় কষ্ট। এটি চিরন্তন সত্য। মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্ম শক্তিগুলো দেহকোষের জন্ম দেয়া অদৃশ্য সন্তান। মা যেমন প্রসব পথে সন্তান জন্ম দেয় অনুরূপভাবে দেহ কোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে যে শক্তি প্রসব হয়ে আসে এ গুলোও অঙ্গের কোষস্থ পরমাণুর জন্ম দেয়া সন্তান। এই অদৃশ্য সন্তান গুলো ইন্দ্রিয় দৃষ্টিকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেলেও কল্পনার রাজ্যে তারা ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দৃষ্টির আপেক্ষিকতায় একে কল্পণার রাজ্যে বন্দী করে রাখে। তাই একে এখন দেখতে না পারলেও দৃষ্টির আপেক্ষিকতার অবসান হলে তাকে দেখতে কষ্ট হবে না। আমরা যদি এই অদৃশ্য বিকীর্ণ সন্তানের স্বভাব, চরিত্র, আকার, আকৃতি রূপ গুণকে মানব চরিত্রের আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণ করতে পারি, তবেই সেগুলোকে পাপ-পুণ্য হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারব।

পৃথিবীতে আমরা কোটি কোটি মানুষ একই পরিবেশের অধীনে বসবাস করি। এখানে আছে সৎ, অসৎ চরিত্রের লোক। আছে আস্তিক, নাস্তিক, খুনী, হাইজ্যাকার ও কত রং বেরংগের লোক। কিন্তু পরজীবনের বৈশিষ্ট্য হবে স্বতন্ত্র ধরনের। সেখানে ভালো, মন্দের একসাথে বসবাস করার সুযোগ থাকবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা জগৎ থাকবে। সেখানে সুখ-দুঃখ আলাদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ সুখীর স্থানে দুঃখ থাকবে না আবার দুঃখীর স্থানে সুখ থাকবে না। বিকীর্ণ শক্তির বেলায়ও দেখা যায় একই রকম নিয়ম। যেমন কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি ইত্যাদি কোন সময় একে অপরের মাঝে দুস্তি করে বসবাস করে না। পক্ষান্তরে বিশ্ব জগতের অনন্তহীন কাঠামোতেও রয়েছে দু'টি স্তর। যেমন অন্ধকার নিষ্প্রভ নীহারিকার জগৎ এবং আলোক উজ্জ্বল নীহারিকার জগৎ। মানব জীবনের বিকীর্ণ সন্তান যদি পাপ-পুণ্যেই না হবে তাহলে আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা যে পাপ, পুণ্য সৃষ্টি হওয়ার কথা ধর্মীয় কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোই বা কি?

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কণার ক্ষুদ্রতম অংশের মাঝে অবিরাম গতির স্রোতে মূল স্থায়ী কণা থেকে কিছু কিছু অস্থায়ী কণা এবং তার কিছু প্রতিকণার সৃষ্টি হয়। এই অস্থায়ী কণাগুলো অতি অল্প সময় পরেই মূল কাঠামো হতে প্রকৃতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ রূপ অস্থায়ী প্রতিকণা

www.pathagar.com

মানবদেহের কোষস্থ পরমাণু থেকেও অদৃশ্য হয়। ব্যক্তি বিশেষের আচরণ বা গতি থেকে প্রতিকণার রূপ ভিন্ন চরিত্রের যে হবে না এ কথার কি কোন প্রমাণ আছে বরং সুকৃতি ও দুষ্কৃতি পূর্ণ হওয়ার পিছনে যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব। এই প্রতিকণা বিকীর্ণ কর্মশক্তিরই প্রতিরূপ। তাই এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিকীর্ণ শক্তির অনুরূপ নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য। বিকীর্ণ কর্মশক্তি একে অন্যের সাথে সহ অবস্থান, সংমিশ্রন, রূপান্তর, অবলুপ্তি, ধ্বংস ইত্যাদি হওয়ার যেহেতু কোন নিয়ম নেই, সে কারণে এদের দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি না হয়ে তারা যাবেই বা কোথায়? সব দিক পর্যালোচনা করে পাপ পুণ্যকে বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে সম্পর্কশীল হওয়ার ব্যাপরটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। অসৎ চরিত্রের থেকে যদি কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং সৎ ঈমানদ্বারগণের আমলের মাধ্যমে যদি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি সৃষ্টি হওয়ার মতো কোন যুক্তি প্রমাণ দেয়া সম্ভব হয়, তবে উল্লেখিত বিষয়টি স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখে।

জীব ও জড় পদার্থের কাঠামোর ভৌতশক্তি এক প্রকার অদৃশ্য সত্তা। এটি অপরিমেয়, ওজনহীন এবং অবিভাজ্য। এর নিঃশেষ বলতে কিছু নেই। বিশ্বের সমস্ত মানুষ মিলে এর একটি দানাকেও নিঃশেষ করতে পারবে না। এই সত্তা এতো ছোট যে,পে একে খালি চোখে দেখা যায় না। তবু তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার না করে পারি না। বস্তু বা প্রাণী দেহের কোষ অভ্যন্তর হতে যে অদৃশ্য ও অস্থায়ী প্রতিকণা জন্ম হয়ে প্রকৃতিতে লুকিয়ে পড়ে, একে না দেখা গেলেও তার অস্তিত্বও স্বীকৃতির বাইরের কিছু নয়। জীব ও জড় হতে যদি শক্তি বিকিরণ না হতো তাহলে ক্ষুধা তো হতোই না বরং পৃথিবী এবং তার বাসিন্দারা ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করতো। সে সূত্রেই বলা যায় আমাদের কাজ-কর্ম থেকে যে শক্তি বিকীর্ণ হয় সেগুলোও স্বীকৃত সত্তা। এই স্বীকৃত সত্তাগুলোও বিকিরণের সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। অর্থাৎ এদেরও গায়ে কালো (কৃষ্ণ) বর্ণ ও আলোক বর্ণের মতো গুণাগুণ থাকতে পারে।

আমরা যা আহার করি এর কিছু অংশ প্রথমেই উচ্ছিষ্ট হয়। এই উচ্ছিষ্ট অংশ শরীর থেকে মল, মূত্র, ও ঘাম হিসেবে নিঃসরণ হয়। তারপর খাদ্যের যে সার অংশ গ্লুকোজ ও চিনি হিসেবে আমাদের রক্তে মিশে এ থেকে আমার, পাই শক্তি। প্রেট্রল যেমন গাড়ীর জ্বালানী শক্তি হিসেবে ব্যবহার হয়ে গাড়ীকে গতিশীল করে, তেমনি খাদ্যের এই পরিশোধিত

www.pathagar.com

অংশ আমাদেরকে কর্মচঞ্চল ও গতিময় রাখে। এই শক্তি যখন কাজ-কর্মের মাধ্যমে বিকীর্ণ হয় তখন এর কিছু অংশ খারাপ আচরণের জন্য উচ্ছিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভাল আচরণের মাধ্যমে উত্তম মান লাভ করাও অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু মানব জীবনের আচার-আচরণ গতিরই অংশ সুতরাং গতির বেলায় যেমন অবক্ষয়তা ও বিপর্যয় থাকে সেরূপে আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি গতির নিয়মে খারাপ-ভাল হওয়া প্রসঙ্গতঃ নীতি বিরুদ্ধ নয়।

মনের চেতনায় দেহের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রতঙ্গ যখন কর্মশীল হয় তখন ঐ অঙ্গ গতিশীল হয়েই কাজ করতে হয়। গতির ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি মানতে হয়। অন্যথায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ১০০ কিঃ মিঃ গতি সম্পন্ন গাড়ীতে যদি ৫০০ কিঃ মিঃ গতি তোলা হয় তাহলে ঐ গাড়িটিতে যেমন বিপর্যয় ঘটতে পারে তেমনি তার থেকে নিঃসৃত হওয়া শক্তি গুলোতেও চরম ক্ষতির সৃষ্টি হয়ে তা কালো ধোঁয়ায় পরিণত হতে পারে। সে জন্য সীমালঙ্গনকারীদের বেলায় দুনিয়ার জীবন ও পরকাল উভয়টিই বিপর্যয়ের। এ দিক থেকে মানব জীবনের জন্য ঈমানও উত্তম আমল (কাজ) গতিকে নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ পন্থা। অর্থাৎ দ্বীন ইস্‌লাম দুনিয়া এবং আখেরাতের সুন্দর-সুস্থ্য ও আরামদায়ক জীবন পদ্ধতি তৈরী করার এক বিশেষ প্রযুক্তিগত কৌশল। এই প্রযুক্তি বা কৌশল অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবনী শক্তির বিরাট অংশকে উত্তম মান সম্পন্ন করে পরজীবনের জন্য সঞ্চয় করতে পারি।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় মানুষের মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। দুনিয়ার জাগতিক ধ্যান ধারণা ও কাজ কর্মের মাধ্যমে সর্বদাই নিয়োজিত থাকলে সে ক্ষেত্রে আত্মিক উন্নতি ব্যতীত দুনিয়া মত্ত জীবন ব্যবস্থায় সে শক্তি তৈরী হয় না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আত্মিক উন্নয়নের একটি কৌশল। আধ্যাত্মিক সাধনাকে ইসলামী মতে মারেফাত বলা হয়। যুগে যগে মানুষ পৃথিবীর বহু বস্তু ও প্রাণী নিয়ে দিন রাত গবেষণা করে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। তেমনি এ যুগে আধ্যাত্মিক সাধনারও নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন হয়েছে। সিলভা মেথর্ড এর মধ্যে একটি আত্মিক সাধনার দাবীদার। সে যাই হউক না কেন আত্মিক উন্নতি ব্যতীত ভাল মানের সত্তা তৈরী আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

একটি ত্রুটিপূর্ণ গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে যেভাবে কালো ধোঁয়া বের হয়, পক্ষান্তরে একটি ভালো ইঞ্জিনের গাড়ী থেকে সেরূপ ধোঁয়া বের হয় না। মানুষের দেহ ইঞ্জিনটি চালায় তার মন। অর্থাৎ মন হলো দেহের চালক। এ চালক যদি খারাপ থাকে তাহলে তার দেহ ইঞ্জিনের কোষ প্রাচীর ভেদ করে যে শক্তি বের হবে, সেগুলো তো কালো ধোঁয়ার মতো হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্য অবস্থা দৃষ্টে পাপ, পুণ্য ও বিকীর্ণ কর্মশক্তিকে একই মনে হয়। মূলতঃ দু'ধরনের কিতাবে একই জিনিসেরই ভিন্ন নাম।

পাপীর বাসস্থান অন্ধকারছন্ন ও জ্বালাময় এবং পুণ্যবানের বাসস্থান আলোক উজ্জ্বল ও শান্তিময়। পাপের সত্তার রূপ অন্ধকারছন্ন এবং পুণ্যের সত্তার রূপ উজ্জ্বলতর। পক্ষান্তরে বিকীর্ণ সত্তার মধ্যে খারাপ মানের সত্তা হলো কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং ভালো মানের সত্তা হলো আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। এ সব লক্ষণ দেখে পাপ, পুণ্য ও বিকীর্ণ সত্তাকে অবস্থান্তে একই মনে হয়।

কোন বস্তুর রূপ যদি পাল্টে যায় তাহলে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাবে। যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রূপ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হলেও যখন এই মৌলিক পদার্থগুলো মিলে পানি তেরী হয় তখন তাদের গঠন ও রূপ যেমন পাল্টে যায় তেমনি তাদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়ে যায়। আবার গতির তারতম্যের জন্য গঠন পাল্টাতে পারে। গতির সাথে বস্তুর রূপ, গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কযুক্ত। সে কারণে বিকীর্ণ সত্তা ও পাপ পুণ্যের মহামিলন গতির কারুকার্য বিশ্লেষণ করা ব্যতীত উপলব্ধিতে আনা কষ্টদায়ক। অতঃপর মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তিকে আমরা তখনি পাপ, পূণ্য বলতে পারব যখন দেখা যাবে বিকীর্ণ কর্মশক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ মানব জীবনের আচার আচরণের সাথে সম্পর্কশীল।

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ

পৃথিবীটাই রূপ রংগের খেলা। কোটি কোটি মানুষের রূপ, রং, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি এতো বিচিত্র, এতো ভিন্ন যার ফলে প্রতিটি মানুষকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয় না। বাগানে রয়েছে অনেক রংগের ফুল। হলুদ, লাল, খয়েরী আরো কতো রং বেরংগের ফুলেরা মিলে করেছে বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি। সূর্যের রশ্মিতে রয়েছে সাত রকম রংগের সমাহার। বাগানের শোভা, মানুষে মানুষে প্রভেদ ইত্যাদি কতই না রহস্যময়? কে করেছেন এতো পরিবর্তন।

www.pathagar.com

সৃষ্টির নিয়মে কোন কিছুর রূপ, কাঠামোও গুণ চিরন্তন নয়। যখন একটি আকার অন্য আকারে ঢুকে তখন তার রূপ, কাঠামোও গুণ সবি পরিবর্তন হয়। একই জিনিস বা শক্তি ভিন্ন আকার বা ডাইছের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হওয়ার সময় তার রূপ, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি সব পরিবর্তন লাভ করে। এর জন্য অবশ্য কৌশল মেনে চলতে হয়। যেমন মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করতে যেরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হয় তেমনি অন্যান্য জিনিসের বেলায়ও প্রয়োজন পড়ে। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকণা অহরহ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিংবা জীবন যুদ্ধের মৌলিক প্রয়োজন মিঠানোর সময় সেগুলো থেকে শক্তি বিকিরণ হয়। এই শক্তি সে খাদ্য থেকে অথবা সূর্য থেকে আহরণ করে। এ শক্তিগুলো বিকিরণ হওয়ার সময় একটি আকারে মধ্যে দিয়ে বিকিরণ হয়। এতে ঐ আকার বা ডাইছের কোন ছাপ তাতে পড়ে কিনা, তা আমরা বলতে পারি না। অদৃশ্য বিকীর্ণ শক্তিগুলো ঢেউয়ের আকারে চলে। এদের কাম্পাংক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিগ্রহ রূপ একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসাবে নিজ অস্তিত্ব নিয়ে শূন্য মাধ্যম দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় যায় ? তার ঠিকানা আমাদের জানা নেই। আমরা জানি এদেরকে পৃথিবী কিংবা সূর্য কেউ আদর করে না। গ্রহণ করে না। বিকিরণের নিয়েমেই একের বিকীর্ণ শক্তির সাথে অন্যে বিকীর্ণ শক্তির কোন সংমিশ্রন হয় না। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়েই হারিয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। পৃথিবীতে একটি মানুষের স্বভাব, আকৃতি প্রকৃতির সাথে অন্য জনের কোন মিল না থাকলেও প্রত্যেকের জড়গঠনে রয়েছে একই ধরনের শক্তি। কিন্তু একই রকমের শক্তি দিয়ে সব কিছু তৈরী হলেও, কেন এই অমিল? কেন এই ভিন্নতা ? আসলে এই ভিন্ন গঠন প্রকৃতির সাজানো খেলা। আর এই প্রকৃতি স্রষ্টার কুদরতি হাতে গড়া। এ জগত যেন আলো আর গতির ধাঁ ধাঁয় গড়া। এর সবক্ষেত্রেই রয়েছে স্রষ্টার অভিব্যক্তির ছাপ। মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি বা খলিফা। যাদের অভিব্যক্তির বা ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। তাদের অভিব্যক্তি থেকেও বিচিত্র ধরনের রূপ, রং, ও আকৃতির সত্তা জন্ম হতে পারে। জীবন খেলায় আমাদের মনের প্রভাব এই দেহ রাজ্যের থেকে যে সত্তা বিকিরণ হয় এতেও তার ছাপ লাগতে পারে। এতে সেগুলোর রূপ রং আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে তরঙ্গের পুটলী আর বিদ্যুতের ঢেউ দিয়ে রং বেরংগের জীব ও জড় অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আমাদের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে কি কিছুই সৃষ্টি হবে না? সকল মানুষের বিকীর্ণ সত্তার রূপ রং কি এক রকম হবে?

www.pathagar.com

আমরা জীব। আমাদের জীবন আছে। আমরা কাজ-কর্ম চলা-ফেরা করি। প্রজনন ধারা সৃষ্টির নিয়মেই আমাদের মধ্যে চালু আছে। এখানের প্রকৃতির সবকিছু আমাদের সুহৃদ নয়। এখানে আছে আমাদের বৈরী সত্তা। জীবন বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে গতির গাড়ীতে ভর করতে হয়। সে কারণে আমরাও ডুবে আছি গতির সাগরে। সোফায় বসে থেকে যদি বলি আয় খাবার আমার মুখে আয়, এতে খাবার মুখে আসে না। খাবার খাওয়ার জন্য হাত নাড়তে হয, মুখ নাড়তে হয় আবার ঐ খাবার যোগাড় করতে গিয়ে কাজ করতে হয়। তাই এই পৃথিবীতে গতিশীল না হয়ে কিছু করা যায় না। এই গতির জন্য দুনিয়াতে মৃত্যু, ক্ষুধা, রোগবালাই ইত্যাদি আমাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে। এদের থেকে কোন ক্রমেই আমরা রেহাই পাই না। দুনিয়ার জীবনে মৃত্যু আসলেও প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের শরীরের বিভিন্ন জীবকোষগুলোর কিছু অংশ মৃত্যুবরণ করে। আবার সময়ের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো জন্মলাভ করে। তাই জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন জীবদেহের নিত্য দিনের খেলা। সেজন্য ক্ষুধাকে আমরা জয় করতে পারি না। এই ক্ষুধাই আমাদেরকে অহরহ্ তাড়িত করে। একে এটম দিয়েও জয় করা সম্ভব হয় না। খাদ্য পেলেই সে পরাজয় বরণ করে। খাদ্যের যে অংশটুকু দেহ গ্রহণ করে, তা থেকেই সে পায় শক্তি। কিন্তু এই শক্তি একবার গ্রহণ করলে সে শক্তি দেহে চির দিন মওজুদ থাকে না। সেজন্য দেহ কিছু সময় পরেই আবার খাদ্য গ্রহন করার জন্য পাগল হয়ে যায়। কেন এই ক্ষুধা আমাদেরকে বার বার আক্রমণ করে? কেনই বা পাকস্থলী বার বার খাদ্য খাওয়ার জন্য বিদ্রোহ শুরু করে? তার কারণ আর কিইবা হবে, পাকস্থলীতে যে খাদ্য থাকে সে তো পরিপাক হওয়ার পর থেকেই তার সার অংশ কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একে একে ব্যয় হয়ে থাকে। সেজন্য ক্ষুধা বার বার লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই শক্তি যখন দেহ থেকে বের হয়ে চলে যায় তখন কি ব্যক্তি জীবনের চরিত্রগত আচরণের (গতির) কোন ছাপ সেই বিকীর্ণ সত্তার ব্যূহ প্রাচীর ভেদ করে তার গায়ে আঁচড় কাটে। কিংবা দুষ্কৃতি অথবা সুকৃতির গন্ধ লাগিয়ে দেয়? আমার বিশ্বাস এর আঁচড় লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার দৃষ্টান্ত পূর্বের অধ্যায়েও দেয়া হয়েছে। তবু এর পরও প্রশ্ন থেকে যায় এই বিকীর্ণ সত্তার রূপ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল হওয়ার কি কোন প্রমাণ দেয়া সম্ভব? কিংবা ঐরূপ হলে তার রূপ, বর্ণ, গোত্র ও গুণাগুণ আলাদা হওয়ারই বা কারণ কি?

www.pathagar.com

পৃথিবীর কোন মাধ্যমের বিকীর্ণ সত্তাই আমরা দেখি না। এবং এর বহ্যিক গুণাগুণ কেমন তাও আমরা ভোগ করিনি। কেউ যদি বলে আমটি ফজলি আমের মতো মিষ্টি। কিন্তু যে ফজলি আম খায়নি তার পক্ষে আমের স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তেমনি কেউ যদি পাত্রী দেখে এসে অন্য যারা দেখেনি তাদের কাছে বর্ণনা করে তখন সে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিসরের মধ্যে অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে তুলনা করে বুঝাতে হয়। হয়তো সেই মেয়ে হুবহু তার মতো না হলেও দেখতে অনেকটা সাদৃশ্যমূলক হয়। এভাবে না বুঝালে কারও বুঝে আসাই সম্ভর নয়। তাছাড়া যে বুঝবে তার পক্ষেও বর্ণনা করা সম্ভর নয়। সেজন্য যে জিনিস দেখানো সম্ভব নয় এবং যার গুণাগুণ ও স্বাদ উপলব্ধি করা যায়নি তার বেলায় রূপক বর্ণনা ছাড়া কোন সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়ার আশা করা ঠিক নয়। সে কারণে বিকীর্ণ সত্তার বেলায় রূপক অস্তিত্বকে দর্শন ও যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। এ ছাড়া তার সঠিক বর্ণনা দেয়া দুরূহ ব্যপার।

অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায়, কালো গাভীর গর্ভের বাছুর কালোই হয় যদি পাল দেওয়ার ষাড়টিও থাকে কালো। অসৎ পথে উপার্জিত খাদ্য খেয়ে যদি সীমালঙ্গনকারী হিসেবে দুনিয়ার জীবনে পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা যায় তাহলে তার বিকীর্ণ সন্তান নষ্ট বা মন্দ স্বভাবের হওয়াই স্বাভাবিক। এটিই স্রষ্টার কুদরতি হাতে গড়া প্রকৃতির প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা।

মানুষের আচার আচরণ গতির মধ্যে কাটে। গতির তারতম্যের জন্য কোন জিনিসের কাঠামো এক রকম হয় না। যেমন রিক্সা, জীপ, প্লেন ইত্যাদির গতির তারতম্যের জন্য তাদের কাঠামো এক রকম নয়। পাখি আকাশে উড়ে তার ডানা আছে। মানুষ পায়ে হেঁটে চলে তার পা আছে বলে। কিন্তু মানুষের উড়ার মতো ডানা নেই বলে তারা উড়তে পারে না। প্রত্যেকের চলার গতি যেমন ভিন্ন তেমনি তাদের আকার আকৃতিও রূপ, গুণ, ভিন্ন। উদরের উচ্ছিষ্ট খাবার ত্যাগ করার জন্য মানুষ প্রকৃতির ডাকে সকল ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে বাইরে যায়। সে যা ত্যাগ করে তা থাকে দুর্গন্ধযুক্ত। কিন্তু খাবার সময় উদর যা গ্রহণ করেছিল তা ছিল সুস্বাদু ও সুগন্ধময়। খাদ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ জীবকোষগুলো গ্রহন করে। এগুলোও জীবকোষ কাজে, অকাজে প্রকৃতির দায় সারতে বের করে দেয়।

www.pathagar.com

এগুলো যখন বের হয়ে যায় তখন কি এর পুরা অংশই উচ্ছিষ্ট থাকে? না এ থেকে ভালো মানের কিছু তৈরী হয়? আমাদের উদরের উচ্ছিষ্ট অংশ প্রকৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু জীবকোষের বিকীর্ণ সন্তান প্রকৃতি বরণ করে না। খাওয়া-দাওয়া এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি জীবের স্বাভাবিক আচরণ। যেমন পশুরাও খায়, আমরা খাই। পশুরাও মল ত্যাগ করে, আমরা করি। পশুরা যৌন কাজে লিপ্ত হয়, আমাদেরও যৌন ক্ষুধা আছে। তবে উভয়ের সঙ্গম ব্যবস্থা যেমন এক রকম নয় তেমনি অন্যান্য কাজগুলোও মানুষ পশুদের মতো করে না। পশুদের বেলায় নিয়মনীতি মানতে হয় না কিন্তু মানুষ নিয়মের অধীন। পক্ষান্তরে মানুষের ভেতরে একটি জটিল আচরণ বিরাজ করে। এই আচরণ স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তার অনুগত্য স্বীকার করা। এই ঐশী বুদ্ধির জন্য মানুষ স্রষ্টার কাছে তার কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু পশুদের এই গুণ নেই বলে তাদের কোন জবাবদিহীতা নেই। গতির জন্য যেমন প্রত্যেক জিনিসের কাঠামোর রূপ, গুণ, ও গঠন ভিন্ন হয় সে কারণে আমাদের আচার আচরণের জন্য (গতির) বিকীর্ণ সন্তানের গঠন বর্ণ, রূপ, গুণ ভিন্ন ও ভাল মন্দ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এরূপ না হলে পশুদের মতো আমাদেরও কোন বিধান অনুসরণ করতে হতো না। আমদের জীবন নীতিতে কোন নিয়ম, অনুসরণ করলে ভালো মান সম্পন্ন সত্তা সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা জানি না। সেজন্য ঐ নিয়ম প্রকৃতির বিধান কর্তাই জানিয়ে দিয়েছেন।

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির ধরণ ও তার গুণাগুণ ভিন্ন আচরণের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বর্ণনা করা যায়। বিজ্ঞানের এই যুক্তি যদি সত্যকে বের করে আনতে পারে তাহলে সেই সত্য আমাদের নতুন জ্ঞান দিয়ে ঈমানের শক্তি করবে বলীয়ান।

এ বিশ্ব জগতে গতির ফলে যে সংমিশ্রন সৃষ্টি হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এই গতির ফলেই প্রকৃতিতে শ্রেণীগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপ স্রষ্টার অভিব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। মানুষ স্রষ্টার অভিব্যক্তির শ্রেণীগত বৈষম্যের উন্নততর বিকাশ। মানুষের আছে কর্মের স্বাধীনতা তাদের আচার আচরণের মাঝে যেমন গতি বিরাজ করে তেমনি তার দেহের সূক্ষ জীবকোষের পরমাণুর ভিতরও গতির তুফান চলে। এই গতির ফলে পরমাণুর উদরস্থঃ শক্তির মাঝে ব্যক্তি চরিত্রের গতির সংমিশ্রণ

www.pathagar.com

ঘটতে পারে। এই সংমিশ্রণ মানব মনের অভিব্যক্তির ফল। এর জন্য তার রূপ, গুণের শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

বস্তু বলতে আমরা যা কিছু বুঝি এর মৌলিক সত্তা সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা। এই কণা দিয়েই তৈরী হয়েছে পরমাণু, তা থেকে অণু। কোটি কোটি পরমাণুর সাজানো স্তর দিয়েই স্থূল আকার সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুর পারমাণবিক ভর তার রূপ, গুণ, ও কাঠামোকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাজিয়েছে। বিশেষ করে পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার উপর বস্তুর পরিচয় নির্ভর করে।

সে যাই হউক এই প্রোটন তো আর সূক্ষ্ম বিদ্যুতের আধার ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। পক্ষান্তরে বস্তুর সূক্ষ্মাতীত পরমাণুতে আছে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণিকা এবং নৈব্যক্তিক কণিকা। ভাবতে অবাক লাগে এই রূপ কণিকা দিয়েই তো মাটি, পানি, বায়ু, ফুল, ফল আরও কত রং বেরংগের জিনিস সৃষ্টি হয়েছে। তবে মরিচ কেন ঝাল লাগে? চিনি কেন মিষ্টি হয়? ফুল থেকে কেন সুগন্ধি আসে? মল, মুত্র কেন দুর্গন্ধযুক্ত হয়? জীবাণু কেন যন্ত্রণা দেয়? আলোক রশ্মির কেন এতো বিচিত্র রূপ ও গুণ? আলোকরশ্মি, গামারশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি ইত্যাদিই বা কেমনে সৃষ্টি হলো?

প্রকৃত বাস্তবতায় দেখা যায় এসব রশ্মির প্রকার ভেদ সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেক রশ্মির কম্পাংক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শ্রেণী ভেদের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে গামারশ্মি অত্যন্ত মারাত্মক। কোন মৌলের আইসোটোপকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে নিউক্লিয়ার ফিসন বা বিভাজন বিক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তি বের হয়। এই শক্তি খুব মারাত্মক। আর এক প্রকার শক্তি আছে তাকে বলা হয় তড়িৎ চুম্বক শক্তি (Electro magnative energy) একে বেতার তরঙ্গও বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে খবরাখবর প্রেরণ করে। বেতার তরঙ্গের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয় তরঙ্গের, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পন সংখ্যার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ দিয়ে। টিভির প্রেরক যন্ত্র কোন দৃশ্যের চিত্রকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে রূপান্তরিত করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়। এই তরঙ্গগুলোর শূন্য মাধ্যম দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিভির গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এটি ও তড়িৎ-চুম্বকশক্তি। আবার আলোক রশ্মির প্রকৃতি ও তড়িৎ-চুম্বকশক্তির অনুরূপ। তবে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরও ক্ষুদ্র। আলোক রশ্মি ভিন্ন রংগের ও রূপের হয়। যেমন লাল, বেগুনী, হলুদ ইত্যাদি। এই রশ্মির

www.pathagar.com

রংগের পরিবর্তন নির্ভর করে আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। লাল আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্যান্যদের চেয়ে বেশী বড়। সেই তুলনায় বেগুনী আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। কি বিচিত্র এই প্রকৃতির লীল খেলা। লাল, বেগুনী, সবুজ আর কালো কত রংগেই তো দেখি। যেখানেই চোখ যায় সেখানেই রংগের খেলা আর গতির ঝিঁঝি রব। আমাদের চোখে যেন প্রকৃতির রঙিন চশমা লাগানো। পৃথিবীর মাঠ ঘাটে, আসমানের ছাদ জুড়ে আলোক আর গতি মিলে করছে খেলা। আমরা যেহেতু আলোক আর গতিরই উপাদান, সেজন্য এই খেলার দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েনা। তাই বিস্ময়ে ভাবি এই গতি কে সৃষ্টি করেছেন? কে সেই প্রজ্ঞাবান? আমরা তো মানুষ, আমাদের বিকীর্ণ সন্তান আমাদের আচরণ (গতি) থেকেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সন্তানের রূপ ও গুণাগুণ কেমন তা কি ভেবেছি কোন দিন? নীল আকাশের অসীম গর্তে এই পৃথিবীর পৃষ্ঠে কত রং বেরংগের মানুষ বাস করে। এখানে সবাই গতিশীল ও কর্মময়। আমাদের মনের উদ্দিপনায় দেহ গতিশীল হয়। স্বামী-স্ত্রীর দেহ মিলন থেকে নিয়ে পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা গতিশীল না হয়ে করা যায়। তাই পরোক্ষ ভাবে আমরা আমাদের কর্মের স্রষ্টা। এই কর্মময় গতি যদি সৃজনশীল না হয় তাহলে আমাদের বিকীর্ণ সন্তান বিকলাংগ বা মন্দ স্বভাবের হতে পারে। আলোর গতির ভিন্নতার জন্য যেমন তার রূপ রং ও গুণের পরিবর্তন ঘটে থাকে তেমনি মানুষের আচরণের (গতির) ভিন্নতার জন্য তার বিকীর্ণ সত্তার রং রূপ ও গুণের পরিবর্তন হতেই পারে। পৃথিবীতে বিভিন্ন টিভির চ্যানেল হতে যে রূপে ভিন্ন বৈশিষ্ট্রের তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় তেমনি মানুষকে যদি একটি জীবন্ত প্রেরক মাধ্যম ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে মানুষের পক্ষ থেকেও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়া কাল্পনিক কিছু নয়। প্রকৃত পক্ষে মানুষের থেকে যে শক্তি বিকীর্ণ হয় সেটিও এক প্রকার তরঙ্গ। তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর যেহেতু তরঙ্গের রূপ, রং ও স্বভাবের পরিবর্তন নির্ভর করে সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মানুষের আচার আচরণ থেকে তাদের বিচ্ছুরীত (বিকীর্ণ) শক্তির রূপ, রং ও স্বভাবের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছু সংখ্যক সত্তার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। এর দ্বারা পরিবেশ দুষিত হয়। জীবন ধারনের জন্য পরিবেশ দূষণ

www.pathagar.com

হুমকির কারণ। কিন্তু তড়িৎ-চুম্বক শক্তি এদিক থেকে অনেক নিরাপদ। পক্ষান্তরে বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে মানব জাতির মঙ্গল-অমঙ্গল দু'টিই হতে পারে। সেজন্য গুণাগুণের দিক থেকে একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মঙ্গলকারী বিকীর্ণ শক্তি ও অমঙ্গলকারী বিকীর্ণ শক্তি। আবার বর্ণের দিক থেকেও বিকীর্ণ শক্তি দু'ধরনের যেমন কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি ও আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। অন্ধকার মানব মনের কাছে ভয়ভীতির ব্যাপার। আলোতে মানুষ যেমন প্রাণ উজ্জ্বল ও ভীতিহীন থাকে অথচ অন্ধকারে তার কিঞ্চিত পরিমাণও ভীতিমুক্ত থাকতে পারে না। সূর্য যখন ডুবে যায় তখন অন্ধকার দানবের মতো সব গ্রাস করে। আমাদের তখন আশা থাকে ১০/১২ ঘন্টা পর আবার সূর্য ফিরে আসবে। তাই হয়তো রাত্রিটা কেটে যায় দিবসের প্রতীক্ষায়। আমাদের তখন ভয় থাকে না। সে মুহুর্তে মনের কোণে আশা নামক প্রহরীটি ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এমন যদি হয় যে রাত্রি আর কাটবে না। দিন আর ফিরে আসবে না। সুর্য আর কখনো উঠবে না। তাহলে অন্ধকারের মাঝে মহাসুখে থাকলেও কেউ তা চাইবে বলে মনে হয় না। কারণ সুখের অন্ধকারও মহা যন্ত্রণাদায়ক। অথচ জাহান্নামের অন্ধকারে আযাব ও থাকবে। সুতরাং সে স্থান কত কষ্টের হবে' কত বিষাদের হবে, সে তো ভাবাই যায় না। এমন স্থানের কথা মনে হলে ভয়ে কার না শরীরের পশম দাঁড়ায়। এ জগতে ভয় আছে, দুঃখ আছে, আছে ভালবাসা ও শান্তি সুখ। পক্ষান্তরে পরপারের জগতে এর কোন ব্যতীক্রম নেই। তবে পার্থক্য এতটুকু পৃথিবীতে একই পরিবেশে যেমন ভয়, দুঃখ, ভালবাসা-সুখ-শান্তি সব মিলে মিশে থাকে মূলতঃ পরকালের জগৎটি এমন হবে না। ভয়-দুঃখের জাগায় ভালবাসা সুখ থাকবে না আবার ভালবাসা ও সুখের স্থানে ভয়-দুঃখের কোন গন্ধও থাকবে না। এটি হলো পরকালীন জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভয়ের জগতের প্রাণীরা থাকবে কুৎসিত ও কালো। তারা দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকবে। অপর দিকে ভালবাসা আর সুখের জগতের মানুষ ও জীনগণ থাকবে জ্যোৎসা রাতের চাঁদের কিরণের চেয়েও উজ্জ্বল।

পৃথিবীর জীবনে আমাদের চিন্তাশক্তি এবং কর্মের স্থবিরতা আছে। আছে সবক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা। সেকারণে আমাদের জ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, দেখার যেখানে শেষ, সেখানেও আমাদের জানা ও দেখার

www.pathagar.com

বাকী থেকে যায়। একটি বৈদ্যুতিক বাতি যেখানে জ্বলে তার উপরে দেয়ালের গায়ে কালো দাগ দেখে চিন্তা হয় আলোর কণা তো আর কালো নয় তবে সেখানে কালো দাগ পড়লো কেন? মনে হয় আলোর উজ্জ্বল রশ্মির ফাঁকে ফাঁকে কিছু অনুজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ হয়। এর জন্য হয়তো দেয়ালের গায়ে কালো দাগ পড়ে। আমরা যে শক্তি বিকিরণ করি তাতে যে কালো রংগের অনুজ্জ্বল সত্তা নেই তা কি করে বলা যায়। আমাদের জীবকোষের একটি পরমাণুকে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব-এর সাথে তুলনা করা যায়। বৈদ্যুতিক বাল্ব-এ যেমন পজেটিভ, নেগেটিভ ও নিউট্রাল ফেইছ সহ একটি কুন্ডলীকৃত তার থাকে তেমনি একটি পরমাণুর ভেতরেও প্রোটন (+) নিউট্রন (নৈর্ব্যক্তিক) এবং ইলেকট্রন (–) আধান সহ নিউট্রিনো থাকে। এখানে নিউট্রিনোর সাথে কুন্ডলীকৃত তারটির সম্পর্ক দেখানো যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী পাওয়ার ষ্টেশন থেকে বিদ্যুত তরঙ্গ পজেটিভ তারটি দিয়ে তরঙ্গের ন্যায় নেচে নেচে এসে বৈদ্যুতিক বাল্ব-এ পৌছে। তবে মাঝে অনেক ষ্টেশন, সাব ষ্টেশন পেরিয়ে সেটি আসে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাল্ব-এ এসে সেই শক্তি যখন নেগেটিভ ফেইছ দিয়ে ফিরে যেতে চায় তখন এ দু'টি তারের মধ্যে সংযোগকারী কুন্ডলীকৃত তারটি দিয়ে আলো বিকিরণ হয়। তেমনি আমাদের দেহের অসংখ্যক পরমাণু নামক জীবন্ত বাল্ব দিয়ে যে শক্তি বিকিরণ হয় এর মূল পাওয়ার ষ্টেশন হলো বাম পাঁজরের নীচে। এর চালক হলো মন। মনের টারবাইন ঘুরে যে অনুভূতি আর প্রেরণা উদয় হয় এগুলো ঢেউ এর ন্যায় ছুটে যায়, দেহের স্নায়ুমন্ডলীর অসংখ্যক বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় নিউটন দিয়ে। দেহের এই বৈদ্যুতিক তার বা নিউরনের পথে পথে রয়েছে ছোট ছোট সাব ষ্টেশন বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এই সাব-ষ্টেশন থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনী শক্তির ঢেউ কাজ সম্পাদনকারী অঙ্গের কোষস্থ পরমাণুর ভেতরে পৌছে। তখন কোষ দেহের ঐ পরমাণু থেকে বৈদ্যুতিক বাল্ব হতে যেরূপে আলো বিবিরণ হয় তেমনি সেখান থেকেও শক্তি বিকিরণ হয়। পরমাণুর গর্ভে থেকে জীবনী শক্তির যে সন্তান তখন ভূমিষ্ঠ হয়, এ সন্তানের গায়ে অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম ছাপ লেগে থাকে। এই তত্ত্ব কণা তখন ভালো মন্দ ইত্যাদি স্বভাব নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ভালো মন্দ হওয়ার পিছনে চালকের মর্জি বা নিয়তের উপর সে সিষ্টেমে ত্রুটি দেখা দেয়। বৈদ্যুতিক বাল্ব যে আলো বিকিরণ করে সেটিতেও রয়েছে প্রযুক্তির ব্যাপার স্যাপার। এর কোথাও কোন দোষ–ত্রুটি থাকলে পুরা ব্যবস্থাটিই অকেজো হয়ে যায়।। এতে বাতি জ্বলে না। আলো বিকিরণ হয় না। এই ত্রুটি পাওয়ার ষ্টেশনে দেখা দিতে পারে কিংবা রাস্তার ছোট ছোট

www.pathagar.com

সাব ষ্টেশনেও দেখা দিতে পারে। অথবা বাল্বটিতেও দেখা দিতে পারে। পাওয়ার ষ্টেশন থেকে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলি প্রবাহের মাত্রা ঠিক করে (ভোল্টিজ ঠিক করে) বাল্বএ প্রেরণ করে। এই মাত্রার উঠানামা করলে বাতি জ্বলবে না (যেমন ২২০ ভোল্টিজের বেশীতে বাতি জ্বলে না)। এর জন্য বাল্বটি ফিউজ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সেটি চির দিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তেমনি মানব মনের কর্ম প্রেরণার প্রবাহ যদি অতি মাত্রিক বা সীমালংঘনশীল হয় তবে জীবকোষের সূক্ষ্মাতীত পরমাণু নামক বাল্বটি আলো বিকিরণ না করে মরে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার চেতনা শক্তির অবক্ষয় আসবে। জীবকোষের পরমাণু নামক বাল্বটি অকালে ফিউজ হয়ে বিকলাংক সত্তায় পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ফিউজ বাল্ব সেখান থেকে খুলে নিয়ে যেমন নতুন বাল্ব লাগানো যায় তেমনি মানব দেহের পরমাণু নামক বাল্বগুলি মরে গেলে সেক্ষেত্রে সেখানে নতুন বাল্ব জন্ম নেয়। এ ভাবেই চলতে থাকে জীবন সংগ্রাম। সাথে সাথে ক্ষয়ে পড়ে জীবনের এক একটি মুহূর্ত। এর মাঝেই লুকিয়ে থাকে কর্মের গন্ধ। এই সত্তা হারিয়ে যায় মহাবিশ্বের অন্ধকার বলয়ের মাঝে। সেই রাজ্যের ঠিকানা হয়তো আমরা খুঁজে পাই না।

এভাবেই তিলে তিলে জমতে থাকে মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির নিষ্প্রভ আলো। এই বিকীর্ণ নিষ্প্রভ আলোক সত্তা দিয়েই তৈরী হবে যন্ত্রণাকারীর বিকলাংগ বিভীষিকাময় উদ্ভুত কালো-সন্তান। এই সন্তান গুলোর গায়ের রং হবে আলকাতরার মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে সন্তানগুলিই একদিন জন্মদাতা পিতাকে নিজের উদরে টেনে নিবে। পরিশেষে এরাই তাকে যন্ত্রণা দিবে আজীবন।

আমাদের দেখার যেখানে শেষ সীমানা, এরপর আরও অনেক কিছু দেখার থেকে যায়। তাই যত নিখূঁত ভাবেই আমরা দেখি না কেন এই সীমাবদ্ধতার আড়ালে যে কিছু লুকিয়ে নেই সে কথা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমাদের দেখার মাঝেও অনেক ভুল থাকে। কিন্তু একমাত্র নির্ভুল ও অভ্রান্ত ব্যাখ্যা হলো আল-কোরআনের ব্যাখ্যা। সেই নির্ভুল কিতাবে পাপের স্বরূপ ও তার স্বভাব সম্পর্কে কি ধারণা দেয়া হয়েছে, তা তলিয়ে দেখে হৃদয়ের স্মৃতি পটে সেই ধারণা ধারণ করে সঠিক পথ খুঁজে নেয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

www.pathagar.com

আল–কোরআনের তাৎপর্য ও পাপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত

ঐশী কিতাব এমনি এক বিচিত্র গ্রন্থ যার মাঝে রয়েছে জীবনের সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান। এতে এমন কোন বিষয় উহ্য নেই যার জন্য আমাদেরকে সমস্যায় পড়তে হয়। এর মধ্যে যেমন আছে বিশ্বের উৎপত্তির কথা, তেমনি রয়েছে এর শেষ পরিণতির কথা। আছে এতে চোরের হাত কাটার বিধান, রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সব দিক বিচার করলে এতে কোন বিষয় উহ্য পাওয়া যায় না।

মানুষ দুনিয়ায় এসে প্রবৃত্তির তাড়নায় আশার বৈতরণী নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই বাঁচার জন্য মানুষকে হতে হয় সংগ্রামী। আমাদের সংগ্রামী জীবন স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ হলে সমাজ ও প্রকৃতির সাথে একাত্মতা হতে পারে না। কারণ প্রকৃতির বিরুদ্ধ নীতি স্রষ্টার সৃষ্টি বিধানেরও নীতি বিরুদ্ধ। এতে চরম অবক্ষয়তা দেখা দেয়। কারণ স্রষ্টা নিজেই তৈরী করে দিয়েছেন জীবন নীতির কানুন। এই কানুন না মানলে মানুষের কর্মজীবন থেকে উৎপন্ন হয় পাপ সত্তা। পক্ষান্তরে স্রষ্টার কানুন অনুসরণ করলে হবে নেক সত্তা। এই পাপ, পুণ্যগুলো জটিল ধরনের জিনিস। এগুলো কোথায় থাকে? কিভাবে তৈরী হয়? একে দেখতে কেমন? আমরা এর কিছুই জানি না।

মানুষ মরে গেলে তার দেহের প্রতিটি বস্তু সত্তা একদিন মিশে যায় মাটির গর্ভে। জীবিত অবস্থায় সে পাচার করে এক জটিল সত্তা। মরার পর তার সব কিছু শেষ হয়ে গেলেও থেকে যায় তার জীবদ্দশার সকল আমল, আচরণের সত্তা যেমন দেহ, দিল বা আত্মার নেকী বা পাপ। এইগুলো তার নিত্য দিনের কাজের কর্মফল। আমাদের কাজের গতি প্রকৃতি এক রকম নয়। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী নেক আমল ও বদ কাজ আমাদের কর্মের ভিন্ন নাম। এই কর্ম থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এদের নাম যথাক্রমে নেক ও গোনাহ। এই সত্তাগুলো কালো না লাল আমাদের দৃষ্টি শক্তি তার কোন খবর দিতে পারে না। আমরা শুধু জানি চোর যদি পরের সম্পদ চুরি করে

www.pathagar.com

তাহলে তার পাপ হয়। সেইরূপে যত প্রকার অন্যায় কাজ আছে তা থেকেও পাপ সত্তা তৈরী হয়। পক্ষান্তরে নেক আমল করলে পুণ্য হয়। এখন যদি ভাবি এই পাপ পুণ্য কেমন? এর কি কোন আকৃতি প্রকৃতি আছে? এগুলো কি শূন্যের মধ্যেই তৈরীর হয়? এই প্রশ্নগুলো প্রকৃতপক্ষেই খুব জাটিল। তাই এর উত্তর পাওয়া ও খুব কঠিন। আমরা জানি শেষ বিচারের দিন পাপ, পুণ্যগুলো ওজন করা হবে। সে দিন যাদের পুণ্য সত্তা বেশী হবে তারা হবেন জান্নাতী অপর দিকে যাদের পাপ সত্তার ওজন বেশী হবে তারা হবে জাহান্নামী। যে জিনিস্ মাপা যায় ওজন করা যায়, এর অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যার অস্তিত্ব আছে, তার রং, রূপ ও গুণ না থাকাও প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ। তাই পাপ, পুণ্যের রূপ, রং, বৈশিষ্ট্য আছে এ কথা মানতে হবে।

এখন চিন্তা করে দেখতে হবে মানুষের কর্মের সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু। তবে বিষয়টি বুঝার আগে কর্মফল কি তা বুঝা প্রয়োজন।

আমাদের এই পৃথিবী সবুজের, শ্যামলের ছায়ায় ঘেরা। এর প্রতিটি অণু কণা প্রকৃতির বিধানের অধীন। প্রকৃতির বিধানের সাথে মানব জীবনের কর্মের বিধানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বের করতে পারলেই কর্মফলের রহস্যের দ্বার খুলে যাবে। পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে অনেক মৌলিক রীতিনীতি। সরকার চালায় রাষ্ট্র। ব্যক্তি মালিকানায় চলে মালিকের অধীনস্ত কর্মচারী বৃন্দ। প্রত্যেক জাগায় আছে ব্যবস্থাপনা নীতি। যারা সরকার বা ব্যক্তি মালিকানায় চাকুরী করে তারা যদি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে তারা পায় কর্মের বিনিময় মূল্য। মালিক পক্ষ এই মূল্য পরিশোধ করে টাকা-কড়ি কিংবা অন্য কোন মালামাল লেনদেনের মাধ্যমে। এই টাকা কড়ি বা মালামাল মালিকের কোষাগারে মওজুদ থাকে। কিন্তু যারা আনুগত্যশীল না হয়ে অন্যায় ও অসদাচরণে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য রয়েছে রাষ্ট্রিয় প্রথায় বিচারের ব্যবস্থা। রাষ্টের প্রথা অনুযায়ী জেল, জরিমানা ও মৃত্যু দণ্ড দেওয়ার নিয়ম আছে। দুনিয়ার বিচারে কেহ কষ্টের সীমা অতিক্রম করলে জীবিত থাকে না। একজন ব্যক্তি যদি ১০টি খুন করে তবে তাকে একবারই মৃত্যু দণ্ড দেওয়া

যাবে। ১০টি খুনের জন্য দশবার জীবিত করে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া দুনিয়ার বিচারে সম্ভব নয়। সেজন্য একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তার অন্যান্য বিচারের ইতি টানতে হয়। পক্ষান্তরে ভালো কাজের পুরস্কার টাকা, পয়সা অন্যান্য মালামালই দিতে হয়। কিন্তু পরকালের জীবন ব্যবস্থায় দুনিয়ার কর্মের জন্য যে কর্মফল দেয়া হবে, সেগুলো কি পূর্ব থেকেই কোষাগারে গচ্ছিত কোন কিছু? সেখানের জেলখানা কি দুনিয়ার অনুরূপ কোন কিছু? কিংবা জাহান্নামীর জন্য মওজুদ আছে নিকৃষ্টমানের সম্পদ এবং মমিন ও নেক বান্দাদের জন্য মওজুদ রাখা হয়েছে উৎকৃষ্ট মানের সম্পদ? খোদার কোষাগার কি পূর্ব থেকেই এই দু-ধরনের সম্পদে ভর্ত্তি রয়েছে। না কি ভালো-মন্দের সম্পদ আমরা এই দুনিয়া থেকেই পাঠাই? এর উত্তরে কে, কি বলবেন, জানি না। তবে আমার হৃদয় আরশিতে এক অজানা রহস্য দীর্ঘদিন ধরে উকিঁ মেরে আছে। তার কথা হলো দুনিয়া যেহেতু পরকালের কর্মক্ষেত্র সেজন্য এগুলো পূর্ব থেকেই মওজুদ থাকতে পারে না। অপর দিকে এগুলো শূন্য থেকে তৈরী হয় না। কিংবা এগুলো দুনিয়ার ভালো মন্দের কর্মফলের ন্যায় বিনিময়তুল্য কিছু নয়। মূলত কর্ম না ঘটার আগেই কর্মফলের সত্তা তৈরী থাকতে পারে না। অর্থাৎ ক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার সত্তা ঐ ব্যক্তির থেকেই উড়ে যায়। তাই কর্ম ও কর্মফল একটি আর একটির পরিপূরক।

দুনিয়াতে কৃষক জমি চাষাবাদ করে তাতে বীজ বপন করে। এক সময় ঐ বীজ গজিয়ে বড় গাছ হয়। তারপর সময় হলে তাতে ফল ধরে। অবশেষে ফল পাকলে কৃষক তা আনন্দে ঘরে তুলে এনে গোলায় মওজুদ করে রাখে। তারপর ঐ খাদ্য সে সারা বছর ভোগ করে। একজন শিল্পী যখন কোন চিত্র অংকন করতে ইচ্ছে করে তখন সে প্রথমেই মনে মনে ঐ ছবিটির একটি নক্সা আঁকে। তারপর সেটি রং আর তুলি দিয়ে বাস্তবে আঁকে। মূলতঃ কোন কাজ করার আগে প্রথমে নিয়ত (ইচ্ছা) করতে হয়। এরপর কাজের পরিকল্পনার নক্সা মনে মনে তৈরী করে সে মতো বাস্তবে রূপ দিতে হয়। সেজন্য কর্ম হলো মানব মনের অভিব্যক্তির ফল। তাই শিল্পী নিজেই হয় কর্মের স্রষ্টা। বিশ্বের সকল শ্রেণীগত রূপ স্রষ্টার অভিব্যক্তির প্রতিস্বাক্ষর। তাই ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাকারী মানব মনের

www.pathagar.com

অভিব্যক্তির স্বাক্ষর হলো তার কর্মফল। এটি তার ইচ্ছা বা কর্মের বৈরী কিছু নয়। যা অন্য কোথাও মওজুদ থাকে। সেজন্য মানুষের কর্মফল শ্রেণীগত অভিব্যক্তির বৈষম্যের কারণে ভিন্ন রূপ ও গুণের হবে। মানুষে মানুষে যেমন প্রভেদ, মনে মনে যেমন অমিল মূলতঃ এ সব শ্রেণীগত বৈষম্যের কারণেই আচার-আচরণের তারতম্যের প্রভাবে কর্মফলের সত্তার চরিত্র ও গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন হবে। সৃষ্টির নিয়মে কর্ম চিরন্তন। এর ধ্বংস বা বিনাশ নেই। কর্মের প্রতিক্রিয়া কর্মের স্রষ্টা ভোগ করবে এটিও প্রকৃতির বিধান । যেমন একজন লোক আজীবন মদ খেয়েছে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে মদ পানকারী নিজেই তার পরিণাম ফল বা কর্মফলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভোগ করবে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জীবন থেকে কর্মের যে অদৃশ্য সত্তা এই ঘন নীল আকাশ, পৃথিবীর চার পাশের বাতাসের অদৃশ্য সাগর আর ওজনস্তর ভেদ করে তিলে তিলে হারিয়ে যাচ্ছে। অসীম রহস্যের অন্তরালে, তার পরিণাম ফল বা প্রতিক্রিয়া কি কোন দিন আমাদের ভোগ করতে হবে না? এই কর্মফল কেমন হবে? এর ঠিকানা কোথায়? আমাদের সাধ্যে আছে কি এর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া? সেই রোমান্টিক জগৎ আমাদেরকে কতইনা ভাবনায় বন্দি করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যাকে টেনে রাখতে পারেনি, কোটি কোটি মানুষের দৃষ্টিকে যে সত্তা ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তার বাড়ী খুঁজে পাওয়া দুনিয়ার জীবনে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে আমাদের জানার ও দেখার সীমাবদ্ধতা আছে, সেখানের কথা প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞ খোদা তা'লা বান্দার উপকারীর্থেই জানিয়ে দিয়েছেন, ঐশী কিতাবের মাধ্যমে। এই কিতাবের বাণী জিব্রাইল (আঃ) নিয়ে এসেছেন নবী, রাসূল (সাঃ) গণের কাছে। তাছাড়া আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সে জগৎ নিজের চোখে দেখে এসেছেন। পক্ষান্তরে ঐশী কিতাব মহাপ্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞ খোদার বাণী বিধায় এতে কোন ভুল ভ্রান্তি নেই। অপর দিকে এই কিতাবের (আল-কোরআনের) বাণীর মমার্থ বুঝাও জ্ঞানের প্রয়োজন। এই কিতাব এমনি এক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর যার প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলো। তাই জ্ঞানী ছাড়া তার নূর, তার আলো হজম করা খুব কঠিন ব্যাপার। এতে রয়েছে বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতির অফুরন্ত উপাদান।

www.pathagar.com

অগণিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই কিতাবে স্থান-কালের পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাথে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার অনেক সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া আছে, আছে রূপক কথাবার্তা, রয়েছে জ্ঞানীর জন্য চিন্তার অসীম অফুরন্ত মনের খোরাক। যে বস্তু আমাদের আশে পাশে নেই, যা কোন দিন মানুষ চোখে দেখেনি, যার স্বাদ, গন্ধ মানুষ কোন দিন পায়নি,যার সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই তার রূপক ও সাদৃশ্য মূলক বর্ণনা মহান প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞারই পরিচয় বহন করে। তা না হলে সে আলোচনা হতো রসহীন, বোধহীন।

পাপ আর পুণ্য দুনিয়ায় থাকে না। তার রূপ রং, কিছুই আমরা দেখতে পারি না। এগুলো হজম করে তার সুফল কিংবা কুফল ভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের রহস্য যার পক্ষে দেখার সুভাগ্য হয়নি তার পক্ষে যেমন আগ্রার তাজমহল কিংবা ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের বর্ণনা দেওয়া কঠিন তেমনি অন্যের বর্ণনা থেকে তার স্বাদ পাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এর যদি সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া হয় তাহলে এর পূর্ণ স্বাদ না পেলেও কিছুটা হলেও অনুমান করা সম্ভব। তাই পরম দয়াবান খোদা আল কোরআনে পৃথিবীর সুদূর অন্তরালের জীবন ব্যবস্থা এবং তৎস্থানের বস্তুর রূপ, গুণ, নাম, দাম, পৃথিবীর লোকালয় পরিবেশের সাথে যে জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার গুণাগুণ দিয়ে সেখানকার আরাম, আয়েশ, দুঃখ কষ্ট রূপ ও গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা পরম স্রষ্টার প্রজ্ঞার স্বাক্ষর। পরকালীন জীবনে কর্মফলের সত্তার জগতটি কেমন হবে তা তো এই ধরনের রূপক ও প্রজ্ঞাশীল ঐশী বাণীর তাৎপর্যের নিগুঢ় তথ্য অনুধাবন না করে বুঝাই কঠিন। আল কোরআনের ভাষায় পাপের স্বরূপ ও স্বভাব আমাদেরকে 'কর্মফল' সম্পর্কে যে তথ্য দেবে তা তো আমাদেরকে নিয়ে যাবে বিশাল অনন্তের দিকে, বস্তুর (Matter) দ্বৈতরূপ প্রতিবস্তুর (Antimatter) জগতের সন্ধানে, অথবা Negative dimenssion এর জগতের দিকে কিংবা প্রতিক্রিয়ার স্বপ্নের দেশে। মন যদি চোখ বুজে সেই স্বপ্নের দেশ ঘুরে আসতে পারত তাহলে সে দেখতে পারত দুনিয়ার এ পার বাড়ীর

www.pathagar.com

অর্জিত ফসল ওপার বাড়ীর গুদামে কেমনে নেয় ঠাঁই। সেখানের পুণ্য সত্তার কর্মফলের বাগানে এই জমিনের মাটির মানুষের কাজের থাকবে ছাপ। তাই আমরা আমাদের কর্মফলের অধীনেই ফিরে যাব একদিন। সেই দেশ সোনালী স্বপ্নের দেশ। দুনিয়ার কর্মজীবন যেন রাতের স্বপ্নের দৃশ্যের মতো একদিন ফুরিয়ে যায়। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অর্থাৎ দুনিয়ার স্বপ্ন স্বাদের ইতি ঘটলেই যেন সব বাস্তবে ফিরে পাব। এখানে স্বপ্নের জিনিস বাস্তবে ফিরে না ফেলেও দুনিয়ার ক্রিয়া বা কর্মের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল সেখানে ফিরে পাব। আসলেই এ দুনিয়া কর্মক্ষেত্র। অপর দিকে ওপার জগৎ প্রতিফলের স্বাদ ভোগ করার জায়গা। সেখানে পাপীর বাড়ীতে কোন বাতি থাকবে না, আলো থাকবে না। তাদের গায়ের রং হবে, আলকাতরার ন্যায় কুৎসিত কালো। নিজের গচ্ছিত কর্মফলের সত্তা থেকে তারা পাবে যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা কোন দিন শেষ হবে না। চোখের অশ্রু নিঃশেষ হয়ে গেলেও যন্ত্রণা আর দুঃখ শেষ হবে না। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে চাইলেও মৃত্যু তাকে বরণ করবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর বিধানেরই মৃত্যু ঘটবে।

মহান আল্লাহ তা'লার প্রজ্ঞাময় বাণী উল্লেখিত দৃষ্টান্তের বাস্তব নমুনা। তাই নিম্নে আল-কোরআনের কিছু সংখ্যক তথ্যপূর্ণ বাণী তুলে ধরা হলো।

"(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমীন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেওয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোষাক পরিধান করে আছে। আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এ জন্য হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহর হিসাব নিতে বিলম্ব হয় না।"

— (সুরা ইবরাহীম ৪৮–৫১)

"প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তার বোঝা তারই ওপর ন্যস্ত; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।" — (আল-আনআম –১৬৪)

"সে দিন যাবতীয় কৃত কর্মের (আমলের) পরিমাণ এক ধ্রুবসত্য।

www.pathagar.com

যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে, কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী; কেননা তারা আমাদের আয়াতের প্রতি যুলুম করছিলো।".

— (আল-কোরআন)

"সে দিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।" — (আল-কোরআন)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।"

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত আমলের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে। এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না" — (আলে ইমরান - ২০)

"তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।"

—(পারা ২৬ সূরা আহকাফ রুকু-২)

"আমি তোমাদরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব। তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল তা তাদের ঐ সব কৃতকর্মের ফল।"

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে তা নিজের জন্যই করেছে।"

—(পারা ২৪, সূরা হামীম, আস-সেজদাহ রুকু - ৬)

"সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃ ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" —(আলে-ইমরান-৩২)

"এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখী, ও সচ্ছল। তাদের সুখী ও সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সেসব পাপ কাজ তারা করতো জিদ ও হঠকারিতা করে। তারা বলতো, মৃত্যুর পর তো আমরা কংকালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির সাথে। তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ দাদাকেও কি এভাবে জীবিত করা হবে?"

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্যে সময় কালও নির্ধারিত আছে।"

অতপর আল্লাহ বলেন, "হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল, তোমরা জাহান্নামের 'যক্কুম' বৃক্ষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি।" —(ওয়াকেয়া ৪২-৫৫)

"যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎকাজগুলো হবে ভস্মস্তুপের ন্যায়। ঝড় ঝঞ্জার দিনে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে সে ভস্মস্তুপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে; ঠিক সে সৎকাজগুলি কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল।"

—(ইব্রাহীম - ১৮)

তাদেরকে বলো! আপন কৃতকর্মের দৃষ্টিতে কোন ধরনের লোক সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা কি তোমাদেরকে বলবো? এ হচ্ছে তারাই, যাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে অযথা নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবছিলো আমরা খুব ভাল কাজ করছি। এসব লোকেরাই আপন প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে যে তাঁর দরবারে হাযির হতে হবে, এ সত্যটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেনি। এর ফলে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। কেয়ামতের দিন আমরা তাদের আমলের কোনোই মূল্য দেব না এবং তারা দোযখে প্রবেশ করবে। তারা যে কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূলগণকে উপহাস করেছে। এ হচ্ছে তারই প্রতিফল।" —(সূরা মায়েদাহ রুকু - ১)

"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যে সব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখেন।" —(আল-বাকারাহ - ১১০)।

" তোমরা যেরূপ আমল করছিলে আজ সেরূপেই তোমাদের প্রতিফল

www.pathagar.com

দেয়া হবে।" —(আল-জাছিয়াহ- ২৮)

"কর্মলিপি পেশ করা হলে তাতে যা কিছু লেখা থাকবে: তুমি দেখবে যে অপরাধী তাতে ভয় পেয়ে যাবে। বলবেঃ হায়! এ কিতাবের কী অবস্থা। কোন ছোট কিংবা বড়ো জিনিসই এতে বর্জন করা হয়নি।

সবই এতে বর্তমান রয়েছে। বস্তুত তারা যা কিছু আমল করে ছিলো তা সবই তারা উপস্থিত পাবে।" —(আল কাহাফ-৪৯)

"যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের আমল নিষ্ফল-তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।"

—(সূরা-আহকাফ পারা-৯ আয়াত ১৪৭)

"সেখানে অধিক শীতও থাকবে না অধিক গ্রীষ্মও থাকবে না।"

—(৭৬ ঃ ১৩)

"কিয়ামতের দিন মানুষ তার সৎ কর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।"

—(আল কোরআন)

" আমরা কিয়ামতের দিন নির্ভুল পরিমাপকারী তুলা দণ্ড রেখে দেব। কারো ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না, যদি একটি শর্ষে পরিমাণও আমল হয়, তবু আমরা তা উপস্থিত করবো, আর হিসেব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।" —(আল আম্বিয়া-৪৭)

"তোমরা যেরূপ আমল করছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে। —(আল-জাছিয়াহ্ - ২৮)

"সেদিন তাদের স্বীয় জিহ্বা এবং তাদের হাত-পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।" —(আন্-নূর-২

" সে দিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে বেরোবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অণু-পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে আর যে বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে; তাও সে দেখতে পাবে। —(আল-যিলযাল-৬-৮)

www.pathagar.com

"আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব, তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল, তা তাদের ঐ সব কৃত কার্যের ফল।"

— (পারা-২৪ সূরা-হামীম, আস-সেজদাহ- রুকু-৬)

"কাফেরগন আপনার (রাসূলে করীম) নিকট শাস্তির বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে। অথচ শাস্তি তাদের চারদিকে ঘিরে রেখেছে।"

—(আল-কোরআন)

আল-কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি যেমন সাবলীল তেমনি রহস্যময়। একে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। যার হৃদয়ের আরশি স্বচ্ছ তাদের বেলায় কোরআনের আয়াতের মর্মকথা বুঝা সহজ। স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষের কাছে এ দুনিয়া প্রকৃত পক্ষেই কর্মক্ষেত্র, চেষ্টা ও সাধনার জায়গা। তাই তারা অযথা কথা বলাকেও পাপ মনে করতেন। তাদের বিশ্বাস এ দুনিয়ার একটি কথাও পরকালের কর্মের হিসেবে থেকে বাদ যাবে না। পাপ পুণ্য কৃতকর্মের ফল। এই কর্মফলের গায়ে দুনিয়ার প্রতিটি ভাল-মন্দ আচার আচরণের প্রভাব পড়ে। ভালো-মন্দ আচরণের কর্মের অদৃশ্য সত্তার সাথে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির গন্ধ লেগে থাকে। দুনিয়ায় কর্মের সুকৃতির সত্তার নাম নেকী এবং মন্দ কর্মের (দুষ্কৃতির) সত্তার নাম গোনাহ। মানুষ তার আমলের সুকৃতি দিয়ে শান্তি পাবে এবং কর্মের দুস্কৃতি দিয়ে শাস্তি পাবে আর পাপ সত্তার রূপ আলকাতরার ন্যায় কালো এবং এর উত্তাপের স্বভাব আগুনের লেলিহান শিখার মতো। রূপক অর্থে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি বা ভস্মস্তুপ এর ন্যায়। পক্ষান্তরে নেক হলো উত্তম মানের সত্তা। যার সুকৃতি আছে। এর রূপ উজ্জ্বল এবং স্বভাব এমন আরামদায়ক, না শীত না গরম। গভীর দৃষ্টিতে মানব জীবনের আমলের (পাপ, পুণ্যের) সত্তার সাথে বিকীর্ণ সত্তার রূপ ও গুণের অনেকাংশে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার বিচার ব্যবস্থায় কষ্টের সীমা অতিক্রম করলে মানুষ জীবিত থাকে না। কিন্তু পরজীবনের আইন হবে ভিন্ন। সেখানে কর্মের সত্তার সাজানো গুছানো সংসারে মানুষ কঠিনতম যন্ত্রণা ভোগ করলেও জীবন বায়ু বের হবে না। অসীম যন্ত্রণার মাঝেও তারা জীবিত থাকবে। অন্য দিকে

www.pathagar.com

সাথীদের নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাবে। সেই জগৎ পৃথিবীর কর্মের অদৃশ্য সত্তার সাজানো সংসার। সেই সত্তার রূপ রং স্বভাব সম্পর্কে দুনিয়ায় অজ্ঞতাই আমাদেরকে করে তুলে লাগামহীন ও সীমালংঘনকারী। কিন্তু প্রকৃতির বিধান ভেঙ্গে যদি এ দুনিয়া থেকে সেই কর্মফলের জগতে একদিনের জন্যও অতিথি হিসেবে বসবাস করে এখানে আবার ফিরে আসা যেত, তাহলে এইরূপ লাগামহীন হওয়ার প্রশ্নই আসতো না। এ যাবৎ যাদের পক্ষে সে জগৎ ঘুরে ফিরে দেখে আসা সম্ভব হয়েছে আসলেই তারা কোন দিন সীমালঙ্ঘন করেনি। আমাদের প্রিয় নবীজির পক্ষে সে জগৎ দেখে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। মেরাজ রজনীতে তিনি সশরীরেই স্বচক্ষে সকল কিছু দেখে এসেছেন। তিনি ছিলেন মহান আদর্শবান, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন মানব জাতির মুক্তির দূত, পরম হিতৈষী। তিনি ছিলেন আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের পক্ষে যে জিনিস দেখা সম্ভব হয়নি, তিনি তা আমাদের হয়েই সব দেখে এসেছেন। আমাদের মুক্তির জন্য তিনি নিজের ভাষায় দেখে আসা সকল ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁকে আমরা মানব জাতির 'রাহবর বলতে পারি। আসলে বর পক্ষ প্রথমে যেমন রাহবরে মুখে কন্যার রূপ, গুণ, স্বভাব ইত্যাদি শুনে থাকে তেমনি আমাদেরও তাঁর কথা শুনে সেই পরম সুখের সন্ধানে পথ চলা প্রয়োজন। যিনি বাল্যকাল থেকে আল-আমীন নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর বেলায়ই উত্তম রাহবর' হওয়া সাজে। পক্ষান্তরে এতে মানব জাতির কল্যাণই বেশী। কারণ তিনি তো ছিলেন পাপ মুক্ত। আমাদের কর্মের অদৃশ্য সত্তার জগতের রূপ কেমন, সে বিষয়টি মানুষ হিসেবে নবীজির মুখের কথা আমাদের বুঝতে সহজ হতে পারে। আমরা আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় নবীজির কথাগুলো পরম ধ্যানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে পাপ, পুণ্যের আসল কারখানা নিজের মাঝেই খুঁজে পাব বলে আশা করা যায়। বস্তুসত্তার বন্ধন থেকে আমাদের আমলের যে সত্তা ইন্দ্রিয় চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে বেড়ায়, সেই গুপ্ত ও সূক্ষ্ম সত্তার কারখানা খুঁজে পেলে নেক আমল করার মতো আরও বিশ্বাস ও প্রত্যয় জাগবে, এটিই স্বভাবের প্রকৃতিগত নিয়ম।

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে কর্মফল

নবী মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির উত্তম রাহবর। তিনি ওপাড় জগতের সুখ-দুঃখ, রূপ-শোভা সবই আমাদের হয়ে দেখে এসেছেন। বরের আগে রাহাবর যেমন কনেকে দেখে, জানে, তেমনি তিনিও সে বিষয়ে পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞাত। সে তুলনায় আমরা হলাম পরপারের জগতের জন্য বরের মতো। তাই পরকালীন জীবন মানব জাতির নিকট নব কুমারী কনের বাসর ঘরের ন্যায়। সেই চির অম্লান পরমাসুন্দরীর গায়ের রং, রূপ, শোভা, গঠন,আকৃতি, প্রকৃতি কেমন তা কোন বরের পক্ষে (রাসূল (সা) ব্যতীত) দেখে আসা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে এপার দুনিয়া বসন্তের ভরা যৌবনের মতো আমাদেরকে আকৃষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কারণ দুনিয়ার জীবনেও স্বাদ আছে, গন্ধ আছে, আছে ভালবাসার মতো কৃত্রিম বধু। আমাদের আত্মার প্রবৃত্তির শিকড় কোন কোন সময় এই কৃত্রিম বধুকে এমন ভাবে ভালবাসে যার ফলে এর স্বাদ আর গন্ধে আমরা আত্মভোলা হয়ে যাই। এতে করে পথভোলা নাবিকের মতো একদিন সেই চিরকুমারী কনের কথা ভুলে গিয়ে তার অলংকার, তার সাজ-সজ্জার কথাও যাই ভুলে। এতে সেই কনের বদন অন্তসার শূন্য উলঙ্গ পড়ে থাকে। কিন্তু যেদিন কৃত্রিম বধুর সাথে সম্পর্কের বার্ধক্য দেখা দিবে তখন আর এখানে থাকা যায় না। একদিন চলেই যেতে হয় আসল বধুর কাছে। এমন অবস্থায় সেই কুমারী বধুর কাছে ফিরে গিয়ে দেখা যাবে তার হাত, পা, নাক, কান অলংকারহীন, সারা বদন জুড়ে নেই কোন বস্ত্র, বাসর রাতের শোভা বর্ধনকারী নয়ন জুড়ানো বাতিগুলো আছে আলোহীন, মনোরম সাজ-সজ্জার নেই কোন তোরণ। আছে অন্ধকার; নিশি দ্বীপের মতো উলঙ্গ এক আজব বধু। গায়ে তার আলকাতরা বর্ণের পোষাক। অসংখ্য ভাইরাস আর রোগ জীবানু করছে তর্জন-গর্জন। আছে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার মতো ধ্বংসাত্মক; জ্বালাময় অগ্নি শিখার উদর জুড়ে কান্নার দাউ দাউ রব। ফণা তুলে বসে আছে নিজ দেহের কোষস্থ পরমাণুর গর্ভের অসংখ্যক বিকলাঙ্গ

www.pathagar.com

সন্তানের দল। আলোর অভাবে বাড়ীময় অন্ধকারের আযাব। খাদ্যের অভাবে কিলবিল করছে তার বিকলাংগ সন্তানেরা। পানির অভাবে মরুভূমির মতো কাঁদছে তার বাড়ির আঙ্গিনা। সারাটা আকাশ ছেঁয়ে আছে কালো ধূঁয়ায়। আগুনের লেলিহান শিখা বাউকুড়ানির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথাও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো নেই একটুখানি শীতল বায়ু। অসহ্য গরমের মাঝেও ঠাঁই নেয়ার মতো নেই কোন শীতল ছায়া। কোথাও কোন ঠান্ডার বালাই নেই, আছে শুধু মরুভুমির মরীচিকা।

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার জীবনকে মোসাফীরখানা ভেবে এখানের এই কৃত্রিম বধুর (পৃথিবীর) রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, যতটুকু ভোগ করার বৈধ অধিকার আছে ততটুকু ভোগ করে এ জীবনের বার্ধ্যক্যের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ক্ষণিকেই তার মায়া, মমতা, ভালবাসার জাল ছিন্ন করে আপন ঠিকানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে দেয়, তবে তারা সেখানে গিয়ে দেখবে তার বাসর বাড়ী রং বেরংঙের সোডিয়াম লাইট দিয়ে আছে সাজানো। মণিমুক্তা আর স্বর্ণ ও এয়াকুতের বালাখানাগুলো রয়েছে অপূর্ব শোভায় সাজানো। নিজ দেহের কোষস্থ পরমাণুর সন্তানেরা আছে তার প্রতীক্ষায়। তাদের গায়ের সুকৃতিতে রয়েছে অপরূপ আনন্দ আর ভালবাসা জাগানোর মতো পারফিউমের গন্ধ। এতে নেই কোন অন্ধকার, ক্ষুধার জ্বালা, মৃত্যু, জরা কিংবা রোগ-বালাইর কোন উপাদান। আছে সূর্যহীন সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত ঝকঝকে আলোর অপূর্ব কিরণ। আছে উত্তম রূপ-রসের প্রয়োজনীয় সুস্বাদু খাবার। আছে রকমারি সুগন্ধি পানীয়। সেখানে গরম অনুভব করার মতো নেই কোন উপাদান। নেই কোন ঠান্ডা লাগার দানা। আছে শীততপ নিয়ন্ত্রিত অপূর্ব আরাম আর আরাম দায়ক ব্যবস্থা। আছে লজ্জায় অবনত পরমাসুন্দরী হুর। তাদের রয়েছে সুরক্ষিত মণি মাণিক্যের মতো অপরূপ সৌন্দর্যময় দেহ। আছে সেবার জন্য অগণিত দাসদাসী।

অথচ দু'ধরনের মানসিক ভিন্নতার জন্য কতই না ভিন্ন পরিবেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে। কিন্তু আমাদের মাথা উঁকি দিয়ে সে দৃশ্য এখন দেখতে না পারলেও এর সত্তা, এর প্রকৃত উপাদান আমরা তিলে তিলে

www.pathagar.com

পৃথিবীর কৃত্রিম বধুর সাথে ঘর সংসার করেই পাচার করে যাচ্ছি। এগুলো আমাদের নিজ দেহের পরমাণুর গর্ভের বিকীর্ণ সন্তান আর দল ও আত্মার অভিব্যক্তির ফসল। বিশ্ব প্রভুর প্রজ্ঞাময় প্রকৃতির কৌশলেই সেগুলো জন্ম নেয়। এই সত্তাগুলো দিয়ে আমাদের বাসর বাড়িগুলো নতুন অংকুরের সমাহারে পল্লবিত হয়ে মনোরম সাজে ফুটে ওঠে। অথবা দুঃখের সাগর সৃষ্টি হলে তর্জন গর্জন শুরু করতে থাকে।

হযরত আদম (আ) মনের অভিব্যক্তির প্রেরণার ফসল থেকে খোদার নির্দেশে যেমন তার দেহের সত্তা দিয়ে স্ত্রীজাত (বিবি হাওয়া) সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এই দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থায় সেই দুই যুগল সৃষ্টির পরিপূর্ণ সংসারে নিজেদের অভিব্যক্তির প্রেরণার ফসল থেকে আবার খোদার ইচ্ছায় তাদের দেহের সত্তা দিয়ে নতুন এক কর্মফলের জগৎ সৃষ্টি হবে। সেটিই পরজগৎ। সেই বিচারে একে সঠিক পয়েন্ট দিন Negative dimenssion -এর জগৎও বলা যায়। তাই আমি পরকালীন জীবনকে নব যৌবনা চিরকুমারী কনের সাথে তুলনা করেছি। এই পৃথিবীর বাসিন্দারাই হবে সেখানকার বর। বর যেমন কনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আগে নিজে তৈরী হয়ে কনের সাজ গোজের জিনিসপত্র নিজের কায়িক উপার্জন দিয়ে কিনে নিয়ে কনের বাড়ীতে যায় তেমনি পৃথিবী বরগণের জন্যও নব যৌবনা চিরকুমারী কনের বসত বাড়ীতে যাওয়ার আগেই নিজের আমলের সুকৃতির প্রভাব দিয়ে ভালো অলংকারাদির উপাদান পাঠিয়ে দিতে হয়, মানব জাতির আমলের সত্তার তৈরীর জগতের নাম কর্মফল জগৎ।

এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, ছেড়ে যেহেতু একদিনের জন্যও সেই কনের রূপ-যৌবন দেখে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই অনেকের বিশ্বাসের শিকড় নড়তে থাকে। দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যদি 'রাহবরের' কথা বিশ্বাস করে কনের দুলা হতে তার সাজ- গোজের জিনিস পত্র নিয়ে দেখতে যেতে পারি তাহলে ওপাড় দেশের নব যৌবনা কুমারী কনেকে কেন বরণ করার জন্য রাহবরের কথা অনুসরণ করতে পারব না।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজি সকল মানুষের পক্ষেই তো রাহবর হয়ে সবকিছু সশরীরে দেখে এসেছেন। মানব জাতির পরম কল্যাণের পুণ্য তিনি পাপ-পুণ্যের যে তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

"পাপ ও পুণ্য দু'টো সৃষ্ট বস্তু।" এগুলো শেষ বিচারের দিন লোকের সামনে দন্ডায়মান হবে। অতপর পুণ্য পুণ্যবানদের সুসংবাদ দেবে এবং পাপ পাপীদের বলবে; দূরে হট, দূরে হট। কিন্তু তারা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। —(আল-হাদীস/ইসলামী দর্শন–৩৫২)

কিয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম বিশেষ আকার ধারণ করে উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম উপস্থিত হবে নামাজ, অতপর দান, অতপর রোযা।

—(আল-হাদীস, ইসলামী দর্শন-৩৫২)

"তা আর কিছুই নয় তোমাদের কৃতকার্য সমূহই ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।"

"পৃথিবীতে যে যা কিছু করবে তার অধিক তাকে দেয়া হবে না।"

"যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে শরীরের রক্ত গোশত বানাবে তাদের ঐ রক্ত গোশত দোযখের ইন্ধন হবে।"

"তোমাদের কৃতকার্য তোমাদের সামনেই হাজির করা হবে।"

—(আল-হাদিস)

মহানবীর ইন্দ্রিয় দূরবীনের কাছে আমাদের দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার কর্মের সুকৃতি ও দুস্কৃতিই হলো পরকালের সম্পদ। সেদিন এই নেকী ও গুনাহ ব্যতীত মানুষের কাছে আর কিছুই থাকবে না। সেজন্য দুনিয়াতে যদি কেউ কারও প্রতি অন্যায় করে থাকে, তাহলে মজলুমের দাবী তার নেকী দিয়েই পূরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যা হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (মানব সন্তানের) প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অবিচার করে, তাহলে তার উচিত এখানেই (দুনিয়াতেই) তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আখেরাতে কারো কাছে কোন কপর্দকই থাকবে

www.pathagar.com

না। অতএব সেখানে তার নেকীর কিয়দংশ ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট নেকী না থাকলে, মজলুমের গুনাহের কিয়দংশই তাকে দেয়া হবে।

মূলত ঃ পাপ–পুণ্যের যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে , তাহলে এরূপ বিনিময় কি করে সম্ভব। তাছাড়া পাপ-পুণ্য তো আর পরপারের জীবনে উৎপাদনের কোন কিছু নয়। এরূপ ব্যবস্থা তো সেখানে থাকবেই না। জীবন ঘনিষ্ট সকল আচার আচরণ কথাবার্তা সবি আমাদের কর্ম। আমাদের মনের অভিব্যক্তি বা নিয়ত সকল কর্মের চাবিকাঠি। চাবি ব্যতীত তালা যেমন খোলা যায় না তেমনি মনের অভিব্যক্তির সংকেত ছাড়া দেহ কাজ করে না। এই চাবি বৈধ-অবৈধ উভয় পথেই ব্যবহার করা যায়। চাবি দিয়ে তালা বন্ধ করে যেমন নিজের মালামাল নিরাপদে রাখা যায় তেমনি বিকল্প চাবি ব্যবহার করে অন্যের সম্পদ লুট করাও যায়। দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার বৈধ পথ কোনটি তা ঐশী কিতাবে উল্লেখ আছে। ভালোমন্দ উভয় পথেই কর্মের নিগূঢ় সত্তা নিঃসৃত হয়। এই নিগূঢ় সত্তা খোদার অতিপ্রাকৃতিক প্রযুক্তির অসীম ডিস্ক এন্টিনায় ধরা পড়ে অথবা নাও পড়তে পারে। ধরা পড়া মানে কবুল হওয়া। কবুল না হলে সেগুলো ঝুলে থাকে। কি বিচিত্র সেই ব্যবস্থা, যেগুলো ধরা পড়ে না সেটির জন্য রয়েছে খোদার অসীম প্রজ্ঞার লীলাখেলা। এর জন্যও রয়েছে ভিন্ন ধরনের গ্রাহক যন্ত্র। পক্ষান্তরে আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা তরঙ্গের মতো ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে কিংবা আকাশ তারের সূক্ষ্ম পথ ধরে তা বেয়ে চলে অনন্তের ওপার দেশের গ্রাহক যন্ত্রের দিকে। সেই গ্রাহক যন্ত্রের প্রযুক্তিতে এই নতুন সত্তা দিয়ে নতুন অংকুরের সমাহারে পল্লবিত হয়ে ভরে ওঠে ব্যক্তির কর্মের প্রতিফলের জগৎ। এই সত্তা তড়িৎ চুম্বক শক্তির ন্যায়, সাগরের জল তরঙ্গের মতো, সীমাহীন বোম সাগরে ঢেউ খেলে খেলে ক্ষণিকেই চলে যায় তার নিজ ঠিকানায়। অপর দিকে আলোক রশ্মি আমাদের কর্মের প্রতিবিম্ব গুলোকে গায়ে মেখে আঁধারের প্রাচীর ভেদ করে ছুটে চলে অসীমের দিকে। এই প্রতিবিম্বগুলি ক্রমে ক্রমে ছবির নেগেটিভের মতো

www.pathagar.com

সেলাই হয়ে কর্মলিপি তৈরী হয়। সেটিই আমল নামার খাতা। এটি আমাদের সারা জীবনের কর্মের গাঁথা আলোক বৈতনীক। এই খাতায় কোন চুল চেড়া ভুল থাকে না। সেখানে জীবনের রঙ্গিন দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো থাকবে। খুনীর অপকর্ম কিংবা ধর্ষনের চিত্র কোনটিও বাদ পারবেনা। কেউ যদি পরকালে দুনিয়ার কর্মের কথা অস্বীকার করে তখন ঐ কর্মলিপিই তার সামনে প্রকাশ করা হবে। তখন সে নিজের কর্মের হুবহু চিত্র দেখে লজ্জায় হেট হয়ে যাবে। পরিণামে বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসবে তার।

পৃথিবীতে নবী, রাসূল(সা)-গণ স্রষ্টার মনোনিত জীবন ব্যবস্থার নমুনা বা ফর্মূলা নিয়ে এসেছিলেন। তাদের দেয়া ফর্মুলা বা নমুনায় জীবন যাপন করার মাঝে উত্তম কর্মফল তৈরীর অন্তরনিহিত রহস্য বিরাজমান। আমরা ওপার জীবনে নিজেদের কৃতকার্য সমূহে ফিরে যাবো এতে কোন সন্দেহ নেই। একদিন তার প্রতিক্রিয়ার স্বাদ-গন্ধ ভোগ করতেই হবে। তাই জীবন নামের পাখিটি মহানিদ্রায় যাওয়ার আগে এখনি তন্দ্রা ভেঙ্গে নিজ স্বার্থেই জেগে উঠা প্রয়োজন। যাঁরা চেষ্টায়, সাধনায় তন্দ্রা ভেঙ্গে জেগে ওঠে ছিল তাঁরাও অতিপ্রাকৃতিক বিধানের রহস্যের কথা স্বীকার করেছেন। আমাদের কর্মের সত্তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মুসলিম মনীষীগণ নবী প্রদত্ত ফর্মূলায় জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। তাই তাদের দর্শনের মূল্য আছে। সে কারণে সেসব মনীষীগণ কর্মের সত্তা সম্পর্কে যে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তা থেকে জ্ঞানের বীজ নিয়ে জীবনকে সুন্দর ভাবে সাজাতে পারলে জীবনে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছা সহজ হবে।

www.pathagar.com

মুসলিম দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য

পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা সকল যুগেই কিছু ব্যক্তিগণকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত মহামানব। এঁরাই আমাদের নবী রাসূল। তাঁরা সহজ সরল পথের দিশারী। এসব নবী রাসূলগণের প্রর্দশিত পথে যাঁরা জীবন যাপন করে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহর নিকট সম্মানের পাত্র, গুণী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা ওহীর জ্ঞান লাভ করতে না পারলেও খোদার অপার মহিমায় আত্মিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছতে পেরে ছিলেন। তাঁদের মনের প্রশস্ততায় এক সময় অন্ধকার হৃদয় থেকে পালিয়ে যায়। তখন তাঁরা এলহাম বা ধ্যানে বিশ্ব-জগতের অনেক রহস্যের সন্ধান পেতেন। তাঁরা বলতে পারতেন অতি প্রাকৃতিক নিয়মের নিগূঢ় রহস্য। এতে করে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের সম্মোহনী শক্তির প্রকাশ ঘটে। তাঁদের এই অলৌকিক সম্মোহনী শক্তিকে বলা হয় কেরামতি। আর নবী রাসূলগণের বেলায় বলা হয় মোজেজা। সাধারণ মানুষের নিকট এই সব মোজেজা বা কেরামতি অলৌকিক মনে হলেও সেগুলির লৌকিকতাপূর্ণ কার্য- কারণ নীতির বাইরে ঘটেনি। এই লৌকিকতা সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়ে না। বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টির অসারতার জন্য আমরা যে জিনিসের ব্যাখ্যা করতে পারি না, সেটিকেই অলৌকিক মনে করি। বিশ্ব-জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অতি প্রাকৃতিক যে বিধান (নিয়ম) চালু আছে সেই স্তরটি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু অলি-দরবেশগণের চোখে তা ধরা পড়ে। তাই তাঁরা দুনিয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে যতটুকু না ভাবেন তার চেয়ে বেশী ভাবেন অতি প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে। সেজন্য তাদের কথায়, কাজে, আচার-আচরণে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার মূল্য বেশী থাকে। তাঁদের কথা বিজ্ঞানের গণ্ডির কাছাকাছি না হলেও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞানের অতি প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পাগলা হাতিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা না গেলেও তাঁদের দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তির নজরেই তা বশ মানতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা দিয়ে হয়ত তাকে বশ মানানো যায় না। আত্মিক পাওয়ার (Power) ও এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির কাজ অতি প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। যেমন মুরগী ২১ দিন তাপ দিলে ডিম ফুটে। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু অতি প্রাকৃতিক নিয়মের বেলায় এর কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। অনেক অলী-দরবেশগণের জীবনীতে এরূপ বাধ্য বাধকতাহীন অনেক অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জানা যায়। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম শিথিল হয়ে পড়ে। এঁদের আত্মিক চোখে, সৃষ্টি জগতের অতি প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্য প্রাকৃতিক বিধানের মতো ধরা পড়ে। ফলে মানব জাতির আত্মা বা দল ও দেহের বির্কীণ সত্তার রূপ, গুণ, স্বভাব তাঁরা আঁচ করতে পারতেন। কারণ তাঁদের অন্তরদৃষ্টি তখন প্রাকৃতিক নিয়মের সীমানার মধ্যে বসবাস করে না। তাঁরা তখন অতি প্রাকৃতিক নিয়মের দৃশ্য বৃষ্টির মতো উপলব্ধি করতে পারেন। এসব মহামানবের কথাবার্তা বিজ্ঞানের সূত্রের ধার ধারে না। তবু তাদের কথাগুলো তত্ত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ব। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে তাঁদের সে সব জ্ঞানগর্ব বর্ণনার সারমর্ম থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়ে যেন দিনে দিনে সেই অতি প্রাকৃতিক নিয়মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মনে হয় যেন বিজ্ঞানের সাথে এখন আর অতি প্রাকৃতিক নিয়মের কোন হানাহানি নেই। দিনে দিনে সব যেন এক হয়ে আসছে। যখন বিজ্ঞানের প্রভাত ফেরী শুরু হয়েছিল তখন বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন বস্তুর আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন। তাই তারা সে সময়ে বস্তুকেই বিশ্বের 'আদি সত্তা' মনে করতো। এরপর যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার হলো তখন বস্তুকে আর স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা গেল না। বস্তু এখন রূপ নিল কাল্পনিক ছায়ায়। তারপর বির্কীণ শক্তির বেলায়ও একই কথা আসল। কিন্তু এই বিকীর্ণ শক্তি যত মিহি বা সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতোই হউক না কেন তার মাঝেই তার গুণাগুণ ও রূপ বিদ্যমান থাকে। আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি কৃষ্ণ বর্ণের অথবা আ-লোক উজ্জ্বল বর্ণের যাই হউক না কেন এদের কোন সংমিশ্রণ হয় না বা কোন কালেও সেগুলোর গুণের পরিবর্তন হয় না। আমাদের আত্মা ও দেহের মাঝে প্রতি মহূর্তে যে পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের কোন ছোঁয়া আমরা লক্ষ্য করতে পারি না। আবার ভৌতিক কোন কারণে যদি সেই

www.pathagar.com

পরিবর্তন সব কিছুকে ওলট পালট করে দেয় তখন ঐ ঘটনাটি আমাদের মনে থাকে কিংবা দৃষ্টিতে পড়ে। এর কারণ হলো সে সময়ের ঘটনাটি আমাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। জীবন খাতার প্রতিটি লাইনে লাইনে অহরহ যে অদৃশ্য পরিবর্তন হয় বা ঘটনার দৃশ্যপট আঁকা হয় তা কি কোন দিন শেষ হয়ে যায়? একটি লোককে কেউ যদি হত্যা করে ফেলে, এতে তার দুনিয়ার জীবন থেকে সে ঘটনাটি অদৃশ্য হয়ে গেলেও মৃত্যুক্ষণের ঘটনাটি কি কখনো প্রকৃতি থেকে বিলীন হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমরা দুনিয়াতেই যদি মৃত্যুর দৃশ্যটি ফটো করে রাখি, তাহলে এটি ইচ্ছা থাকলে আজীবন আমরা ধরে রাখতে পারব। কোন দৃশ্যের আ-লোক প্রতিবিম্বের যে ছবি আমরা ধরে রাখি এতো শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, সেগুলোতো প্রকৃতির বাতাসের গায়ে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আজীবন অটুট থাকে।

আমাদের জীবন চাকা অবিরত ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের সময় জীবনের প্রতিটি মহূর্তের দৃশ্য ও প্রতিচ্ছবি আমাদের স্মৃতি পটে বিরাজ করে না। যে সকল ঘটনা চরম সুখ ও চরম দুঃখ দেয় সেগুলোই শুধু মনে থাকে। একটি শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আজকে যে শিশু হয়তো ৬০ বৎসর পর সে-ই আবার বৃদ্ধ। সময় স্রোতের ঊর্ধ্বগতির ফলে দেহে যে পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তন ধরে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি সেই পরিবর্তনশীল কাঠামোকে জীবন্ত অবস্থায় আলাদা আলাদা করে ধরে রাখা সম্ভব হতো, তবে একটি মানুষ ৬০ বৎসরে বহু রূপে দেখা দিতে পারত। কিংবা একটি মানুষের সারা জীবনের কর্মগুলোকে যদি পর্যায়ক্রমে মালা বানিয়ে গেঁথে রাখা যেত তবে কত বিচিত্র দৃশ্যই না দেখা যেত। অথচ আমাদের দৃষ্টি কোন কিছুকেই ধরে রাখতে পারে না। কালের স্রোতের সাথে সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে যায় শূন্যে। এ সব পরিবর্তনগুলো বিরাজ করে অতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে। সেখান থেকে বিকীর্ণ কর্মশক্তির একটি কণাও হারিয়ে যায় না, বিনাশ হয় না। সাগরের জলরাশি থেকে যে রূপে তার সত্তা বাষ্প হয়ে মেঘ মুল্লুকে ঘুরে বেড়ায় তেমনি আমাদের দেহের অদৃশ্য বিকীর্ণ কর্মশক্তি, যা কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম ফাঁক ভেদ করে শূন্যে বের হয়ে পড়ে, সেগুলোও ঘুরে বেড়ায় স্রষ্টার

www.pathagar.com

অতি প্রাকৃতিক 'বোম' সাগরে। এতে মানব দেহের কর্মের আঁচড় লেগে থাকে। এই সত্তা বিনাশ না হলেও আমাদের দৃষ্টি তার কাছে অসহায়। আমরা এই পৃথিবীর সর্ব উচ্চ আকাশ ছুঁয়া প্রাচীরের ওপরে উঠে উঁকি মেরেও তার খোঁজ খবর নিতে পারি না কিংবা রকেট যাত্রায় বের হলেও তার সন্ধান পাব না। কোথায় সেই অদৃশ্য সত্তার জগৎ, কেউ কি তার ঠিকানা বলতে পারবে?

নিশ্চয়ই যাঁদের অন্তর দৃষ্টিতে অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রাকৃতিক নিয়মের মতো ধরা পড়ে তাঁরা তার কথা বলতে পারেন। পৃথিবীতে অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ মানুষের কর্মের অদৃশ্য সত্তার কথা তুলে ধরেছেন। সেই সুনামধন্য মনীষীগণের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী (রহ) একজন অনন্য প্রতিভার লোক। তাঁর ভাষায়, মানব জীবনের ভালো মন্দের সত্তা হলো আলো-আঁধারের মতো। তিনি বলেছেন– "যে সমস্ত কার্য হতে অসৎ বা মন্দ স্বভাবের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাদিগকে পাপকার্য বলে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কার্য হতে মহৎ গুণাবলী বা সৎ স্বভাবের উৎপত্তি হয় তাদিগকে পুণ্যকর্ম বলে। মানুষের যাবতীয় কার্য-কলাপ বা গতিবিধি পাপ ও পুণ্য এই দুই অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় অবস্থায় থাকতে পারে না।

মানুষের দল বা আত্মা স্বচ্ছ আর্শির ন্যায় উজ্জ্বল আর মন্দ স্বভাব বা পাপকার্যগুলো ধুম্র ও অন্ধকারের ন্যায় মলিন। এটি ক্রমশঃ আত্মার ভেতর প্রবেশ করে তাকে অন্ধকারচ্ছন্ন করে তোলে। অতপর মানুষের মন্দ স্বভাব ও পাপ কার্য স্বচ্ছ আত্মার সামনে একখানি কাল বর্ণের পর্দা ঝুলিয়ে দেয় এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার পরমোন্নত দরবার দর্শন হতে বঞ্চিত করে। সেই পরমোন্নত স্থান তার নিকট আচ্ছাদিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সদগুণ ও মহৎ স্বভাবগুলো আলোকতুল্য। সেটি আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক সমস্ত মলিনতা ও পাপ বিদূরীত করে আত্মার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা বাড়িয়ে দেয়। এ জন্যই নবী করিম (সা) বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি পাপ কার্যের পশ্চাতে এক একটি সৎকার্য করবে। ফলে সৎ কার্যটি মন্দ কার্যটিকে বিলোপ করে দিবে। 'কিয়ামত দিবসে মানবাত্মাই উজ্জ্বল সৌন্দর্য বিশিষ্ট বা অন্ধকারবৃত মলিন হয়ে বিচার ক্ষেত্রে উত্থিত হবে।"

–(কিমিয়ায়ে সা'আদাত-৪৮)

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (রহঃ) মানুষের সকল কর্মকে মাখলুক বলেছেন এবং ভাষার উচ্চারণও কর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলরামী কোরআন মাজিদের নিম্নের আয়াতগুলোর উদ্বৃতি করেছেন এভাবে – "হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যে 'খায়ের' ব্যয় করেছ এবং যে খায়ের ব্যয় করছ, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।' –(আল- কোরআন)

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধী খুব খাটো। সেজন্য আমরা.উপরোল্লেখিত মনিষীগণের মতো সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি না। তাদের অন্তর দৃষ্টি নক্ষত্রের আলোর মতো স্বচ্ছ। তাই গোনাহ বা নেক কণা এঁদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

মন্দ যে করে সে সব সময়ই ভালোজনকে ফাঁকি দেয়। আলো আঁধার মিলে দুনিয়া, আর ভালো মন্দে মিলে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর কর্মশক্তি আলো আঁধারের মতো। সমুদ্রের কল ধ্বনিকে যেমন পানির দরিয়া গিলে ফেলে তেমনি এই দিগন্ত বিসৃত সীমাহীন আকাশ নামের 'বোম' সাগর মানুষের কর্মশক্তি গুলোকে গিলে ফেলে? এর পেট ছিঁড়ে সেগুলোকে কোন দিন বের করা যায় না। সবই যেন লোকালয় দৃষ্টির অন্তরালে নিমিষেই হারিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার খবর রাখে না। এই সত্তাগুলো অপ্রাকৃতিক বস্তু। ওরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলেও ইমাম গাজ্জালী (রহ) মতো মহৎ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাঁদের অন্তর চোখের কর্ণিয়ার পর্দায় স্বচ্ছভাবে সবই ধরা দিয়েছিলো। এসবই তাদের অধ্যবসায় সাধনা, আর চেষ্টার ফল। মানুষ জন্মের 'প্রকৃতি' তার চেষ্টার হাতিয়ার। প্রকৃতগত ভাবে জীবজন্তু জন্মের সময় তার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগেই নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ তাদের সংগেই থাকে। ঠান্ডা কিংবা গরম তাদেরকে পরাভূত করতে পারে না। খাদ্যের জন্য ভাবতে হয় না, বসবাসের জন্য চিন্তা করার দরকার হয় না। প্রকৃতির বিস্তর মাঠ, বন-জঙ্গল পানির-দরিয়া আবাদী-অনবাদী ভূ-মন্ডল সবই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র, খাদ্যের সীমানা। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই জন্মগ্রহণ করে অসহায় অবস্থায়। জন্মেই তাদের প্রয়োজন হয় পোষাকের। প্রকৃতির পোষাক তাদের শীত নিবারণ করতে

www.pathagar.com

পারে না। শরম ঢাকার জন্য তাদের থাকে না কোন প্রকৃতিগত ব্যবস্থা। তাই লজ্জাস্থান লুকানোর জন্য প্রয়োজন হয় পোষাকের। দরকার হয় খাদ্য তৈরীর জন্য রন্ধনশালার। থাকার জন্য প্রয়োজন হয় নিরাপদ বসতবাড়ীর, এ সবরের আয়োজন করতে গিয়ে মানুষের করতে হয় চেষ্টা-সাধনা। এই সাধনার ফলে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলো চিন্তা বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়, প্রসারিত হয়। যেসব মানুষ জ্ঞান পিপাসী হয়ে জেগে ওঠে, তাদের তখন ঘুম নিদ্রা হয়ে যায় হারাম। তারপর সাফল্য ফিরে আসে। ক্রমে ক্রমে এই সাফল্যের দানাগুলো জমে জমে প্রকৃতি একসময় কৃত্রিম শোভায় ভরে ওঠে। ঘর-বাড়ী, দালান-কোটা, কল-কারখানা, শোবার জন্য খাট-পালং, আসবাবপত্র, চলাচলের জন্য যানবাহন সবি সে তৈরী করতে সামর্থ হয়। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করে অসহায়ত্ব রোধের সকল পন্থা। এরপর জাগে তার চিরন্তন ভাবনা। তখন সে মরতে চায় না, দুঃখ চায় না, চায় অফুরন্ত জীবন। এই জীবনের জন্য ভাবতে ভাবতে তার অনেক কিছু জানা হয়, দেখা হয়। দেখতে দেখতে জানতে জানতে একসময় প্রকৃতির দ্বার খুলে যায়। অতি ইন্দ্রিয়ের পর্দা হালকা হয়ে আসে। ফলে অপ্রাকৃতিক জগতের আলোক রশ্মি শিশিরের মতো তার অন্তরকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দেয়। পক্ষান্তরে কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে অপ্রাকৃতিক জগতের গন্ধ-সাধ আসতে থাকে। চোখের পর্দায় ক্ষীণ আলোর আভায় সব দেখা যায়। পৃথিবীতে অনেক মনীষী মানুষের প্রয়োজনে জ্ঞান পিপাসী হয়ে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে অপ্রাকৃতিক জগতের অনেক নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। তখন তারা বিস্ময়ে লুটে পড়েছিলেন স্রষ্টার অপার মহিমার সাগরে। সেই জগৎ বিখ্যাত কালজয়ী বিজ্ঞান সাধকগণের জ্ঞানগর্ব কথা আমাদের চিন্তার খোরাক। ধ্রুব তারার মতো দিকভ্রান্ত নাবিকের পথ নির্দেশক। জানার জন্য জানা নয়। মানার জন্য জানাই উত্তম, যদি যুক্তির সাগরে তাদের কথাগুলো ঠাঁই দেয়, তবে জীবন তরীর নোঙ্গর ফেলার আগেই তা জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে পাল ঘুরিয়ে, হাল ঘুরিয়ে দিক ঠিক করে পথ চলতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই, রাত্রির তর্জন-গর্জনের কথা ভাবতে হবে। আকাঁ-বাঁকা পথ ছেড়ে হাল ধরতে হবে সরল পথের দিকে। তবেই মুক্তির আশা করা যায়।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিকীর্ণ কর্মশক্তি

বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হচ্ছে মানুষ ততই অসীমের শিকড় তালাশ করতে শুরু করেছে। অসীমকে জানার সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো মানুষের সীমাবদ্ধতা। মানুষ স্বভাব সিদ্ধ নিয়মে সীমাবদ্ধতার প্রাচীরকে ফারাক করতে চায়, ভাঙ্গতে চায়। তাই মানুষ এখন আর পৃথিবীর লোহা লক্করের তৈরী যন্ত্রযানে চড়তে চায় না। এতে সময়ের যেমন অপচয় হয় তেমনি জীবনের ঝক্কি ঝামেলাও পোহাতে হয় অনেক। অপেক্ষার মৃত্যু বহর নিয়ে তীর্থের কাকের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বার বার সময় দেখতে হয়। কখন আসবে সেই যন্ত্রযান, সিডিউল টাইম তো চলেই গেল। আর কত অপেক্ষা করা যায়। সেজন্য লোহা লক্করের যন্ত্রযানের প্রতি মানুষের অনীহা। তাই মানুষ বিরক্তির অবসান চায়, পরিত্রাণ চায়। ভাবে ফ্যাক্স, টেলেক্স এর মতো যদি দেহটিকে শূন্যে তরঙ্গ করে পাঠিয়ে দেয়া যেতো, তাহলে তো এ ঝামেলাই থাকতো না। অবশেষে যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা সেখানে যদি আর একটি মেশিন দেহকোষের অদৃশ্য তরঙ্গ দানাগুলোকে জড়ো করে পূর্বের ন্যায় মানুষ বানিয়ে দিতে পারতো, তবে এক নিমিষেই পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ফিরে দেখে কাজ-কর্ম সেরে আবার নিজ গন্তব্যে ফিরে আসা কতই না সহজ হতো, সুখের হতো। প্রয়োজনে চাঁদের দেশ কিংবা মঙ্গল গ্রহ বিচরণ করা সম্ভব হতো। মানুষের কল্পনার দুয়ারে কত যে স্বপ্ন এসে ভীড় করে তার ইয়ত্যা নেই। এই স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবে রূপ নেবে কি না জানি না। তবু মানুষ চেষ্টায় রত, সাধনায় রত। মানুষ আজ সাধনার তরী নিয়ে সাফল্যের আশায় অসীম সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য যন্ত্র ছাড়াই তার পথ খুঁজছে। পাশ্চাত্য জগতের থিওসফী নামক আধ্যাত্মিক সাধনার পথ এর দাবী রাখে থিওসফীর মতে মানুষের তিন প্রকার দেহ আছে। যেমন – জ্যোতির দেহ, মানস দেহ ও জড়দেহ। আত্মা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবান হলে জড়দেহকে রেখে মানুষের পক্ষে ইথারিক দেহ (জ্যোর্তির দেহ) ধারণ করে বিশ্ব ঘুরে আসা সম্ভব। কারণ আত্মা যদি আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয় তবে সব দেহই আত্মার বশ মানতে রাজি। এতে স্থূল দেহও কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবে না। একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে যদি জ্যোতির দেহ নিয়ে মানুষ উড়াল দেয় তখন তার স্থূলদেহ

www.pathagar.com

জ্যোতির গতিতে ওজনহীন হয়ে সেটিও উড়াল দিবে। গতিশীল জিনিসের বেলায় স্থুল জিনিস শূন্য দিয়ে ভ্রমণ করা কোন সমস্যার ব্যাপার নয়। তবে সেই গতি হতে হবে স্থুল আকারকে ওজনহীন করার মতো বেগবান। থিওসফীর সাধনা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগে মানুষের জন্য এক যুগান্তরকারী অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। এক কালে মুসলিম সুফী সাধকগণ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে অনেক অলৌকিক ব্যাপার রপ্ত করেছিলেন। তারা পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন, আকাশ দিয়ে চলতে পারতেন। বর্তমানের থিওসফীর সাধনা যেন মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাখিকে আকাশে উড়তে দেখে একদিন মানুষ পাখির মতো ডানা লাগিয়ে উড়তে গিয়ে সফলকাম হতে পারেনি। কিন্তু এতেও মানুষের চেষ্টা, সাধনা, তদবির কমেনি। সেই সাধনার ফলেই একদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ বানাতে পেরেছিলেন। আজ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই উড়োজাহাজ উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছেছে। তার পথ ধরেই মানুষ এখন রকেট (Space ship) বানিয়ে চাঁদের মাটিতে বিচরণ করে সফল ভাবেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছেন। এবার শুরু হয়েছে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পালা। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় আজ যে জিনিস কল্পনার বিষয়বস্তু কাল তা সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বলছি যন্ত্রযান ছাড়া ঘুরার যে সাধ মানুষের মনের বাসরে উঁকি দিয়ে আছে তা হয়তো একদিন সত্য হিসেবে ফলতেও পারে।

এক সময়ের পঁচা-গান্দা বস্তুবাদী চিন্তাধারা মানুষকে বানিয়ে ছিল ইতর বানরের জাত। আজ সেই পঁচা-গান্দা ডারউইনি মতবাদ বিজ্ঞানীগণ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছেন। পক্ষান্তরে মার্ক্স-এর দর্শন জন্ম দিয়ে ছিল নাস্তিক্যবাদ। এই নাস্তিক্যবাদই এক শ্রেণীর জ্ঞান পাপীদেরকে বানিয়ে ছিল অন্ধ ও লোভাতুর জন্তু জানোয়ারের মতো। তারা হাশর-নশর পাপ পুণ্য, পুনরুত্থান, শেষ দিবসের বিচার-আচার কিছুই বিশ্বাস করতো না। খাও দাউ স্ফুর্তি করো, আগামী কাল বাঁচবে কি না বলতে পারো, এই মন্ত্র গলায় ঝুলিয়ে তারা জীবনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এখন অবশ্য তারা তার স্বাদ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এইডস এর প্রতিক্রিয়া সেই মজা এখন লিভার বেরামের রোগীর মতো জিহবাকে করেছে তিতা

www.pathagar.com

এবং শরীরকে দিনে দিনে করছে নিস্তেজ। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারতায় এই সব বস্তুবাদী ধারণা এখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বসেছে। কোন কোন দেশ থেকে সে সব নাস্তিক্যবাদী প্রভুদের পাথরের লাশ ক্রেইন দিয়ে সরিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যখন এই নাস্তিক্যবাদী ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল, তখন অসীম সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল একেবারে সীমাবদ্ধ। সে জন্য অনন্ত অসীমের প্রেমময় মধুর বাণী মানুষ হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারেনি। তখন ধর্মের বাণী ছিল উপেক্ষিত। ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু যুগশ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান বিজ্ঞানী আলবট্ট-আইনস্টাইনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আপেক্ষিক তত্ত্ব অসীমের ধারণাকে করেছিল শিথিল ও সহজ। তারপর থেকে মানুষের মনে অংকুরিত হতে থাকে পরকালের ধ্যান ধারণা। বর্তমানে মানুষের সেই বিশ্বাসের শিকড় মেলতে মেলতে চলে গেছে অনন্তের দিকে, অসীমের দিকে। সেই অসীম থেকে সসীম নিতে থাকে আত্মিক খাদ্যরস। ফলে মানুষের মনে পুনরায় ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ। জাগরণ শুরু হয়েছে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বিজ্ঞানের সেই সাধক পুরুষ একাধারে যেমন ছিলেন বিজ্ঞানী তেমনি ছিলেন পরকাল ও স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তিনি ভাবতেন মানুষের বিকীর্ণ কর্মশক্তির কথা, ভাবতেন অপ্রাকৃতিক জীবন ব্যবস্থার নিয়ম নীতির কথা। তার ভাবনার বিষয়বস্তুর রহস্যময় তত্ত্ব মানব জাতিকে দেখিয়েছে, আলোর পথ, মুক্তির পথ।

বিজ্ঞানের এই সাধক পুরুষ পরকাল সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো – "সেই অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নীচের দিকে টেনে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছু নেই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদেরকে স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে।" –(বিশ্ব নবী- ৪৪২)

আস্তিক্যবাদী এই বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার ফল ধর্মেরই সারকথা। তিনি বিশ্ব জগতের সম্প্রসারণ ও মানুষের বিকীর্ণ কর্মশক্তি সম্পর্কেও বিশ্বাসীদেরকে নতুন ধারণা দিয়েছেন। সে ধারণা আমাদেরকে কর্মফলের জগৎ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁর মতে–

"বিশ্বের কোথাও পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বে পদার্থের পরিবর্তন হচ্ছে

www.pathagar.com

এ কথা সত্য কিন্তু এই পরিবর্তন একই দিকে পদার্থের ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতির দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত ব্যাপার সে পরমাণুর ভেতরেই হউক আর বহির্বিশ্বেই হোক একই বিষয় নির্দেশ করে যে, পদার্থও কর্মশক্তি বাষ্পের মতো অদৃশ্য শূন্যের ভেতর অবিরত ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে নিভে যাচ্ছে। তারাদের অনেকেই এখন পোড়া কয়লা মাত্র, বিশ্বের সর্বত্র তাপের মাত্রা কমে আসছে। পদার্থ বিকীর্ণ হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কর্মশক্তি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব তাপ মৃত্যুর দিকে এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।" – (বিজ্ঞান না কোরআন - ১৯৫ পৃষ্ঠা)

ইসলাম ধর্মের পূবশর্ত গায়েবে বিশ্বাস স্থাপন। না দেখে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের মূল। ধর্মীয় রীতি নীতিতে আমল করা মানে ঈমানের স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্ব শর্ত তার তত্ত্ব ও সূত্র তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ নির্ভর হতে হবে। বাস্তবে তা না হলে বিজ্ঞান কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

আমাদের এই পৃথিবী রং বেরংগের বস্তু নিয়ে গঠিত। প্রাণহীন জড় পদার্থ এবং প্রাণধারী জীব সত্তার দেহাবরণ এই দুনিয়ার পদার্থের তৈরী। সকল পদার্থের আদি মৌল পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। আইনস্টাইন বলেছেন, বিশ্বের অন্য কোথাও পদার্থের মৌল উপাদান তৈরী হয়েছে। মূলতঃ তার এই কথার কোন তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ নির্ভর যুক্তি বা ব্যাখ্যা না থাকলেও এতে রয়েছে বিজ্ঞানের পদযাত্রার প্রথম হাতিয়ার অনুমান ভিত্তিক তথ্য কথা, ধরে নেয়া বা মনে করার মতো বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি। এই বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বিজ্ঞান প্রথম থেকেই এভাবে যাত্রা শুরু করে তার স্বপ্নের আসন থেকে বাস্তবে পদার্পণ করেছে। সেজন্য বিজ্ঞান অনুমান ভিত্তিক সংখ্যা 'ধরে নেওয়া' কিংবা 'মনে করি' ইত্যাদি ব্যতীত এক ইঞ্চিও এগুতে পারেনি। পৃথিবীর পদার্থ ও কর্মশক্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলেও তার যে ধ্বংস নেই সেটিও বিজ্ঞানের কথা। মানব জীবনের কর্মশক্তি শূন্যে ছড়িয়ে পড়লেও সে সত্তার যে ধ্বংস হবে না এ কথা বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে এই সত্তা যে পরকালের জগৎ সৃষ্টির আদি মৌল হবে না তা কি করে বলা যায়। পৃথিবীর মৌল উপাদান যদি বিশ্বের অন্যত্র সৃষ্টি হয়ে এর প্রাকৃতিক শোভা রূপ যৌবন গড়ে তুলতে পারে তবে আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে নতুন আর এক বিচিত্রময় জগৎ সৃষ্টি

www.pathagar.com

হওয়া কাল্পনিক কিছু হতে পারে না। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ, তার বিকাশ, তার রূপায়ণ ইত্যাদি কি এর স্বাক্ষী হিসেবে ধরে নিতে পারি না? এ জগৎ যদি ঘনায়ন ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের স্বার্থক ফসল হতে পারে, তবে কি এখানের বীজ থেকে নতুন কোন বাগান কিংবা উদ্যান অংকুরিত হয়ে পল্লবিত হবে না। কেউ যদি বলে এটা সত্য নয়, তাহলে তাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, শক্তির যেখানে বিনাশ বা ধ্বংস নেই, আবার কর্মশক্তি যেহেতু একটির সাথে অন্যটির সংমিশ্রণ হয় না তবে ঐ শক্তি যাবে কোথায়? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান গ্রাহ্য হলে, ধর্মের ক্ষেত্রে গায়েবে বিশ্বাস অযৌক্তিক হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরকাল কর্মশক্তির রূপান্তরিত জগৎ (কর্মফলের জগৎ) বৈ অন্য কিছু নয়। যেমন বলা হয়েছে, আদ্ দুনিয়া মাজরা'আতুল আখেরাত অর্থাৎ দুনিয়া পরকালের কর্মক্ষেত্র। অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক নিউটনের ভাষায় পৃথিবীকে বলা যায় - ক্রিয়ার জগৎ এবং পরকালকে বলা যায় প্রতিক্রিয়ার জগৎ। এই প্রতিক্রিয়ার জগৎ আমাদের থেকে অনেক দূরে। যার দেখা পাওয়া মনুষ্য শক্তির অধীন নয়। একে যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। যদি বিজ্ঞানের মতো পদ যাত্রার প্রথম হাতিয়ার 'মনে করি' কিংবা 'ধরে নেয়ার' মতো বাহন নিয়ে অজানা পথে অনন্তের দিকে সূক্ষ্ম নজর দিয়ে চলতে থাকা যায়, তাহলে সেই দৃষ্টি এতো দূর নিয়ে চলে যাবে যার কোন কূল কিনার পাওয়া যাবে না। যার কিনার সেই তার কোন সূত্র বা প্রয়োগশীল ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। সসীম যদি অসীমের পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় তাহলে অসীম বলতে কিছু থাকে না। এটাই যুক্তি ও অসীমকে সীমাহীন অনন্ত হওয়ার সূত্র। এই পৃথিবী সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি গিলে হজম করে বেঁচে আছে। যতক্ষণ সূর্যের আয়ু আছে ততদিন হয়তো বা এই পৃথিবী বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু সূর্যের আয়ু ফুরিয়ে গেলে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে এ কথা সত্য। অন্যদিকে এ পৃথিবীর পদার্থ ও মানব জীবনের কর্মশক্তি (অদৃশ্য বিকীর্ণ শক্তি) গিলে হজম করে, যে জগৎ চির আয়ু লাভ করছে, সেটিই কর্মশক্তির রূপান্তরিত পরজগৎ বা কর্মফলের জগৎ। এই বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ, পুণ্যের সম্পর্ক থাকা রহস্যময়। কর্মফলকে যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য বলা প্রমাণ করা যায় তাহলে সেই রহস্যের কথা যুক্তির মানদন্ড দিয়ে ওজন করে তা বিশ্বাস করতে আমাদের বাঁধা কিসের?

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ

মানুষ মানুষের প্রয়োজনে কল্যাণে সমাজ, জাতি বিশ্বের কল্যাণে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, তৈরী করে নতুন কলকব্জার মডেল। এ সবি মানুষ মানুষের কল্যাণেই করে থাকে। কেউ তো কোন দিন বৃথা কিছু সৃষ্টি করতে দেখেনি। সেদিক থেকে এই পৃথিবীর মহান নির্মাতা কি এই আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর সাজ-সজ্জা, মানুষ, জন, পশু-পাখি বৃথা সৃষ্টি করেছেন? মানুষ যখন বৃথা কিছু তৈরী করে না পক্ষান্তরে খোদাও এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি। পৃথিবীর সব প্রাণী বিবেক বুদ্ধিশীল নয়। বিবেক বুদ্ধি আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই মানুষকে নিজ কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতার মধ্যে মানব জাতির মহা কল্যাণের নিগূঢ় শর্ত বিদ্যমান। চিরঞ্জীবি হওয়ার মহান সুব্যবস্থা। কারণ যাদের জবাবদিহিতা নেই তারা অমর নয়। পক্ষান্তরে তাদের কর্মও অমর নয়। এই পৃথিবীর জীনেই তাদের শেষ পরিণতি। তাদের জন্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তৈরী করা হয়নি। আমরাই শুধু স্রষ্টার প্রতিনিধি। সে জন্য তিনি আমাদের জন্য পৃথিবীকে বানিয়েছেন আখেরাতের কর্মক্ষেত্রে। বাণিজ্যের জন্য দিয়েছেন অফুরন্ত সম্পদ। প্রতিনিধির কাছ থেকেই হিসাব নিকাশ নেওয়ার বিধান আইনতঃ বৈধ। পৃথিবীর বাণিজ্য বহর থেকে কি মালামাল নিয়ে গিয়ে আমাদের হিসাব-নিকাশ বুঝাতে হবে সেটিই আমাদের জানার বিষয়। স্রষ্টার মনোনীত জীবন পদ্ধতির মধ্যে পরকালের সুফল নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে শয়তানী জীবনাচারের মধ্যে কুফল বা অশান্তি নিহিত। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধশীল উন্নততর চরিত্র, মানবতার বিকাশ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা প্রেম এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই ভালো সম্পদ রোজগার হতে থাকে। অন্যদিকে তাঁর বিপরীত গুণাগুণ দ্বারা মন্দ জিনিস তৈরী হতে থাকে। এর জন্য বণিকের মতো জাহাজ বোঝাই মাল-মাল নিয়ে বের হতে হয় না। বরং বিবেক বুদ্ধির সত্তাকে জাগ্রত করে পশু শ্রেণী থেকে উঠে আসতে হয় মানুষ্য শ্রেণীতে। তবেই আখেরাতে সুকৃতির মূল্যমান সম্পদ তৈরী হবে। পরিণামে এই সত্তাগুলো ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আকাশ ভেদ করে তার প্রকৃত ঠিকানায় জমতে থাকবে। এর জন্য শর্ত হলো হালাল খাদ্য, ঈমান ও সৎ আমল।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে শরীরে রক্ত গোশত বানাবে, তাদের রক্ত গোশত দোযখের ইন্ধন হবে।"

খুঁটিহীন, বেড়াহীন, পৃথিবী নামক সোনার তরীর পিঠে চড়ে, খেয়ে দেয়ে, ঘুম, নিদ্রা, আরাম-আয়েশের মাঝেও জীবন কাটিয়ে দিয়ে এমন কি সম্পদ আমরা পাচার করছি, যা কখনো কোন রাডার যন্ত্রে ধরা পড়েনি? আকাশ কিংবা বাতাসের গাঁয়েও ধাক্কা লাগেনি? এর কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? বর্ণালী অণুবীক্ষণের যুগে, কম্পিউটার নামক কৃত্রিম মাথা নিয়ে সে জিনিস তালাশ না করে বোকার মতো বসে থাকা বিবেক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় করিয়ে দেয়। যেহেতু জীবন নদীর এ কূল সাগর পাড়ি দেয়ার মাঝে সে কূলের সুখ-শান্তি, উত্থান-পতন সবি গাঁথা, সে জন্য হলেও তার কথা ভাবা দরকার, তার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন – "এ দুনিয়া নিছক খেলা-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনের প্রকৃত আরাম হচ্ছে পরকাল।"

–(আল- আনকাবুত - ৬৪)

এ বিশ্বে সকল ক্ষেত্রেই বাহ্যিক কোন 'কারণ' ব্যতীত কোন ঘটনার উৎপত্তি হয় না। কার্য-কারণ নীতির ফলে এ বিশ্ব বিচিত্র রূপ লাভ করছে। যেমন বাতাস না বইলে গাছের পাতা নড়ে না তেমনি বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক কারণ থাকতে হয়। সেই রূপে সকল কারণের ও একজন কর্তা থাকতে হয়। তাছাড়া ক্রিয়া না ঘটলে কখনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। এ পৃথিবীতে সব জিনিস আমাদের সুখ দেয় না, শান্তি দেয় না। যে জিনিস সুখ দেয়, সে জিনিস আবার দুঃখ-কষ্ট দেয় না। সে কারণে পৃথিবীতে সুখের জন্য রয়েছে সুখের সত্তা বা বস্তু, আবার কষ্টের জন্য রয়েছে কষ্টের উপাদান।

পক্ষান্তরে প্রতিটি মানুষের সকল কাজ সব প্রাণীকে সুখ দেয় না, শান্তি দেয় না। যে সব কাজে দুঃখ দেয় এরও প্রতিক্রিয়া হয়। আবার যে সব কাজে সুখ দেয় তারও প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে কর্ম যেমন ধ্বংস হয় না তেমনি প্রতিক্রিয়ার বিনাশ বা ধ্বংস নেই। মানব আচরণের কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকেই যে প্রতিফলের সত্তা তৈরী হবে তার কিছু আগাম গন্ধ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত আমলের প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না।' -(আলে- ইমরান-২৫)

বিবেক যে সব কাজকে অসঙ্গত বা খারাপ মনে করে সেগুলো পাপ কাজ। দুনিয়াতে সকল পাপ কাজই দুঃখ বয়ে আনে। পৃথিবীর মাটিতে ও তার প্রতিক্রিয়া পড়তে দেখা যায়। অনেকে এর জন্য চরম কষ্ট ভোগ করে। দুনিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাপনায় অনেকের বিবেক বুদ্ধি অবশ্য পাপ-কাজে নিমজ্জিত থাকতে থাকতে তার চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এর জন্য মূলত ঃ দায়ী রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি। কারণ অনেক রাষ্ট্র ও ধর্মনীতিতে রয়েছে অধর্মের বোঝা। এই বোঝা তিলে তিলে মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে, যার জন্য এদের বিবেক এটিকেই (অধর্ম নীতিকে) সত্য মনে করে। পৃথিবীতে মানুষ চরম সমস্যায় না পড়লে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে না। আজ পৃথিবীতে ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক তা বিচার বিশ্লেষণ করার কোন বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নেই। যদি আমাদের কর্মের সত্তা ধরা পড়ত, তাহলে আমরা সহজেই ভালো-মন্দ বিচার করতে পারতাম। যেহেতু আমরা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি না সে কারণে পৃথিবীতে ধর্মীয় সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না। পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থায় সকল মানুষ নিজের কর্মের প্রতিফল এখানে ভোগ করে না। যে ব্যক্তি অত্যাচারী সে রাজাই হউক কিংবা সাধারণ গ্রাম্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হউক অথবা ছিনতাইকারী, কিংবা চোর, ডাকাত, ধর্ষণকারী বা খুনীই হউক। যেহেতু এ পৃথিবীতে সবাই সুবিচার পায় না সে কারণে এই পৃথিবী পুরাপুরি কর্মফল ভোগ করার মতো স্থান নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর জন্য এক নিখুঁত স্থান নির্ধারিত আছে। তা না হলে সকল ক্রিয়ারই যে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, নিউটনের এ সূত্রটি ভুল প্রমাণিত হবে। যেহেতু এ সূত্রটি বিজ্ঞান সম্মত, সে কারণে ধর্মীয় বিধানে পরকাল বলে যে জগতের কথা বলা হয়েছে, তাকে প্রতিক্রিয়ার জগৎ বা প্রতিফলের কিংবা কর্মফলের জগৎ বলা যায়। আল্লাহ বলেছেনা- "একটি সরিষা পরিমাণ আমল হলে তাও আমরা নিয়ে আসবো। আর হিসেব করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।"-(আল-আম্বিয়া - ৪৭)

www.pathagar.com

পাহাড় থেকে যখন ঝরনা বয়ে যায় তখন তার সাথে পাহাড়ের ধূলিকণা মিশে আসে। ফুলে যখন বাতাস লাগে তখন সে সুগন্ধি বয়ে নেয়। নর্দমায় যখন আবর্জনা পচে গ্যাস হয় তখন বায়ু দূষিত হয়। ক্রটিযুক্ত গাড়ী যখন রাস্তায় চলে তখন সেটি খুব কালো ধোঁয়া দেয়। ঝরণার সাথে মিশে আসা ধুলিকণা যেমন নদ-নদী আর সাগরে ঠাঁই নেয় তেমনি সুগন্ধির উপাদান ও দুগন্ধের উপাদান এবং গাড়ীর কালো ধোঁয়া বাতাসের পরতে পরতে মিশে ভেসে বেড়ায়। পক্ষান্তরে মানব ইঞ্জিনের দৈনন্দিনের ক্যালরিগুলো সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতির গন্ধ নিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটি রাস্তার শুরু থাকলে তার শেষ থাকতে হবে এটিই নিয়ম। তা না হলে সে জনপদ বিরাণ হয়ে যায়। সেদিক থেকে জীবন যাত্রার শুরু ও শেষ গন্তব্য আছে প্রমাণ হয়। এরূপ না থাকলে জীবন যাত্রা অনেক আগেই বিরান হয়ে যেত। প্রথমে রাস্তা যখন কোন প্রান্ত থেকে শুরু হয় তখন সেখানে অতীত খুঁজে না পেলেও, যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখানে থাকে প্রাপ্তির স্থান। যেমন শহর, বন্দর ইত্যাদিতে রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা। প্রকৃত পক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে সকল রাস্তা শহর, বন্দরে এসেই ঠাঁই নেয়। সেইরূপে জীবন যাত্রার যেখানে শেষ নিবাস সেখানে ও আছে অনন্ত প্রাপ্তির ব্যবস্থা। এই প্রাপ্তি চরম সুখের হতে পারে অথবা চরম দুঃখের হতে পারে। কারণ খালি হাতে অথবা অচল মুদ্রা নিয়ে গেলে সেখানে যেমন সওদা মিলবে না, তেমনি অচল মুদ্রার কামড়ে অতিষ্ট হতে হবে। অন্য দিকে সেখানের প্রাপ্তির উপকরণ এই দুনিয়া ছাড়া পাওয়াও সম্ভব হবে না। তাই সেখানে অন্তরজ্বালাও হবে। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে এ রহস্যময় উপকরণের নাম কি? মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন তো কারও কবরে কিছু রাখতে দেখা যায় না। সাড়ে ৩ হাত মাটির নীচে মাটির বিছানায়, সাদা কাফনে ঢেকে দিয়ে সবাইকে তো প্রকৃতির পোষাকেই শুইয়ে রাখা হয়। তাদের সাথে তো কোন সিন্দুক, বাক্স, কিংবা ব্যাগে করে কিছু দিতে দেখা যায় না। তবে এগুলো নেয় কেমন করে?

আল্লাহ বলেন – "তোমরা যে রূপ আমল করেছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।" –(আল-জাছিয়াহ - ২৮)

পৃথিবীর আহ্নিক গতি, কোষস্থ পরমাণুর জীবন সংগ্রাম, কর্মক্ষম মানুষের

www.pathagar.com

কাজ-কর্ম, চিন্তাধারা ইত্যাদি কারণে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় নিত্য নতুন শক্তি নেয়ার। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক লোক বেঁচে থাকার জন্য সারাদিনে ২২০০/২৩০০ ক্যালরি শক্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। সময়মত এ শক্তি না পেলে আমাদের জীবন থেমে যেতে চায়। আবার এ শক্তি বেশীক্ষণ দেহে স্থায়ী ভাবে মওজুদও থাকে না। এই শক্তি পাহাড়ের ঝরনার মতো অথবা বিকলাংক গাড়ীর ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মতো অথবা আলোক রশ্মির মতো অবিরত দেহ কোষের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে ছুটে চলে কোথায় যেন? যেখানে গিয়ে সেগুলো ঠাঁই নিচ্ছে সেখানেই বা কি গড়বে? সে জগৎ যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন সেটি আমাদের অভিব্যক্তির ফসল, কর্মের প্রতিফলের জগৎ। ঝরণা যেমন ধূলিকণা বয়ে নেয়, ফুল থেকে বাতাস যেমন সুগন্ধি নিয়ে চলে, নর্দমার পচা আবর্জনার গন্ধ যেমন বাতাসের পরতে পরতে লেগে থাকে তেমনি আমাদের মনের অভিব্যক্তির (নিয়তের) প্রেরণার ফসল কর্মশক্তির (বিকীর্ণ সত্তার) গায়ে প্রতিবিম্ব স্বরূপ মেখে নিয়ে সেটিও লোকচুরি দিয়ে পালিয়ে যায়?

আল্লাহ বলেন– "সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" –(আলে-ইমরান - ৩০)

মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের পুরা জীবনটাই ঢালাই করা একটি রেশমী চাদরে মতো। তাঁতীর তানা পুড়ানে সূতা গাঁথা অবস্থাটা যেমন মা-তৃগর্ভ কালীন সময়ও অবুঝ শিশু জীবন। তারপর ধরাধামে আসার আগ পর্যন্ত সময়টিতে সে পূর্ণতা লাভ করে। এ সময় একই সাথে জীবনের দু'টি পিঠই তৈরী হয়ে যায়। যেরূপে তাঁতীর তানা-পুড়ানে একই সাথে দু'টি পিঠ পূর্ণ হয়, সে রূপেই জীবনের এ পিঠ পূর্ণতা লাভ করলে ও পিঠও তৈরী হয়ে যায়। যখন পুরা চাদরটা তৈরী হয়ে যায় তখন দুনিয়ার জীবনেরও সময় ফুরিয়ে আসে। কিন্তু ওপরের পিঠে গন্ডগোল দেখা দিলে নীচের পিঠেও তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। তাঁতী যখন কাপড় বুঁনে তখন সে ওপরে পিঠ দেখে কিন্তু সে মহূর্তে নিচের পিঠে কি হচ্ছে তা সে লক্ষ্য করতে পারে না। তেমনি আমরাও শুধু দুনিয়ার পিঠের খবরই রাখতে পারি। আমাদের পাপ কাজ কিংবা নেক আমল থেকে নীচের পিঠে কি

www.pathagar.com

হচ্ছে তাতো আমরা তাঁতীর মতোই জানতে পারি না। সেজন্য ঈমানদার ব্যতীত অন্যেরা নীচের পিঠের বিষয় বিশ্বাস করে না। কিন্তু একদিন যখন ওপরের পিঠ উল্টিয়ে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে –"হে আমাদের প্রভু, আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদিগকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করব; নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।" –(পারা- ২১ সূরা সাজদাহ রুকু-২)

বর্তমান বস্তু জগতের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার যে আইনে পরকালীন জগতের জিনিসপত্র গোপন রয়েছে, জীবন যাত্রার দ্বিতীয় পিঠ উল্টিয়ে দিলে সেখানে সবই উদ্ভাসিত দেখা যাবে। সেখানে কোন সূক্ষ্ম সত্তাও গুপ্ত রবে না।

মানব জীবনও তার প্রকৃতি কূলহীন মহা সাগরের মতো গতিময়। এ জীবন সাগরে কখনো জোয়ার আসে আবার কখনো ভাটা পড়ে। পরিশেষে একদিন তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন দুনিয়ার 'জীবন সাগরের' গতির চিরস্থায়ী মৃত্যু ঘটে। এখানে জীবন যতদিন চলে ততদিন দেহ কোষের জীবন্ত পরমাণু নামক প্রতিটি বাল্ব সতেজ থাকে।

আমাদের মনের অভিব্যক্তির চৈতন্যক্রিয়া যখন ঢেউ আকারে স্রোতের ন্যায় সেই পরমাণু নামক বাল্বে গিয়ে পতিত হয় তখন যদি পুরো ব্যবস্থাটি ত্রুটি মুক্ত থাকে, তাহলে ঐ বাল্ব দিয়ে এক উজ্জ্বল সত্তা বিকীর্ণ হবে। এ সত্তা বিকীর্ণ কর্মশক্তি। অন্য দিকে ব্যবস্থাটি যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে, তবে ঐ বাল্ব দিয়ে পাচার হবে অনুজ্জ্বল সত্তা। সর্বোতভাবে সবকিছুই চালকের মর্জির উপর নির্ভর করে। চালক যদি রোগগ্রস্ত গ্রস্থ হয়, সীমালঙ্ঘনকারী হয় তাহলে পুরা সিস্টেমটিই হবে অসুখ, বিসুখে আক্রান্ত।

আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্গন করে, সে নিজের আত্মার ওপরই অত্যাচার করে।–(পারা ২৮, সূরা তালাক রুকু-১)

ধর্মীয় দৃষ্টিতে যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে তারা সীমালঙ্ঘনকারী, অবিশ্বাসী। তারা কোন নিয়মনীতি মানে না। পরকাল, বেহেশ্‌ত, দোযখ পাপ-পুণ্য কিছুই বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) তারা নেককার ও নিয়মনীতিতে বিশ্বাসী। ওরা হাশর-নশর, বেহেশ্‌ত, দোযখ, পাপ, পুণ্য, সবই বিশ্বাস করে। মানব মন ও তার দৈহিক

www.pathagar.com

কাঠামোর পুরা ব্যবস্থাটি মিলে মিশে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সার্বিক ব্যবস্থাপনার মতো। সে জন্য একে সেই সিস্টেমের অনুরূপ নিয়মের মতোই বিধানে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। দেহ ইঞ্জিনে বিদ্যুৎ (ঢেউ) যত বেগেই প্রবাহিত হউক না কেন পথে সাব ষ্টেশন, ও মাঝে মাঝে ট্রান্সমিটার বসিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যতটুকু ভোল্টেজ-এ জীবন পরমাণু নামক বাতি থেকে আলো বিকীর্ণ হবে ততটুকুই সরবরাহ করতে হবে। তা না হলে জীবন বাতির আলো কোষস্থঃ পরমাণু নামক বাল্ব দিয়ে বের হতে পারবে না। অকারণেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। পরিশেষে সেগুলো দূষিত, বিকলাংগ, দুর্যোগময় স্বভাব নিয়ে হারিয়ে যাবে শূন্য গহবরে। আল্লাহ বলেন– "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ।"

অবিশ্বাসী,পাপাচারী ও সীমালংঘনকারীর আচার-আচরণ থেকে হয় গোনাহ। এই গোনাহ জাহান্নাম সৃষ্টির মূল উপাদান।

জাহান্নানের রূপ অন্ধকারচ্ছন্ন। সেখানে থাকবে কষ্ট আর অশান্তি। যেহেতু গোনাহ নামক পাপসত্তা নিয়েই সেটি তৈরী হবে সুতরাং গোনাহের রূপ স্বভাব তার অনুরূপ। অর্থাৎ গোনাহর রং কালো ও তার স্বভাবের উত্তাপ জ্বালাময় ইত্যাদি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তির রূপ অন্ধকার ও হুমকির সম্মুখীন থাকে। সেজন্য কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তি ক্ষতিকারক। মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তির যে অংশটি পাপাচারে মগ্ন থাকা অবস্থায় অদৃশ্য হয়, সে গুলো কি কৃষ্ণ কায়া বর্ণ ধারণ করে? আমাদের চর্ম চোখ এ দিক থেকে নিরেট মুর্খ। সে তার কোন জবাব দিতে পারে না

আল্লাহ বলেন– "হ্যাঁ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে। বস্তুতঃ এ রূপ লোকরাই দোযখী হয়। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। –(২ঃ ৮২)

নেক ও পাপ আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির নাম কি-না আমরা সঠিক করে বলতে পারব না। এই সত্তা খুব পাতলা ও অদৃশ্য বলে একে চোখে দেখা যায় না। এমনও হতে পারে এগুলো তরঙ্গ ঝাঁক এর মতো কোন কিছু কিংবা বিদ্যুতের ঢেউ এর ন্যায় কোন অদৃশ্য সত্তা। তবে সে সত্তা যাই

www.pathagar.com

হউক না কেন তার মাঝে তার রূপ ও গুণাগুণ ব্যক্তি বিশেষের ভিন্ন আচরণের (গতির) জন্য ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের হতে পারে। যেহেতু এ সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয় দুরবীনকে ফাঁকি দিয়ে দূরে চলে যায় তাই এর কোন খবর আমরা রাখতে পারি না। অথচ এই দেখতে না পারার মধ্যেই যত সব সমস্যা। যার জন্য আমরা অন্যায় কাজ থেকে মুক্তি পেতে পারি না। আবার ভালো কাজ মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরতে পারিনা। তবে এ কথা সত্য যে, পাপ সত্তাগুলো দেখা গেলে আমাদের পক্ষে মাটিতে পা ফেলে হাঁটতেই কষ্ট হতো। ভাবতাম কখন জানি কি হয়ে যায়। পাপ সত্তাগুলো যেহেতু জাহান্নামের উপাদান এবং কষ্টের সত্তা সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য রূপ, গুণ যে পুণ্য কণার মতো নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় আমরা অনেক অজানাকেও জানতে পেরেছি। এ সাফল্যের থেকেই বস্তুর সম্পর্কে নিতে পেরেছি নতুন ধারণা। যে বস্তু এতো দিন ছিল আকারশীল, সেই বস্তুই এখন আমাদের কাছে আকারহীন, ঢেউ এর মতো সূক্ষ্ম। এখন আর বস্তুকে বস্তু বলে মনে হয় না। একে না ধরা যায়, না দেখা যায়। তাই আমরা যে সত্তা বিকিরণ করি সে গুলোও কাল্পনিক ছায়ার মতো হলেও এতে পাপের গন্ধ লেগে থাকে। এইগুোল আমাদের গ্যালাক্সির প্রকৃতি ধরে রাখতে না পারলেও খোদার সৈনিকের রাডারে তা ধরা পড়ে। সেই সত্তাগুলোই প্রতিফলের জগত সৃষ্টির মূল উপাদান।

মহাবিশ্বের সুদূর আকাশের যে কোন একটি বিন্দুতে তাকালে সেখানে একটি করে নক্ষত্র দৃষ্টি গোচর হয়। তাদের মাঝে এমনও অসংখ্যক নক্ষত্র আছে, যেগুোল সূর্য থেকে অতি বিশাল ও অতিশয় উজ্জ্বল। এখন প্রশ্ন হলো এতো উজ্জ্বল, এতো বিশাল নক্ষত্র থাকার পরও কেন এই আকাশ রাতের বেলায় অন্ধকার দেখায়? দিনের বেলায় কেন হারিয়ে যায় সূর্যের আলোতে? অথচ রাতের আকাশটি দুপুরের চাইতে কমপক্ষে ৩০ হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল হওয়ার কথা ছিল। এক সময় এ প্রশ্নটি আলবার্স বিপত্তি নামে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত এ বিপত্তির সমাধান দেয়া হয় মহাবিশ্বের অসীমত্ব ও তার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণকে স্বীকার করে। প্রতি নিয়ত গ্যালাক্সিগুলির দূরে সরে যাওয়ার গতিমাত্রা বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে একই আকাশকে দেখা যায়। কি বিস্ময়! কি বিচিত্র এ

www.pathagar.com

সৃষ্টির লীলা খেলা। নক্ষত্র রাজির আলোর পরাজয়কে আমরা মহাবিশ্বের অসীমত্বকে স্বীকার করে মেনে নিলাম। কিন্তু আলোর অবর্তমানে যে অন্ধকার রাশি আলোর জাগো দখল করে সে কি জিনিস? তা তো কোন দিন আমরা তলিয়ে দেখিনি। বাতির উজ্জ্বলতা ও তার দূরত্ব অসীম অন্ধকারকে জয় করতে পারে না। ঘরের এক কোণে একটি বাতি থাকলে সেটি ঘরের পুরা অংশটিকে সমান ভাবে আলোকিত করতে পারে না। বাতির উজ্জ্বলতা যতই হউক অন্ধকার যদি অসীম হয়, তাহলে সেটি অন্ধকারের কাছে পরাজয় বরণ করে। একটা নির্দিষ্ট সীমার পর 'অন্ধকার' আলোককে পাহারা দিয়ে রাখে। অপরদিকে আলো নিজ আয়ত্বের মধ্যে অন্ধকারকে হজম করে ফেলে। পক্ষান্তরে আলোর অভাব হলে অন্ধকার তার স্থান দখল করে নেয়। আলোকের অস্তিত্ব আছে। সেটির অতি পাতলা দানা আছে। সে স্থান দখল করে।এর দ্বারা উত্তাপ অনুভব হয়। তার বর্তমানে আমরা গরম অনুভব করি। প্রকৃতির গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু যে অন্ধকার আলো চলে গেলেই তার ঘর দখল করে নেয়, সে কি জিনিস? তার কি কোন দানা আছে? আলোর অবর্তমানে এ জগতের প্রকৃতির গায়ের জ্বর কমতে থাকে। তখন অন্ধকার শীতের কফিন গায়ে জড়িয়ে প্রকৃতিকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু ওপার জগতে অন্ধকার শীতের কফিন পড়তে পারবে না। গরম শেষ হওয়ার আগেই তার আইন রদ হয়ে যাবে। কিংবা হলেও সেটিতে আবার আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ বলেন- "এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানি মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি- যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখী ও স্বচ্ছল। তাদের সুখী ও স্বচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে।"–(ওয়াকেয়া - ৪২-৪৫)

আলোর সামনে কোন প্রতিবন্ধক পড়লে তার বিপরীত স্থান অন্ধকার হয়ে যায়। রাতের যে আকাশ দুপুরের চাইতে ৪০ হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল থাকার কথা ছিল, তা কি শুধু মহাবিশ্বের অসীমত্ব ও তার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলেই তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে? তার সামনে কি কোন প্রতিবন্ধক নেই? বিজ্ঞানের সুদূর প্রসারী পরিমাপক যন্ত্রে সেই প্রতিবন্ধকের

www.pathagar.com

অদৃশ্য জাল ধরা না পড়লেও আমার অনুমান এর সামনে এক ধরনের মিহির প্রতিবন্ধক আছে। সেই প্রতিবন্ধক জালটি পৃথিবী ও মানুষের কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তি। এই কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তি মহাবিশ্বের অগণিত জ্যোতিষ্কের আলোক রশ্মিকে প্রতিবন্ধক প্রাচীর দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই অসীম অন্ধকার ছেদ করে নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর কাছের আকাশকে উজ্জ্বল করতে পারে না। এই অন্ধকার পাপ রাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ বলেন- "দোযখ কাফির দিগকে বেষ্টন করে রেখেছে।"—(পারা-২১ সূরা আনকাবুত রুকু-৬)

পারলৌকিক জীবন পদ্ধতির সাথে দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি আমলের এতো নিখুঁত সম্পর্ক যেমন পানির সাগর ও আকাশের মেঘ মালা। পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ঠাঁই নিলে তা আবার ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। কিন্তু আমাদের আমলের বিকীর্ণ কর্মশক্তি শূন্যে অদৃশ্য হলেও তা আর পৃথিবীতে নেমে আসে না। সেগুলো যেখানে গচ্ছিত হওয়ার কথা সেখানেই জমা হয়। আমাদের আমলের অণু বিন্দুগুলিও একদিন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব।

আল্লাহ বলেন- "সে দিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথক ভাবে বেরোবে। অতপর যে ব্যক্তি অণুপরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে আর যে বিন্দু পরিমাণ ও মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।" —(আয-যিলযাল-৬-৮)

পাপ সত্তা বা গোনাহ নামক জিনিসটি যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের পরিভাষায় কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এটি অতি পাতলা ও মিহি। এতে নেই আলোক তড়িৎ চুম্বক শক্তির মতো প্রভাব। এর গতি অতিশয় ধীর। তার গায়ে আছে সংক্রামক জীবানু। এর প্রতিটি সত্তা কুৎসিত কালো। পাপ কাজের অভিব্যক্তির থেকে মনের জাদুকরী স্পর্শে দেহের প্রতিটি রেণু কণা থেকেই এর জন্ম হয়। পাপ সত্তার মতো পুণ্য সত্তাও মনের ইঙ্গিতে জন্ম হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্য সত্তার সাথে আমাদের আমলের সম্পর্ক যে কোথায় তা না জানলে হৃদয় কুটিরে আর এক শূন্যতা বিরাজ করবে। মানব প্রকৃতি শূন্যতাকে মেনে নেয় না বলে আমরা হাত বাড়িয়ে রাখি সামনের দিকে। আর পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে সত্যের তালাশ করি।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্যসত্তা

আমাদের পরিচয় আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই সকল জীবের চেয়ে আমরা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের পাপ. পুণ্য নিয়ে ভাবতে হয় না। আমরা যতই ভাবি না কেন আসলে পাপ, পুণ্য কি জিনিস, তার রং, রূপ কেমন এ সম্পর্কে আমরা একেবারে অজ্ঞ। আমরা শুধু জানি সৎ পথে চললে পাপ হয়। মূলতঃ এ পাপ, পুণ্য অতি প্রাকৃতিক নিয়মের জিনিস। তবে এগুলির জন্ম হয় এই মাটির ভূবন থেকেই, মানুষের আচার-আচরণের মাধ্যমে। কিন্তু এগুলি অতি প্রাকৃতিক নিয়মের জিনিস বলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার গুণাগুণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। অন্য দিকে এ জিনিস দেখার মতো কোন যন্ত্র আমাদের কাছে নেই। তবে অতি মানবগণ তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। তাই দুনিয়াতে অতি মানবের আগমন, মানব কল্যাণের জন্যই হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন অতি মানবের শূন্যতা দেখা দিয়েছে তখনই মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কার রীতিনীতি মানতে ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শ্রেণীভেদে সৃষ্টি হয়েছে নাস্তিক গোষ্ঠী। তারা বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো এই বিশ্ব একটি দুর্ঘটনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এরপর থেকেই উদ্দেশ্যহীন ভাবেই সকল কিছু ঘটে যাচ্ছে। আবার একদিন আকস্মিক ভাবে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সব বস্তুবাদীদের বস্তুসর্বস্বতা নীতি মানুষকে বানিয়ে তুলেছিল ভোগবাদী। অন্য দিকে যারা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তারা চন্দ্র, সূর্য সহ নানা কল্পিত দেব-দেবী ও মনগড়া কুলীন বংশ সৃষ্টি করে তাদেরকে পূজা অর্চণা করতে শুরু করে। এরূপ অন্ধকার অমানিশার যুগেই অতি মানবের আবির্ভাব হয়েছে। এ সব ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে এসে তাদের কওম, বা জাতিকে সহজ-সরল পথে স্রষ্টার দ্বীন (জীবন বিধান) মেনে চলার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তারা প্রয়োজনে গায়ের রক্ত পর্যন্ত দিয়েছেন। তবু সত্যের পথ থেকে, আলোর পথ থেকে, পিছিয়ে আসেননি। কোন ভয়-ভীতি, কোন প্রলোভন, কোন বাধা-বিপত্তি,

www.pathagar.com

তাদেরকে ক্ষান্ত করতে পারেনি। নমরুদের অগ্নি পরীক্ষা, ফেরাউনের খোদার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা, তায়েফবাসীর অত্যাচার, কোরেশদের শতমুখী নির্যাতন এসবও তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া থেকে এক ইঞ্চিও বিচলিত করতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হলো একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধান মেনে চলার মাঝে কি এমন অন্তর্নিহিত রহস্য লুকিয়ে আছে, যার জন্য নবী, রাসূলগণ (সাঃ) ও ছিলেন পেরেশান এবং স্রষ্টাও তাঁদেরকে দিয়েছিলেন জীবন বাজির তাগিদ। নিশ্চয়ই মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের বিরাট সাফল্য এর মাঝেই লুকিয়ে আছে। তা না হলে এতো গুরুত্ব থাকার কথা নয়, এতো তাগিদ আসার কথা নয়। এতো যুদ্ধ বিগ্রহেরও কোন প্রয়োজন পড়তো না। প্রসঙ্গতঃ মানুষ যখন পার্থিব জীবনে নিজেদের আচার-আচরণের মাধ্যমে সেই রহস্যময় সম্পদ নষ্ট করতে শুরু করে, তখনি মহা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পথভুলা বান্দাদেরকে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী, রাসূল (সাঃ) গণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই নবী, রাসূল (সাঃ) গণ দুনিয়াবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, সত্যের পথে এনেছেন।

সাধারণ মানুষের যান্ত্রিক চোখে প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ এবং ওজন স্তরের ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। তারা জানে অবাধে গাছপালা কাটলে, কল কারখানা ও গাড়ীর নিয়ন্ত্রণহীন ধোঁয়া ইত্যাদি পরিবেশকে নষ্ট করে। পরিবেশ ও ওজনস্তর নষ্ট হলে জীবন হয় হুমকির সম্মুখীন। সে জন্য তারা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। কারণ বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হলে পরিবেশ দূষণ আরও তড়ান্বিত হয়। বর্তমান বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আর্ন্তজাতিক ভাবে সেমিনার, সভা, সমিতি গঠন করে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি সেই কর্মসূচীর ফসল। এই পদক্ষেপ দুনিয়ার আয়ু বৃদ্ধির কৌশল ও বটে। এ প্রচেষ্টা, দুনিয়ার জীবনে শান্তিতে বসবাসের ভবিষ্যত কর্মপন্থা। সাধারণ মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পরিবেশ দূষণের উপাদানের আধিক্য টের করতে পেরেছে বলেই তারা এসব পদক্ষেপ নিতে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে জিনিস দেখেনা সে জিনিসের মঙ্গল-অমঙ্গল দিক সম্পর্কে

www.pathagar.com

তারা থাকে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা জন্যই তারা এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবে না। তাই তারা এ ব্যপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় না। ফলে সে বিষয়টি তারা সব সময় অবহেলার চোখে দেখে। কিন্তু নবী, রাসূল (সঃ) গণ অতি-প্রাকৃতিক বিষয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন বিধায় তারা মানুষকে কল্যাণের পথে আসতে উদ্বুদ্ধ করতেন। জীবন বাজি রেখে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন। তাদের প্রদর্শিত কল্যাণের পথ হলো, একত্ববাদে বিশ্বাস ও আল্লাহর নির্দেশিত জীবন বিধান অনুসরন করা। এই পথে চলা খুব কঠিন আবার সহজও। ভোগবাদী প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে এই পথে পা দেওয়া প্রথম প্রথম একটু কঠিন মনে হয়। কিন্তু যারা প্রবৃত্তির জিহ্বাকে আগুনের জিঞ্জির দেখিয়ে কাবুশ করতে পারেন তাদের পক্ষে এ পথে চলা কঠিন নয় বরং সহজ। এই পথ যত কঠিন আর যত সহজই হউক না কেন মানুষ যে যা করবে সে তার প্রতিফল ভোগ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ বলেন-"যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফরীর বোঝা তারই উপর ন্যস্ত আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করলো, সে ধরণের লোকেরাই নিজেদের কল্যাণে পুণ্য রাস্তা পরিস্কার করছে।" – (আররুম-৪৪)

পাপাচার অকল্যাণের পথ প্রসারিত করে বা তৈরী করে। এ থেকে পাপ বা গোনাহের মিহির দানা তৈরী হয়। এই সত্তার আধিক্য হলে কল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হলে যেমন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে দূষণ ক্রিয়া শুরু হয় তেমনি পাপ সত্তা মানুষের পরপারের জীবন ব্যবস্থার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ বা গোনাহ কি জিনিস সে বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কল্যাণের পথে চললে কি হয় সে বিষয়ে আলোচনা করার পালা। তাই এ বিষযটির উপর যথাযথ আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

রাতের নির্মল আকাশে তারাদের মেলা বসে। এই দৃশ্য দেখতে কি অপূর্ব লাগে, কিন্তু যারা অন্ধ তাদের পক্ষে এই দৃশ্য দেখা সম্ভব হয় না। আমাদের ভালো মন্দ আমল থেকে কি হয়, তা যখন আমরা দেখতে পারি না, সে কারণে আমাদের চোখ থাকতে ও আমরা অন্ধের মতো। এক অন্ধ

www.pathagar.com

আর এ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। তবে অন্ধের হাতে যদি লাঠি কিংবা শক্ত কিছু থাকে তাহলে সে আর এক অন্ধকে ধরে ধরে পথ চলতে পারবে। আমরা যদিও অন্ধ তবু আমাদের হাতে আছে কোরআন-সুন্নাহর মতো শক্ত লাঠি। তাই নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-"উত্তম চরিত্র ও আচার ব্যবহার দুনিয়া ও আখেরাতের মংগল লুটে লয়।"

মন যখন সৎ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন দেহের যে অংশটি সে কাজ করবে তার মাঝে গতির সঞ্চার হয়, তখন দেহের ঐ অংশটি কাজের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। ফলে কাজটি করতে গিয়ে ঐ অংশের এক একটি সূক্ষ্ণ তথ্যকণা বা ডি, এন, এ কিছু তথ্য পাচার করে। এই তথ্যগুলি মৌলিক ভাবে এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির মাঝে মনের অভিব্যক্তি মিশে থাকে। ভালো আমলের মাধ্যমে যে জিনিস পাচার হয় সেই অদৃশ্য তথ্য কণায় থাকে আমলের সুকৃতি কিংবা মন্দ আমল হলে তাতে থাকে কর্মের দুস্কৃতি। এ গুলি বিনাশ হয় না, ধবংস হয় না। পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়, একসময় এই বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি কণায় রূপ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। আমরা কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি। গাছপালা তা গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। এ ভাবেই চলে প্রকৃতির নীতি চক্রের খেলা। কিন্তু আমাদের কর্মশক্তি কোন ভাবেই পৃথিবীতে ফিরে আসে না, এই শক্তি যেন বিশাল শূন্য মন্ডল গিলে ফেলে। কিন্তু এই শূন্য মন্ডল এর একটি কণাও হজম করতে পারে না। তাই এর বিনাশ নেই। ধবংস নেই। আমাদের ভালো আচরণ থেকে সুকৃতির যে সত্তা পয়দা হয় এর নাম নেক বা ছোয়াব। এই নাম ধর্মীয় পরিভাষার। এর রং উজ্জ্বল ও আলোকময়। তার গুণ চুম্বকত্বপূর্ণ ও প্রশান্তিময়, তার মান উৎকৃষ্ট। একই জিনিসের ভাষাগত তারতম্য ও স্থান কালের ব্যবধানের জন্য ভিন্ন নাম হতে পারে। সেদিক থেকে নেক বা ছোয়াবের সত্তাগুলির নাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিভাষাগত ভাবে ভিন্ন পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমরা নেক বা গোনাহর দ্বারা সরাসরি উপকার কিংবা অপকার কিছুই পাই না বলে পরিভাষাগত বৈষম্য থাকলেও আলাদা করতে পারি না। কাল হাশরে আমাদের আমলের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিগুলিই নিজেদের সামনে হাজির করা হবে। আজ আমাদের থেকে যে তথ্য কণাগুলি পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি

www.pathagar.com

এই মৌলিক শক্তি কি না তাই বা কে জানে? তাছাড়া এগুলির আর যাওয়ার জাগাই বা কোথায়?

আল্লাহ্ বলেন"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক তবে শর্ত এই যে সে মুমেন হবে– তাহলে দুনিয়াতে তাকে পূত পবিত্র জীবন যাপন করায় এবং (আখেরাতে) এমন লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব।" – (নহল -৯৭)

"সে দিন তাদের স্বীয় জিহবা এবং তাদের হাত, পা, তাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে সাক্ষাৎদান করবে।" – (আল কোরআন)

মানুষের সকল কর্মের কর্মফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামে অবিশ্বাসী অনেক লোক ও সৎকাজ করে। তাদের এই সৎকাজ হয়তো তারা আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধির লালসায় অথবা কুসংস্কার পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে করে থাকে। তাদের এসব নেক আমল (সৎকাজ) কার্যতঃ পরকালে নিজেদের কোন উপকারে আসবে না। তারা এর প্রতিদান আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। অথবা এর কোন বিনিময়ই তারা পাবে না। কিন্তু পাপ সত্তাগুলি জিয়ে থাকবে, তার ফলাফল তারা ভোগ করবে। সে জন্য নিয়ত ও ঈমান হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। নিয়ত বা ইচ্ছা যেখানে উদয় হয় সেটি এক জটিল জিনিস। একে না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। দুনিয়াতে এতো ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মনের ভিন্ন প্রেরণা বা অভিব্যক্তি থেকে। মনের ভিন্ন গতিই কর্মকে এক করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, "যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এ রূপ যে তাদের সৎকাজগুলি হবে ভস্ম স্তুপের ন্যায়। ঝড়, ঝঞ্চার দিনে প্রচন্ড বায়ু বেগে সে ভস্ম স্তুপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে ঠিক সে সৎকাজগুলির কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দুরে নিয়ে গিয়েছিল।" – (ইব্রাহিম- ১৮)

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন- "হে ঈমানদারগণ তোমাদেরকে কি এখন একটা ব্যবসার কথা বলে দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে অব্যাহিত দেবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং আল্লাহর

www.pathagar.com

পথে মাল ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম কর। যদি জানতে চাও তাহলে শুনে রাখ এই হচ্ছে তোমাদের জন্যে মঙ্গলদায়ক।" – (আসসাফ ১০-১১)

যারা নবী রাসূল (সাঃ) গণের প্রদর্শিত পথে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান না মেনে দিক ভ্রান্ত নাবিকের মতো দুনিয়ার জীবন পাড়ি দিয়ে পরপারে চলে যাবে। আল্লাহ তদের আমল সম্পর্কে আগাম খবর দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের উত্তম বস্তু সমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করছে।"

– (পারা ২৬ সূরা আহ্‌কাফ রুকু- ২)

মানব জীবনের আচার আচরণ থেকে যে দু'ধরণের সত্তা তৈরীর আভাষ পাওয়া যায় তৎমধ্যে উত্তম আমলের সত্তা হলো সুকৃতিময়, উৎকৃষ্ট ও মংগলদায়ক এবং পাপ কর্মের সত্তা হলো- সুকৃতিময়, উৎকৃষ্ট ও মংগলদায়ক এবং পাপকর্মের সত্তা হলো- দুষ্কৃতিময়, উত্তপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণের ধূম্ররাশির মতো। এগুলি শীতল ও আরামদায়ক নয়। যা কিছু মংগলদায়ক তা উজ্জ্বল ও প্রশান্তিময়। একেই নেক বা ছোয়াব বলা হয়েছে। মানব জীবনের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা, পরমাণুর গর্ভের সুস্থ্য আলোক উজ্জ্বল প্রসবিত সন্তান, যা তরঙ্গ ঝাঁক বা ঢেউয়ের আকারে অদৃশ্য হয়, একে যদি নেক বলা যায় তবে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক পাওয়া যাবে। এই সম্পর্ক যুগান্তকারী এক মহামূল্যমান ইতিহাস সৃষ্টি করবে, যা চিন্তাশীল মানুষকে ভাবনার খোরাক যোগাবে। এ থেকেই বের হয়ে আসবে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক তত্ত্ব।

আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তিতে সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতি যাই থাকুক যা কেন সেগুলি আমাদের অলক্ষ্যেই তরঙ্গ ঝাঁক বা ঢেউ এর ন্যায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বার বার সাগরের জলরাশির মতো জীবন নদীতে যে ঢেউ উঠে তার তর্জন-গর্জন কিনারায় ধাক্কা লেগে মিলিয়ে যায়। এই ঢেউগুলি দেহের অসংখ্যক শিরা উপশিরার আবরণ ছেদ করে তার সুকৃতি অথবা দুস্কৃতির গন্ধ নিয়ে হারিয়ে যায় শূন্য সাগরের অতল তলে। অথচ আমরা এর কোন খবর রাখি না।

আল্লাহ বলেন– "অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এ রূপ যেমন গভীর

www.pathagar.com

সমুদ্র তলে অন্ধকারপুঞ্জ এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে, তার উপর আর এক তরঙ্গ, তার উপরে মেঘমালা (ফলে তথায় আলো পৌছিতে পারে না) উপরে নীচে বহু অন্ধকার রাশি বিদ্যমান; যদি কেহ নিজের হাত বের করে তবে দৃষ্টি গোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন তার জন্য নূর নেই।" – (সূরা নূর আয়াত – ৪০)

স্রষ্টার এই মহা বিশ্ব ব্যবস্থা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতোই ধরা যায়। মানুষের অতীত বর্তমানসহ সকল ঘটনার তথ্য (আমলের সত্তা) ঐ কম্পিউটারের স্মৃতিফলকে (মেমোরীতে) সঞ্চিত হয়। কম্পিউটারের মেমোরীতে যেমন তথ্য কণার ঢেউ (তরঙ্গ) পুরে দেওয়া হয়, তেমনি মানুষের ভালো-মন্দ আচার-আচরণের সত্তাগুলি মহাবিশ্ব ব্যবস্থার অতিপ্রাকৃতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামের মেমোরীতে তরঙ্গের মতো নেচে দোলে, খেলে খেলে তাতে বন্দি হয়। একটি মানুষের জন্য এই বিশ্ব কম্পিউটার প্রোগ্রামে দুইটি মেমোরী প্লেট থাকা বিচিত্র কিছু নয়। তার একটিতে থাকবে ভালো কাজের বিকীর্ণ সত্তার তথ্যকণা। আর অপরটিতে মন্দ কাজের তথ্য কণা। এই ব্যবস্থা এতো নিখুত যে, সেখানে থেকে কোন তথ্যই হারানোর ব্যবস্থা নেই। আমাদের সারা জীবনের পাচার করা তথ্য কণাগুলি এই সকল মেমোরী প্লেট থেকে এক সময় সরবরাহ করা হবে।

আল্লাহ বলেন- দু'জন নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা প্রত্যেকের ডানে ও বামে বসে নিয়ন্ত্রণ করছে; মুখ থেকে এমন কোনো কথাই বেরোয় না যে, কোন তত্ত্বাবধানকারী তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৈরী থাকে না।"

– (ক্বাফঃ ১৭, ১৮)

আলোক তরঙ্গের তরঙ্গ দৈঘ্য ও কম্পাংকের ভিন্নতায় তার রূপও গুণের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে একই দ্রব্য সামগ্রীর উপাদান বিভিন্ন ডাইছে বা ফরমায় ঢুকিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতির দ্রব্য তৈরী করা যায়। মানব দেহ ইঞ্জিনের প্রতিটি কোষ পরমাণুর ফরমা দিয়ে যে শক্তি প্রসব হয় সেই সন্তান ভিন্ন আকার আকৃতির ও গুণের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশ্ব ব্যবস্থা আলো আর অন্ধকারময় দুই বিপরীত ধর্মীয় সত্তায় গড়া। অন্ধকারপুঞ্জ এবং অন্ধকারের সত্তা সব সময়ই নিকৃষ্ট ও

www.pathagar.com

অকল্যাণকর। সেদিক থেকে আলোক ও আলোক সাদৃশ্য সত্তা উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলদায়ক। ধর্মীয় পরিভাষায় এ রূপ সত্তার নামই নেক। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি মানব জীবনের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে ধর্মীয় পরিভাষার নেক সত্তার সাদৃশ্যমূলক যুক্তির কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ, পুণ্যের অর্ন্তনিহিত সম্পর্ক যদি খুঁজে না পাই তাহলে সে কথা বলা হবে বাহুল্য মাত্র। সে জন্য বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ, পুণ্যের সম্পর্ক আছে কি, না, তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় এ কথা, এ চিন্তা হবে মূল্যহীন ও অসার।

বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ, পুণ্যের সম্পর্ক

মানব দেহ যন্ত্রটি অসংখ্যক জীবকোষের সমষ্টি। আত্মার বর্তমানে দেহযন্ত্রটির প্রতিটি জীবকোষের সূক্ষ্ম কণা ভৃত্যের মতো তার নির্দেশ পালন করে চলে। মনের ভালো মন্দ সকল নির্দেশেই সে মাথা পেতে নেয়। বিদ্যুত গতিতে দেহযন্ত্র তার চাহিদা পূরণ করতে সক্রিয় থাকে। ঘুম আসলেও আত্মার জন্য সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তবে দেহ যন্ত্রটি খাদ্য ব্যতীত সক্রিয় থাকতে পারে না। খাদ্যের অভাব হলেই সে দুর্বল হয়ে যায়। সেজন্য খাদ্য তার জীবনরক্ষার বাহন। যখন সে আত্মার নির্দেশ পালনে ব্যতিব্যস্ত থাকে তখন তার উদরের শক্তি হজম হয়ে যায়। তার কোষ গহবরের ফাঁক দিয়ে সেই শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রসব হয়। জন্ম নিয়েই সেগুলি মিলিয়ে যায় প্রকৃতিতে। আমাদের দেহ যন্ত্রের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে যে জিনিস প্রসব হয় সে সত্তা এক প্রকার জীবনি শক্তি। এই জীবনি শক্তিই কর্মের বিকীর্ণ সন্তান। মাতৃ গর্ভ থেকে জন্ম নেয় দুই বিপরীত ধর্মী সন্তান। এরা স্ত্রী ও পুরুষ জাত। এই দুই জাতের মধ্যে সাদা, কালো, সুন্দর, অসুন্দর, বিকলাংক কিংবা কুৎসিত ইত্যাদি রকমের হতে দেখা যায়। সেই রূপে জীবকোষের গর্ভের প্রসব করা সন্তান দু'জাতেই হতে পারে। এরা স্ত্রী, পুরুষ জাত না হলেও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এ

www.pathagar.com

দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। এগুলি ভালো মন্দ কর্মের বিকীর্ণ সত্তা। আর ধর্মীয় পরিভাষায় পাপ, পুণ্য দুটি সৃষ্ট সত্তা।

নবী (সাঃ) বলেছেন – "পাপ পুণ্য দুটি সৃষ্ট বস্তু।"

আল্লাহ বলেছেন – "তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে সে সব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা–ই পাবে। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন।" – (আল–বাকারাহ– ১১০)

মানুষের মন্দ আচার আচরণ থেকে এই পাপের সত্তা উৎপত্তি হয় এবং উত্তম স্বভাব, ঈমান ও সৎকর্ম থেকে পুণ্য সত্তা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মানুষ কোটি কোটি মণ খাদ্য খেয়ে গোলা শূন্য করে ফেলে। এই খাদ্য ফলানো থেকে নিয়ে তা গোদামজাত করাতে হাজার হাজার শ্রমিক প্রয়োজন পড়ে। বছরের পর বছর কত কোটি মণ খাদ্য যে এভাবে পয়দা হয় তার হিসেব রাখা কঠিন। কিন্তু আমাদের দেহ যন্ত্রটি ঠিক রাখতে যে খাদ্য লাগে বা যে জ্বালানী প্রয়োজন হয়, সে তো ধীরে ধীরে কোষ গহ্বরে সাইলেন্সার পাইপ দিয়েই উধাও হয়ে যায়। এই নির্গত শক্তিকে কেউ মাথায় বোঝা বয়ে নিতে হয় না। একে যেন 'হা' করে গিলে ফেলে এই নির্বাক মহাশূন্য। এর জিহবার থেকে একটি সরিষা পরিমাণ কণাও হারিয়ে যায় না। কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না।

আল্লাহর বলেন "মাটি (মৃতদেহের) যা কিছুই খেয়ে ফেলে তা সব আমাদের জানা থাকে, আর প্রতিটি অণু–পরমাণু কোথায় আছে তা আমাদের গ্রন্থেও সুরক্ষিত রয়েছে।" – (সুরায়ে ক্বাফ- ৪)

সাদৃশ্যের বিচারের পাপ, পুণ্য যেমন অদৃশ্য তেমনি মানব জীবনের বিকীর্ণ সত্তাও অদৃশ্য। পক্ষান্তরে ধর্মের বিধানে যে জিনিসকে পাপ, পুণ্য, বলা হয়েছে এগুলিকেও আমরা দেখি না আবার আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি ও দেখা যায় না। এখানে ও দেখাযায় উভয় সত্তার মধ্যে পরিভাষাগত তারতম্য থাকলেও অদৃশ্যতা ও দেখা না যাওয়ার সম্বন্ধ উভয়ের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। প্রসঙ্গতঃ দেখা যায় আমরা দু'টি সত্তাকে যতই কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছি ততই যেন ব্যবধানের পর্দাক্ষীণ হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি এবং পৃথিবীর জড় পদার্থের বিকীর্ণ শক্তি কেউ ফিরে নেয় না। না সূর্য, না প্রকৃতি। শক্তির নিত্যতা, সূত্রের বিধানে এদের ও ধ্বংস নেই। আবার পাপ, পুণ্য যে যা করে নিজের জন্যই করে। কারও বোঝা কেউ বহন করবে না। তুলনা মূলক ভাবে পাপ পুণ্য ও বিকীর্ণ শক্তির ধ্বংসহীনতার নিয়ম একি পর্য্যায়ের। এখানে ও তাদের অভিন্নার্থক সম্পর্ক। কোনটির ও ধ্বংস বা শেষ নেই। আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তার বোঝা তারই উপর ন্যস্ত; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।" –(আল, আন আম–১৬৪)

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষনা করেছেন, – "কিয়ামতের দিন আমরা নির্ভুল পরিমাপকারী দাঁড়িপাল্লা রাখবো। সুতরাং কোনোব্যক্তির প্রতি কিছুমাত্র জুলুম করা হবে না। বরং একটি সরিষা পরিমাণ আমল হলে তাও আমরা নিয়ে আসবো। আর হিসেব করার জন্যেই আমরা যথেষ্ট।"

– (আল-আম্বিয়া -৪৭)

মানুষ ও পৃথিবীর অন্যান্য উাপাদানের বিকীর্ণ সত্তার রং প্রধানতঃ দু'ধরণের। যেমন একটি হলো কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং অন্যটি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। অপর দিকে জাহান্নাম ও পাপের জগৎ অন্ধকারচ্ছন্ন ও যন্ত্রণাময় এবং জান্নাত বা পুণ্যের জগৎ আলোক উজ্জ্বল ও শান্তিময়। এখানে ও উভয় পরিভাষার সত্তার নামের ভিন্নতা থাকলেও রংগের বেলায় রয়েছে পরম দুস্থি। এসব সম্বন্ধ থেকে মন নামক রহস্য কুটিরে প্রশ্ন জাগে তাহলে বিকীর্ণ সত্তাই কি(?) পাপ, পুণ্য? এ সম্পর্কে পুরাপুরি উত্তর না দেওয়া গেলেও আমরা উভয়টির স্বভাব চরিত্রের থেকে একটি সত্যকে আবিষ্কারের কিছু রসদ পাব সে বিশ্বাস নেওয়া যায়।

আগুনের চরিত্র পুড়ানো, পানির চরিত্র ভিজিয়ে দেওয়া , জীবাণুর চরিত্র যন্ত্রণা দেওয়া। কিন্তু রহস্যের ব্যাপার হলো, আগুন আগুনকে পুড়াতে পারে না। পানি, পানিকে ভিজাতে পারে না, জীবাণু জীবাণুকে যন্ত্রণা দেতে পারে না। জীবন ও দেহের বৈষম্যমূলক সত্তা দিয়ে একে অপরের দ্বারা কষ্টপায়, এটিই প্রকৃতির বিধান। অথচ কষ্ট দেওয়া ঐ জিনিসের মৌলিক ধর্ম নয়। প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মে একটি অপরটি চেয়ে বৈষম্যের হলেই একের দ্বারা

www.pathagar.com

অন্যজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আক্রান্ত হয়। মানুষ আর পশু এক শ্রেণীর জীব নয়। পশুরা নীতির কথা, ধর্মের কথা, স্রষ্ঠার কথা ভাবে না। কিন্তু মানুষ নিজের থেকেই এসব ভাবে কিংবা ভাবতে না চাইলেও ভাবনার উপাদানগুলি বিষ্ময় সৃষ্টি করে তকে ভাবিয়ে তুলে। এই মানুষেই ভোগবাদী কু-প্রবৃত্তির শিকার হয়ে পশু-শ্রেণীর নীচে চলে যায়। মানুষের ঘরে মানুষ হলে মানব সমাজে বসবাস করার অধিকার রাখে। কিন্তু মানুষের ঘরে ভিন্ন প্রজাতির (পশুর শ্রেণীর) প্রাণীর জন্ম হলে তার সে অধিকার থাকে না। অপর দিকে এ প্রজন্ম তাকে কোন সুখ দিতেও পারে না। বরং এ থেকে সে যন্ত্রণাই পাবে, তাই মানব আত্মা কুপ্রকৃতির ব্যাধির শিকার হলে তার মুক্তির উপায় নেই। কারণ ভোগবাদী ব্যাধি তিলে তিলে তার আমলের সত্তাগুলি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। অর্থ্যাৎ রোগক্রান্ত আত্মার জন্ম দেওয়া কোষ পরমাণুর সন্তান নিকৃষ্ট প্রজাতিই হবে। সেজন্য নীরোগ আত্বা ব্যতীত পরকালে মুক্তির উপায় নেই।

আল্লাহ বলেন- "যারা আল্লাহ -তা'আলার সমীপে নিষ্পাপ ও নীরোগ আত্মা নিয়ে যেতে পারবে তারা ব্যতীত আর কেহই মুক্ত পাবে না।"

– (পারা ২৯ সূরা শো'আরা রুকু -৫)

পৃথিবীতে আমাদের আচার-আচরণ থেকে অন্য প্রজাতি বা সমগোত্রীয়রাও কষ্ট পেয়ে থাকে। এখানে কষ্ট দেওয়া তার মৌলিক ধর্ম না হলে ও ভোগবাদী প্রবৃত্তি তার মৌলিক ধর্ম নষ্ট করে ফেলে। তাই চরিত্র হলো প্রবৃত্তির পরিমাপ। প্রবৃত্তি সীমালঙ্গন করলে কিংবা ভোগবাদী হলে সে শ্রেণীর মানুষের কোন চরিত্র থাকে না। তারা পশুর শ্রেণীতে চলে যায়। এমন কি প্রবৃত্তির চরম দাসত্ববরণ করলে মানুষ পশুর চেয়ে ও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অবদমিত প্রবৃত্তি মানুষকে বিবেক বুদ্ধিশীল বানায়। কিন্তু যারা ভোগবাদী প্রবৃত্তির দাসত্ববরণ করে, তারা আল্লাহ খোদায় বিশ্বাস করে না, পাপ, পুণ্য, পুনরুত্থান, শেষ দিবসের বিচার আচারও বিশ্বাস করে না। ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন, অবদমিত যৌন কামনা বিভিন্ন ভাবে মানসিক বিশৃংখলা ঘটিয়ে উম্মাদ রোগের সূচনা করতে পারে। তার কথা হলো অতৃপ্ত যৌন কামনাই মানসিক অসঙ্গতির কারণ। কিন্তু তার এই যুক্তিহীন

www.pathagar.com

কথার মূল বিষয় হলো ভিন্ন। যেমন মানুষের কামনা ও আশার শেষ নেই। যার শেষ নেই, সীমা নেই, সেটি অসীম ও অফুরন্ত। কিন্তু মানুষ তো সসীম। এ হিসেবে তার প্রবৃত্তিকে অবদমিত রাখাই শ্রেয়। কিন্তু যারা ফ্রয়েডের মতো ভোগবাদী মানসিকতায় ভোগে, তারা শেষ পর্যন্ত অসীমকে জয় করতে না পেরে প্রবৃত্তির উম্মদনায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়ে যায়। পরিণামে এ সব ভোগবাদী প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট মানুষের অন্তর ও দেহের প্রসবিত বিকীর্ণ কর্মশক্তি এমন এক নিকৃষ্ট সত্তায় পরিণত হয় যাকে তুলনা করা যায় মানুষের গর্ভে থেকে যেমন সাপ বিচ্ছু জন্ম হওয়া। অর্থ্যাৎ তাদের রোগাক্রান্ত আত্মার স্পর্শে বিকীর্ণ সন্তান হবে বিকলাঙ্গ, ধূম্ররাশির মতো কৃষ্ণবর্ণের । তার গায়ে থাকবে যন্ত্রণার কাঁটা।

দুনিয়ার জীবনে যারা ভোগবাদী, যারা সমকামী, যারা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত থাকে তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন, সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি। এসব ব্যাধিতে ভোগবাদীরা কষ্টকরে, যন্ত্রণায় কাতরায়। অথচ মুমেন বান্দারা এর ছুঁয়াই পায়না। দুনিয়ার জীবনে যেখানে ভোগবাদীরা নিজেদের আচার-আচরণের জন্য কষ্ট পায়, সেখানে তাদের উপার্জিত নিকৃষ্ট সন্তানগুলি কেন তাদেরকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না? মানুষের আত্মা ও দেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান হলো, প্রবৃত্তির অপূর্ণতা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি। কিন্তু এরা নিজের জন্য নিজেরা ক্ষতিকর নয়। তবে কেন এই প্রতিদ্বন্দিতা? এর মূল কারণ হলো, মানুষের দেহ কোষের সাথে রোগ জীবাণুর কোষের সাদৃশ্যহীনতা বা অমিল। তাই এদের দ্বারা মানব দেহ আক্রান্ত হয়। অন্য দিকে রোগের ভিন্নতা সৃষ্টি হয় ব্যাকটেরিয়, ভাইরাসের গঠন ও তার চরিত্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

তেজস্ক্রিয়তা এক প্রকার বিকীর্ণ শক্তি। এই শক্তি জ্বালাময়। এবং সেটি সৃষ্টির সৃজনশীলতা ধ্বংস করে। বিদ্যুত পানি থেকে তৈরী হয়। এই শক্তি মানব জীবনের অনেক উপকারে আসে। সে অন্ধকার দূর করে। কিন্তু অন্ধকার কোন উপকার করতে পারে না। যেমন অন্ধকারে কেউ সজাগ অবস্থায় আরামে থাকে না। অপর দিকে অন্ধকার সুখের হলে ও অসীম

www.pathagar.com

অন্ধকার কষ্ট দেয়। আবার অন্ধকারের উপাদান ও মানুষকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক জিনিসের গতির ভিন্নতার জন্য তার কাঠামো, রূপ, গুণ, স্বভাবের পরিবর্তন হয়। পৃথিবীতে ও এর প্রমাণ মিলে যেমন রিক্‌সা, জীপ, প্লেন ইত্যাদির, গতির ভিন্নতার জন্য তাদের গঠন রূপ, গুণ ও স্বভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আচরণ ও স্বভাবের ভিন্নতার জন্য তা থেকে নিকৃষ্ট সত্তা প্রসব হতে পারে। পক্ষান্তরে এই নিকৃষ্ট সত্ত্বার কাছে যখন মানুষ ফিরে যাবে, তখন তার ঐ বৈরী সত্তা দিয়েই সে কষ্ট পাবে। একটি ভালো জিনিসের ভিতরে যখন খারাপ জিনিস (বৈরী সত্তা) ঢুকে তখন তার মূল স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। এর জন্য ভালোর কিছু কষ্ট হয়। যেমন কলেরা জীবাণু যখন সুস্থ্য মানুষের পেটে প্রবেশ করে তখন তার স্বভাবিক আচরণের মাঝে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। অর্থ্যাৎ তার বমি ও তরল পায়খানা আরম্ভ হয়। এতে শরীর ক্রমে ক্রমে পানি শুন্যতায় শুকিয়ে যায়। পরিণামে তার খেচুনী হয়, কষ্ট বাড়ে। একটি ভালো জিনিসের ভিতরে তার গঠন প্রকৃতির সাদৃশ্যহীন কোন খারাপ জিনিস ঢুকলে ভালো জিনিসের যেমন স্বভাবের পরিবর্তন হয় তেমনি একটি ভালো জিনিস খারাপ পথে চললে তার দ্বারাও মন্দ (নিকৃষ্ট) জিনিস সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই সেরা জীব যখন পশুর চেয়ে ও নিকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন তার আচরণ থেকে তার মূলসত্তার বৈরী উপাদান জন্ম হবে। কিন্তু পরজীবনে সেই মানুষটি যখন সৃষ্টি সেরা জীব হিসেবে পুনরুত্থান হবে তখন তার দুনিয়ার জীবনের পাঠানো ঐ নিকৃষ্ট সত্তার গড়া নিবাসে জীবনযাপন করতে দেওয়া হবে। এগুলি তার উপার্জিত সম্পদ হেতু সে এর বাইরে যেতে পারবে না। তখন ঐ বৈরী সত্তার সাথে জীবনবাসে সে কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। আর মনে উদয় হবে অনুশোচনার তীব্র জ্বালা। যা মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক। এর দ্বারা কষ্ট পাওয়ার মূল কারণ হলো- ঐ নিকৃষ্ট সত্তাগুলির জীবন ও দেহের প্রকৃতি, মানব জীবন ও তার দেহ প্রকৃতির সাথে বৈরী সম্পর্ক থাকা। সে কারণে ভোগবাদী মানুষের কষ্টের সীমা থাকবে না। যে জীবন বিধান মেনে চললে ভালো মানের সত্তা তৈরী

হবে তার কথা পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল-কোনআনে তিনি ঘোষণা করেছেন-"আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত ও নিভুল জীবন ব্যবস্থা যা চিন্তাও কর্মের প্রণালী।"

– (আল-কোরআন)

আলোক থেকে মানুষ যেমন কষ্ট পায় না তেমনি আলোক সাদৃশ্য কোন সুস্থ্য উপাদান থেকে ও মানুষ কষ্ট অনুভব করে না। জান্নাত বা পুণ্যের জগৎ আলোক উজ্জ্বল ও কষ্টহীন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মানব জীবনের বিকীর্ণ র্কশক্তিকে (ভালো মানের) ধরা যায়, আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। পৃথিবীতে যত ধরণের আলোক রশ্মি দেখা যায়, সে সকল আলোক রশ্মির বর্ণ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাংকের উপর। মূলতঃ গতির ভিন্নতার জন্যই রূপ, গুণও স্বভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই বিশ্ব জগৎ আলোর লীলা খেলা ও তরঙ্গ গতির নিপুণ চলাচলের ধাঁ ধাঁ।

সার্বিক অর্থে এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পাপ, পুণ্যের দানার সাথে মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তির কোথায় যেন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আমরা বলি জল, আবার কেউ বলে 'আব', কেউ বলে water। ভাষাগত ভিন্নতায়, নাম ভিন্ন হলেও জিনিস কিন্তু এক ও অভিন্ন। সেরূপে সৃষ্টিকর্তা যে জিনিসকে গোনাহ (নিকৃষ্ট সত্তা) এবং পুণ্য (উৎকৃষ্টসত্তা) বলেছেন, কে জানে বিজ্ঞানের ভাষায় সেই জিনিসের নাম, কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি হয়েছে কি-না? প্রকৃত পক্ষে বিকীর্ণ সত্তার সূক্ষ্ম দানাগলি হলো অদৃশ্য ঢেউ বা তরঙ্গ কিংবা বিট। সে যাই হউক জান্নাতের সাথে পুণ্যকণার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি যদি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তির সাথে জান্নাতের সম্পর্ক খুঁজে বের করা সম্ভব হয়, তাহলে বিকীর্ণ সত্তার সাথে পাপ, পুণ্যের সম্পর্ক পানি আর আবের মতোই মনে হবে।

www.pathagar.com

জান্নাত ও পুণ্য সত্তার সম্পর্ক

দুনিয়ার যাবতীয় প্রাকৃতিক উপাদানের মূল মৌলিক কণাগুলিই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলেছেন, সূদূর অনন্ত অসীম ঠিকানায় কোন এক নির্জন পরিবেশে এই কণার জন্ম হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে চারটি মূল মৌলিক কণা ও চারটি মূল মৌলিক বল থেকে এই বিশ্বের বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তারপর গতির ফলে সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়ে যৌগিক কণা রূপ নিয়েছে। এভাবে এই সুন্দর বিচিত্রময় পৃথিবীর মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, আটার হাজার মাখলুক জন্ম হলো। এর কোথাও কোন তিল পরিমাণ অসংলগ্নতা নেই। আছে বিবেক বুদ্ধিশীল এক মহা পরিকল্পকের মহান পরিকল্পনার ছুঁয়া। এই পৃথিবী যতই সুন্দর হউক তবু এর কোন কিছু চিরস্থায়ী নয়। এই আছে, এই নেই, সব কিছু যেন জন্ম হয়ে হারিয়ে যাওয়ার তালে থাকে। মৃত্যুর স্বপ্ন অনেক কিছুকে করে দেয় ক্ষণস্থায়ী। হাজার হাজার বছরের পুরানো অনেক কিছু এখন আর পৃথিবীতে নেই। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সে যদি সবকিছুকে হজম করে ধরে রাখতে পারত, তাহলে এই পৃথিবীর বর্তমান আয়তন ফুলে ফেঁপে কোটি কোটি পৃথিবীর সমান হয়ে যেত। যেহেতু তার আকার আয়তন আগের মতোই আছে, তখন বলা যায় এই পৃথিবী কোন কিছু হজম করে রাখতে পারে না। তার মাতৃকোল থেকে অসংখ্যক রং বেরংগের সন্তান প্রসব হয়ে যায় অসীম অরণ্যের শুন্য ভুবনে। এগুলি পৃথিবীর বস্তু কণার গর্ভে থেকে এবং তার পৃষ্টের যাত্রীদের মনন জগতের সীমাহীন বাসনার জরায়ু থেকে ও অঙ্গের কোষ বেষ্টনীর প্রসব রাস্তা দিয়েই জন্ম নেয়। এদের মধ্যে সুকৃতিময়, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্টমানের মঙ্গলদায়ক যে সব সন্তানের জন্ম হয়, তারা মিলে মিশে যে উদ্যান বা বাগান সৃষ্টি করে, তার নাম জান্নাত। সেই বাগান বাড়ীর মনোরম শোভা ফারফিউমের গন্ধ, আবে- কাউচারের সিগ্ধ পানির নহর, হুর, গেলমানের আত্মীথিয়তা সব মিলে পরম শান্তি সুখের সেই দেশে আলোর বন্যায় নিকৃষ্ট উপাদান বলতে সেখানে কিছুই থাকবে না।

তাই প্রেম ক্রিয়ার পর ফরজ গোসলের প্রয়োজন হবে না। রোগ বালাই ঝরা মৃত্যুর গন্ধ সেখানে থাকবে না।

www.pathagar.com

প্রেম ভালবাসা আনন্দ আর শান্তির সুগন্ধিময় বাতাসে সে বাগান বাড়ি থাকবে পরিপূর্ণ। এই সব মনোরম জিনিসের উপাদান এই পৃথিবী থেকেই লুটে নিতে হয়। সংগ্রহ করতে হয়, সৎকর্মের মাধ্যমে।

তাই জান্নাতের সাথে পৃথিবীবাসীর কর্মের বিকীর্ণ শক্তির ও তার আচার আচরণের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি মুছে ফেলে দেওয়া যায় না।

মায়ের গর্ভে থেকে যেমন পৃথিবীর আলো বাতাসের গন্ধ পাওয়া যায় না তেমনি এই পৃথিবীর মৌলিক কণা যে কোথায় তৈরী হয়েছে তার খরব বলা যায় না। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীর বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে সুদূর অনন্তে কোথাও কিছু সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা বলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর আড়াল থেকে মৌলিক কণা সৃষ্টি হয়ে যেহেতু এই সুন্দর ভূতল সৃষ্টি হতে পেরেছে সুতরাং পৃথিবীর থেকে কর্মের বিকীর্ণ সত্তা দিয়েও নতুন জগৎ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের আত্মার অবর্তমানে জীবদেহ পচে গলে দুর্গন্ধের হয়ে যায়। খোলা আকাশের নীচে তা পড়ে থাকলে বায়ু ও তার পারিপার্শিক পরিবেশ দূষিত হয়। পচনশীল জীবদেহে বাসা বাঁধে বেরাম জীব গোষ্টী। এই জীব গোষ্টী সেটিতে বংশ বিস্তার করে, ডিম পাড়ে। একসময় সেগুলি ফুটে বাচ্চা বের হয়। এ ভাবে ঐ দেহটি তিলে তিলে তাদের খাদ্যের আকড়াতে পরিণত হয়। জীবিত অবস্থায় কিছু মানুষ অচেতন পশু মনের স্তরের নীচে চলে যায়। এদের সচেতন মন তখন থাকে মৃত। এই চেতন মনের মৃত্যুতে তাদের মনুষ্যত্ব বোধ হারিয়ে যায়। তখন এরা বিবেক শূন্য নিকৃষ্ট জীবাণুর শ্রেনীতে চলে যায়। এই সব নিকৃষ্ট মানুষ ভোগবাদী প্রবৃত্তির গোলাম বনে যায়। তখন তাদের আচর-আচরণ নিকৃষ্ট বেরাম গোষ্টীর চরিত্র ধারণ করে। এই শ্রেণীর মানুষের মনন চরিত্রের উপর শয়তানের আঁচড় লাগার ফলে এর সম্মিলিত প্রভাবে দেহ কোষ থেকে প্রসব হয় নিকৃষ্ট মানের এক উপাদান। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-"কাফির বেঈমান হলো মুরদা আর ঈমানদ্বার মুমিনগণ হলো যিন্দা।"

রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, এতে দেখা যায় কাফিরদের বিবেকশীল চেতন মনের মৃত্যুর কথাই ফুটে উঠেছে। কারণ ওরা প্রকৃত পক্ষে মৃত না

www.pathagar.com

হলে ও তাদের চেতন মনের কোন সাড়া শব্দ থাকে না। পক্ষান্তরে বিবেকশীল চেতন মন যাদের সক্রিয় থাকে তাঁদেরকেই বলা হয়েছে যিন্দা। এই যিন্দা বা জীবিত রূহানী শক্তিধর মানুষের মনও দেহে আশ্রয় নেয় খোদার গুণাবলীর অনুপম প্রেম ভালবাসা, মানবতা আর খোদাভীরুতা। এই শ্রেণীর মানুষের থাকে মনুষ্যত্ববোধ। তাদের চেতন মন ও দেহের বিকীর্ণ কর্মশক্তি থেকে জন্ম নেয় উৎকৃষ্ট মানের উপাদান। এই উপাদান জ্ঞান, বিশ্বাস, নিয়ত ও কর্মের সমন্বিত অভিব্যক্তির ফসল।

আল্লাহ বলেন-"আল্লাহর কাছে তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম পশু, যারা কিছুই বুঝে না।" – (আল-আনফাল-২২)

আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন-"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখেন। –(আল-বাকারাহ-১১০)

আমরা পৃথিবী নামক প্রাকৃতিক যে গোলক বৃত্তটিতে বাস করি, এখানে সূর্য উঠে, ভোর হয় আবার সুর্য ডুবে, রাত হয়, নদ-নদীর স্রোতের মতো সময় বহে, এখানে জন্ম হলে মৃত্যু তার দরজার কাছেই বসে থাকে। তাই যৌবন জোয়ারে ভাটা পড়ে। এখানে পানিরা ঠান্ডার কষ্ট নিবারণ করতে গায়ে বরফের কাঁথা পড়ে। আবার উষ্ণতায় নিজের মূর্তি ছেড়ে বাতাসের মুল্লুকে গা হেলে দিয়ে শীতল বায়ুর ছুঁয়া নেয়। কিন্তু যেখানে সূর্য উঠবে না, অস্ত যাবে না, সময় উঠার নামার যেখানে বালাই নেই, পূর্ণিমার রজনীর মতো যে ঘরময় আলোর ছুটোছুটি, যার উঠান আর আকাশ আলোর বন্যায় স্নান করে সর্বদা থাকবে পুত-পবিত্র। যেখানে মৃত্যু নেই, ক্ষুধা নেই, রোগ যন্ত্রণার কোন উপাদান নেই, যেখানে দাস দাসী আর মনি মানিক্য খচিত বালাখানা শোভাবর্ধন করে আছে, সেখানে নেই কোন রন্ধনশালা, সেখানে প্রয়োজনবোধ হওয়ার সাথে সাথে সব প্রস্তুত পাওয়া যাবে, যেখানে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রয়োজন হবে না, সেরূপ এক রহস্যময় জগতের কথা, তার সুখ-শান্তি আরামের মর্ম এই ঝরা মৃত্যু সুখ-দুঃখের রঙ্গ-মঞ্চে বসবাস করে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা এমনি কঠিন যেমনটি হয় ধনীর বেলায় দরিদ্রের কষ্ট অনুভব করা।

www.pathagar.com

আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক। এই জ্ঞান স্থান-কালের অধীন। সহজ কথায় আমরা স্থান-কালকে হজম করতে পারি না। যেখানে যতদিন থাকি, যার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যে জিনিসের স্বাদ নিতে পেরেছি, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ক্ষণিক ধারণা থাকে। তবে কষ্ট একবার পার হয়ে গেলে তা আস্তে আস্তে যেমন ভুলে যাই তেমনি সুখের বিষয় ও ভুলতে শুরু করি। আবার একবার কষ্টে পড়ে গেলে পূর্বের আরাম আয়েশের খবর থাকে না। তবু পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখের উপাদান সম্পর্কে আমাদের একটা কিঞ্চিত উপলব্ধি জ্ঞান আছে। কিন্তু পরকালীন জীবন ব্যবস্থার সুখ-দুঃখের উপাদান পৃথিবীর আনাচ কানাচে না থাকায় সে সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া কষ্টকর। তবু বিশ্বাস করতে হবে। মায়ের গর্ভে থেকে জন্ম হয়ে যেরূপে এই পৃথিবীকে পেয়েছি, সে ভাবেই একদিন মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে আর এক নতুন জগৎ পাব। আজ যেমন পৃথিবীর সুখ-দুখ আরাম আয়েশ ভোগ করছি সে দিন ও এর কোন কমতি থাকবে না। পরকালীন সুখ ভোগের বাসর ঘর যে উপাদান দিয়ে তৈরী হবে তার নাম নেকী বা পুণ্য কণা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অনেকাংশে আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তির সাথে সাদৃশ্যমূলক ভাবা হয়েছে। এই উপাদান এই প্রকৃতির গর্ভে থেকেই সংগ্রহ করে পাঠাতে হয়।

আল্লাহ বলেন-"সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।" —(আল-কোরআন)

নেকী আর বদী যে যাই করুক না কেন এই পৃথিবীই হলো তার কর্মক্ষেত্র। আবাদী ভূমি, চাষাবাসের স্থান। এখানে যা ফলানো হবে তা ওপার জগতে গিয়ে মওজুদ পাওয়া যাবে। সেগুলির ওজন হবে। প্রত্যক্ষ করা যাবে। নিজের কি-না তাও যাচাই বাছাই করা যাবে। তখন হয়তো অবাক হয়ে বলব জীবনে যা কিছু করেছি, সেখান থেকে কিছুই তো বাদ পড়েনি বা ভুলে যায়নি। গোপন ও [illegible]। অথচ আজ [illegible] অনেকেই জীবনের [illegible] অতি মূল্যবান সময়, খেলার ছলে, তামাশার আড্ডায় বসে, নারী আর [illegible] গন্ধে ভুলে গিয়ে নষ্ট করে চলেছি। কোন দিন এ [illegible]

www.pathagar.com

ভেবেও দেখিনা কি করে নেকী অথবা বদী কণাগুলি এখান থেকে উড়ে যায়?

আল্লাহ্ বলেন- "তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যেই করবে আর দুষ্কার্য করলে তাও নিজেদের জন্যে করবে।" – (বনী ইসরাইল-৭)

মাটি আর আকাশ আমাদের অনেক কিছুই গিলে ফেলে। প্রাথমিক অবস্থায় মাটি কিছু হজম করলেও সে আবার অন্য সময় ঐগুলিই বমি করে দেয় কিন্তু আকাশ কিছুই হজম করতে পারে না। আমাদের নেকী আর বদী কণাগুলি এমন ভাবেই পালায় যা আমরা কল্পনা ও করতে পারি না। এর বাতাস কিংবা ঝাঁঝ ও আমরা টের পাই না। এগুলি বেতার তরঙ্গের সুপ্ত ঢেউ কিংবা টিভির বিদর্শন বিন্দুর ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে তরঙ্গের স্রোতের মতো উড়ে যায়। এক ঝাঁক সাদা বক যে ভাবে গোধূলীর আকাশ পাড়ি দিয়ে তার আশ্রয় ঠিকানার দিকে উড়ে চলে, সে ভাবেই আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তাগুলি ডানা ওয়ালা পাখির মতো অনন্ত আকাশের দিকে নিজের ঠিকানা পাওয়ার আশায় স্পন্দিত গতির তালে তালে অথবা ঢেউ খেলে খেলে অদৃশ্য মূর্তি ধরে উড়ে যায়।

জান্নাতের বাগান যে নেকী দিয়ে তৈরী হবে তা তো এখান থেকেই যোগাড় করে, বাতাসের প্রাচীর, ওজন স্তরের বেস্টনী আর সীমাহীন শূন্য ভূমি পাড়ি দেওয়ার মতো গতি দিয়ে, ঐশী আকর্ষণের মতো চুম্বকত্ব গুণের সুভাস মেখে, বেতার তরঙ্গের মতো ডানা পরিয়ে, ফিকোয়েন্সী নামক উচ্চ [illegible] তড়িৎ ঝাঁকুনি দিয়ে পাঠাতে হবে। এরূপ ভাবে পাঠাতে পারলে [illegible] ডিশ এ্যান্টেনায় [illegible] পড়বে।

আল্লাহ্ বলেন- "তোমা[illegible] কি তোমাদের আমল ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দৃষ্টিতে প্রতিফল দে[illegible]।" – (আন নামল-৯০)

জান্নাতের সাজ-সজ্জা, [illegible] রূপ সৌন্দর্য সুস্বাদু পানীয়, ভোগ বিলাসের সর্বময় উপকরণ স[illegible] করা হবে [illegible]ষের দুনিয়ার জীবনের পাঠা[illegible] নেকী দিয়ে [illegible] যেমন নেকী [illegible]বে তার চির বাসস্থান সে ম[illegible] যাদের কোন [illegible] থাকবে না তাদের আবাসস্থল হ[illegible]।

www.pathagar.com

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল তারা জাহান্নামের আযাব হতে দূরে থাকবে। যারা দোযখের আযাবে গ্রেফতার থাকবে তাদের চিৎকার ও ক্রন্দন এরা শুনতে পাবে না অধিকন্ত তাদের মন যা চাইবে বেহেশতের মধ্যে তারা তাই পাবে।

তাদের সুখ অনন্ত কাল স্থায়ী হবে। কোন রূপ ভয় আতঙ্ক তাদিগকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ফেরেস্তাগণ এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে আল্লাহ তোমাদের নিকট যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তা হলো এ দিন।" – (২১০ঃ ১০১–১০৩)

বাতাস না বইলে যেমন পানিতে ঢেউ বা তরঙ্গ উঠে না তেমনি সৎকাজের নিয়ত ও সৎকর্ম না করলে নেকী হবে না। পক্ষান্তরে নেকী না পাঠালে জান্নাতে বাড়ী উঠবে না, সুস্বাধু পানীয়ের নহর সৃষ্টি হবে না। হুর গেলমানের আতিথিয়তা পাওয়া যাবে না, সর্বোপরি ভোগ বিলাস, আনন্দ ভালবাসার সাগরে ঢেউ উঠবে না; সুখ বাড়িতে জ্যোৎস্নার আলো ফুটবে না। তাই জান্নাতের পরতে পরতে তার শিরায় শিরায় রয়েছে পুণ্যবান বা নেকীর সুকৃতি, আছে তার নিগূঢ় সম্পর্ক। জান্নাত আর জাহান্নাম মানুষের কর্মের প্রতিফলের জগৎ। পুণ্য কণার সাথে যেরূপ রয়েছে জান্নাতের সম্পর্ক তেমনি পাপ কণার সাথে রয়েছে জাহান্নামের মিল। এই পাপ কণাগুলি ও পৃথিবীর পেঠ থেকে জন্ম হয়। কিন্তু এগুলি প্রসব করে মানুষ নামের ভোগবাদী প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট জীবগণ, এরা নামে আর গঠনে মানুষ হলেও তাদের আচার আচরণ হয় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মানুষ নামধারী নিকৃষ্ট এই জীবের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে গঠিত হবে জাহান্নাম। অতঃপর জেনে বুঝে সে পথ পরিহার করাই উত্তম।

www.pathagar.com

জাহান্নাম ও পাপ কণার সম্পর্ক

জাহান্নাম পাপিষ্ঠ শয়তান, জ্বীন ও মানব গোষ্ঠীর চিরস্থায়ী বাসস্থান। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার আইনের পতন হলে, প্রকৃতি যখন ভয়ংকর মূর্তি ধরে সব ধ্বংস করে মহাপ্রলয়ের মহাআক্রোশে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে শান্ত হয়ে যাবে, তারপর আবার এক বিশাল মাঠ (হাশরের মাঠ) গজে উঠবে। যেভাবে বীজতলায় চারা গাছ গজায় সেভাবেই মানুষ নামের জীব কুল সেখানে গজাবে যারা দুনিয়ার মাটিতে জীবন নিয়ে একদিনের জন্যেও পা রেখেছিলো তাদের কেউ সেদিন উঠার বাকি থাকবে না। সবাই বিবস্ত্র বিস্ময় চিত্তে হা হুতাঁশ করতে থাকবে। বিচারের ঘন্টা ধ্বনি বেজে উঠলে, সারিবদ্ধভাবে মিজানের পাল্লায় সবার নেকী, বদী ওজন করা হবে। সেদিন যাদের পাপের বোঝা ভারী হবে, তাদেরকে জাহান্নাম নামের এক জেলখানায় বাস করতে হবে। জাহান্নাম পাপীর কর্মের প্রতিফলের জগৎ। এ জগৎ জলন্ত অগ্নি ও বিষধর সাপ বিচ্ছু ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। সেখানে আযাব দেয়ার মতো, কষ্ট দেয়ার মতো, অগণিত রং-বেরংগের যন্ত্রণার দানা থাকবে, থাকবে দুনিয়ার জীবনের ভ্রান্ত দর্শনে পথ চলার মানসিক অনুশোচনা. যা শারীরিক আযাব বা কষ্টের চেয়েও অপরিসীম কষ্টদায়ক। তৎস্থানের সাপ-বিচ্ছুগুলো প্রতিমুহূর্তে জাহান্নামবাসীকে দংশন করবে। তাদের দংশনের যন্ত্রণা এতো ভীষণ হবে, যা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ বা কঠিন। বলা হয় এসব সাপ বিচ্ছু একবার দংশন করলে শত শত বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণার নেশা কাটবে না। সেখানে আযাবের যে সকল ফেরেশ্‌তা রয়েছে তারা ও প্রতি মুহূর্তে দোযখীদের যন্ত্রণা দিতে থাকবে। এসব যন্ত্রণার মাঝে কারও মৃত্যু হবে না কিংবা আযাবের পরিমাণও কমতে দেয়া হবে না। যদি কমতেও থাকে তাহলে তার আযাব আবার বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ বলেন– "দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে একবার তাদের শরীরের চর্ম শেষ হয়ে গেলে পুনরায় সেখানে নতুন চর্ম উৎপন্ন করে দেয়া হবে।"

www.pathagar.com

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন– "কাফেরগণ অনন্তকাল দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, তা কখনো শেষ হবে না এবং বিন্দু মাত্রাও কম করা হবে না। সুখ-শান্তির লেশ মাত্রও সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না।"

– (সূরা বাকারাহ-৮৬)

মহা যন্ত্রণার সাগরে পাপীরা অনন্তকাল সাঁতার কাঁটতে থাকবে। অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে সাঁতার কাঁটতে কাঁটতে মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ জানাবে, তবু মৃত্যু হবে না, জীবন বায়ু বের হবে না।

এই পৃথিবীতে একই সূর্যের তাপ, বাতাসের শীতলতা, কদর, নেক্‌কারগণ যেমন ভোগ করেন, বদকাররাও তেমনি তার থেকে স্বাদ, গন্ধ, আলো-বাতাস ভোগ করে। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেক্‌কার, বদ উভয়েই থাকতে পারে, তারা এখানে একত্রেই বসবাস করছে। পরম সঙ্গতার সময় নেক বদের সোহাগ আদর নিচ্ছে, কামনার সাগরে দু'জন অনেক সময় এক হয়ে যেতে ও আকুতি প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরজীবনের বিশ্ব ব্যবস্থার আইন হবে ভিন্ন ধাঁচের। সেখানে পাপীর জাগায় পাপীরা থাকবে আর নেকের জায়গায় থাকবে শুধু নেক্‌কারগণ। এ মাটির রাজ্যেও বিচার ব্যবস্থার নীতিমালা আছে, আছে জেলখানা, আছে হাজত খানা। এখানের বিচার ব্যবস্থার নীতিমালার দানাগুলো দোষী ব্যক্তির নিজের হাতে গাঁথা থাকে না। এর কোনটিও সে তৈরী করে না। কিন্তু পরজীবনের শাস্তির দানাগুলো পাপীর নিজের তৈরী। তার কর্মের সত্তা। তাই সেখানের বিচার ব্যবস্থার জন্য সালিশ দরবার বসাতে হবে না। তার আমলই তাকে তার উদরে টেনে নিবে। সে জন্য সে বিচার ব্যবস্থা অতি নিখুত ও সূক্ষ্ম। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে মানুষ যা কিছু পয়দা করে পাঠাবে, সেখানে সে তারই প্রতিফল ভোগ করবে। সে কারণেই কেউ তার কর্মের বেশী ভোগ করবে না আবার কাউকে কমও দেয়া হবে না। কাল হাশরে মানুষ নিজের কর্মলিপি চিনে নিবে। তাই প্রতিবাদ করার কোন ভাষা তাদের থাকবে না।

আল্লাহ এরশাদ করেন– "যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি একবিন্দু পরিমাণ বদকাজ করবে, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে।" – (আল-কোরআন)

www.pathagar.com

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন– "সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথক ভাবে বেরোবে। অতপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে আর যে বিন্দু পরিমাণ ও মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।" – (আয-যিলযাল-৬-৮)

"সেদিন নিশ্চিত রূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতপর যার আমলের ওজন ভারী হবে, সেই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতিবরণ কারী।" – (আল আরাফ-৮-৯)

মানব জাতির মন্দ স্বভাবের কর্মের প্রতিফল জগতের নাম জাহান্নাম। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট জগত বলে তাদের মন্দ আচার-আচরণের সত্তাগুলোও নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট সত্তার নাম পাপ কণা বা গোনাহ। এগুলো জাহান্নাম তৈরীর মৌলিক উপাদান।

দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর সূক্ষ্ম কণার মাঝে যেমন তার গুণাগুণ মওজুদ থাকে তেমনি জাহান্নামের মৌলিক উপাদানের মাঝে মানব মনের অভিব্যক্তির দোষ-গুণ হাড়ে হাড়ে মওজুদ থাকবে। মেলালিন স্টিমোলেটিং হরমোনের প্রভাবে মানুষের গায়ের রং কালো হয়। বংশগতির ধারায় মাতা-পিতা থেকে তার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। সেজন্য কালো মাতা-পিতার সন্তান প্রকৃতির নিয়মেই কালো হয়। আমাদের নিকৃষ্ট আচার-আচরণের সত্তাগুলোতে চরিত্র গতির যে ছাপ বা প্রতিক্রিয়া পড়বে তাতে তার গুণাগুণ নিকৃষ্ট ও দুস্কৃতি পূর্ণ হবে। জীবন নদীর মাঝে উত্তাল তরঙ্গ উঠলে তা যদি নিয়ন্ত্রণহীন হয়, তবে এর বৈরী প্রভাবে দেহকুলের শিরা উপশিরার সুক্ষ্ম সত্তা ধুম্ররাশির মতো ঘোলাটে হয়েই বিকীর্ণ হবে। অপর দিকে মনের অভিব্যক্তির কণাগুলো কালো কুৎসিত পাখির মতো উড়ে যাবে। এ সত্তা দিয়েই তৈরী হবে জাহান্নাম। তাই পাপ কণার সাথে জাহান্নামের যেমন সম্পর্ক তেমনি দুনিয়ার অসৎ জীবন ব্যবস্থারও রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। এ কারণে জীবনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা ঠিক নয়। ভেবে চিন্তে সঠিক পথ বা রাস্তা চিনে শক্ত ভাবে হাল ধরে জীবন সাগর পাড়ি দিতে হবে। ঝড় ঝাঞ্ঝার মতো শত প্রতিকূলতার মাঝেও হাল ঘুরানো

www.pathagar.com

উচিত নয়। জীবন নদীতে যতই জোয়ার আসুক না কেন বাঁধ ভাঙ্গতে দেয়া উচিত হবে না। কোন ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত পথে হাল ধরে বসে থাকলে জীবনি শক্তি বা কর্মশক্তি যাই বলি না কেন তা হারিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, উথলিয়ে উপচিয়ে পড়বে গিয়ে অশান্ত সাগরে, অন্ধকার কূপে, জীবাণুর নর্দমায়, বিষাক্ত গ্যাসময় দরিয়ায় বা দুর্গন্ধময় বায়ুর অতল গহ্বরে। সে সাগর, সে দরিয়া, চির অন্ধকার নিশি দ্বীপের মতো গহিন ও যন্ত্রণাময়। এ সাগরের জলরাশি বা উপাদান ঘোলা, দূষিত জীবাণুতে পরিপূর্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ। এই জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গা জীবন নদীর তলিয়ে যাওয়া এলোমেলো ঢেউ বা তরঙ্গ মিশ্রিত ফেনার মতো। এর আবরণ বা গায়ের রং আলকাতরার গায়ের কালো বোরকার মতো। অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিলে যেমন পানির দানা তৈরী হয়েছে তেমনি জাহান্নাম হলো কর্মের উৎপাদিত বিভিন্ন যৌগিক উপাদানের জগৎ। সে জগতে যে উপাদান আছে সেগুলো হলো বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের এবং মনের পাঠানো সুক্ষ্ম ঢেউ থেকে তৈরী। এগুলো পৃথিবীর টেলেক্স ও ফ্যাক্স এর সাংকেতিক তরঙ্গ বার্তার মতো পাঠানো হয়ে থাকে। একে বলা যায় জীবন যাত্রার জ্বালানী ধোঁয়া বা কিরণ। ধোঁয়ার রং কৃষ্ণ বর্ণের বা আলকাতরার মতো। এগুলো জাহান্নাম নামের দ্বীপচরের প্রতিটি পরতে পরতে মিশে থাকবে। মহামহিমায় স্রষ্টা তাঁর বান্দাদেরকে সে দিনকার মহাবিপদ সংকেত পাক কোরআনের অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই, তাদের মুখ মন্ডল যেন রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, যেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

– (সূরা ইউনুস আয়াত -২৭)

পৃথিবীতে জেলখানার চৌদিক উচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে, এর ভেতরে জেলী বা হাজতীরা বাস করে। তাদের খানাপিনা বাইরে থেকে সাপ্লাই হয়। এগুলো অন্যেরা ফলায়। তাদের শাস্তির মাঝে বড় কষ্ট হলো

www.pathagar.com

পরিবার পরিজনহীন নিসঙ্গতা। তাছাড়া সেখানে অনেক সুখেই থাকে। তাদের জীবন একদিকে ভাবনাহীন। তাদেরকে জেলরক্ষিরা সকল সময় মারধর করে না। স্বাস্থ্যের অনুপযোগী খাদ্যও খেতে দেয় না। তারা রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেলে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানো হয়। এসব কোন কিছুই তার নিজের তৈরী নয়। কিন্তু পরকালের জেলখানার খানাপিনা তার কর্মফলের সত্তা দিয়েই তৈরী হবে। যন্ত্রণার দানাগুলোও তার উপার্জিত। খাবারের বিস্বাদময় দানাগুলো এবং রোগ বালাইয়ের জীবাণুগুলোও তার কামাই। এগুলো সে এ পৃথিবী হতেই ওয়াগন বোঝাই করে পাঠিয়ে দেয়।

সেজন্য অসৎ আচরণের সাথে পাপ কণার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি তার সাথে রয়েছে জাহান্নামের গভীর প্রেম। প্রত্যেক জিনিসের কলেবর বৃদ্ধি করলে একই কথা বার বার এসে যায়। তাই এর সমাপ্তির শেষে আমাদের জানা উচিত পাপ-পুণ্য হয় কোন পথে।

পাপ পুণ্য হয় কোন পথে

পথ বা রাস্তা যদি সরল সোজা ও মসৃণ হয় তাহলে চলতে কোন বাঁধা বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। চলার জন্য রাস্তা যেমন সরল সোজা ও মসৃণ থাকা চাই তেমনি গতি থাকা চাই ধীর স্থির ও পরিমাপ মতো। আঁকা বাঁকা পথ, সীমালংঘনশীল বা পরিমাপহীন গতি, উদ্দেশহীন যাত্রা, এসব আলামতের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন মেশিনারীজ যন্ত্রযানের গতি সীমার একটা নির্দিষ্ট কেপাসিটি থাকে। এ কেপাসিটি নির্মাতা বেঁধে দেন। কেটালগ বা গাইড বুকে সেই নীতির কথা লিখা থাকে। এতে থাকে যন্ত্রের যান্ত্রিক নিয়মাবলীর যাবতীয় দিক নির্দেশনা। চালকের জন্য সে নির্দেশ মেনে চলা ফরজ।

আমরা পৃথিবী নামক সে ভূতলটি চষে ভোগ করছি, সেই রাজ্যে কোন জিনিসই স্থির নয়। পৃথিবী ঘুরছে, চন্দ্র, সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। আপন অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য এবং নিজ

www.pathagar.com

নিজ কর্ম প্রেরণার দ্বায়ভার মিটানোর জন্য কেউ এখানে বসে থাকে না। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী যদি না ঘুরে, না সন্তরণ করে, তাহলে সে আকাশের কোল থেকে ছিটকে পড়বে। এমন হলে তারা কোথায় যে হারিয়ে যাবে তার কোন ঠিকানা বলা যাবে না। আবার যাদের পেট আছে তারা যদি বসে থাকে– হাত, পা, মুখ, না নাড়ে তাহলে যেমন তার খাদ্য যোগাড় হবে না তেমনি খাদ্যও পেটে যাবে না। পরিণামে ক্ষুধার জ্বালায় শুকিয়ে মরতে হবে। তাই গতির জগতে কেউ গতিহীন বা কর্মহীন থাকতে পারে না। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি যে ঘুরছে, তাদের গতির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীমা আছে। কখনো তারা এই পরিমাপ বা সীমা অতিক্রম করতে পারে না, সীমালংঘনকারী হয় না। প্রতি দিন তারা একই নিয়মে সন্তরণ করে। ব্যতিক্রম বা বন্ধনহীনতার কোন রোগ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। জড়পিন্ডের ভেতর কিংবা বাইরের গতিতে তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। তারা যদি নিজেদের খেয়াল খুশি মতো থাকতে চেষ্টা করতো কিংবা তাদের যদি স্বাধীনতা থাকত, তাহলে এই সুন্দর আকাশের পতন অনিবার্য ছিল। এতে তাদের বিপর্যয়ের পরিণতিতে ঘূর্ণিঝড়ের মতো সকল কিছুর শান্তি বিনাশ করে দিত। ফলে সৃষ্টির স্থায়ীত্বের মাঝে করুণ পরিণতি দেখা দিলে এই সুন্দর আকাশ, গ্রহ নক্ষত্রের সন্তরণ কিছুই টিকে থাকত না। তাই মহা বিশ্ব ব্যবস্থায় জড়পিন্ডের গতি তাদের মর্জির উপর বেঁধে দেয়া হয়নি। এদের গতি প্রকৃতির স্রষ্টা নীতিগত ভাবে যে ভাবে বেঁধে দিয়েছেন তারা এর ব্যতিক্রম করে না। বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃতির নীতি আপনা থেকে সৃষ্টি হয়নি। তার রয়েছে একজন স্রষ্টা। বিশ্বের মহামহিয়ান স্রষ্টাই প্রকৃতির মাঝে গতির ঘন্টা বেঁধে দিয়েছেন। এই ঘন্টা স্থির না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো একই নিয়মে সাঁতরাতে থাকবে।

আল্লাহ বলেন- "তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে একটি বিশেষ আইনের অধীন করে দিয়েছেন। এসবই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে।" – (আর -রা'আদ -২)

মানুষ নামের বিবেক বুদ্ধিশীল প্রাণীর দেহযন্ত্রও তার মন এক রহস্যময় গতির অধীন। এ রাজ্যে কেউ গতিহীন নয়। মানুষের কাজ-কর্ম

www.pathagar.com

আচার-আচরণ গতিশীল হয়েই করতে হয়। সাধারণ অর্থে কোন কিছু করাকে বুঝায় কাজ। এই কাজ গতির পরিণত রূপ। বিজ্ঞানের ভাষায় বল প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হওয়া অথবা শতিশীল বস্তুর স্থির হওয়াকে বুঝায় কাজ। মানুষের কাজ কর্ম হলো তার আচার আচরণ বা স্বভাবের ক্রিয়া। বল হলো বাহ্যিক কারণ যা পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চেষ্টা করে। এই বলকে পরিমাপ করা যায় যেমন বল (F) = ভর (m) x ত্বরণ (f)। ত্বরণ হলো নির্দিষ্ট সময়ে গতিবৃদ্ধির হার। বলের পরিমাপ থেকে কাজেরও পরিমাপ করা যায়। যেমন কাজ (W) = বল (F) সরণ (s)। সরণ হলো একক সময়ে দূরত্বের হার। সুতরাং বলের পরিমাপ এবং বলের ক্রিয়া রেখা বরাবর প্রয়োগ বিন্দুর সরণের (দূরত্বের) মানের গুণফলই হলো কাজের পরিমাপ। এই উদাহরণের আঁলোকে বলা যায় মানব জাতির কাজ, কর্ম, আচার-আচরণও পরিমাণহীন থাকতে পারে না। এগুলোরও ওজন করা হবে। মহা বিজ্ঞানী খোদার প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের পাল্লায় মানব জতির কর্মফল ওজন হবে। আল্লাহ বলেন "সেদিন নিশ্চিত রূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতপর যার আমলের ওজন ভারী হবে সেই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতিবরণ কারী। – (আল-আরাফ ৮-৯)

"বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এ নামায়ে আমলে ছোট বড়ো কোন গোনাহহ অলিখিত নেই।" – (ক্বাহফ-৪৯)

কাজ করতে হলে সবার বেলায়ই শক্তির প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ করার সামর্থকে শক্তি বলে। যেভাবে কাজ ও বলকে পরিমাপ করা যায় সেভাবে কাজের পরিমাপ থেকে শক্তির পরিমাপও তার হিসাব নিকাশ করা সম্ভব। পৃথিবীতে যার গায়ে শক্তি বেশী, সে ইচ্ছা করলে অন্যের তুলনায় বেশী কাজ করতে পারবে। যান্ত্রিক যান গতি-শক্তি পায় পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি থেকে, আর মানুষ শক্তি পায় খাদ্য থেকে। এই শক্তি স্থির অবস্থায় তার দেহে মওজুদ থাকে। পৃথিবীর সকল কিছুর শক্তির উৎস হলো সূর্য। এ সৌর শক্তি বিভিন্ন ভাবে পদার্থের কঠিন আবরণ ভেদ

www.pathagar.com

করে তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। যন্ত্রে যে শক্তি নেয়া হয় তাকে বলে যান্ত্রিক শক্তি। মানব দেহ যন্ত্রেও যান্ত্রিক শক্তি থাকে। স্থির অবস্থায় এই শক্তির পরিমাপ করা কঠিন। তাই যান্ত্রিক শক্তির প্রকাশ ঘটে গতি শক্তির ও স্থিতি শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে। কাজ হলো শক্তির মাপকাঠি। যন্ত্র যেমন কাজ করে, মানুষও তেমনি কাজ করে। কাজ করবার জন্য যন্ত্র বা দেহ যদি নিথর থাকে, তাহলে তার মাঝে শক্তি আছে কি না বুঝা যায় না। শক্তির প্রকাশ হয় কাজের মাধ্যমে। কাজ যেমন শক্তির মাপকাঠি তেমনি গতি হলো কাজের উৎকর্ষতা বা কাজ সম্পাদনের বাহ্যিক কারণ। সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর দেহ যখন কোন ঘটনার জন্ম দেয় বা অবস্থানের পরিবর্তন করে তখন দেহের নড়া-চড়া থেকেই কাজের উৎপত্তি হয়। সেজন্য দেহে যে শক্তি থাকে একে বলে গতি শক্তি। গতি শক্তির (K. E)= $\frac{১}{২}mv^2$ এর সমান।

শক্তির বেলায় ক্ষয়, অপচয়, রূপান্তর ইত্যাদি কর্মই ঘটে। পদার্থের রূপান্তরে যে শক্তি উৎপন্ন হয় এর পরিমাণ $E= mc^2$। যত ক্ষয় অপচয় রূপান্তরই ইউক না কেন শক্তি চিরদিনই অবিনশ্বর। এর কোন ধ্বংস বা শেষ নেই।

গতির জগতে সবাই সরল সোজা ভাবে চলে না। চন্দ্র, সূর্য ঘুরে ঘড়ির কাঁটার মতো। দেয়াল ঘড়ির দোলকটিই ঘুরে অন্য ভাবে। এর গতি দোলন গতি। চলন্ত সাইকেলের চাকা ঘুরে ঘূর্ণন গতিতে। লাটিমের গতি চলন ঘূর্ণনগতি, মানুষের গতি চলনগতির মধ্যে পড়ে। এই চলন গতি একরকম হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায়ও চলন গতি দু'ধরণের যেমন সরল চলন গতি ও বক্র চলন গতি। সরল চলন গতি বিশিষ্ট দু'টি বিন্দুর যোগফল পরস্পর সমান্তরালে থাকে, এবং পথ থাকে সরল সোজা। কিন্তু বক্র চলন গতির পথ হয় আঁকা বাঁকা।

মানুষ জীবন সাগরে নিজের প্রয়োজনে সংগ্রাম করছে। দু'পায়ে ভর করে তারা দিন রাত সাঁতার কাটছে। তার চলন গতিই নির্ভর করে তার জয়-পরাজয়।

www.pathagar.com

সরল সোজা পথে নির্দিষ্ট গতিতে জীবন সাগর পাড়ি দেয়া সহজ। কিন্তু আঁকা বাঁকা পথে উদ্দেশ্যহীন গতিতে, পরিমাণহীন বেগ দিয়ে সে সাগর পাড়ি দেয়া খুব কঠিন। এর ফলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে। তাকে চন্দ্র, সূর্যের মতো গতির ঘন্টায় বেঁধে দেয়া হয়নি। সে ইচ্ছা করলে যে ভাবে খুশি সে ভাবে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু কোন পথে জীবন চালালে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকায় আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহা দয়াবান খোদা-তাআলা চলার জন্য একটি কেটালগ বা গাইড বুক দিয়ে দিয়েছেন। সেই কেটালগে সীমালংঘনকারীর বিপর্যয়ের কথা বলা আছে। দুনিয়ার জীবনে সীমালংঘনকারীরা শয়তানের সহচর। তাদের চলন গতি ভোগবাদী প্রবৃত্তির দংশনে আঁকা বাঁকা ও বক্রাকার হয়। এদের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। যেখানেই জীবনের একটু স্বাদ আছে, সেখানেই তারা মগ্ন হয়ে যায়। জীবনকে যথেচ্ছা ভোগ করার জন্য তারা জঘন্যতম কাজ করতে ও দ্বিধাবোধ করে না। পরিশেষে এরা বক্র চলন গতির পথে শয়তানের বন্ধুত্ব বা শিষ্যত্ব বরণ করে। তাই এ পথ বিপর্যয়ের পথ বা পাপ সৃষ্টির পথ। এ পথের অনুসারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারাও খোদার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। যারা তাঁর আনুগত্য করে না ওরা জারজ, চরিত্রহীন ও সীমালংঘনকারী। সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের মাঝে আছে খোদা প্রদত্ত বেঁধে দেয়া স্বভাব। স্বভাবের গতিসীমা অতিক্রম করলে সীমালংঘন হয়। দুনিয়াতে সীমালংঘনকারীরা থাকে চরিত্রহীন।

মানুষের সৎ ও সুন্দর গুণাবলী তার স্বভাবের গতিসীমা অতিক্রম করে না। জীবনের প্রতিটি কাজ যাতে স্বভাবের গতিসীমার মধ্যে থাকে, তাই একে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধানের অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে। এ বিধানের নাম দ্বীন ইসলাম। এ পথেই মঙ্গলময় পুণ্য সত্তা তৈরী হয়।

আল্লাহ বলেন-"তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের সকল সৎকাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।"- (বাকারাহ-২১৭)

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা হলো দ্বীন ইসলাম। এ পথ সরল চলনগতির পথ। এ পথে যারা চলে তারা চেতনশীল ঈমানদার ও মু'মিন। তাদের জীবন যাত্রা থেকে এক রহস্যময় সত্তা তৈরী হয়। এর নাম পুণ্য বা নেক।

আল্লাহ বলেন– "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমার ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পদকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইস্‌লামকেই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) রূপে মনোনীত করলাম।" – (মায়েদা-৩)

"যে লোক গালাগাল করে ও অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়, ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, যুলুম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত, বড়ই অসৎ কর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর জারজও।" – (সূরা কালাম-১১-১৩)

প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক জিনিসের গতির পরিমাপ থাকা চাই এবং চলার পথ হওয়া চাই সরল, সোজা ও মসৃণ। আমরাও প্রকৃতির বাইরের কোন সম্পদ নয়। তাই আমাদের জীবন গতির পথও হওয়া চাই সরল সোজা। আমাদেরও ভেবে চিন্তে ধীর স্থির গতি নিয়ে চলতে হবে। বস্তু আর জগৎ সৃষ্টির পিছনে গতি হলো সর্বেসর্বা। গতি থেকে সময় ও বস্তুর উৎপত্তি। আমাদের আচার-আচরণও গতির মধ্যে কাটে। তাই এ থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। সেগুলো বস্তু না হলেও বস্তুর বংশানুক্রমিক অন্য কোন জাত। বস্তুর সাথে গতির সম্পর্ক অনুধাবন করতে না পারলে জীবন গতির হাল ঘুরানো কঠিন। সেজন্য গতি বস্তু না হলেও বস্তুর উৎপত্তির কাহিনী শুনতে হবে। জানতে হবে তার আগা গোড়া। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে সরল সোজা পথ ধরতে হবে।

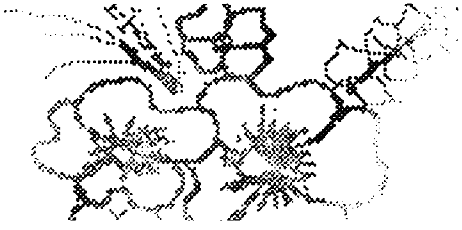

www.pathagar.com

গতি ও বস্তু

বিশ্ব মাতৃকোল যখন ছিল শূন্য, সে সময় পরমাণু কিংবা কোয়ার্ক নামের কোন সন্তান জন্ম হয়নি। তখন বিশ্ব ভূবন ছিল গতিহীন একটা স্থির আসর। আমরা জানি না সে অবস্থাটা কেমন ছিল। আমাদের কল্পনার সাগরে তার কোন অস্তিত্ব স্থির করতে পারিনি। তখন যে বিশ্বে কেউ ছিল না, এমন নয়। তখন ছিলেন প্রভু রাজাধিরাজ, তাঁর গুপ্ত আসনে। সে সময়ে বিশ্বে ছিল পরমস্থিতি অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু এখন বিশ্বে যে অবস্থাটিকে স্থির মনে হয়, আসলে সেখানে স্থিরতার কোন বালাই নেই। একটি ইট কিংবা একটি গাড়ী আজীবন একস্থানে পড়ে থাকলেও সেগুলো প্রকৃত পক্ষে স্থির নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সাথে সাথে সেগুলোও অবিরত ঘুরছে। তাদের ভেতরের পরমাণুর ইলেকট্রন কণিকাগুলো থাকে সদা ভ্রমণশীল। কখনো এরা থামে না, ঘুমায় না, স্থির হয় না। তবু সেটিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে স্থির মনে হয়, এটি হলো তার আপেক্ষিক স্থিতি। আসলে সেটি স্থির থাকে না। গতির বেলায়ও একই কথা। সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়ার নাম পরমগতি। বর্তমান বিশ্বে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়া অসম্ভব। তাই পরম স্থিতি ও পরমগতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে না। তবু একটি গাড়ী যখন নির্ধারিত স্থান থেকে চলে যায় তখন আমরা মনে করি, গাড়ীটি গতি নেয়ার আগে স্থির ছিল। গাড়ীর এই স্থিরতাকে বলা হয় আপেক্ষিক স্থিতি। পক্ষান্তরে আপেক্ষিক স্থিতি অবস্থায় তার মাঝে যে গতি বিরাজ করে সেটিকে আপেক্ষিক গতি বলে। তাছাড়া চলন্ত ট্রেনের দরজা জানালা এবং যাত্রীদের থাকে আপেক্ষিক গতি। সে দিক দিয়ে পৃথিবীর যাত্রীরা নিরব থাকলেও তাদের মাঝে গতির বাজনা বাজতে থাকে। তাই বিশ্বের আদি-গোড়া চিন্তা করলে তার রহস্যের অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছেন–সমস্ত ঘটনা স্থান-কালের ন্যায় চৌমাত্রিকের উপর নির্ভরশীল এবং এর সকল কিছুই আপেক্ষিক। সাধারণ অর্থে বস্তু ও স্থান-কাল পরস্পর

www.pathagar.com

নির্ভরশীল। বস্তু ছাড়া সময় যেমন অচল তেমনি সময়হীন বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই।

তাই বস্তুর উৎপত্তির সাথে সাথে সময় ও কালের চাকা ঘুরতে থাকে। এই অবস্থা থেকে বুঝা যায় পরমস্থিতি অবস্থায় সময় ও কালের চাকা ঘুরেনি। সেই সাথে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাও প্রসব হয়নি। সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে যখন পরম গতির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই সময় ও কালের চাকা ঘুরতে শুরু করে। সে সময় প্রসব হয় বস্তুর আদি সত্তা। পরমস্থিতির সাগরে বস্তুর শুক্র কণা স্রষ্টার কল্পনার রাজ্য থেকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো জেগে ওঠে। তখন শুরু হয় পরমগতির খেলা। এরপর থেকে চলতে থাকে বিশ্ব দেয়াল ঘড়ির দোলকটি। টিক টিক করে সময় ও কালের ধ্বনি শুরু হয় চর্তুদিকে। বাজতে থাকে ঢেউ এর কলকল রব। সে অবস্থায় ওজন ও আয়তন বিশিষ্ট কোন উপাদান জন্ম হয়নি। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের সংগায় সেই ঢেউকেও বস্তুর আদি রূপ ধরা হয়ে থাকে। আমরা ভাবতে পারি পরমগতির সাগরে ঢেউয়ের উত্তাল স্রোতের মাঝে কিনার ধরে জেগে ওঠে বস্তুর আদি ক্ষুদ্রতম কণা। এই ক্ষুদ্রতম কণা স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট অতি অল্প ওজনদার ও খুব মিহি। এরূপ কোটি কোটি কণা একত্র হয়ে জেগে ওঠে বস্তু নামের দ্বীপচর। তার আগে স্রষ্টার পরিকল্পিত বিবর্তন ধারায় কত যে গুপ্ত খেলা, কত যুগ ধরে চলে আসছিল তা আমরা অনুমান করতেও পারি না। তাই গতিহীন বস্তু আর বস্তুহীন গতি দু'টিই অচল। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই পদার্থ বা গতির মন্থরতাই বস্তু। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে আর একটু বাড়িয়ে বলা যায় গতি হলো বস্তু ও স্থান কাল সৃষ্টির বাহ্যিক কারণ আর রূপান্তর হলো মহামনের (স্রষ্টার) অভিব্যক্তির ফল। তাই মহামনের অভিব্যক্তির স্পন্দনময় বিচ্ছুরীত ঢেউ হলো গতিশক্তি। এই গতি শক্তিই হলো বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান। এতে আছে মহা প্রজ্ঞাবান, বিশ্ব প্রকৌশলীর বিজ্ঞানময় নিপুণ প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি আমাদের চোখে ঝাঁঝ লাগিয়ে দেয়। সে জন্য এর কোন কূল-কিনার পাওয়া কঠিন।

www.pathagar.com

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জালে অনস্তিত্ব জগতে (পরমস্থিতির সাগরে) যখন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তখন গতি নামের এক ঢেউ পরমস্থিতির রাজ্যে যে অবস্থান্তর ঘটায় তার নাম পরম গতি। তাই ঢেউ হলো বস্তুর আদি সত্তা। যখন এই ঢেউ ছিল না তখন বস্তুরও কোন উপাদান ছিল না। সে জন্য স্রষ্টা একাধারে বস্তু ও তার উপাদানের স্রষ্টা। পরম স্রষ্টার মহা প্রজ্ঞাময় প্রযুক্তিতে ক্রমে ক্রমে পরমগতি আপেক্ষিক গতির বাস্তবতার মধ্যে লুকিয়ে যায়। এমন অবস্থায় অনন্ত অসীম ভুবন জুড়ে বস্তু কণার মাঝে যখন পরমগতি লুকিয়ে পড়ে, তখন আপেক্ষিক গতি তার স্থান দখল করে নেয়। তাই পরমগতির সান্নিধ্য লাভ করা আমাদের পক্ষে, সম্ভব হয় না। সার্বিক অর্থে এই বিশ্বের গতি-বস্তু ও স্থান-কালের উদয়ন মহামনের অভিব্যক্তির ফল।

জাগতিক বিশ্ব ভুবনে আকাশের কোলে আজ যত গ্রহ, নক্ষত্র উদয় হয় এগুলো যে কোন একদিন ছিল না তা পরমস্থিতির উদাহরণ থেকেই পাওয়া যায়। স্রষ্টার সৃষ্টি প্রেমের পরম অনুভূতিতেই পরমস্থিতির রাজ্যটি অবস্থান্তর হয়ে পরমগতি লাভ করে।

এই বিশাল বিশ্ব জগতে পৃথিবীর মাতৃকোলে রয়েছে স্রষ্টার প্রতিনিধি। এ দায়িত্ব পেয়ে পরম সৌভাগ্যবান আমরা। আমাদের আত্মা পরমকৌশলী আল্লাহ নিজের অনুরূপে, প্রেম, অনুভূতি শক্তি দিয়ে বিবেক বুদ্ধিশীল করেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।" – (আল-কোরআন)

পরম খোদার সৃষ্টি প্রেম, অনুভূতি, আর অভিব্যক্তির ফল হলো এই বিশ্ব ভুবন। এখানের সকল সৃজনশীল প্রজাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে মানুষকে আল্লাহ নিজের অনুরূপ প্রেম ও অনুভূতিশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার অভিব্যক্তির ফল তো আমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বা পারিপার্শ্বিকতার কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে কি তার গতি বা আচরণ থেকে কিছুই সৃষ্টি হবে না? সত্যিকার অর্থে যার প্রেম আছে, অনুভূতি, বিবেকবুদ্ধি আছে তার বেলায় নতুন কিছু না হওয়ার কোন কারণ

www.pathagar.com

থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এটিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তা না হলে তিনি মানুষকে নিজের মতো প্রেম, অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করতেন না।

এ বিশ্ব বসতিতে সকল কিছুর জোড়া আছে। কিন্তু এমন এক জিনিসের জোড়া নেই যার নাম হলো বস্তু। এখানে বস্তু আছে নিঃসঙ্গ। বস্তুর নিঃসঙ্গ সংসারে তার বিপরীত কোন জাত নেই। নেই আমাদের আশা আকাংখা হতে উৎপন্ন কোন দ্বৈত সত্তা। স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি আক্‌লে আউয়াল বা আদমিয়াত হলো posative সত্তা। অপর দিকে এই সত্তার আকুল আবেদন, নিবেদন ও কামনা বাসনা থেকে খোদার নির্দেশে তার অস্তিত্ব থেকে নতুন যে জাতের পয়দা হয়, তার নাম হাওয়া। এই হাওয়াই Negative ধর্মী জাত। এ সম্পর্কে বিশদ ভাবে আদম (আ) থেকে বিবি হাওয়া পয়দা হওয়ার রহস্য কথায় আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর বসতিতে মানব মানবীর আর্বিভাব সৃষ্টির পূর্ণতার ফসল। এ জগতেও আমাদের কামনা বাসনা ও আশার কোন কমতি নেই। তাই এ জগৎ স্রষ্টার অভিব্যক্তির চূড়ান্ত রূপান্তর। অতএব এ জগৎকেও আমরা posative জগৎ ধরতে পারি। তবে এ জগতে আমাদের ইচ্ছার রয়েছে স্বাধীনতা। আছে আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের সকল উপকরণ। সৃষ্টির অভিব্যক্তি থেকে খোদার নির্দেশে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে যে সত্তা রূপান্তরিত হয়ে বের হয়ে আসে তার পরিচয় Negative হিসেবেই বিচার করতে হয়। এরূপ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে দেখা যাবে পৃথিবী সকল কিছুর গর্ভ থেকে তার দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তুর সত্তা নামের এক নতুন জিনিস তৈরী হচ্ছে। যদি বস্তুর গর্ভ থেকে প্রতিবস্তুর কণা বের হয় তাহলে প্রতিবস্তুর জগৎ আমাদের পরকালের ভাবনার গভীর সাগরে ঠাঁই দিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

বস্তু ও প্রতিবস্তু সম্পর্ক

বস্তু বা পদার্থ আমাদিগকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বলতে গেলে বস্তুর পেট ছিড়ে ছিড়ে আমাদিগকে চলতে হয়। আমাদের এ জড়দেহটিও বস্তু বা পদার্থের জীবন্ত কণা দিয়ে তৈরী। আত্মার অবর্তমান হলে মাটি থাকে গিলে ফেলে। কি বিচিত্র এই পৃথিবী! পৃথিবীতে যা কিছু ওজনশীল ও আয়তন বিশিষ্ট এবং জায়গা জুড়ে থাকে, সে গুলোই বস্তু। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাও স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট স্থান নিয়ে বাস করে। কিন্তু আধুনিক বস্তু কাল্পনিক ছায়ার মতো শূন্যে ভেসে বেড়ায়। একে ধরে বন্দি রাখা যায় না, আবার নিক্তিতে দাঁড় করিয়ে ওজনও নেয়া যায় না। বস্তু এখন স্থানের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না। বরং একটি ঢেউকেও বলা চলে বস্তু। এই বস্তু এতো সূক্ষ্ম যে, একে এখন না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। কিন্তু বিশ্বের আদি অতীতের দিকে বস্তুর কোন অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সুদূর অতীতে এই বিশ্বে বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। কখন এই বস্তু পয়দা হয়েছে তা আমরা ভাবতেও পারি না। তবে এই বস্তু ও মহা জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন এর ইতিহাস পাওয়া যায়। যিনি বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি সেই ইতিহাসের প্রবর্তক। কিন্তু মানুষ যে ভাবে বস্তু পয়দা হওয়ার কথা চিন্তা করেছে, এ এক বিভ্রান্তিকর কল্পিত কাহিনী। পরমস্থিতি অবস্থায় জগৎ বলতে কিছু না থাকলেও পরম স্রষ্টা তার রহস্যময় আসনেই ছিলেন। বস্তুর সাথে গতির সম্পর্কের আলোক থেকে বলা যায় যখন কোথাও কিছু ছিল না তখন স্রষ্টার সৃষ্টি প্রেমের সাড়া পেয়ে পরমস্থিতির সাগরে তরঙ্গের যে ঝড় বা ঢেউ ওঠে, সেই অবস্থাটি ছিল পরমগতির জগ ৎ। তাই গতি ও তরঙ্গ হলো সৃষ্টির মূল উপাদান। গতির কল্পনা থেকে তার একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে এটিও বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত। একটি স্থির গাড়ী যেমন চালক ব্যতীত কোন কালেও গতি প্রাপ্ত হতে পারবে না আবার এটি স্রষ্টা বা নির্মাতা ব্যতীত সৃষ্টিও হতে পারবে না। কিন্তু বস্তুর মূল মালমসলা যদি গতি ও তরঙ্গ হয় তাহলে একে গড়তে নিশ্চয়ই বাস্তবে

www.pathagar.com

একজন স্থির নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে। তাই এই বিশ্বের পরম মালিকই বস্তুর এবং তার উপাদানের স্রষ্টা।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-"আল্লাহই সকল সৃষ্টির আরম্ভ করেছেন; তারপর তা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করছেন এবং সবশেষে সবাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"– (১৭ ঃ ৫০-৫৩)

"(আর তিনিই) সৃষ্টিকর্তা আসমানসমূহের এবং যমিনের যখন কোন কিছুর পূর্ণতা সাধন করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু তাকে (এত টুকুই) বলে দেন যে, 'হয়ে যা' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।" –(সূরা বাকারাহ–১১৭)

আমরা মানুষ জাতি এই বস্তু জগৎ চষে চষে ভোগ করছি। আমাদের প্রেম-অনুভূতি, দয়া-মায়া, আকাংখা, বিবেক-বুদ্ধি সবি আছে। আছে আমাদের কর্মের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা। এ ধরার মাটিতে আমরা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারি। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবীর মতো আমাদের গতি বা চলাচলের সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। আমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে পথ চলতে পারি। অনেক সময় বিবেকের মৃত্যু হলেও জীবন যাত্রা থেমে থাকে না। তাই যে ভাবেই চলতে চাই না কেন, আমরা দুনিয়ার জীবনে স্বাধীন। এ স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা মনের একান্ত গোপন বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারি। এমন অবস্থায় আমাদের অন্তর বাসে যখন কামনার ঝড় ওঠে তখন নিথর জড়মূর্তিটি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। সহসাই যেন কামনার দানাগুলো এই জড়মূর্তিটির প্রতিটি স্নায়ু কোষে গতির স্পন্দন ঢেলে দেয়। এই স্পন্দন ঢেউ এর ন্যায় বিদ্যুৎ বেগে সকল কল-কব্জা পেরিয়ে চলে যায় কাজ সম্পাদনকারী অঙ্গের দিকে। এতে অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্রিয়াশীল হয়, গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের অন্তর বাসে কামনার যে ঝড় ওঠে তার একটুও বিলুপ্ত বা ধ্বংস হয় না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো নাসিকার ছিদ্র দিয়ে বায়ুর মতো চলাচল করে না। এ গুলো মস্তিষ্ক হয়ে যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে গিয়েই অদৃশ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই ঢেউ অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায়? এবং কি রূপে যায়? বিশ্বের ইতিহাসে গতি থেকে সব ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সৃষ্টি হয়, এ ধারণা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। খোদার সৃষ্টি প্রেমের কামনার ঝড় থেকে ঢেউ নামের যে তরঙ্গ গতির ঝড়

www.pathagar.com

শুরু হয় তা থেকেই তো এ বস্তু জগতের উৎপত্তি। অতএব যে খোদা এই মানব জাতিকে নিজের অনুরূপ প্রেম প্রবৃত্তি আর ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা এবং দুনিয়ার-প্রতিনিধি করে সৃষ্টি করেছেন, সেই জাতের কামনার ঝড় বা ঢেউ থেকে কি কিছুই সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টির অসীম রহস্য তলিয়ে দেখলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, নিশ্চয়ই মানব প্রতিনিধির মাধ্যমে এ দুনিয়া থেকে কিছু না কিছু সৃষ্টি হচ্ছে।

আল্লাহ্ বলেন-"তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যই করবে আর দুষ্কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্য করবে।" – (১৭-৭)

"এমন কি যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার কান, তার চোখ এবং তার চামড়া, তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। সে তার চামড়াকে বলবেঃ তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?

সে জবাব দিবেঃ যে খোদা প্রতিটি জিনিসকে বাক্‌শক্তি দেন, তিনিই আমাকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন। তোমরা লুকিয়ে কাজ করতে এবং এ কথা জানতে না যে, তোমাদের স্বীয় কান, চোখ, এবং চামড়া তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। বরং তোমরা ভাবতে যে, তোমাদের বহু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ পর্যন্ত অনবহিত।"

– (হা-মীম আস সেজদাহ-২০-২২)

দুনিয়া, আখেরাতে সকল কিছুই খোদার সৃষ্টি। তিনি যেমন বস্তু ও বস্তুর উপাদানের স্রষ্টা তেমনি পরকালেরও মালিক। কিন্তু বস্তু ও পরকালের সত্তা কিংবা বস্তু ও প্রতিবস্তুর সত্তার সাথে মানব কর্ম ও তার জীবন ব্যবস্থার কোন বাস্তব সম্পর্ক আছে কিনা সেটিই বস্তু ও প্রতিবস্তুর সম্পর্ক তালাশ করার মূল বিষয়। তাই আমি বস্তু ও প্রতিবস্তুর সম্পর্ক বের করতে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি দর্শন ও ধর্মের নীতি কথা তুলে ধরেছি।

মানুষ, জীবজন্তুসহ উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে জোড়া সম্পর্ক। আছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার ভেতরে একই ভর বিশিষ্ট বিপরীত চার্জ ইলেকট্রন ও পজিট্রন। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যার জোড়া বা বিপরীত

www.pathagar.com

ধর্মী কোনে কিছু পাওয়া যাবে না। একমাত্র জোড়াহীন সত্তা হলো ফেরেশ্‌তা। এদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন সম্বন্ধ নেই। এরা নারীও নয়, পুরুষও নয়।

আল্লাহ বলেন-"তিনিই মহান যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, মাটির উদ্ভিদ হতেও তাদের মানুষ হতেও এবং এরূপ জিনিস হতে যার সম্পর্কে তাদের নিজেদের কোন জ্ঞান নেই।"

– (৩৬-৩৬)

"এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছে, যেন তোমরা অনুধাবন কর।" – (৫১-৪৯)

বাস্তবে আমরা সকল জিনিসের জোড়া পেলেও এমন এক জিনিসের জোড়া পাই না যার সাথে আঁড়ি দিয়ে এক সেকেন্ডও চলা সম্ভব নয়। সেই জিনিসটি হলো বস্তু। পৃথিবীর কালিজা ছিঁড়ে বস্তুর অন্তর ঠিকানা খুঁজে পেলেও তার কোন জোড়া বা দ্বৈত জাতের সংসার খুঁজে পাওয়া যায় না।

বস্তু এখানে বস্তুর মতোই সংসার করছে। কিন্তু এর সংসারে তার জোড় বন্ধন খুজে পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ধারায় বস্তুর পেটে তার দ্বৈত রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর নাম প্রতিবস্তুর কণা। কিন্তু এ কণার কোন আবাস ভূমি আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে নেই। এ কণাগুলো জড়বস্তু তথা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দেহের কোষ পরমাণুর গা থেকে শিশিরের মতো শূন্য মাতৃগর্ভে ঝরে ক্ষণিকেই সেখান থেকে লুকিয়ে পড়ে। মূলতঃ এ মাতৃথলী গর্ভধারিণী মায়ের মতোই সেগুলোকে উদরে পুড়ে রাখে। কখন, কোথায় যে সেগুলো গিয়ে প্রসব হয় সে খবর কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর বেলায় এদের আয়ু খুবই ক্ষণস্থায়ী। এদের সাথে বস্তু কণার দেখা হলেই সংঘর্ষ হয়, যুদ্ধ চলে। কেন জানি তারা একে অপরকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে ওঠে। ওদের ধাক্কা ধাক্কি আর ঠেলা ঠেলিতে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলোক তরঙ্গ বের হয়ে আসে। জোড়া সম্পর্কে তারা কেন জানি একজন আর একজনকে প্রেমের বন্ধনে ঘর বাঁধতে চায় না। এদের ঠেলা ঠেলি দেখে মনে হয় গতিশীল

www.pathagar.com

কণিকার সাথে স্থিতি কণার যেন ধাক্কা ধাক্কি। সে যাই হউক, প্রতিবস্তুর সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু সেটিই দেখা যাক।

এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ধারায় আদম (আ) এর সুপ্ত মনের বাসনায় প্রবৃত্তির যে ঝড় উঠে ছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতেই খোদার নির্দেশে নিজ (আদম আ) সত্তা হতে তাঁর বিপরীত জাত পয়দা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন–"তিনি তোমাদের জীবজন (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সম প্রকৃতির সঙ্গিনী দিয়েছেন যেন একসঙ্গে তারা বসবাস করতে পারে।" – (৭-১৮৯, ৩৯-৬)

"সদা প্রভূ ঈশ্বর আদম হতে গৃহীত পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করলেন ও তাঁকে আমাদের নিকটে আনলেন।" – (বাইবেল ২ঃ ২২)

সৃষ্টির পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্বে এই মানব, মানবীগণ একসাথে মিলিত হয়ে বাসা বেঁধে ছিলেন এই পৃথিবীর বাগিচায়। এই বাগিচা বস্তু নামের প্রাকৃতিক জীবন্ত ও মৃত সরঞ্জামে তৈরী। বৈধ পথে এর সবকিছু ভোগ করার অধিকার তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমানে মানুষ বৈধ, অবৈধ দু'ভাবেই তা ভোগ করছে।

বস্তু জগতের বাসিন্দাদের মাঝে মানুষ নামের বিবেক বুদ্ধিশীল জাতির জড় মূর্তির বাম পাঁজরের নীচ বরাবর যে চালক বসে আছে, সে তো কোন সময় অলস হয়ে বসে থাকে না। যখন যা ইচ্ছা তাই সে এই জড়মূর্তিটি দিয়ে করায়। তার ইচ্ছার ব্যগ্রতা মস্তিষ্কের সূক্ষ্ণ ভাঁজগুলোকে আলোড়িত করে, গতিশীল করে। গতির এই স্পন্দন স্রোতের বেগে অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তখন সেখানে ইচ্ছার ব্যগ্রতার ঢল নামে। এই ঢল অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রান্তদেশের কণাগুলোকে প্লাবিত করে, তার রূপ পাল্টে দেয়। এতে জন্ম হয় নতুন সত্তা। পক্ষান্তরে এ নতুন সত্তা সেখানে বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। মায়ের জরায়ুতে যেমন সন্তান পূর্ণতা (৪০ সপ্তাহ) লাভ করলে কিংবা অপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ কুঠুরীতে মরে গেলে তাকে সেখান থেকে বের করে দেয় তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরমাণুর গর্ভে যখন নতুন শুক্র জন্ম হয় তখন সে ঐ শুক্রটিকে প্রসব করে তার স্থান খালি করে। এ শুক্রর নাম

www.pathagar.com

প্রতিকণা। যা দিয়ে সৃষ্টি হবে নতুন এক জগৎ। তাই বস্তুর সাথে দুনিয়ার জীবনে আমাদের আত্মার ও দেহের যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি পরকালে আমাদের জীবন ব্যবস্থার সাথে এই রহস্যময় প্রতিকণার সম্পর্ক থাকতে পারে বৈ কি? সেটি প্রতিবস্তুর জগৎ হবে কিনা তা আমাদের জানা না থাকলেও এ জগতের ওপারে যেমন পরজগৎ আছে বলা হয় তেমনি বস্তু জগতের ওপারের ঐ জগতকে প্রতিবস্তুর জগৎ বলতে বাধা কিসের? এ কথা স্বীকার না করলে কার্যতঃ বস্তুর জোড়া প্রতিবস্তুকে অস্বীকার করতে হয়। আমরা হয়ত কেউ বলি, পরজগৎ বা পরকাল, কেউ বলি কর্মফলের জগৎ, সে ক্ষেত্রে কেউ হয়ত বললো প্রতিবস্তুর জগৎ। এখানে তো শুধু ভাষাগত শাব্দিক পার্থক্যই বলা চলে। আসলে সে যাই হউক মূল জিনিস তো এক। পরকালকে তো আর অস্বীকার করা হলো না। রিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে, এ বিশ্বের কোন কোন এলাকায় প্রতিবস্তুর জগৎ বিদ্যমান আছে। সকল যুক্তির সীমানা পেরিয়ে শেষাবধি যেহেতু আমাদের জ্ঞান অসীমের কাছে হার মানে তাই আমাদের যুক্তি ষোল আনাই যে সত্য হবে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবু এ কথা বলতে পারি, বস্তু জগতের গর্ভ থেকে যে সত্তার জন্ম হয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে, তা দিয়েই যদি পরকাল বা পরজগৎ তৈরী হয়, তাহলে প্রতিবস্তুর জগতের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমাদের আত্মা একটি বিশালাকার দেহ রাজ্যকে এক জায়গায় বসে শাসন করে। এ দেহ রাজ্যটি জড় পদার্থের সমষ্টি, একে একটি জীবন্ত জড়মূর্তিও বলা চলে। বস্তুর গর্ভ থেকে যেহেতু প্রতিবস্তুর কণা ভূমিষ্ট হয়, তাহলে প্রতিবস্তুর কণার সাথে আমাদের আচার-আচরণের বিকীর্ণ সত্তা বা পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

অতপর প্রতিবস্তু আর পাপ-পুণ্যের সেই কঠিন সম্পর্ক যদি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয়, তাহলে বিজ্ঞানের সূত্র ধরে আমরা পরকালকে আবিষ্কার করতে পারব, তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

www.pathagar.com

প্রতিবস্তু ও পাপ পুণ্য

দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মে মাতা পিতার উত্তরাধিকারী হলো তার সন্তান সন্ততি। যতদিন তারা জীবিত থাকেন ততদিন সন্তান সন্ততিরা তাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ভোগ করতে পারেন না। যখনি তারা এই পৃথিবীর আলো বাতাস ছেড়ে অন্য জগতে চলে যায় তখনি তাদের অধিকার বৈধ হয়। প্রতিবস্তুর বেলায় ও তেমনি এক রহস্যময় উত্তরাধিকার আইন বা নীতি প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষিত আছে বলে মনে হয়। যেমন বস্তুর গর্ভে প্রতিবস্তুর কণা নামের যে অদৃশ্য কণা পয়দা হয় তার বৈধ মালিকানা এই বস্তু জগৎ অবলুপ্তি বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু কোথাও খুজে পাওয়া যায় না, তাই বলা যায় সে জগৎ দেখার মতো বিধান এখনো চালু হয়নি। সে কারণে এর গুণাগুণ সম্পর্কে বস্তু জগতের বাসিন্দাদের কোন প্রকার জ্ঞান লাভ সম্ভব হচ্ছে না। অপর দিকে আমাদের আচার-আচরণের সত্তা পাপ, পুণ্য ও সেই রূপ রহস্যের জালে বন্দি। এই পাপ, পুণ্য কি এবং কেমন, কিভাবে, কোথা থেকে সৃষ্টি হয়, কোন রাস্তা দিয়ে উড়ে যায়, কোথায় যায় ? এর কিছুই আমরা জানি না। তাই কৌতুহলী মন প্রতিবস্তু ও পাপ, পুণ্য সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে ঘুম-নিদ্রা হারাম করতে বাধ্য। সৃষ্টির জোড়া তত্ত্ব, বা বিপরীত জাতের সন্ধান, বস্তু ও প্রতি বস্তুর সম্বন্ধ ইত্যাদি পাপ, পুণ্যের চিন্তা চেতনাকে দিনে দিনে যেন হিমালয় চূড়ার মতো ভাবনার পাহাড় আবিষ্কার করতে শক্তি-সাহস যোগাচ্ছে।

বস্তু কণার পজিট্রন যখন ইলেক্ট্রনকে নর-নারীর মতো আদর-সোহাগে প্রেমের রাশিতে বেঁধে রাখে, তখন মিলনের তীব্র আনন্দের জোয়ারে ইলকট্রনগুলো পজিট্রনের চারপাশে ঘুরতে থাকে, এতে গতি নামের প্রাণ শক্তি তাদের মিলনের অন্তিম স্বাদ মিটিয়ে দেয়। ফলে তারা চরম পুলক অনুভব করে। ক্ষণিকেই ঢেউ জাগে তাদের গায়ে। এতে করে পরমাণুর সূক্ষ্ম গর্ভ থলিতে নতুন এক ভ্রুন-এর জন্ম হয়। তারপর যখন এই ভ্রুণের পূর্নতা আসে তখন সেটি গর্ভ থলি থেকে এক রহস্যময় রাস্তা দিয়ে প্রসব হয়ে প্রকৃতির সাগরে ভূমিষ্ঠ হয়। এই নতুন প্রজন্মের নাম প্রতিকণা বা প্রতিবস্তুর কণা। মানুষের জীব কোষের একটি ডি,এন, এ-এর ভেতরেই থাকে অগণিত সংখ্যক পরমাণুর স্তর। জীবদ্দশায় মানুষের অঙ্গের গাঠনিক

www.pathagar.com

কোষগুলো অনবরত পরিবর্তন হয়। প্রতি নিয়ত জন্ম-মৃত্যুর পালা বদল চলে তাতে। যখন নতুন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ঐ কোষের ভেতরে সূতার মতো আকৃতির এক ধরণের অতি সূক্ষ্ম সত্তা জেগে ওঠে। একে বলা হয় ক্রোমোজম। এই ক্রোমোজম বংশ তির ধারা বজায় রাখে। শুধু কোষ বিভাজনের সময়ই তাকে সেখানে লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রোমোজম একসময় খুব উত্তেজিত হয়ে নড়াচড়া শুরু করলে তার শরীর পাক খেতে খেতে খুব পাতলা স্প্রিংয়ের মতো হয়ে যায়। এই অবস্থায় পুরা ডি,এন,এ-এর মাঝেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিশেষে কোষ বিভাজন সম্পন্ন হলে ক্রোমোজম গুলো আবার সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিসের প্রেরণায় ক্রোমোজম গুলো উত্তেজিত হয় সেটি আমাদের ভাবনার বিষয়। পক্ষান্তরে এই অদৃশ্য ক্রোমোজম কোন তথ্য নিয়ে পালায় কি, না তাই বা কে জানে? আমাদের মনের কামনার বাসর থেকে যে ঢেউ ওঠে এর দ্বারা যদি সেটি উত্তেজিত হয়, তাহলে তার মাঝে মনের অভিব্যক্তির ছুয়া লেগে থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এই অদৃশ্য সত্তাকে তথ্যকণা ও বলা যায়। কিংবা তার নাম দেয়া যায় কর্মফলের ভ্রুণ।

ছোট বেলায় ভাবতাম মাতৃগর্ভে স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গ তৈরী হওয়ার মতো দু'টি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি হলো স্ত্রী প্রকোষ্ঠ। আর অপরটি পুরুষ প্রকোষ্ঠ। সন্তানের বীজ স্ত্রী প্রকোষ্ঠে ঢুকলে স্ত্রী সন্তান হয় আর পুরুষ প্রকোষ্ঠে ঢুকলে পুরুষ জাত সন্তান তৈরী হয়। অথচ বড় হয়ে বাস্তবে বই পত্র পড়ে অভিজ্ঞতা হলো তার বিপরীত। এখন জেনেছি স্ত্রী লোকের জনেন্দ্রিয়তে জরায়ু নামের একটি মাত্র কুঠুরী আছে। এর ভেতরেই ছেলে-মেয়ে তৈরী হয়। পিতা-মাতার ক্রোমোজমের নিপুণ ক্রিয়া কলাপেই বংশ গতির ধারা বজায় থাকে। তার মাঝে জীন নামের এক সূক্ষ্ম সত্তার আনুপাতিক প্রাধান্য আর প্রাধান্যহীনতার ওপরই সন্তান ছেলে-মেয়ে হওয়া নির্ভর করে। কারণ জীন এর মাঝেও আছে দ্বৈত রূপ। মায়ের গর্ভে সন্তান গঠনের সময় শুক্র আর ওভাম মিলে প্রথমে যে পিন্ডটি গঠিত হয়, সেটিতে যদি পুরুষ জীনের সংখ্যা বেশী থাকে, তবে ছেলে সন্তান হয় অপর দিকে যদি স্ত্রী জাত জীনের সংখ্যার আধিক্য হয় তবে মেয়ে সন্তান হয়। মূলতঃ ক্রোমোজম এমনি সত্তা যা লিঙ্গ রূপান্তর থেকে নিয়ে সন্তানের স্বভাব-চরিত্র, বর্ণ ,গঠন আকৃতি প্রকৃতি সবি বিন্যস্ত করে।

www.pathagar.com

এই বিশ্ব জগৎ সূচনা হবার আগে কোথাও শক্তি, (বস্তুর উপাদান) কিংবা বস্তু ও সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সে সময় অস্তিত্বহীন পরম স্থিতিশীল এক রহস্যময় অবস্থা অবশ্যই বিরাজমান ছিল। সে অবস্থাটা কেমন ছিল আমরা তা বলতে পারব না। তখন গতি নামের কোন চাকা ঘুরেনি। ধর্মের মহান উৎস থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সে সময় নিরাকার এক আল্লাহ বিরাজমান ছিলেন। এবং তিনিই প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন। তাই তিনি একাধারে সৃষ্টির উপাদানের স্রষ্টা এবং জগৎ ও প্রাণের স্রষ্টা। তাঁর পরিকল্পনা ব্যতীত কিছুই সৃষ্টি হয়নি। অথচ একশ্রেণীর বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আল্লাহ খোদাকে না এনে বলেন, বিশ্বে আদি অবস্থায় অস্তিত্বহীন শূন্য পরিবেশে কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ করে আদি ভর-শক্তি সমাবেশ ঘটে। এই ভর-শক্তি উচ্চ তাপে ও চাপে একসময় প্রচন্ড বিস্ফোরণে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একে বলা হয় মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংগ। কিন্তু তারা আদি ভর-শক্তি সৃষ্টির কোন কারণ বা উৎস ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে এতটুকু বিশ্বাস করেন যে, শক্তির রূপান্তরেই বস্তু এবং গতি বিহীন বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না। পক্ষান্তরে বস্তুর মূল উপাদান হলো তরঙ্গ বা ঢেউ।

আমাদের মনের কামনার কুঠুরীতে প্রেরণা বা ঢেউ উদয় হয়। প্রবৃত্তির প্রেরণায় এখানে সুমতি ও কুমতি বাস করতে পারে। একে সদভাব ও কুভাব বলা যায়, কিংবা কুপ্রবৃত্তি বা সুপ্রবৃত্তি। যে কোন রকম প্রবৃত্তির তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আমাদেরকে স্থূল দেহের সাহায্য নিতে হয়। দেহ কাজ করলেও তার কোন আত্মিক ক্ষুধা মেটে না। মন বিশ বছর আগে যদি কোন অঙ্গের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে, তবে বিশ বছর পর সেই অঙ্গে এর কোন অনুভূতির ছাপ থাকে না।

অথচ বিশ বছর আগের ঘটনাটি যদি মনে হয়ে যায় তবে সহসাই মনের গভীরে তার কিছু অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তাই অঙ্গের কোন সময় সুখ-দুঃখ ভোগের পিপাসা বা লিপ্সা হয় না। কার্যতঃ অঙ্গ শুধু জীবনকে তার মধ্যে ধরে রাখার জন্য তারি আজ্ঞাবহ থাকে। মূলতঃ দেহ জীবনের প্রয়োজনেই আহার করে, কাজ-কর্ম, ঘুম-নিদ্রার প্রযোজন বোধ করে। মনের প্রয়োজনেই সে মসজিদে যায় কিংবা গোপন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে। মন যখন দেহকে মসজিদে কিংবা বেশ্যালয়ে নিয়ে যায় তখন কার্য অনুযায়ী সুপ্রবৃত্তির কিংবা কুপ্রবৃত্তির কামাবেগ দেহের স্নায়ু কোষে ঝড় তোলে , এতে করে অঙ্গ কিছু শক্তি হারায়। মনের প্রবৃত্তির ঢেউ বা তরঙ্গ থেকেই স্নায়ূ কোষগুলো উত্তেজিত হয়। তাই ফুরানো শক্তির মাঝে মনের সুপ্রবৃত্তির বা কুপ্রবৃত্তি মিষ্টি দাঁতের বা বিষ দাঁতের কামড় লেগে তা হয়ে ওঠে সুকৃতিময় অথবা দুষ্কৃতিময়। ধর্মের বিধান থেকে জানা যায়, আমাদের হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখ সহ শরীরের চামড়া থেকে পর্যন্ত পাপ কিংবা পুণ্য হয়। এ ছাড়া শুধু মনের মাধ্যমেও পাপ-পুণ্য হয়। কিন্তু এই সত্তাগুলো যে কিভাবে অঙ্গের থেকে সৃষ্টি হয়, তার কোন খবরই আমরা বলতে পারি না। সকল কাজের কর্মফল নির্ভর করে নিয়ত বা ইচ্ছার উপর। কারণ মনের ইচ্ছা ব্যতীত দেহের এক বিন্দুও নড়াচড়া করার উপায় নেই। দেহ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়ই হোক, সে মনের নির্দেশেই কাজ করে। তাই মনের সুমতি থেকে সুকৃতির সত্তা এবং কুমতি থেকে দুষ্কৃতির সত্তা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বিজ্ঞান বস্তু বা জড়সত্তার গর্ভের বিকীর্ণ সন্তানের নাম দিয়েছে প্রতিকণা বা প্রতিবস্তুর কণা। এ বিকীর্ণ সত্তাতে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেমন, কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। এ বিষয়ে পূর্বেও অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। তবে এখানে মনের ইচ্ছা বা প্রেরণা থেকে দেহ কোষের গর্ভে কিংবা মনের বাসর থেকে যে সত্তা বিকীর্ণ হয়, একে ধর্মের ভাষায় পাপ, পুণ্য বললেও বিজ্ঞানের ভাষায় বিকীর্ণ কর্মশক্তিও বলা যেতে পারে। মূলতঃ এই বিকীর্ণ শক্তিতে কর্মফলের জগৎ সৃষ্টি হবার ছাপ লেগে থাকে। এটি ক্রোমোজমের জীন নামক সূক্ষ্ম সত্তার মতো গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বহন করে। এ থেকেই মানব জীবনের কর্মফল বা প্রতিফলের জগৎ তৈরী হবে।

আল্লাহ বলেন, " সে দিন তারা নিজেদের কর্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিগুলো দেখতে পাবে।" –(আল-কোরআন)

"সেদিন তাদের নাক, কান, চোখ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।"

–(আল-কোরআন)

রাসূল (সঃ) বলেছেন - "পাপ, পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু।" –(আল-হাদীস)

www.pathagar.com

আমাদের পেট নামের গুদাম ঘরটিতে এক সাথে চিরদিনের জন্য মাল তুলে বোঝাই করে রাখা যায় না। খেয়ে দেয়ে সেটি বোঝাই করার পর কিছুক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকলে সেটি আবার খাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। তাই খাবার খেতে একটু দেরী হলেই দেহ অবশ হয়ে আসে। তখন পুরা দেহই পীড়া অনুভব করে। এতে বুঝা যায় দেহ কোষের কোষাগার হতেও শক্তি পাচার হয়। এই কোষাগার থেকে যে জিনিস পাচার হয়, এগুলো কি মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর দৃষ্টিতে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির সত্তা? একেই কি রাসূল (স) বলেছেন– পাপ-পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু? অন্য দিকে বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোই কি প্রতিকণা? আসলেই পুরা বিষয়টিই গবেষণার দাবী রাখে। তাই সহজ ভাবে একে একি জিনিস বলা কঠিন। যদি একই জিনিসের ভাষান্তরে বিভিন্ন নাম হয়েছে বলে প্রমাণ করা যায় তবে তার সত্যতা জোর দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। তবে একথা সত্য যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যুক্তির মাধ্যমেও অনেক সময় একটা জিনিসের সত্যতা যাচাই করা যায়। মূলতঃ অদ্যাবধি যত যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, তার শেষ সীমা বা ঠাঁই, এরূপ সাদৃশ্যই প্রমাণ করে। তা থেকেই বুঝা যায় প্রতিবস্তুর কণা ও পাপ, পুণ্যের মাঝে একটি অতি গোপন নিগূঢ় প্রীতি আছে।

বিজ্ঞানে ক্রিয়া , প্রতিক্রিয়া বলে দু'টি কথা আছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বা ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া কর্তার ইচ্ছায় সরাসরি না ঘটলেও ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝেই প্রতিক্রিয়া সত্তা জন্ম হয়ে যায়। পরিশেষে এই প্রতিক্রিয়ার স্বাদ ভোগ করতে হয় ঐ কর্তাব্যক্তির। এটি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ঘটনা।

"নিউটন বলেছেন", প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। অথচ বাস্তব জীবনে এর অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। এ অসঙ্গতির পেছনেও রহস্য বিরাজ করছে। সেই রহস্যের জাল কোথায় তা না জানলে মনের কোণে অতৃপ্তির দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে পারে। কিন্তু অতৃপ্তি আমাদের প্রকৃতি ভরণ করে না। মন সব সময় জানতে চায়, বুঝতে চায়। এই আগ্রহের ফলে হয়ত আমরা জানতে পারব ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের খেলা। তখন হয়ত কর্ম ও কর্মফলের সম্পর্ক খুঁজে পাব।

www.pathagar.com

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক লিখতে বসে একটি ঘটনা স্মরণ হয়ে গেল, সে ঘটনাটি এ লিখার সাথে অনেকাংশে মিল আছে বলে ঐ ঘটনাটি দিয়েই প্রসঙ্গটি শুরু করছি। একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। বইয়ের কালো হরফের ছাপাগুলি আমার হৃদয়ে এমনি অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল যার জন্য চোখের হলো বিরহ। সে দিন ঘুম মনে হয় আত্মহত্যা করে মরেই গিয়েছিল। তাই রাতের আগা গোড়ার কোন হিসেব আমার থাকেনি। পৃথিবীর উঠোনখানি কখন যে রাতের কালো বোরকা পড়েছিল তার কোন সময় জ্ঞান আমার ছিল না। এক সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দরজা খুলে টয়লেটে যেতে উঠলাম। কিন্তু উঠে প্রথম দরজা খোলার সাথে সাথে আমার কানে পাশাপাশি দু'টি শব্দ বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ ভেবেছিলাম দ্বিতীয় শব্দটি হয়ত মেইন দরজায় হয়েছে। হয়তোবা এই মহূর্তে কেউ রোগীর জন্য ডাকতে এসেছে। তাই তাড়াহুড়া করে টয়লেটের কাজ সেরে মেইন দরজার কাছে এসে কাঁচের জানালা দিয়ে এপাশ ওপাশ দেখতে লাগলাম। কিন্তু কাছে তখন কাউকে খুঁজে পেলাম না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কে? কোন সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে? এবারও কোন শব্দ নেই? তখন মনে একটা অজানা আতংক ভীড় করল। এতে ইতস্ততায় ভূগতে ছিলাম, দরজা খুলে দেখব কি। এই অজানা আতংককে পরাজয় করার সাহস সে মহূর্তে আমার ছিলো না। তাই দরজার খিলগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে, বিছানায় এসে গা হেলে শুয়ে রইলাম। কিন্তু কেন জানি ঘুম হচ্ছিল না। তাই বার বার কান পেতে শুনছিলাম, ঐ শব্দটি আবার হয় কি না। অনেকক্ষণ চলে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই। নিরব নিস্তব্ধ একাকি শুয়ে আছি বলে বার বার বুকের ভেতরের প্রহরীটা কেঁপে উঠতে থাকে। কিন্তু এতো ভয়ের মাঝেও প্রকৃতি হলো বৈরী। আবার সে ডাক দিয়ে বসল। কি করব, ভয় আছে তাতে তার কি আসে যায়, প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। জোর করে চেপে ধরেও তাকে বারণ করা গেল না। যেতেই যখন

www.pathagar.com

হবে, তাই আবার উঠে এসে দরজার খিল খুললাম। কিন্তু এবারও দরজা খুলতেই পাশাপাশি দুটি শব্দ আমার কানে বেজে উঠল। এবার যখন দরজা খুলতেই দু'টি শব্দ হলো তখন আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। ধ্বনি হলেই তো প্রতিধ্বনি হবে তাই এবার নিচিন্তেই টয়লেট থেকে এসে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

মানুষ যখন মাটি দিয়ে হাঁটে তখন সে পা দিয়ে মাটিতে ঠেলা দেয়। এই ঠেলা বা চাপকে বলা হয় ক্রিয়া, আর মাটি পায়ের উপর বিপরীত দিকে যে ঠেলা দেয়, সেটি হলো সমান মানের প্রতিক্রিয়া। বন্দুক থেকে যখন গুলি বের হয় তখন সেটিও পেছনের দিকে ধাক্কা দেয়।

এ ধাক্কাটিও বলের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিঘাত যে গুলো ছুড়ে তার গায়েই লাগে। তাই প্রত্যেক ক্রিয়া জনিত বলের ঘাত, প্রতিক্রয়া জনিত বলের ঘাতের সমান। এ ক্ষেত্রে যদি উভয় বলের মান সমান না হয় তাহলে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না। পিচ্ছিল পথে এই দুই বলের মান সমান থাকে না বলে পথ চলা খুব কঠিন হয়। প্রকৃতির নিয়মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ নিয়ম অনড় না থাকলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এর বৈরী বা দ্বন্দ্ব বিরাজ করলেও প্রকৃতির সুদূর প্রসারী অনন্তে এর যোগ বিয়োগ সমান।

মানুষের সকল কাজ কর্মকে ক্রিয়া বলা চলে। আমরা বলি ঐ লোকটি কর্মব্যস্ত। এ কথা দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি কাজে আছে বা ক্রিয়াশীল আছে। কিন্তু মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা ক্রিয়ার অধীন হলেও প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক কাজের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিঘাত কিংবা প্রতিফল এই পৃথিবীতে ভোগ করে না। এখানেই শুধু প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থার মাঝে বৈরী বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কিন্তু সুদূর অনন্তে এর যোগ বিয়োগ সমান কি না সেটিই আমাদের দেখার বিষয়।

একদিন একজন বয়স্ক লোকের দ্বারা একটি ১৩ /১৪ বছরের কিশোরী সতীত্ব হরণের শিকার হলে, সে জীবনপণ সংগ্রামের মাধ্যমে তার ইজ্জত রক্ষা করে, তার নিকট থেকে ছুটে এসে, দু'হাত তুলে খুব বদদোয়া করছিল। তার বদদোয়াতে আকাশে বাতাসে মাটিতে কিংবা ঐ ব্যক্তির

www.pathagar.com

কোথাও কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়তে না দেখে আমি বিস্ময়ে ভাবছিলাম কি ব্যাপার, ঐ দিন এক দরজা খুলতে গিয়ে দুটি শব্দ শুনতে পেয়ে ছিলাম কিন্তু আজ এই মেয়েটির কাকুতি মিনতির কোন পাল্টা প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া কেন হচ্ছে না? ধ্বনি হলেই যেখানে প্রতিধবনি হয়, এবং ক্রিয়া হলেই যেখানে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, আজ কি তা মিথ্যা হয়ে গেল? তবে কি নিউটনের সূত্র ভুল? না, কি এর জন্য কোন জগৎ আছে, যেখানে এর প্রতিধ্বনি ছড়াচ্ছে বা তার প্রতিঘাত ভোগ করার ব্যবস্থা হচ্ছে?

একজন ছিনতাইকারী যখন নিরীহ পথ যাত্রীকে গুল করে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে যায় তখন লোকটি মারা যাওয়ার আগে যন্ত্রণায় কাতরিয়ে কাকুতি মিনতি করে বিশ্ব প্রভুর দরবারে বিচার জানায়। তারপর হয়তো সে রাস্তায়ই মরে পড়ে থাকে। এদিকে ছিনতাইকারী জন সমুদ্রের ভীড়ে নিজেকে আত্ম গোপন করে নিশ্চিন্তে বহাল তবিয়তে বেঁচে যায়। এর জন্য তার কিছুই হয় না। এ সমাজে এরূপ হাজার রকম ক্রাইম করে অনেকেই বেঁচে আছে। এখানে সব ক্ষেত্রে কেন প্রতিঘাত বা প্রতিফল ভোগের ব্যবস্থা নেই? এ রূপ প্রশ্ন অবশ্য অনেকের মনে উদয় হতে পারে।

এ বিশ্ব জগতের মধ্যে সকল কিছু যেমন একি স্তরে সংঘটিত হয় না তেমনি এ জগতের বিধানে রয়েছে দ্বৈত নিয়ম। যেমন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিধান। অপ্রাকৃতিক বিধানে যত ঘটনা ঘটে তা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এগুলো যেমন ঘটে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে তেমনি কর্মের প্রতিফলও সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের এ দুনিয়ার লোকালয়ের অনেক বাইরে। তাই একে সাময়িক ভাবে খুজে পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রশ্ন উদয় হলেও তাকে বিশ্বাস করতে হবে। অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের আচার আচরণের প্রতিক্রিয়া এ দুনিয়ার ঠেলা ঠেলি নিয়মে হবে না। স্রষ্টার সৃষ্ট বিধানে সেই আইন ভিন্নভাবে সাজানো রয়েছে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যেই করবে আর দুষ্কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্যে " –(বনী ইসরাইল -৭)

www.pathagar.com

"তোমরা যে রূপ আমল করছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।"–(আল জাছিয়াহ -২৮)

আল্লাহর বিচার ব্যবস্থার আইন খুব রহস্যময়। এই আইনের বিধান অনেকে টেরতে না পেরে হতাশায় ভোগে, যখন দেখে অন্যায়কারীর পরাজয় নেই, শাস্তির কোন বালাই নেই, বরং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে তাদের উত্তরোত্তর সুনাম ও খ্যাতি দু'টিই হচ্ছে। কিন্তু এ দুনিয়াতে যদি একজন ছিনতাইকারী তার কর্মের পুরাপুরি কর্মফল ভোগ করে ফেলে তাহলে ঐ ছিনতাইকারী যাকে গুলি করে মারল সে তো তার বিচার প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। তাছাড়া একজন লোক দশ ব্যক্তিকে খুন করলে তাকে তো আর দশবার মৃত্যু দন্ড দেয়া সম্ভব নয়। এখানে শাস্তিসীমা অতিক্রম করলে কেউ জীবিত থাকে না। পৃথিবীবাসীর এমন অনেক কর্ম আছে যার একটি কর্মফল ভোগ করতে দিলেই সে জীবিত থাকবে না। সে জন্য এ দুনিয়ায় পুরাপুরি কর্মফল ভোগ করার বিধান আল্লাহ রাখেননি। কিন্তু আমরা স্রষ্টার বিচার ব্যবস্থাকে যতই হালকা মনে করি কেন দুনিয়ার সব কিছু ফুরিয়ে গেলেও অন্যায়কারীর শাস্তির উপকরণ নষ্ট হবে না, ধ্বংসও হবে না। হারানোও যাবে না।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"আমরা কিয়ামতের দিন নির্ভুল পরিমাপকারী তুলাদন্ড রেখে দেব। কারো ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। যদি একটি শর্ষে পরিমাণও আমল হয় তবু আমরা তা উপস্থিত করবো। আর হিসেব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।" –(আল–আম্বিয়া-৪৭)

আমাদের আমলের কণাগুলো কোথায় কিভাবে রাখা হচ্ছে তা পরম স্রষ্টাই ভাল জানেন। একজন মজলুম মৃত্যুর যাত্রীর কাঁন্নার ধ্বনিগুলো যন্ত্রণার দানা হয়ে, অদৃশ্য পালক মেলে ঘুরবে নির্মল আকাশে, অপেক্ষা করবে সেই অত্যাচারীকে ধরে শাস্তি দেয়ার জন্য। অন্য দিকে অন্যায়কারীর মন ও দেহের কুপ্রবৃত্তির দানাগুলো তার জন্য আমানত হিসাবে গচ্ছিত হবে। এই দানাগুলোই হবে তার বেদনার বস্তু। প্রতিক্রিয়াময় যন্ত্রণার উপাদান।

www.pathagar.com

আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

"প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ কর্মলিপি আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। আমরা তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি কিতাব বের করবো, যা সে নিজের সামনে উম্মুক্ত পাবে। তাকে বলা হবে; নিজের কর্মলিপি পড়ে দেখ। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসেব করার জন্য যথেষ্ট।"

–(বনী ইসরাইল ১৩-১৪)

এই পৃথিবীতে অন্যায়কারীকে তার কর্মের প্রতিফল পুরাপুরি ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এখানে যদি পাপীকে কর্মের সাথে সাথে তার প্রতিফল ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হতো তাহলে সে সংশোধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। কারণ পাপীর একটি মাত্র জঘন্যতম আচরণের প্রতিফলই তার এরূপ হাজার জীবনকে ধবংস করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পৃথিবীর জীবন তো বার বার ফিরে আসে না। দুনিয়ার জীবন একবারই আসে, একবারই যায়। তাই প্রতিক্রিয়ার ঘন্টা বিলম্বে ধ্বনিত হওয়ার বিধান মানব জাতির পরম কল্যাণের জন্যেই রাখা হয়েছে। সময় দেওয়া হয়েছে, সংশোধনের। সে জন্য আমরা আমাদের কর্মের ক্রিয়াজনিত বলের ঘাত বিপরীত প্রতিক্রিয়া সাথে সাথে ভোগ করি না।

আল্লাহ এরশাদ করেছেন—

"আমরা আসমান জমিন এবং তার মধ্যকার বস্তু নিচয়কে খেলার সামগ্রিরূপে সৃষ্টি করিনি। আমরা তো এগুলো বিচক্ষণতার দাবী অনুসারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। অবশ্য তাদের বিচারের দিন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট।"–(আদ দোখান–৩৮-৪০)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।"

–(আল-কোনআন)

"তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলো কবয করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করতে করতে তাদেরেকে নিয়ে যাবে। এটাতো এ কারণেই করা হবে যে তারা এমন পন্থা–পদ্ধতি ও

www.pathagar.com

মতবাদ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং যে পথ অনুসরণ তাঁকে সন্তুষ্ট করা যেতো সে পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এজন্যই তিনি তাদের সমস্ত কর্মকান্ড বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"

–(মুহাম্মাদ ২৬-২৭)

আমাদের পাপ-পুণ্যের সত্তা ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। আবার এই পৃথিবীতে পুরাপুরি কর্মফল ভোগ করার মতো ব্যবস্থাও নেই। এই সুযোগে এক শ্রেণীর মানুষ পরকাল ও পাপ-পুণ্য বিশ্বাস করতে নারাজ। অন্য আর একদল আছে তারা ভাবে খোদার নির্দেশ ব্যতীত যেহেতু পাপ, পুণ্য কোন কাজই করা যায় না, সেহেতু তাদের ধারণা তারা পাপ-পুণ্য যাই করুক না কেন, তারা তার কর্তা নয়। এই বিশ্বাসের সূত্র ধরে তারা আরও মনে করে, খোদা যে ভাবে চালায় সেভাবেই যখন চলতে হয় সুতরাং খারাপ কাজ করলেও তাদের কোন দোষ নেই। তাদের ধারণা যিনি পাপ করান তিনিই তা মাফ করে দিবেন।

আল্লাহ বলেন–

"মানুষ কি এটা মনে করে বসেছে যে, তাকে এমনিই অকারণে ছেড়ে দেয়া হবে।" –(আল-কোরআন।)

প্রকৃতপক্ষে তাদের বিভ্রান্তির মূল বিষয় হলো, তারা মনে করে তারা পাপ-পুণ্যের কর্তা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে তাদের কর্মের কর্তা সে নিজেই। স্রষ্টা শুধু ব্যক্তির বাসনা নিবৃত্ত করার হুকুম বা নির্দেশই দেন। সুতরাং যিনি বাসনার গাছ লাগাবে, তিনি তার ফল ভোগ করবে। খোদার সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা এতো নিখুঁত ও রহস্যময় যা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয় না। সেই জন্য আমরা এই সেই বলে থাকি। অথচ স্রষ্টার সৃষ্টির জগতের রহস্যময় ব্যবস্থাপনা তলিয়ে দেখলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এর জন্য দায়ী আমরাই।

www.pathagar.com

পাপ পুণ্যের কর্তা কে ?

আমাদের সমাজে এক ধরণের ফকির সাধু আছে, এরা গানের সুরে বলে, যেমনি ঘুরাও তেমনি ঘুরি, এ পুতুলের বা কি দোষ? কথায় বলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। পক্ষান্তরে স্রষ্টার নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। এমন কি গাছের একটি শুকনো পাতাও তাঁর নির্দেশ ব্যতীত মাটিতে পড়ে না। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের পাপ পুণ্যের কর্তা কে? অনেকে মনে করেন, খোদার হুকুমে যেহেতু ভাল-মন্দ উভয় কাজ করতে হয় সেজন্য পাপ-পুণ্যের কর্তা খোদা নিজেই। এরূপ ধারণা থেকেই ফকির সাধুরা পুতুলের মতো নাচতে থাকে, গাইতে থাকে। মূলতঃ ঘটনাটি একটু জটিল ও রহস্যময়। সাধারণ অর্থে এর উত্তর এরূপ দাঁড়ালেও গভীর দৃষ্টিতে অন্তর কম্পিউটার দিয়ে নিরীক্ষা করলে মূল জিনিসটির রহস্যের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু যাদের অন্তর দরজায় তালা দেওয়া, যারা হুকুম দাতা বা আদেশকারীকে পাপ-পুণ্যের কর্তা মনে করেন তাদের এই ধারণা নেহায়েত অমূলক ও ভ্রান্ত। আকাশের মেঘমালার বিচরণ, পেশাদার খুনীর হাতে অস্ত্র চালানোর ক্ষমতা এ সবি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই হয়। মহা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিধানের অধীন কিছু জিনিস আছে, যাদের স্বকীয় ইচ্ছা শক্তি অকার্যকর। যেমন পৃথিবী চাইলেই পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরতে পারবে না, তেমনি সূর্য চাইলেই তার ঘূর্ণন বন্ধ রাখতে পাবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা পরম সত্তার ইচ্ছাধীন। তাই তারা জবাবদিহির বাঁধন থেকে নৈতিক ভাবেই মুক্ত। অন্য দিকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসেবে মানুষের ইচ্ছার স্বকীয়তা আছে, কর্মের স্বাধীনতা আছে। যাদের ইচ্ছার ও কর্মের স্বাধীনতা আছে, তাদের বাস্তব জীবনের আচার-আচরণ তার নিজের ইচ্ছাধীন। এ ক্ষেত্রে সে নিজে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণা এবং কর্মের জন্য নৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ। তবু কথা থেকে যায়, মানুষ যতই স্বাধীন হউক না কেন তবু তার কাজের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। তবে ইচ্ছার স্বকীয়তার জন্য তাকেই ভাল মন্দের দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। সবক্ষেত্রেই যখন স্রষ্টার আদেশের প্রয়োজন হয়, তাই কিছু অবুঝ লোক প্রশ্ন তুলে ভালো মন্দ সবি যেহেতু

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত করা সম্ভব হয় না, সুতরাং যিনি নির্দেশকারী তিনিই পাপ-পুণ্যের কর্তা। তারা এর স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখায় যে কাজে পাপ হয় তা তো আল্লাহ ভাল করেই জানেন কিন্তু তিনি এ কাজের হুকুম না দিলেও তো পারেন অর্থাৎ তিনি নির্দেশ না দিলে তো কাজ করাই সম্ভব হতো না সুতরাং ওতে যে অন্যায় করে এর দোষ কোথায়? আসলে এ সব যুক্তি একটি চূড়ান্ত সত্যের ওপর একটি অতিক্ষীণ প্রলেপ মাত্র। এই প্রলেপ ঘষে দূর করে দিলে, দেখা যাবে মূল সত্যের আলো। আমাদের বিবেক ও ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতায় এই প্রলেপ কোন প্রতিবন্ধকই নয়। মানুষের যেমন ইচ্ছা আর কর্মের স্বকীয়তা আছে, তেমনি তার হৃদয় কুঠুরীতে বাস করে ভালো মন্দ ফারাক করার মতো বিবেক নামের এক প্রহরী। সে ভাল মন্দের ঘ্রাণ নিয়ে ইচ্ছা শক্তির স্বকীয়তার কাছে যুক্তি আপীল করে। বিবেক সকল ক্ষেত্রে ভাল কাজে সায় দেয়, মন্দ কাজের বিরোধিতা করে। কিন্তু ইচ্ছা শক্তি যদি বিবেকের যুক্তি না শুনে, তখন বিবেক নিরব হয়ে যায়। যখন বিবেক ইচ্ছার ব্যগ্রতার কাছে হার মানে তখন মনের স্পন্দনে দেহ যখন তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য উদ্যত হয়, সে মহূর্তে স্রষ্টার নির্দেশ আসে। এতে করে বিবেক কর্মের প্রতিফল ভোগ করার জন্য স্রষ্টার কাছে নালিশ করে। পক্ষান্তরে কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে মনের স্পন্দনে নিজ দেহ ও মনের ভেতর থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এটিই পাপ-পুণ্য বিধায় ব্যক্তি নিজেই এর কর্তা। এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যা সাধারণের বিবেকে উদয় হতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যখন কোন লোক মন্দ কাজ করার জন্য উদ্যত হয় বিবেককে অবদমিত করে তখন তো আল্লাহ ইচ্ছা করলে, তাদের ইচ্ছা শক্তিকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু সে মহূর্তে কেনই বা তিনি করেন না? আল্লাহ পারেন না, এমন কোন কাজ নেই। তিনি ইচ্ছার ব্যগ্রতা ও কর্মের স্বধীনতার জন্য ব্যক্তিকে কর্ম সম্পাদনের মহূর্তে নির্দেশ দেন। এখানে যেমন তাঁর হুকুম ব্যতীত কিছুই হয়না তেমনি তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে ইচ্ছার ব্যগ্রতাকে ও অবদমিত করেন। এ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনকারীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাছাড়া যে কর্মটা সম্পাদন করার জন্য ইচ্ছাকারী চেষ্টা করছে তা আসলেই তকদিরে উল্লেখ নেই। এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছাকারীর ইচ্ছার ব্যগ্রতা অবদমিত করা হয়।

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি কুলের প্রতিটি রেনু দানা আল্লাহর সৃষ্টি সত্তার অধীন বা তাঁর প্রকাশের আবরণ বা চিত্র। সমস্ত বিশ্বই তাঁর অনুশাসনশীল রাজ্য। আমাদের আত্মার প্রকাশের আরবণ এই জড় মূর্তিটিও মনের রাজ্য। মন একে শাসন করে। দেহ রাজ্যের কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তার আবেদন নিবেদনের সংকেত যদি মনের বারান্দায় এসে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, তখন মন তার সমস্যা সমাধান করার জন্য নির্দেশ দেয়। মূলতঃ দেহের সমস্যা দেহ সত্তা দিয়েই সমাধান করা হয়। এখানে মন শুধু নির্দেশ প্রদান করে। মন যদি দেহের প্রেরীত আবদার না শুনে, তাহলে মনের পক্ষে একাকি পুরা দেহ রাজ্য শাসন করা সম্ভব হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মশার আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য দেহের প্রাপ্ত ভাগ হতে যখন মনের কাছে সংকেত পাঠানো হয়, তখন মন বাধ্য হয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য হাতকে নির্দেশ দেয়। এই সংকেত বা নির্দেশ পেয়ে হাত দেহকে রক্ষা করতে তৎপর হয়। পরম সত্তার (আল্লাহর) পক্ষে এই বিশাল সৃষ্টির খবরাখবর রাখার মহা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ও তেমনি রহস্যময়। এর সংকেত এতো তড়িৎ আদান প্রদান হয়, যার সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

কোন ব্যক্তির ইচ্ছার ব্যগ্রতার সংকেত যখন পরম সত্তার কাছে পৌছে তখন তার কর্ম ভালো মন্দ যাই হক, সে ব্যক্তি স্রষ্টার কাছে থেকে নির্দেশ পাবেই। ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি থেকে যখন posative Impulse (ইতিবাচক সংকেত) বা Conduct of afferent Impulse প্রেরিত হয়, তখন স্রষ্টার পক্ষ থেকে Negative Impulse (নেতিবাচক সংকেত) বা Efferent Impulse আসে। এই নির্দেশ পেয়ে ব্যক্তি কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু এই Negative Impulse এর সংকেতে যখন ঘটনাপর্বটি সম্পন্ন হয় তখন তার সত্তা থেকেই একটি Negative dimenssion এর জাত পয়দা হয়। তাই Negative dimenssion এর সত্তা তৈরীর জন্য Posative Impulse যে তৈরী করে সে-ই দায়ী। তাই মানুষের কর্মফল নিজেরই অর্জিত। তবে আল্লাহর ব্যতীত কেউ কোন কাজ করতে পারে না।

www.pathagar.com

কথায় আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। অর্থাৎ যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া। রহিম ভাত খেয়েছে এর জন্য শক্তি কিন্তু করিম পাবে না। করিম বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়েছে তার ধাক্কা রহিমের গায়ে লাগবে না। বরঞ্চ যে কাজ করবে, সে এর প্রতিক্রিয়া টের পাবে। সে জন্য যে কর্ম করবে, সে ব্যক্তিই কর্মফলের জন্য দায়ী থাকবে। যেহেতু সমস্ত বস্তুর স্থিতি আল্লাহ হতেই উদ্ভব হয়েছে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি তাঁরই ক্ষমতাধীন। সে কারণে আল্লাহ নিজেই পরোক্ষভাবে সকল কর্মের আদেশ দাতা। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে কেউ কষ্ট ভোগ করলে, এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহর অনুভূতিতে কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। কারণ কষ্টবোধ হওয়া আল্লাহর গুণাবলীতে নেই। যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে সকল কিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন, সেহেতু শান্তি বা অশান্তি, সুস্থতা কিংবা অসুস্থতা, ধনী কিংবা দরিদ্র, এ সব তাঁর বেলায় বলা বা ভাবার কোন প্রশ্নই আসে না। এগুলোর প্রশ্ন শুধু একাধিক্যের বেলায়ই চলে। একক, অনাদি ও পরম সত্তার বেলায় তার কোনটিও প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে কোন মানুষ কষ্ট ভোগ করলে তাতে আল্লাহর কিছু যায়, আসে না। যেমন একজন মানুষ হিসেবে আমি কখনো কষ্ট পাবো না যতক্ষণ না আমার শারীরিক ও মানসিক সত্তার বহির্ভূত অন্য কোন সত্তা আমার অস্তিত্বের ওপর আঘাত না করে। এই সত্তা কোন জীবাণু কিংবা মানসিক ব্যথা, বেদনা ও হতে পারে। এসব সত্তা আমাদের দেহ ও মনের সত্তাধীন নয়, বলে এগুলোর দ্বারা আমরা কষ্ট পাই। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর সৃষ্টি সত্তার বহির্ভূত কিংবা তিনি তার মালিক নন। কষ্ট বোধ হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায় প্রযোজ্য। আমি ততক্ষণই সুস্থ থাকব, যতক্ষণ আমার মন ও শরীর পরজীবি কোন সত্তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আমার মন ও অস্তিত্বের (শরীরের) বাইরের কোন সত্তা যখন এর ওপর চড়ে বসবে, তখনি আমার অনুভূতিতে কষ্টবোধ হবে। কিন্তু এমন কোন সত্তা আছে কি, যা আল্লাহর রাজ্যের বাইরে থেকে এ সৃষ্টিতে ঢুকতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়।

কারণ সকল রাজ্যই আল্লাহর মালিকানাধীন। অতএব কষ্ট বোধ হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায়ই প্রযোজ্য। সৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্য আল্লাহর

www.pathagar.com

সৃষ্টিতে সকল কিছুই নিজ কর্মের জন্য দায়ী। কর্মের স্বাধীনতা আর ইচ্ছার স্বাধীনতা থেকেই যেহেতু কর্মফল তৈরী হয়, সে কারণে যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে তারা নিজেরাই পাপ-পুণ্যের কর্তা। বিশ্বের সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় afferent (অন্তর্মুখী) আর efferent (বহির্মুখী) বার্তাই সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলছে। মূলতঃ efferent বার্তাকে যদি Posative Impulse (ইতিবাচক সংকেত) আর afferent বার্তাকে Negative Impulse (নেতিবাচক সংকেত) মনে করি তাহলে এর আদান-প্রদানে যে নতুন সত্তা সৃষ্টি হয় সেটিই পরজগতের উপাদান। তাই এঁকে Negative dimenssion এর সত্তা বলতেই বা আপত্তি কিসের? কিন্ত Negative dimenssion হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন।

বস্তুর উপাদান ও NEGATIVE এর উৎস

কাঠ আর লোহা দিয়ে যেভাবে মিস্ত্রি আসবাবপত্র তৈরী করেন, তেমনি স্রষ্টা এ বিশ্বকে পয়দা করেননি। তিনি আসলেই কোন কার্পেন্টার গড না। একাধারে তিনি যেমন বস্তুর স্রষ্টা তেমনি তিনি ঐ বস্তুর উপদানেরও স্রষ্টা। এ জগতে কোন এক সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন তো বস্তু ছিলই না, সেই সাথে এর উপাদানও ছিল না। অর্থাৎ সে সময় পুরুষ (+) ও স্ত্রী (-) আদানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পাশাপাশি নৈব্যক্তিক উপাদানেরও জন্ম হয়নি। হয়ত ছিলও না নিউট্রিনো নামের কোন উপাদান। এমন এক অনস্তিত্বশীল জগতে কি করে কোথা হতে, এই বিশ্ব-জগতের বস্তুর উপাদান, বস্তুর অভ্যন্তরের Posative আদান ও Negative আদান এবং নৈব্যক্তিক সত্তার সৃষ্টি হলো? মূলতঃ তা জানতে হলে আমাদেরকে অনেক দূর অতীতের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের মাধ্যমে অতীতের অনেক কিছুই জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান কি করে দ্বৈত রূপ ও নৈব্যক্তিক (নিউট্রন) সত্তা সৃষ্টি হলো- এ সম্পর্কে কিছুই খবর রাখে না। আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য এই বিশ্বকে তরঙ্গের লীলা খেলা মনে করে। এই পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, সাগর, মহাসাগর এবং বিশ্বময় যত পদার্থ আছে- এ সবই হলো তরঙ্গের গাঁথুনিযুক্ত বড় রকমের

www.pathagar.com

বোঝা। অপরদিকে পদার্থের সূক্ষ্মাতীত কণা হলো- তর
আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটি সেটিও ঢেউ বা তরঙ্গের বোঝা। ৮.
দেহাবরণটিও জীবন্ত ঢেউ বা তরঙ্গের সারি, যা প্রাচীরের মতো সাজানো রয়েছে। এ সব ভাবলে অবাক হয়ে শির নত করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করার থাকে কি?

বস্তুর অভ্যন্তরে যে চারটি মৌল কণা রয়েছে, যা দিয়ে পদার্থ গঠিত হয়েছে, সেগুলো হলো- প্রোটন (+), নিউট্রন (নৈর্ব্যক্তিক), ইলেকট্রন (−) এবং নিউট্রিনো। এদের মাঝে কি করে নর-নারীর মতো সম্বন্ধ গড়ে ওঠল বিজ্ঞান কি তার জবাব দিতে পারবে? আমার ধারণা বিজ্ঞানের হাতে পরীক্ষিত কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু বস্তুর আদি উপাদান তরঙ্গ বা ঢেউ থেকে যদি সে রহস্যের অনুসন্ধান শুরু করা যায় তবে তরঙ্গের প্রকৃতি ও গতিপথ ধরে সে বিষয়ের যে তথ্য পাওয়া যাবে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রুহ আমাদের পরম সত্তা। এর রাজ্য হলো দেহ। আমাদের মনের অভিব্যক্তি এ দেহ রাজ্যের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। আবার দেহ কোষের প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকেও ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় সংকেত আসে মনের নিবীড় কুটিরে। আমাদের দেহের ভেতরে এই ঢেউ দু'টি উৎস থেকেই উৎপন্ন হয়। যেমন মন থেকে এবং অঙ্গের অগ্রভাগ থেকে। এদেরকে বহির্মুখী ও অন্তরমুখী তাড়না বলা চলে। এখানে ঢেউ বা তরঙ্গের প্রকৃতি ও গতিপথের উৎস ২টি। অর্থাৎ প্রয়োজন সাপেক্ষে ঢেউ আদান ও ঢেউ প্রদান হয়। মূলতঃ একি জিনিস বা সত্তা থেকে ঢেউ আদান ও প্রদান হতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দু'টি সত্তা। কিন্তু এভাবে ঢেউ আদান ও প্রদানের ফলে বহির সত্তা থেকে মূল সত্তার নির্দেশের মাধ্যমে নতুন এক জগতের উদ্ভব হবে। কার্যতঃ এটিই Negative জাতি। এ ধরণের জাত পরোক্ষ ভাবেই সৃষ্টি হয়। এখানে দেহের মূলসত্তাকে Posative হিসেবে এবং মনের নির্দেশকে নিউট্রন এর মতো আঘাতকারী (উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী) হিসেবে ধরলে, এর ফলে দেহের কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গের থেকে যে উদ্দীপক সত্তা সৃষ্টি হবে,

www.pathagar.com

সেটিই Negative জাত। পক্ষান্তরে এই গতির কার্যক্রম চালু থাকলে এর কিছু অংশ বর্জ্য হবেই। মহা সৃষ্টির এই বর্জ্য নিউট্রিনোর সাথেও সম্পর্কিত থাকতে পারে।

এই বিশাল জগৎ আল্লাহ তা'আলার রাজ্য। এ রাজ্য অনাদিকাল থেকে এভাবে সাজানো ছিল না। আদি অবস্থায় পরমস্থিতির জগতে কিছুই ছিল না তখন তিনি (আল্লাহ) 'কুন ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে সৃষ্টির অস্তিত্ব পয়দা করেন। তখনকার পরমস্থিতির জগৎটি অবস্থান্তর হলে তাতে জাগে পরম গতি। সেই স্তর হলো আল্লাহর নূর এর জগৎ। মহান আল্লাহ- ঐ পরিসরে প্রত্যক্ষভাবে আদম (আ) কেই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যক্ষভাবে যা সৃষ্টি করেন তাঁর বৈশিষ্ট্য পুরুষ জাতের সাথে সম্পর্কিত। তখন আদম (আ) ছিলেন সঙ্গীহীন। এতে তাঁর মনে নিসঙ্গতার আবেগ পয়দা হয়। সেই আবেগের প্রতিধ্বনি কালক্রমে রিলে হয় খোদার দরবারে। পরিশেষে আল্লাহ্ নির্দেশ পাঠান আদম (আ)-এর কাছে। এতে আদমের (আ) নিজের অস্তিত্ব থেকেই তার সমমনা যে সত্তা তৈরী হলো সে সঙ্গী ছিল Negative সত্তা। পক্ষান্তরে এই প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হতে মূল থেকে কিছু অংশ বিচ্চ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। যা সৃষ্টি জগতের বৈরী সত্তা। প্রসঙ্গতঃ এই বৈরী সত্তা সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য ছিল। এই বৈরী সত্তাকে মহা সৃষ্টির বর্জ্যও বলা চলে।

এ মহা বিশ্বের বিবর্তন প্রক্রিয়ার দু'টি জগত রয়েছে। যেমন একটি হলো আত্মিক জগত এবং দ্বিতীয়টি জড় জগত। মূলত দুটি জগত পৃথক পৃথক হলেও আত্মিক জগতের নিগূঢ় ব্যবস্থাপনার মাধ্যম থেকেই যে জড় জগতের আদি উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, নিম্নের ধারণা থেকে সে বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদান প্রোটন (+) ও ইলেকট্রন (−) পরস্পরকে নর-নারীর মতো আকর্ষণ করে এবং বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সাথে বাঁধা আছে নিউট্রন আবার সেই অস্তিত্বের সাথে বিপরীতমুখী আকর্ষণ নিয়ে লেগে আছে নিউট্রিনো। এসব দেখে অনুমান করা যায়, বস্তু জগতের উপাদান আত্মিক জগত থেকেই পয়দা হয়েছে। বস্তুর এই উপাদানগুলো তরঙ্গের প্যাকেট। খোদার 'কুন ফাইয়াকুন

www.pathagar.com

বলার মাঝে তরঙ্গ বা ঢেউ-এর মৌলিক রূপ থাকা স্বাভাবিক। তবে আল্লাহ যেহেতু মানুষের মতো কথা বলেন না, সেহেতু আমাদের মনের প্রেরণা যেভাবে দেহ রাজ্যে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়, হয়তো সেভাবেই খোদার ইচ্ছার প্রভাব সৃষ্টিতে প্রেরীত হয়। আবার সৃষ্টির ইচ্ছা খোদার কাছে তরঙ্গের আকারেই রিলে হয়। খোদার নির্দেশে সৃষ্টির ইচ্ছায় তার (সৃষ্টির) নিজের অংশ থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এর সাথেই Negative এর সম্পর্ক আছে। বস্তুর আদি উপাদান কোথাও মওজুদ ছিল না। সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের ক্ষমতা বলে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ বিশাল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর মধ্যে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হলো Posative সত্তা। এর উৎস থেকেই জগৎ বিকশিত হয়।

পাক কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন, অতপর তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মীনীকে এবং সেই দু'জন (আদম এবং হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" – (সূরা নেসা আয়াত-১)

আমরা এই মহা বিশ্বের ক্ষুদ্র এক গ্রহ পৃথিবীতে বাস করি। আমরা স্রষ্টার প্রতিনিধি। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এ বিশ্বের পরম স্রষ্টা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর বাণিজ্যশালায় আমরা স্থায়ী না হলেও সৃষ্টি হিসেবে আমাদের এখানে অপূর্ণতা নেই। এখানে আমরা কাজ করি মনের তাড়নায়। আমাদের মনের কামনার দানাগুলো দেহকে কর্মচঞ্চল করে। সৃষ্টি হিসেবে আমাদের মনের তাড়নায় নিজ দেহ সত্তা ও মনের গহিন কুঠুরি থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হবেই। এই সৃষ্টিও এক অর্থে Negative সত্তা। কারণ দুনিয়ায় সৃষ্টির অভাববোধ থেকে স্রষ্টার ইচ্ছায় যা কিছু সৃষ্টি হবে সেটিই পরোক্ষ সৃষ্টি। এই পরোক্ষ সৃষ্টির অদৃশ্য দানাগুলোকে Negative dimenssion- এর সত্তা বলতে বাঁধা কিসের ? আর পরকালকে Negative dimenssion এর জগৎ বলতে অসুবিধাই বা কি ? কারণ সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার নির্দেশে আমাদের অস্তিত্ব হতেই তো সেই Negative সত্তা তৈরী হয়ে উড়ে যাচ্ছে অনন্তের দিকে।

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল এক সত্তা থেকে অন্য সত্তা বা অধিক সত্তা তৈরী হওয়ার সন্দেহ একেবারে দূর করে দিয়েছে। এখন বিজ্ঞানের কাছে এটি কোন রহস্যের ব্যপার নয়। যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ইউরিনিয়ামের একটি আইসোটোপের নিউক্লিয়াসকে যদি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়; তবে নিউক্লিয়ার ফিশন বা বিভাজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে মূল নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে প্রায় সমান আকারের দু'টি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এভাবে বার বার আঘাত করতে থাকলে ফিশন শিকল বিক্রিয়ায় প্রচুর নিউক্লিয়ার শক্তি বের হয়ে আসে। এখানে আইসোটোপ হলো একই মৌলের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যার পরমাণুতে অবস্থিত নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। এই ফিশন শিকল বিক্রিয়ায় দেখা যায় নিউট্রনের আঘাতের ফলে একটি হতে দু'টি তার থেকে পর্যায়ক্রমে তারও অধিক নিউক্লিয়ার শক্তির জন্ম হয়। কি বিচিত্র এই কৌশল। এই কৌশলটি একটি বস্তু সত্তা থেকে আর একটি বস্তু সত্তা সৃষ্টির বিজ্ঞান সম্মত কানুন। এটি মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিবর্তন খেলা যে এভাবেই শুরু করেছেন তার কিছু প্রমাণ আমরা আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (সহধর্মিনী) সৃষ্টির মর্মকথা থেকে অনুধাবন করতে পারি। তবে এ কথা সত্য যে, মানুষের আবিষ্কার যেমন সুফল দিতে পারে, আবার সেটি প্রয়োগের ব্যতিক্রমের জন্য ক্ষতিও করতে পারে। পক্ষান্তরে খোদার সৃষ্টি মানুষ সৌভাগ্যবানও হতে পারে, আবার দুর্ভাগ্যবানও হতে পারে। মূলত ঃ পুরা বিষয়টির সুফল-কুফল নির্ভর করবে প্রয়োগ বা কর্মনীতির ওপর।

এ জগতের কোন কিছুর আকার ও গুণ চিরন্তন নয়। যখন কোন আকার বিলুপ্ত হয়ে অন্য আকারে প্রবেশ করে কিংবা তার অস্তিত্ব থেকে অন্য কোন সত্তা পয়দা হয়, তখন তার গঠন ও গুণের পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমাদের দৈহিক গঠনের সূক্ষ্ম আকার ভেদ করে যে সত্তা মনের ইঙ্গিতে খোদার ইচ্ছায় পয়দা হয়ে পালিয়ে যায় সেই পরোক্ষ বা Nagative সৃষ্টির উপাদান ও তার গুণাগুণ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক অজানা সত্তা। যার সাথে বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই। সেজন্যই পরকালীন জীবন ব্যবস্থার সাথে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

www.pathagar.com

এ পৃথিবীর যাত্রীগণ অজানা গন্তব্যের দিকে, নিজের ইচ্ছার বিপরীতে হলেও ছুটে চলেছে চাঁদ, সূর্যের মতো বিরামহীন ভাবে। গতির স্তব্ধতা আসলে চাঁদ সূর্যের যেমন মৃত্যু হবে, তেমনি পৃথিবীর যাত্রীদের জীবন চাকা অচল হলেই 'মৃত্যু দূত' জীবন প্রদীপ নিয়ে চলে যাবে। এ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ খোদার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ও সফল সৃষ্টি। এখানে মানব গঠনের পূর্ণতা আসলেও এ দুনিয়ায় মানুষের সময়ের পূর্ণতা নেই। মৃত্যুর জন্য মানুষ কোন বিষয়েই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সে কারণেই স্রষ্টার বিবর্তন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করে, এখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা বলা ঠিক নয়। বরং এক চিরস্থায়ী অস্তিত্বের দিকে ক্রমেই তা এগিয়ে যাচ্ছে। যে দিকে আমরা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছি, সেই জগতের রহস্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে, মানব সৃষ্টি রহস্য। এ রহস্য রাজ্যের মানুষ, খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে, ফিরে যাবে সেই স্থিতি রাজ্যে। সেই রাজ্যে সূর্য নেই, চাঁদ নেই, পদার্থ নেই, সন্তরণ নেই। অথচ এই পৃথিবীর কিংবা সৌর মন্ডলের কোন একটি কণাও স্থির নয়। পক্ষান্তরে গতির যাত্রা শুরু হয়েছে পরমস্থিতি থেকে। মূলতঃ গতির মধ্যে কারও কোন স্থায়িত্ব থাকে না। শুধু স্থিতির রহস্যের অন্তরালে বিশ্বের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আমাদের এ পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চ গতির ঢাক্না দিয়ে ঝুলানো। এটি একবার স্থির হলেই কোথায় যে হারিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারবে না। সকল কিছুর যখন দ্বৈত রূপ আছে, এ সূত্র থেকে এ কথা বিশ্বাস করা যায় গতির দ্বৈত রূপ স্থিতি জগৎ যে আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সৃষ্টির কর্ম প্রেরণা বা অভাববোধ থেকে খোদার নির্দেশে, তার নিজের থেকে যেটি সৃষ্টি হয়, সেটি যেহেতু Nagative সত্তা, সুতরাং Negative dimenssion-এর জগৎ থাকা ও স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

গতি ও স্থিতি জগৎ

স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়ার নাম গতি। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিশ্বে কোন কিছু পরম স্থিতি অবস্থায় নেই। সে জন্য পরমগতি লাভ করাও অসম্ভব। কারণ পরম স্থিতি থেকে যা অবস্থান্তর হয় এর নাম পরম গতি বলে, সেটি সম্ভব হয় না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যেগুলোকে স্থির মনে হয় সেটা তার আপেক্ষিক স্থিতি। কারণ এ বিশ্বে কোন জিনিস স্থির অবস্থায় নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি গাড়ী যখন আপেক্ষিক স্থিতি অবস্থা থেকে তার গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে, তখন তার প্রাথমিক অবস্থাটিকে আমরা স্থির মনে করি কিন্তু গতিপ্রাপ্ত অবস্থায়ও সেটি আজীবন চলতে থাকে না। কোন এক সময় সেটি তার গন্তব্যে পৌছে স্থির হয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থির অবস্থায় তার কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় সেটি না খেয়ে চলতে পারে না। এ সময় এর সবকিছুর মাঝে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রয়োজন হয় বিশ্রামের। সাথে সাথে রোগ বালাই বা যান্ত্রিক ত্রুটি এবং মৃত্যু সমস্যাও তার পিছু ধাওয়া করে। তাই গতির জগতটিতে সব সময় অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। এখন প্রশ্ন হলো, সকল গতিশীল বস্তু যখন স্থিরতা চায়, বিশ্রাম চায়, তাহলে এই গতির জগতটি কি কখনো স্থির হয়ে থমকে দাঁড়াবে? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর হলো গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব। একে কোন না কোন সময় স্থির হতেই হবে। তাছাড়া অন্য আর একটি যুক্তিতে বলা যায়, যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতিতে সকল কিছুর দ্বৈত রূপ আছে, সেদিক থেকে গতির দ্বৈত রূপ স্থির অবস্থা তো থাকবেই। তবে এই বিশ্ব যেদিন স্থির হয়ে যাবে, সেদিন তার বর্তমান কাঠামো ধ্বংস না হয়ে থাকতে পারবে না। পক্ষান্তরে এই বিশ্ব ধ্বংসের পর তার ভর-শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে ও ঘুমিয়ে যাবে না। একদিন হয়তো কালের উদ্দেশ্যেমুখী বিবর্তন ধাপে সেই নিষ্ক্রিয় সত্তাগুলো নতুন সাজে জেগে উঠবে। বিজ্ঞানীগণের ধারণা হলো, নিউট্রিনো নামক এক প্রকার কণার আকর্ষণের ফলে এই বিশ্বের সম্প্রসারণ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর এর আকর্ষণের ফলেই বিশ্ব আবার সংকোচিত হয়ে আদি মহা বিস্ফোরণের (Big Bang) পূর্বে বিশ্ব যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। এবং আবার মহা বিস্ফোরণের ফলে পুনরায় এই বিশ্ব নতুন ভাবে সৃষ্টি হবে।" —(আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন)

www.pathagar.com

বিশ্ব যদি স্থির হয়ে যায়, তখন সময়ের ঘন্টা অনড় হয়ে যাবে। সেটি জনমের জন্য তার ঘূর্ণন বন্ধ করে দিবে। এই অবস্থায় পর্দাথ বলে কিছুই থাকবে না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এমন এক বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সেই অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নীচের দিকে টেনে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছুই নেই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে।"—(বিশ্ব নবী)

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন— "সেদিন আমি আকাশ-মন্ডলীকে গুটাইয়া লইব যেরূপ কাগজের তাড়া গুটাইয়া লওয়া হয়, যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম তদ্রুপ ইহার পরেও করিব, ইহাই আমার ওয়াদা, নিশ্চয় আমি উহা সংঘটিত করিব।"

—(২১-১০৪)

"আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমি তো অসমর্থ নহি যে, আমি তোমাদের গঠন পরিবর্তিত করে দিব এবং তোমাদিগকে এমন ভাবে গঠন করব যা তোমরা অবগত নও। এবং অবশ্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি পরিজ্ঞাত আছ, তথাপি তোমরা কেন উপলব্ধি করতে পারছ না। —(৫৬ ঃ ৬০-৬২)

"গর্বিত কাফেরদের জন্যে ভয়ানক গর্হিত স্থান জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে অবস্থান করতে হবে চিরকাল" —(যুমার-৭১)

বিজ্ঞান ও কোরআনের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে বর্তমান বিশ্বের ধ্বংসের পর নতুন যে বিশ্ব ব্যবস্থা শুরু হবে, সেখানে গতি থাকবে না, থাকবে না কোন আবর্তনশীল চাঁদ, সূর্য নামের কোন উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্র। সেদিন গতিশীল আবর্তনের সময় কালের হিসাব অচল হয়ে যাবে। ক্ষয়, মৃত্যুশীল পদার্থ নামের কোন প্রকার জড় অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না। 'মৃত্যু দূতের' সেদিন মৃত্যু হয়ে যাবে। ফলে জীবন ফুরাবে না। সাত-আসমান জমিন পরিমাণ সরিষার পাহাড় হতে যদি হাজার বছর পর পর একটি করে সরিষা খাওয়া হয় তবু সেই খাদ্যের পাহাড় একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরও জীবন নদী বয়ে চলবে। সেখানের জীবনের কোন সীমানা নেই, শেষ নেই। এর কারণ একটিই তাহলো সে জগত হবে স্থির। প্রকৃতপক্ষে স্থিরতার মাঝে সময়

www.pathagar.com

যায় না, পদার্থ বলে কিছু থাকে না। সেই বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আমাদের গঠন কিরূপ হবে, সেই সম্পর্কে আমরা অবগত নই। এই অবস্থাটা এ জন্যই হবে যেহেতু এ বিশ্বে গতি আছে অপরদিকে তার বিপরীত রূপ স্থিতিশীলতার জন্যেই সেই পরিবর্তন দেখা দিবে।

এই বিশ্বে জোড়া রহস্যের মিলন তত্ত্বে অনেক জিনিসের এবং অনেক ঘটনার জোড়া বা প্রতিঘাত খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে গতির পাশাপাশি সময়ের চাকাও ঘুরছে কিন্তু এই বিশ্বে সময় যায় না এরূপ কোন স্থানের খবর আমাদের কাছে আপাতত নেই। তাছাড়া বস্তু জগতের পাশাপাশি তার বিপরীত বস্তুর দ্বৈত জগত (প্রতিবস্তুর) কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই জোড়া রহস্যের অসম্পূর্ণতার অন্তরালে পরকাল নামের ওপার জগতে বস্তুর দ্বৈত রূপের (প্রতিবস্তুর) কোন জগৎ আছে কি না, তাই এখন ভাবনার বিষয়? এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে জোড়া তত্ত্বের মূল রহস্য খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইংগিত

আগুন, মাটি, পানি, বায়ুর জগতে জোড়া সম্পর্কের মধুর মিলন প্রকৃতপক্ষে খুব বিচিত্র। এই জগতে গাছপালা পশু পাখির যেমন রয়েছে জোড়া তেমনি আলোর দানারও রয়েছে দ্বৈত রূপ। আছে ইলেকট্রন, প্রোটনের মাঝে স্বামী স্ত্রীর মতো সম্বন্ধ। আসলে পুরুষ ও নারী দ্বৈত বন্ধনের জগতের মধ্যে অঙ্গের গঠনের দিক থেকে নিয়ে স্বভাব, আচার আচরণের মাঝে একে অপর থেকে বৈরী দেখা গেলেও কেন জানি উভয়ের মাঝে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবার মাঝে যেন প্রেম প্রেম ভাব উঁকি দিয়ে থাকে। মিলনের বাসনায় যেন সবাই ব্যাকুল থাকে। যখন দুই বিপরাত লিঙ্গের মধুর মিলন হয় তখন প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ নিয়মে নতুনের আগমন ঘটে। সেই নতুনরা আবার একদিন ঘর বাঁধে, সংসার করে। তাদের মাঝেও সেই চক্র শুরু হয়। এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র জোড়া থাকলেও গতি আর বস্তুর কোন জোড়া নেই। এরা এতিমও নয় বিধবাও নয়। অর্থাৎ এখানে (পৃথিবীতে) গতির সাথে পাশাপাশি স্থিতি বিরাজ করে না। ঘর বাঁধে না। সেই রূপে বস্তুর সাথে প্রতিবস্তুও ঘর সংসার করে না, জুটি বাঁধে

www.pathagar.com

না। জোড়া সম্পর্কের মধুর মিলনে অনেক ক্ষেত্রে নতুনের আগমন হলেও গতিশীল কাঠামোর বস্তুর সাথে স্থিতিশীল জিনিসের দেখা হলে, এদের মধ্যে প্রলয় ঘটে, সংঘর্ষ বাঁধে। যেভাবে বস্তু কণার সাথে প্রতিবস্তুর কণার দেখা হলে একে অপরকে ধ্বংস করে তেমনি গতি আর স্থিতির সম্পর্কও তার অনুরূপ। সে কারণে এরা পাশাপাশি অবস্থান করে না, ঘর বাঁধে না। কিন্তু স্থিতিশীল প্রতিবস্তুর জগৎ বলতে আলাদা কোন জগৎ এর কথা কি কল্পনা করা যায়? পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কণার গর্ভ হতে অহরহ যে প্রতিবস্তুর কণা জন্ম হচ্ছে, সেই প্রতিবস্তু সূক্ষ্ম কণা যেহেতু এখানে নতুন করে ঘর বাঁধে না, সংসার করে না সেহেতু এরা যেখানেই থাক না কেন সেখানে তারা নতুন সংসার তৈরী করবে। যদি তাদের সংসার থাকে, বাড়ী-ঘর থাকে তাহলে এ বিশ্বের প্রকৃতির কোন কিছুই জোড়াহীন থাকবে না। আল্লাহ বলেন, "এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।" —(৫১ - ৪৯)

"এবং তিনি সমস্ত জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছেন।" —(৪৩-১২)

আদিকাল থেকে মানুষের জানা ছিল জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ জগতের সকল শাখার জোড়ার কথা। কিন্তু বস্তুরও যে জোড়া আছে সে কথা তাদের জানা ছিল না। এ যুগের মানুষ উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে বস্তুর জোড়া প্রতিবস্তুকে (Antimatter) খুঁজে পেয়েছে। আরও জানা গিয়েছে আলোর দ্বৈত রূপের কথা, আবিষ্কার হয়েছে একই ভর বিশিষ্ট প্রত্যেক বিদ্যুতবাহী কণার বিপরীত বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত দ্বৈত আদান সম্পর্কে। এতো কিছু জানার পর ও আমাদের জ্ঞান চূড়ান্ত সীমায় পৌছেছে কিনা, জানি না।

আল্লাহ বলেন, "তিনিই মহান, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মাটির উদ্ভিদ হতেও তাদের মানুষ হতেও এবং এরূপ জিনিস হতে যার সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই।"—(৩৬-৩৬)

এ পৃথিবীর আশে পাশে গতির জগতের পাশাপাশি স্থিতি জগৎ নেই অথবা বস্তু জগতের পাশাপাশি প্রতিবস্তু জগৎ নেই। যদি সৃষ্টির ভারসাম্যের কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে বস্তু ও গতির দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তু বা স্থিতি জগতের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে, এই বিশ্বের কোন কোন এলাকায় প্রতিবস্তু দ্বারা গঠিত নীহারিকা

www.pathagar.com

বিরাজ করছে। কারও কারও মতে বিশ্বের অন্যত্র Negative dimenssion এর জগৎ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক আলহাজ্ব গোলাম ছোবহান সাহেব সে গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বি. এস. সি পড়ার সময় আমাদের এক প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগকে Negative dimenssion সম্বন্ধে অনেক কথা বলতো, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমরা বিষয়টির বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। তাঁর মতে Negative dimenssion এর জগৎ আছে। তিনি লিখেছেন সে জগৎ প্রতিবস্তুর জগৎ কিনা তাই বা কে জানে?

আমরা যাকে প্রতিবস্তুর জগৎ কিংবা Negative dimenssion এর জগৎ বলছি সেটি ধর্মের পরিভাষায় পরকাল কিনা তাই বা কে জানে? পরকাল এমনি এক জগৎ যেখানে আবর্তন থাকবে না, চন্দ্র, সূর্য নামের কোন জ্যোতিষ্ক ঘুরবে না। আবর্তনের সময় সেখানে অচল থাকবে। অর্থাৎ গতির জগতের মতো স্থান কালের অধীন লোকাল টাইম সেখানে অচল থাকবে। তবু সেখানে সময় যাবে, সময় জ্ঞান থাকবে। সেই সময় খুব রহস্যময়, খুব জটিল। সেই সময় মাপার জন্য কোন কৃত্রিম ঘড়ির প্রয়োজন হবে না। একি সাথে হাজার হাজার মানুষ বাস করলেও সবার সময় জ্ঞান এক হবে না। সে জগৎ স্থিতির জগৎ বলেই সময়ের এই করুণ পরিণতি দেখা দিবে। সেখানে পদার্থ হয়ে যাবে অচল। আমাদের আশে পাশে যেহেতু বস্তুর দ্বৈত রূপের জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই বলা যায় সে জগৎ প্রতিবস্তুর জগৎ ও হতে পারে। বিজ্ঞান সম্মত প্রন্থায় জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইংগিত আমাদের ভবিষ্যত জগৎ সম্পর্কে অসীম ভাবনায় ফেলে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, ভাবতে ভাবতে ভাবনার কুটির হয়ে যায় শূন্য। তখন জ্ঞান রাজ্যে নিজেকে একটি চড়াই পাখির মতোও মনে হয় না। অথচ ভাবতে ভাবতে রাত্রি শেষ হয়ে যায়। আর ঘুমের বাড়িতে ধরে যায় আগুন। তখন সময়ের থাকে না কোন খেয়াল। তাই মনের ঘড়িতে সময়ের সংগা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। পরিশেষে এই জটিলতা থেকে প্রশ্নের উদয় হয়। তখন ভাবি সময়েরও কি দ্বৈত কিছু আছে?

www.pathagar.com

পরকালের সময় সম্পর্কে নতুন ভাবনা

সময় সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে প্রকৃতির অনেক আচার-আচরণ দ্বৈবের লীলা খেলাই ভাবতে হবে। কিন্তু দ্বৈব আচরণ যেমন বিজ্ঞান স্বীকৃতি দেয় না, তেমনি ধর্মও তার পাত্তা দেয় না। বিজ্ঞান প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ কোন আইন মানতে রাজি নয়। তার কথা হলো, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্যকারণ নীতির উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যদিকে ধর্ম দ্বৈব আচরণ বিশ্বাস না করলেও, তার এমন কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে যা আমাদের নিকট দ্বৈব আচরণের মতো মনে হয়। এরূপ মনে হওয়ার প্রধান কারণ হলো, স্থান-কাল ও বস্তু সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা। যেমন সময়ের ক্ষেত্রেই আমরা নির্ভরশীল পৃথিবী ও সূর্যের আবর্তনের উপর। অথচ মৃত্যুর পর কিংবা এই দুনিয়াতেই অনেক ক্ষেত্রে 'সময়' এ সবের ধার ধারে না। কবরের জীবন সম্পর্কে বলা আছে কারও সেখানকার জীবন হবে অগণিত লম্বা আবার কারও মনে হবে চোখের পলকের সমান। ধর্মের এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে দ্বৈব আচরণ মনে হলেও, সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা থেকে অবসর নিতে পারলে, সে সম্পর্কে নতুন এক বিশ্বাস জন্মাবে। এই বিশ্বাসের কাছে তখন আর দ্বৈবের কোন নীতি ঠাঁই পাবে না। তাই 'সময়' খুব রহস্যময়। একে যেমন ধরা যায় না, তেমনি বাঁধাও যায় না। এর না আছে হাত-পা, না আছে বস্তুগত কোন ডালাপালা, না আছে নিজস্ব কোন অস্তিত্ব। যেখানে স্থান নেই, বস্তু নেই, সেখানে সময় বলে কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে স্থান-কাল ও বস্তুর কোনটিরও পৃথক বা স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানে স্থান ও বস্তু আছে, সেখানে সময় থাকে। কিন্তু সময় চেপে বসে কোন ঘটনার মাথায়। সে জন্য একে ধরা যায় না, স্পর্শও করা যায় না। শুধু মাত্র স্থান ও বস্তুর মাঝ থেকে কোন ঘটনা বা নতুন কিছুর উৎপত্তির হিসেব মনে রেখে সময়ের ঘূর্ণন কল্পনা করা যায়। তাই সময়ের কোন বস্তুগত সংগা বা দাড়ি দেয়া যায় না। এই মহাবিশ্বের মানচিত্রে কোথাও 'সময়' বলে কোন একক বা স্বাধীন সত্তা জন্ম হয়নি। সেজন্য সময়কে সব সময় পরাধীন বা পরজীবি মনে হয়। যাকে পরজীবি মনে হয় সেটি পরনির্ভর বা ব্যক্তির ঘাড়েই চড়ে

www.pathagar.com

বসে। এ কারণে তার সম্পর্কে একক ভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাকে জানতে হলে তার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কেই জানতে হয়। তা না হলে এর আইন ও নীতি খুব সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন ঘুরে ফিরে পৃথিবী ও সূর্যের আবর্তনের মধ্যেই সময়ের সংগা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। অথচ সময়ের হিসাব কোথাও এক হয় না। স্থানের ব্যবধানে যেমন এর পার্থক্য দেখা দেয় তেমনি ব্যক্তিনির্ভর ঘটনার উপরও এর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন মানুষ যখন অপেক্ষায় বা বিপদ আপদের মাঝে থাকে তখন তার ক্ষেত্রে সময় খুব লম্বা মনে হয়। এ সব ক্ষেত্রে সময় একেবারে যেতেই চায় না। সেজন্য অনেকেই মনে মনে ভাবেন অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভালো অথবা বিপদ আপদের থেকে পরিত্রাণ উত্তম। অন্যদিকে আনন্দের সময়, সুখের সময়, বাসর রাতের সময় খুব দ্রুত চলে যায়। এ সব ক্ষেত্রে কেউ মৃত্যুর কামনা করে না। পরিত্রাণের আশা করে না। মনের ঘড়িতে উভয় ক্ষেত্রে সময় জ্ঞান ভিন্ন হলেও কৃত্রিম ঘড়িতে কিন্তু সবার জন্য সময় একই থাকে। বিপদগ্রসত ব্যক্তির জন্য যেমন সুখীর জন্যও তেমনি। তাই সময় রহস্যের এই জটিলতা ঘড়ির কাঁটা দেখে বুঝা বা ধরা সম্ভব নয়। এ সব ক্ষেত্রে মনের অতিন্দ্রিয় কুঠরীতে দেয়াল ঘড়ির ন্যায় সময় মাপার মতো কৃত্রিম কোন কিছু লাগানো থাকলে বুঝা যেত, সময় কত ব্যক্তি ও ঘটনা নির্ভর। এখানে যে বিষয়টি রহস্যময় তাহলো প্রত্যেক ঘটনার বেলায় সময়ের চাকা একি মাপে না ঘুরার ব্যাপারটি। ভয়ার্ত ব্যক্তির মনের ঘড়ির কাঁটা যতো দ্রুত ঘুরে, সেই তুলনায় আনন্দের আসরের যাত্রীর মনের ঘড়ির কাঁটা একেবারে স্থির থাকবে। সময়ের এতো তারতম্যের কথা শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তাহলে সময় কি জিনিস? এবং এর সংগাই বা কি হবে?

আমরা জানি সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর আবর্তনের ফলে রাত দিনের পালা বদল হয়। পৃথিবী তার অক্ষের উপর চব্বিশ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে। সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর গতি থেকে দুনিয়াতে সময়ের পরিমাপ স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ গতি ও দূরত্বের পাল্লা থেকে সময়ে উৎপত্তি ঠিক হলো। এই হিসাবকেও সময়ের এককে বন্দি করা যায় না। কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্য যদি নিজেদের স্ব-স্ব গতি বন্ধ করে দেয় তবে এক্ষেত্রে সময়ের চাকা ঘুরবে না, রাত দিনের পালা বদল হবে না। এই সূত্র ধরে গতি থেকে ঘটনা ও

www.pathagar.com

সময়ের উৎপত্তির জাগরণ শুরু হয়েছে এ কথা ভাবা যায়। পৃথিবীর আবর্তন কালকে চব্বিশ ঘন্টার সীমানা দিয়ে আমরা কৃত্রিম ঘড়ির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। কিন্তু প্রকৃত সময় নির্ধারণ করতে হলে একটি স্থির স্তম্ভের প্রয়োজন। কিন্তু মহাবিশ্বের মানচিত্রে এমন কোন স্থির স্তম্ভ নেই বলে সময়ের পরিচিতি সর্বত্রই 'লোকাল' ভাবে স্থির করতে হয়। কিন্তু যে সময় গত হয়ে যায় তার যেহেতু কোন বস্তুগত কাঠামো থাকে না, তাই একে ধরে রাখা বা মনে রাখা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়। সেজন্য আমরা এই কঠিন জিনিসকে মনে রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ঘটনাকে করেছি সাক্ষী। যেমন যীশু খৃস্টের জন্মের ইতিহাস থেকে গণনা করা শুরু হয়েছে খৃস্টাব্দ সনের এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর হিজরতের ঘটনা থেকে শুরু করা হয়েছে হিজরী সনের। কালের চাকার স্রোতকে এ ভাবে বেঁধে রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনাকে স্থির ভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে সম্মুখের সকল ঘটনাকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। এরূপ না করলে সকল ঘটনাই একদিন আমাদের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু এই হিসেব পৃথিবীর বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথাই মনে করে দেয়। অথচ অন্য গ্রহের বেলায় সে হিসেব একেবারেই অচল। যেমন আজ হয়ত আমরা রাসূলের (সা) আগমনকে ১৪০০ বছর আগের রাখা ভাবি কিন্তু এমনও গ্রহ আছে যেখানে হয়ত রাসূলের আগমন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সেই গ্রহে আমরা থাকলে তাই মনে করতাম। এই তারতম্য হওয়ার কারণ হলো রাসূল (সা) যে সময় পৃথিবীতে ছিলেন তখনকার আলোকের প্রতিবিম্বগুলো হয়ত এতো দিনে সেই গ্রহে পৌছবে। অন্যদিকে যে গ্রহ সূর্য হতে অনেক দূরে এবং যার আবর্তন কাল পৃথিবীর সমান নয়, সেই গ্রহে রাত-দিনের পালা বদল পৃথিবীর আবর্তনের পরিমাপ মতো হয় না। এর জন্য সে সব ক্ষেত্রে বছরের হিসাব পৃথিবীর সমান তালে ঘুরবে না। তাই গতির ক্ষেত্রেও মহা বিশ্বে কোথাও স্ট্যান্ডার্ড সময় নেই। সময় সর্বত্রই স্থান-কাল ও ঘটনার সাথে একাকার হয়ে মিলে মিশে বাস করে। তাই আইনস্টাইন সময়কে ধরেছেন আপেক্ষিক।

সময় যেমন কখনো একা চলতে পারে না, তাকে যেহেতু ঘটনার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, তাই ঘটনার যেমন রয়েছে ভিন্নতা তেমনি সময়ের

www.pathagar.com

ও রয়েছে ভিন্ন পরিমাপ। আমরা ঘড়ি দিয়ে যে সময় নির্ণয় করি, এই সময় পৃথিবীর গতি বা আবর্তনের পরিমাপ। জীবনের সাথে সময়ের এই সম্পর্ক ও সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। তাই গতির পরিমাপের উপর সময়ের মাপকে আসল মাপকাটি ধরা যায় না। যেহেতু গতির ক্ষেত্রে দূরত্বের পাল্লা চলে সেহেতু এই পরিমাপ সবার ক্ষেত্রে এক হয় না। অপরদিকে গতি বেশী হলে সময় যেমন কম লাগবে তেমনি দূরত্বও খাটো মনে হবে। তাই পৃথিবীর আবর্তন ও স্থানের সাথে সময় সম্পর্কশীল হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বেলায় সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হয়। কখনো আবার বড় মনে হয়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়, কেউ যদি দ্রুতগামী কোন যান্ত্রিক গতিযানে চড়ে পথ চলে এবং তার চলার অবস্থাটি যদি আনন্দ ও স্বস্তির হয় তাহলে তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে। কিন্তু এই চলার পথ যদি কারও বিপদের হয়, তবে তার বেলায় সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে না। অর্থাৎ কাউকে যদি চলন্ত গাড়ীতে পায়খানায় ধরে বসে এবং সে গাড়ীতে যদি পায়খানা করার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে না। কিংবা কেউ যদি গাড়ীর দরজায় ঝুলে থাকে এবং তার যদি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রেও তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে না। এদের দু'জনের বেলায় অল্প সময় অল্প দূরত্ব অনেক বড় মনে হবে। অপরদিকে যে ভিতরে আরামে বসে গল্প গুজব করবে, তার কাছে কিন্তু সময় ও দূরত্বের কোন হিসেব থাকবে না। আবার বিপদ আপদ ছাড়াও উড়োজাহাজের যাত্রীর ও রিক্সার যাত্রীর সময় জ্ঞান এক রকম মনে হবে না। গতির তারতম্যের জন্য সময় জ্ঞান ভিন্ন হয় বিধায় গতির শিকল দিয়েও মনের ঘড়িতে সময়কে এক করে বাঁধা যায় না। অপরদিকে যারা ঘুমে বা বেঁহুশ অবস্থায় থাকে তাদেরও সময় জ্ঞান থাকে না। কেউ যদি এক ঘুমে কিংবা বেঁহুশ অবস্থায় এক মাসও পড়ে থাকে, তবে সে বিগত সময়ের কোন উদাহরণ দিতে পারবে না। বরঞ্চ ঘুম থেকে উঠে এক মাসকেই এক রাতের সমান মনে করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ঘুমন্ত অবস্থায় ভয়ার্ত স্বপ্নের মুখোমুখি হয়, তবে তার সময় খুব প্রখর থাকবে। আল কোরআনে উল্লেখিত আসহাবে কাহাফ-এর ঘুমন্ত যুবকগণের দৃষ্টান্ত এমনি এক জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁরা প্রতিক্রিয়াহীন ঘুমের

www.pathagar.com

মধ্যে শত শত বৎসর পড়ে থাকলেও তাঁদের কোন সময় জ্ঞান ছিল না। অপরদিকে বলা হয় কাল হাশরের মাঠের একটি দিন কারও মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান আবার কারও মনে হবে চোখের পলকের সমান। প্রকৃত বাস্তবতায় আবর্তনের সময়সীমা যদি 'সময়ের' মাপকাঠি হতো তাহলে এর এতো ভিন্নতা কেন? কেনই বা এতো অসঙ্গতি? সেজন্য প্রশ্ন হলো সময়ের একক বলতে আমরা কাকে স্থির করব?

গতি আমাদের মনের ঘড়িতে সময়ের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি দিতে না পারলেও গতি যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে সময় ও দূরত্বকে খাটো করে দেয় তেমনি সে বস্তুর আকারকেও ধরে রাখে। যেমন এই মহা বিশ্বের বিশাল শূন্যতার মাঝে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সহ আকাশের মাতৃকোলে তারাদের যে মেলা বসে, তাদের কেউ কিন্তু স্থির নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন গতিতে মহাশূন্যে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে। অথচ এদের যদি কারও কোন গতি না থাকে, তাহলে এদের খুঁজে পাওয়াই হবে দায়। কারণ শূন্যের মাঝে কোথাও তো এদেরকে খুটি পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই গতি আছে বলেই এরা বেঁচে আছে, আছে এদের সুন্দর কাঠামো ও আকার আকৃতি। নেই শুধু স্থায়ীত্ব। অহরহ চলছে তার মাঝে জন্ম মৃত্যুর খেলা। যখন এই মহা বিশ্বের গতির চাকা স্তব্ধ হয়ে যাবে তখন আকাশের মাতৃকোল থেকে একে একে সবাই মৃত্যুর কোলে ধ্বসে পড়বে। ইসরাফীল (আ) এর শিঙ্গার প্রচন্ড ধ্বনিতে সব কিছু রেণু রেণু হয়ে যাবে। তারপর এমন একদিন আসবে যেখানে সূর্য থাকবে না, চন্দ্র থাকবে না, পৃথিবী থাকবে না, কিংবা কোন গতিশীল বস্তুও থাকবে না। সেই জগৎ তো সৌর জগতের মতো কোন ভেগা নামক নক্ষত্রের পিছনে ছুটে চলবে না, কেউ কোথাও সন্তরণ করবে না। তবে কি সময় চির দিনের জন্য স্থির হয়ে যাবে? এখন প্রশ্ন হলো যদি সময় বলতে কিছুই না থাকবে তাহলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও সময়ের কথা উল্লেখ করা হলো কেন? যেমন দোযখবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, একবার দোযখীকে সেখানে সাপে দংশন করলে তার যন্ত্রণা শত শত বৎসর পর্যন্ত চলবে। আবার বেহেস্তবাসীর একবার আনন্দের মিলনে (যৌন মিলনে) শত শত বছর চলে গেলেও তার কাছে সময়ের কোন পরিমাপই থাকবে না। মূলতঃ পরপারের

www.pathagar.com

গতির সম্পর্কের আবর্তনের 'সময়' চিরদিনের জন্য অচল হয়ে গেলেও সেখানে সময়ের চাকা ঘুরবে। বরং সময় নামের সেই জিনিসটি হবে খুব কঠিন ও বেদনাদায়ক। সেখানে 'সময়' মাপার জন্য কোন কৃত্রিম ঘড়ি প্রয়োজন হবে না। হবে না কোন স্থির স্তম্ভের। যার যার মনন রাজ্যে এক জটিল জিনিস 'সময়' রাশিটিকে উঠানামা করবে। আজকে এপার জগতে গতি আর আবর্তনের সময়ের পাশাপাশি মনের ঘড়িতে য়ে সময় উঠানামা করে বরং তার সাথে সে সময়ের যথার্থ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিন আমাদের মনের ঘড়িতে অনুভূতি নামক যে কাঁটাটি থাকবে এর মাঝে যদি কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়াশীল ছাপ লাগে তবেই সেটি দেয়াল ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে থাকবে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার ছাপ যত তীব্র হবে সময় জ্ঞানও ততো লম্বা মনে হবে। কিন্তু চলমান ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়ার দাগ যদি সেই ঘড়ির কাঁটাতে না পড়ে তবে এ কি সাথে হাজার হাজার বছর চলে গেলেও সেই কাঁটা থাকবে স্থির। সেজন্য প্রতিক্রিয়াহীন (যন্ত্রণাময়) ঘটনার কোন সময় জ্ঞান থাকবে না। তাই সময় হলো, মনের খেয়ালে বা মনের গহীন অরণ্যে চড়ে বসা কোন বিষাদময় ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ঘর্ষণের ছাপ বা ফল। কিন্তু সুখের আসরে মনের কুঠুরীতে যে শক্তি সময় জ্ঞান তৈরী করবে, সেই চাকাটি থাকবে স্থির। সেজন্য কারও বেলায় সময় হবে লম্বা ও জটিল। তাই যারা যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে, তাদের আফসোস হবে। তাদের মনে সময় শেষ হওয়ার জন্য মৃত্যুর প্রার্থনা জাগবে। তবু মৃত্যু হবে না, সময়ও যাবে না। মূলতঃ সময়ের এই রহস্যময় সংগা আমাদেরকে সৃষ্টি সম্পর্কে এক অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়। যার মাঝে পাওয়া যায় স্রষ্টাকে বিশ্বাসের নতুন তত্ত্ব।

আদিতে যখন এই বিশ্বে ভর-শক্তি ও সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তখন পরমস্থিতি অবস্থায় সর্বত্র ছিল শূন্য সময়। সেই শূন্য সময়ের কোন Value নেই, মূল্য নেই। যখন থেকে সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন থেকেই সময়ের চাকা ঘূরতে শুরু করেছে। স্রষ্টা নিজকে প্রকাশ করার জন্যই এই সুন্দর, অনুপম, অপার, অসীম, জগতের ভিত্তি রচনা করেছেন। এই বিশ্বের সকল কিছুর উপাদান ও তার জড় গঠন স্রষ্টার মনের খেয়ালের বীজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এরজন্য বাইর থেকে কোন প্রকার মালমশলা

www.pathagar.com

আনার প্রয়োজন পড়েনি, এই জগৎ স্রষ্টার অভিব্যক্তিরই ফল। তাই সময়ের অস্তিত্ব আত্মা ও বস্তু সত্তার সাথে মিশে আছে। কিন্তু চেষ্টা ও সাধনার মার্ধ্যমে এই সময়ের পাল্লাকে অতিক্রম করতে না পারলে পরজীবনে কোন নিস্তার পাওয়া যাবে না। সেদিন জাহান্নামের নিশি জগতে যন্ত্রণাশীল প্রতিক্রিয়ার দানা হয়ে সময়ের অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে। অতএব মনের খেয়ালে প্রতিক্রিয়ার শেষ ভাবনা আমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে কঠিন চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই জাহান্নামের আযাব আর অসৎ কর্মের প্রতিক্রিয়া খুব কাছাকাছি বিষয় মনে হয়।

জাহান্নামের আযাব

টক জাতীয় খাবার খেতে দেখলে জিহবায় যেমন পানি আসে তেমনি 'আযাব' শব্দ শুনলে মনে কেমন জানি ভয় হয়। আসলে জাহান্নাম নামের কোন জগৎ যদি না থাকে, তাহলে 'আযাব'রা ফেরারী আসামীর মতো সূরে সূরে কাউকে (অসৎ) শাস্তি দেয়ার জন্য খুঁজতে যাবে না। আযাবের জন্য যেমন থাকতে হবে তার উপকরণ তেমনি এর জন্য থাকতে হবে পৃথক জেলখানা। দুনিয়ার জীবনে কোন প্রতাপশালী শাসক কিংবা কোন ধনবান ব্যক্তি যদি আজীবন অন্যায় অত্যাচার আর অশ্লীলতায় লিপ্ত থেকে ও মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়, তাদের বেলায় অন্যত্র যদি দুনিয়ার কর্মের প্রতিফল ভোগ করার কোন ব্যবস্থাই না থাকে, তবে এক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধানে কেমন জানি শূন্যতা মনে হয়। দুনিয়াতে এমন নজির বহু আছে, যার অন্যায়ের সাগরে সাঁতার কেটেও কোন রূপ আযাব ভূগতে হয়নি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরূপ শূন্যতা অসঙ্গতির ব্যাপার। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কর্ম ও শক্তির বিনাশ আছে মনে হয়। কিন্তু এই ধারণার অবসান অনেক আগেই শক্তির নিত্যতা সূত্র এবং নিউটনের গতির ২য় সূত্র করে দিয়েছে। নিউটনের কথা হলো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু আজীবন অন্যায় করেও যে সব লোক দুনিয়ায় কর্মের কোন প্রতিফল ভোগ করেনি তার বেলায় তো এ যুক্তি টিকে না। সুতরাং প্রকৃতির বিধান মতে এ ধারণাই পাওয়া যায়, প্রতিফলের জগৎ বলতে বিশ্বের অন্যত্র কোথাও কোন জগৎ আছে, তার কাজ এই দুনিয়ার

www.pathagar.com

প্রকৃতির আইনের পতন হলে শুরু হবে। অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টি কৌশলের আইন কানুনের মাঝে এমন এক নীতি বেঁধে দিয়েছেন যা থেকে কর্মের সাথে সাথেই তার প্রতিফলের সত্তা তৈরী হয়ে যায় এবং এই সত্তা দিয়ে যে জগৎ তৈরী হবে তার নামই পরজগৎ। মূলতঃ সেই জগৎ দুটি স্তরে বিভক্ত। তার একটি স্তর জাহান্নাম এবং অপরটি জান্নাত। সেই জাহান্নাম নামের জেলখানায় থাকবে কঠিন কঠিন আযাবের উপাদান। এই উপাদান দুনিয়াবাসীর কর্মের নিগুঢ় রহস্যময় দানা দিয়ে তৈরী করা। সেই স্থানে থাকবে কাফের, বেঈমান, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজকসহ অন্যান্য যাদের নেকের পরিমাণ গুনাহ থেকে কম হবে তারাই। সেখানের বাসিন্দাদের মধ্যে কারও যাবৎ জীবনের সাজা হবে আবার কেউ কেউ নির্ধারিত দিন পর্যন্ত আযাব ভোগ করে সেখান থেকে মুক্তি পাবে। সেখানের বাসিন্দাদের গায়ের রং হবে আলকাতার রংগের মতো কৃষ্ণ কায়া বর্ণের। বিভিন্ন রকম আযাবের প্রাণীর সাথে তারা জীবন কাটাবে। এসব প্রাণী তাদেরকে কষ্ট দিবে, অশান্তি দিবে। এরা নিজের অবাধ্য সন্তানের মতো জ্বালাতন করবে। এই উপাদান অন্য কোথাও হতে আমদানী করতে হবে না, তৈরী করে আনতে হবে না। নিজেদের উদর হতেই এরা দুনিয়া থেকে রপ্তানী হয়েছিল। সেদিন কেউ কারও কষ্ট দূর করতে হাত বাড়াবে না, কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাবে না, বরং একে অপরের থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা কড়া গন্ডায় হিসেব করে নিয়ে যাবে। কারও উপর অন্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে না। দুনিয়ায় একসময় 'মৃত্যুদূত' পৃথিবীর জীবন থেকে কষ্টের পরিত্রাণ করে দিলেও, সেখানে মৃত্যু হবে না, কষ্টও যাবে না। তৎস্থানে কেউ মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করলেও মৃত্যুর পেয়ালা সে পাবে না।

তাই জাহান্নাম সে তো ভীষণ আযাবের স্থান। সেদিন কর্মফলের সত্তার দ্বারা অনন্ত অশান্তি, দুনিয়ার জীবনের ভুলের অনুশোচনা, স্রষ্টাকে না চেনার জ্বালা, ব্যর্থ প্রেমিকের মতো বিরহের অগ্নি হৃদয়কে করবে জর্জরিত। চোখ বুঝে নিজে নিজেই কলিজা ছিড়ে প্রাণকে করতে চাইবে জবেহ, কিন্তু প্রাণকে সে ধরতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না। এতে নিজের উপর নিজের প্রতিহিংসা বেড়ে যাবে। তাকে ধরতে না পেরে সে ক্রোধের অনলে নিজেই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তবু বৃষ্টির ছোঁয়া পাবে না। গায়ে শান্তির

www.pathagar.com

গন্ধ লাগবে না। এর নামই দোযখ বা জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাক কোরআনে দোযখ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

নিম্নে তার কিছু মাত্র উল্লেখ করা হলো–

"কাফেরগণ অনন্তকাল দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, তা কখনো শেষ হবে না। এবং বিন্দুমাত্র কম করা হবে না, সুখ শান্তির লেশমাত্র তাদের অবশিষ্ট থাকবে না। –(সূরা যুখরুফ - ৭০)

"তাদের প্রতি আযাবের কিছুমাত্রও লাঘব করা হবে না; এবং তারা সেখানে কারও নিকট থেকে কিছু মাত্র সাহায্য পাবে না। –(সূরা বাকারাহ- ৮৬)

"কাফেরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্ধারিত। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে। আর না তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে। তারা আর্তনাদ করে বলবে প্রভু আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিন। আমরা পূর্বের মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এখন থেকে ভালো কাজ করব।

আল্লাহ তাদেরকে বলবেন- আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলাম না, যাতে করে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতে? (তা যখন করনি) তখন এ শাস্তি ভোগ কর। যালেমদের আজ কোনই সাহায্যকারী নেই।" –(ফাতির ৩১-৩৭)

"যেদিন এ কাফেরদেরকে সে আগুনের মুখে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদেরকে বলা হবে; তোমাদের নিজেদের অংশের নিয়ামতসমূহ তোমরা দুনিয়ার জীবনেই শেষ করেছ এবং তার স্বাদও উপভোগ করেছ। দুনিয়াতে তোমাদের কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা যে সব অহংকার করছিলে এবং যে সব নাফরমানী করছিলে তার প্রতিফল হিসাবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাময় আযাব দেয়া হবে।" –(আহকাফ– ঃ২০)

"এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি– যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐ সব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখী ও সচ্ছল। তাদের সুখী ও সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সেসব পাপ কাজ তারা করতো জিদ হঠকারিতা করে। তারা বলতো মৃত্যুর পর তো আমরা কংকালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির মাঝে, তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ দাদাকেও কি এভাবে জীবিত করা হবে?

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময়-কালও নির্ধারিত আছে।"

অতপর আল্লাহ বলেন, হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল, তোমরা জাহান্নামের যক্কুম 'বৃক্ষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি।" –(ওয়াকেয়া - ৪২- ৫৫)

হাদীসে কুদসীর বর্ণনায় আছে-

"জান্নাতের অধিবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোযখের অধিবাসীগণ দোযখে প্রবেশ করবে। অতপর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকেও বের করে নিয়ে আস (দোযখ হতে)। তৎপর তাদিগকে সেখান হতে বের করে আনা হবে। তারা তখন কৃষ্ণকায় হয়ে যাবে। তখন তা'দিগকে আবেহায়াতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এইভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে যেভাবে জলার ধারে বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখনি যে, তা কেমন হলুদ বর্ণ হয়ে গজিয়ে উঠে।" শায়খাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এই হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

"কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এরূপভাবে উপস্থিত করা হবে যেন একটা ভেড়ার বাচ্চা। তারপর তাকে আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান করা হবে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন "আমি তোমাকে জীবিকা দান করেছিলাম। তোমার প্রতি কৃপাবর্ষণ করেছিলাম এবং তোমাকে নিয়ামত দান করেছিলাম। তুমি তার পরিবর্তে কি কাজ করেছ? " সে বলবে "আমি তা জমা করেছিলাম, তা বৃদ্ধি করেছিলাম; আর আমার যা ছিল তার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আপনি আবার আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি তা নিয়ে আসতে পারি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমাকে তা দেখাও যা তুমি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে। সে পুনরায় বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি তা জমা করেছিলাম, তা বৃদ্ধি করেছিলাম, তৎপর আমার যা ছিল তার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তা নিয়ে আসতে পারি।" অতপর যখন স্থির হবে

www.pathagar.com

যে, বান্দা ভাল কিছু অগ্রিম পাঠায় নাই, তখন তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে।" তিরমিযী এটি আনাস (রা)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। (হাদীসে কুদসীর বর্ণনা)

আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন আমাদের পক্ষে দুনিয়ার জীবদ্দশায় জাহান্নামের আযাবের গন্ধ পাওয়া ও তার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। কিংবা হিমালয় পর্বতের চূড়ায় উঠেও তা দেখা যাবে না। বর্তমান বস্তু জগতের আইন-কানুন রদ হয়ে গেলে সেই গুপ্ত জগতের সকল জিনিস আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিপুণভাবে দোযখের আযাব সম্পর্কের পাক কোরআনে বর্ণনা করেছেন। সেই বাণীতে রয়েছে দুনিয়া আখেরাতের সম্পর্কে কথা। না দেখে এসব বিশ্বাস করা এবং সে মতে আমল করা ঈমানের অংশ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা দেখে আসা সম্ভব না হলেও মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য যিনি সত্যের মাপকাঠি, তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে মে'রাজ রজনীতে স্বচক্ষে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই মহা মানব আমাদের আলোর পথের দিশারী, অন্ধকার নিশি দ্বীপের জগতের সামনে পরশ মণির আলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি দূত। মানব জাতির উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদের পরম বন্ধু। বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি আমাদের সামনে দোযখের শারীরিক আযাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। দোযখের অগ্নি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এর উত্তাপ পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক তাপযুক্ত। এর এক বিন্দু যদি সূর্যোদয়ের স্থানে স্থাপন করা হয় তবে তার উত্তাপে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে ঐ অগ্নিকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার ফলে তা লাল বর্ণ ধারণ করেছে, তৎপর পুনরায় এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার ফলে তা সাদা হয়েছে। তারপর আরও এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করার পর ঘোর কালো বর্ণ ধারণ করেছে এবং সে অবস্থায়ই আছে। তাই দোযখের মধ্যে ভীষণ অন্ধকার বিরাজিত। দুনিয়ার অগ্নির স্বভাব সেটি পাপী ও নিষ্পাপ সকলকেই ভস্ম করে থাকে। সেদিক থেকে দোযখের অগ্নির বিশেষত্ব হলো, তাতে পাপীগণ জ্বলবে কিন্তু একেবারে ভস্ম হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আর তা নিষ্পাপ ব্যক্তির কোন ক্ষতি

www.pathagar.com

করবে না। দুনিয়ার অগ্নিতে পানি ঢেলে দিলে আগুন যেমন সম্পূর্ণ নিভে যায় কিন্তু দোযখের অগ্নিকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও নিভে যাবে না, বরং পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাসূল (সা) আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার শিকল দিয়ে দোযখকে বেঁধে রাখা হবে। এর প্রত্যেকটি শিকল ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে রাখবে। এতদসত্ত্বেও দোযখ দোযখবাসীকে টেনে আনার জন্য সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। ফেরেশ্তাগণ যদি সেই সময় তাদের হস্তস্থিত শিকল একটু শিথিল করে দেয়, তবে দোযখ তাদের হাত হতে ছুটে গিয়ে পাপী, পুণ্যবান নির্বিশেষে হাশরের মাঠের সকলকেই স্বীয় উদরে টেনে নিবে। এতে অবশ্য পুণ্যবানদের কোন ক্ষতি হবে না।

দোযখে উষ্ট্রের ন্যায় পদার্থ বিশেষ অতিশয় বৃহৎ বৃহৎ অগণিত সর্প রয়েছে। এগুলোর বিষ এত তীব্র যে তা একবার দংশন করলে ৭০ বৎসর পর্যন্ত তার জ্বালা বিদ্যমান থাকবে। দোযখের সর্পের বৈশিষ্ট্য হলো, এদের বিষের যন্ত্রণা দুনিয়ার সর্পের ৭০ গুণ অধিক হবে। অথচ এতে কারও মৃত্যু হবে না। দোযখে হৃষ্ট-পুষ্ট খচ্চরের ন্যায় অসংখ্য বিচ্ছু আছে। সেগুলো সর্বদা দোযখীদিগকে দংশন করবে। তারা একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার যন্ত্রণা অব্যাহত থাকবে। অথচ প্রতি মুহূর্তেই তারা দোযখীদিগকে দংশন করবে। এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআন মাজীদে বলেছেন, "আমি তাদিগকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব তারা যে সকল অসৎ কর্মে লিপ্ত ছিল তা তাদের সেইসব কৃত কার্যের ফল।" হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, দোযখীদের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ও ভীষণ কালো হবে। দোযখীদের কাকেও যদি দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো তবে তাদের কুৎসিত ও বীভৎস চেহারা দেখে এবং তাদের শরীরের দুর্গন্ধে দুনিয়ার মানুষ মরে যেতো।

এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআন মাজীদের সূরা মুমিনুনে ঘোষণা করেছেন- "দোযখের অগ্নি দোযখীদের চেহারাকে সম্পূর্ণ রূপে তেথলিয়ে বীভৎস্য ও মুখমন্ডলকে বিগরিয়ে দিবে।" বলা হয় দোযখবাসীদের পিপাসা হলে বিষধর সাপ ও বিচ্ছুর বিষে পরিপূর্ণ এক পেয়ালা রক্ত ও পুঁজ এনে তাকে পান করতে দেয়া হবে। দোযখবাসীগ

www.pathagar.com

আগ্রহ ভরে পান করা মাত্রই- তাদের শরীরের চামড়া মাংস গলে গলে পুড়তে থাকবে। এমনকি হাড়ের জোড়াগুলো পর্যন্ত আলগা হয়ে যাবে।

মহান রাব্বুল আলামীন বিজ্ঞানময় কোরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন, কাফেরদের জন্য আমার নিকটে জিঞ্জির, আগুনের স্তূপ, গলায় বিধঁবার উপযোগী কণ্ঠক এবং ভয়াবহ আযাব মজুদ রয়েছে।" —(সূরা মুজ্‌জাম্মিল)

সূরা নাবায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, "দোযখবাসীরা উত্তপ্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘোলা পানি এবং গোচ্ছাক ব্যতিত অন্য কিছুই পান করতে পারবে না।" গোচ্ছাক দোযখবাসীদের শরীরের পুঁজ, চোখের অশ্রু ও গুপ্তাঙ্গ হতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক প্রকার উত্তপ্ত পানীয়।

জাহান্নাম বা দোযখ সম্পর্কে কোরআন হাদীসে ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। দোযখের আযাব এতো ভীষণ হবে যা আমাদের কল্পনা ও চিন্তা শক্তির বাইরে। আমাদের জ্ঞান স্থান-কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় আমাদের মাথায় সেখানের যন্ত্রণার কথা, এ মুহূর্তে ধারণ করাই সম্ভব হয় না। তবে এ কথা সত্য যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে দোযখের শাস্তির উপাদান এই পৃথিবী থেকে তৈরী করে পাঠাচ্ছি। ধর্মীয় পরিভাষায় এর উপাদানের নাম 'গোনাহ'। এই সত্তার নাম বিজ্ঞানের পরিভাষায় হয়তো অন্য কিছুও হতে পারে। জাহান্নামের আযাবের কথাবার্তা অনেক জাগায় হয়তো রূপক ও সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া আছে। এ পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের হাতে জাহান্নাম ও তার আযাবের কোন প্রমাণাদি ধরা পড়েনি। ধরা না পড়ার কারণের মধ্যে হয়তো থাকতে পারে, এ লাইনে আমাদের চেষ্টা তদ্বির কম থাকা অথবা বিজ্ঞান সে সত্য উদঘাটন করতে অপারগ। তবে বর্তমান রবাটের যুগেও আমাদের পক্ষে তার ধারে কাছে না যেতে পারলেও সে সত্যকে বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকার করে নেয়ার মতো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। সত্যকে যাচাই করার জন্য সে চেষ্টাও এক মহৎ প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

জাহান্নামের অবস্থান ও তার বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক

জাহান্নামের আযাবের বর্ণনা বিজ্ঞান সম্মত কি-না, তা নিরীক্ষণ করার আগে পরকালের বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন। পরকাল অনেক দূরের জায়গা। কতটুকু দূরে এর হিসেব বলা যাবে না। কোথায়, কোন দিকে, তাও আমাদের অজানা। বর্তমান দুনিয়ার কোন বাসিন্দা জাহান্নাম দেখে ফিরে আসেনি। কারও পক্ষে রকেটে চড়ে সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়। কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়েও তার খবর নেয়া দুঃসাধ্য। তবু পরজগৎ বলতে একটা জগৎ যে আছে তার অনেক যুক্তি দেয়া যায়। গতি সম্পর্কে, তার দ্বৈতরূপ স্থিতি জগৎ থাকা বিজ্ঞানের বিচারে যুক্তিশীল। আবার বস্তুর দ্বৈতরূপের সম্পর্কে জোড়া তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের কোথাও প্রতিবস্তুর জগৎ থাকা অযৌক্তিক নয়। কিংবা সেটি কর্ম থেকে কর্মফলের জগৎ অথবা ক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার জগৎও হতে পারে।

অপর দিকে সৃষ্টির প্রবৃত্তির তাড়নার ফসল ঋণাত্মক জগৎও হতে পারে (Nagative dimession এর জগৎ)।

বর্তমান গতির জগতের কঠিন বস্তুর সূক্ষ্ম কণাগুলো কাঁপে, ঘুরে ও দোলে এবং একের উপর অন্যটি গড়াগড়ি করে। গ্যাসীয় অবস্থায় আপন খুশি মতো ছুটে বেড়ায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে থাকে ও ঘুরে। এখানে সবকিছু যেন বিরতিহীন অশান্ত। পদার্থ হলো শক্তির ঘণীভূত অবস্থা বা গতির মন্থরতা। গতি অবিরাম হওয়া যুক্তিহীন। এর স্থিরতা থাকতেই হয়। অর্থাৎ গতিশীল জগৎ যেহেতু অনিশ্চয়তার দিকে ক্রমেই ধাবিত হচ্ছে, এ থেকে বুঝা যায় তার স্থিরতা আছে। সেই স্থির বিশ্বটি কোথায়, তা আমরা বলতে পারবো না। সেটি হয়তো বিশ্বের এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে আমরা জীবিত অবস্থায় গিয়ে ফিরে আসতে পারি না। গতির জগতের নাম বস্তু বা জড় জগৎ। সে হিসেবে তার দ্বৈতরূপের জগৎ হিসেবে একে স্থিতি জগৎ বা প্রতি বস্তুর জগৎ বলতে পারি। বিজ্ঞানের কথায় পদার্থ ও শক্তির যেহেতু ধবংস নেই, শুধু পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে রূপ নিতে পারে, সুতরাং পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া শক্তি কোন না কোন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে অন্য জগৎ গড়ছে।

www.pathagar.com

আমরা প্রতিদিন যে শক্তি ব্যয় করি তা খাদ্য থেকেই পেয়ে থাকি। সূর্য থেকে খাদ্য বস্তুতে এই শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মওজুদ হয়। এই শক্তির মাধ্যমে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন ও ক্ষয়পূরণ হয়। সূর্য প্রতিদিন তার তহবিল থেকে প্রায় ৩৬০ হাজার মিলিয়ন টন শক্তি বিকীর্ণ করে। তন্মধ্যে আমরা সে শক্তির অতি অল্প পরিমাণ অংশই কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই, তবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক কাজ-কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে যে শক্তি ব্যয় হয় তা যায় কোথায়? পৃথিবী কিংবা সূর্য তো একে পুনরায় গ্রহণ করে না। তবে এর হবেটা কি? নিশ্চয়ই তার দ্বারা কোথাও কিছু হচ্ছে। সে জগৎকে আমরা প্রতিবস্তুর জগৎ বা পরকাল বলে ভাবতে পারি । সে জগৎ কেমন তা আমরা এ মূহূর্তে বলতে পারবো না। অনেক দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ জগৎ সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন- এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ক্রমবিকাশের পালায় এখনো তা অবিরাম বৃদ্ধি হয়েই চলছে। এবং ভবিষ্যতে কতকাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলবে তা কারও জানা নেই। মহাশূন্যে সৃষ্টির এই বিকাশ দ্রুত হতে দ্রুততর বেগে সম্প্রসারণ হয়েই চলছে। এই বিকাশের গতি উত্তরোত্তর এতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, একে আলোর পক্ষেও ঘুরে আসা সম্ভব নয়। অথচ আলোর বেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আল–কোরআনে বিশ্বের সম্প্রসারণ গতির কথা বলা আছে। আল্লাহ বলেন– "এবং আকাশ মন্ডল আমি আপন শক্তি ও কৌশল দিয়ে সৃষ্টি করেছি, নিশ্চয়ই আমি সম্প্রসারণকারী।"- (৫১-১৭)

বৈজ্ঞানিকগণ আরও মনে করেন, বিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে সাথে শক্তি বিকিরণের জন্য এই বিশ্ব ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে আরম্ভ করেছে এবং এই বিশ্বের ভর-শক্তি যথোপযুক্ত ঠান্ডা হওয়ার পর সেটি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানের বস্তুর মৌলিক কণা নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি হতে অনেক অস্থায়ী কণা গঠিত হয়। তাছাড়া এদের পাশাপাশি অনেক বিপরীত প্রতিকণাও গঠিত হয়। এই মহা বিশ্বের বিশাল শূন্য মন্ডলীতে অন্ধকার রাতে মেঘ শূন্য আকাশে সাদা সাদা পাতলা মেঘের ন্যায় যে স্তর দেখা যায় তার নাম নীহারিকা।

এই নীহারিকা বায়বীয় জড় কণার বিশালপুঞ্জ। অপরদিকে ছায়াপথকেও নীহারিকা ধরা হয়। দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করলে এই নীহারিকা মন্ডলীতে অসংখ্য তারকা দেখা যায়। এ সব তারকাগুলো বড়

www.pathagar.com

বড় দলের অসংখ্য পুঞ্জ সৃষ্টি করে আছে। তারকা রাজির এই সকল পুঞ্জকে গ্যালাক্সি বলা হয়। মহা শূন্যের অসংখ্য গ্যালাক্সির একটি কক্ষদ্বার হলো ছায়াপথ। আমরা আকাশে যে সব উজ্জ্বল তারকা দেখি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে বহুদূরে অবস্থিত গ্যালাক্সি মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, সূর্যের মতো পরিবারভুক্ত আরও অনেক নক্ষত্র মহাশূন্যে বিরাজমান আছে। কেউ কেউ মনে করেন মহাশূন্যের নীহারিকাগুলো স্থির নয় (যেগুলো দেখা যায়) এসব নীহারিকাগুলো অবিরাম বন বন শব্দ করে ঘুরছে। অনেক বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মহা বিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক নীহারিকা পদার্থের এবং বাকি অর্ধেক প্রতিবস্তুর। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে এই বিশ্বের কোন এলাকায় প্রতিবস্তু দিয়ে গঠিত নীহারিকা বিরাজ করছে। প্রতিবস্তু মূলতঃ বস্তুর দ্বৈত রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন গর্ভ থেকে এবং মানুষের দেহ কারখানা থেকেও প্রতিবস্তুর কণা প্রসব হয়। এরা পৃথিবীর প্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। ক্ষণিক সময় পড়েই সেগুলো এখান থেকে উধাও হয়ে যায়। যেহেতু শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই, সে ধারণার আলোকে বলা যায়, আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তিই কি প্রতিবস্তু কি না, তাই বা কে জানে? যদি জোড়া তত্ত্বের উৎস ধরে বিচার করা হয়, তাহলে এই প্রতিবস্তুর জগতের সাথে পর জগতের সম্পর্ক থাকার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাবধি প্রায় ১০০ কোটির মতো নীহারিকার সন্ধান পেয়েছেন। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন, সকল নীহারিকা আলো বিকিরণ করে না। সেগুলো নিষ্প্রভ নীহারিকা। সহজ কথায় এগুলো ছাইয়ের স্তূপের মতো। এগুলোকে মহাকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। সে জন্য এর পেছনের তারকাগুলো দেখা যায় না। এর পেছনে হয়তো রয়েছে উজ্জ্বল নীহারিকা। সেগুলোতে যে কি আছে তা বলা অসম্ভব। এ বিশ্বের অসীমত্বের কথা ভাবতে গেলে নিশ্চয়ই অবাক না হয়ে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ আরও অনুমান করছেন, আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই রয়েছে অসংখ্য নিষ্প্রভ নীহারিকা। একে বলা হয় কৃষ্ণ বিবর। এর ভিতরে যে কি কান্ড ঘটছে তাও দেখা সম্ভব হয় না। আবার এ সব কৃষ্ণ বিবরের আড়ালে যে কি আছে তাও দেখা সম্ভব নয়। কারণ এর ভেতর থেকে যেমন কোন আলো আসে না আবার তার পার্শ্বের কোন তারকার আলোও সে স্থান ভেদ করে আসতে পারে না। এ সকল বর্ণনার সাথে জাহান্নামের মতো অন্ধকার দ্বীপপুঞ্জের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নাম ঘোর কালো বর্ণের অন্ধকার দ্বীপ পুঞ্জের মতোই। বলা হয় জাহান্নামের নিষ্প্রভ অগ্নি স্তূপ সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দিতে পারে। এর দুর্গন্ধময় সামান্যতম উপাদান পৃথিবীর সমস্ত আলো বাতাসকে দূষিত করার জন্য যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা নিষ্প্রভ নীহারিকার আড়ালে যে সকল উজ্জ্বল নীহারিকা আছে, সেগুলো এই অন্ধকার স্তূপের জন্যই দেখা যায় না। বেহেশ্‌ত ও দোযখের পারিপার্শ্বিক অবস্থানের বেলায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। সেখানে বেহেশ্‌ত এর অবস্থান সর্বদাই দোযখের উপরে রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। বেহেশত এর সারি করা স্তরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকের বেহেশ্‌তগুলো নীচের দিক থেকে সুরম্য, বিশাল ও আরামদায়ক, পক্ষান্তরে দোযখের অবস্থানও উপরের দিক থেকে নীচের দিকে পর্যায়ক্রমে কষ্টকর ও অন্ধকারাছন্ন। এসব স্থান থেকে কারও দিকে কেউ হাত বাড়ালে কেউ ফিরেও তাকাবে না। সে জগৎ অতি নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণায় ভর্তি।

জড় পদার্থের মধ্যে সরিষা একটি কঠিন বস্তু। এর আকার অতি ক্ষুদ্র। অপর দিকে বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন (O_2) হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থ। এগুলোর কোনটিই প্রয়োজনহীন নয়। আকাশের কোটি কোটি ছায়াপথের গোষ্ঠীভুক্ত আরও অসংখ্য কোটি কোটি তারকা রাজির বিশাল বিশাল বিস্তৃতিময় অনন্ত অসীম ঠিকানা কি অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? এর কি কোন প্রয়োজন নেই? বোকাও এ কথা বলবে না, তার প্রয়োজন নেই। তাই স্বীকার করতে হবে ধর্মীয় বিধানে জাহান্নাম ও জান্নাতের যে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে, হয়তো বা সেই বিশাল জগৎ এর সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হলো —মানব জীবনের দুনিয়ার কর্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি কি মানুষকে শাস্তি ও যন্ত্রণা দিতে পারবে? বিজ্ঞানের আলোকে যদি আমাদের কর্মের প্রতিফলের মধ্যে ঐ গুণাগুণ থাকে তাহলে জাহান্নাম ও জান্নাতকে অস্বীকার করার কি কোন যুক্তি খাটবে?

ধর্মের কাজকর্ম কোন নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক পর্ব বা লোক দেখানো কোন বিষয়বস্তু নয়। দ্বীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীর স্বভাব আল্লাহর দান। স্বভাবের বিপরীত কিছু করতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে আল্লাহ সৎ ও সুন্দর গুণাবলীর স্বভাব দান করেছেন। এতে রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল। কিন্তু মানুষ যদি তার স্বভাবের বিপরীত চলে তখন তার বেলায় দু'স্থানেই অমঙ্গল দেখা দিবে।

www.pathagar.com

দুনিয়ার জীবনে আমরা আখেরাতের অমঙ্গল দিক লক্ষ্য না করতে পারলেও দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে সব কাজ এখানে অমঙ্গল ডেকে আনে তা লক্ষ্য করতে পারি। এর প্রত্যেকটি কাজ মানুষের স্বভাবের বিপরীত কর্ম। এই বিপরীত কর্মগুলো ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বর্জন করার আদেশ রয়েছে। এরপরও যারা সেই আদেশ লংঘন করে স্বভাবের বিপরীত কাজ করতে থাকে, তারা কোন না কোন ভাবে কষ্টের স্বীকার হয়। এ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, স্বভাবের বিপরীত কাজ আখেরাতেও কষ্ট দিবে। অবাধ যৌনাচার ও নেশা করা স্বভাবের বিপরীতধর্মী কাজ। এ কাজগুলোকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। তবু যারা এই নিষেধ উপেক্ষা করে সেগুলো চালিয়ে যায়, এদের দুনিয়াতেই পদে পদে যন্ত্রণা পেতে হয়। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস্ এগুলোর মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করে। স্বভাবের বিপরীত কাজ করাতে এগুলো দুনিয়াতেই অপকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে অসৎ ব্যক্তিকে দংশন করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু যারা স্বভাবের বিপরীত কাজ করে না এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চলে তারা কিন্তু দুনিয়াতে এর দ্বারা পদে পদে যন্ত্রণা পায় না। তাই বিশ্বাস করতে হবে স্বভাবের সৎ ও সুন্দর গুণাবলী পরকালীন জীবনের জন্যও মঙ্গলকর। কিন্তু দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুসরণ না করলে সৎ ও সুন্দর গুণাবলী গড়ে ওঠে না।

মানুষ প্রবৃত্তির মোহে আকৃষ্ট না হয়ে কোন কাজ করতে পারে না। দুনিয়ার জীবনে মানুষ দু'ভাবে মোহ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কেউ দুনিয়ার মোহে পড়ে কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশিত হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়। কেউ আবার স্রষ্টার দিদার লাভের আশায় তার জীবন ব্যবস্থার নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলতে গিয়ে স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে। এ সব লোককে কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশন করতে পারে না। তারা কোন কাজেই স্বভাবের সীমালংঘন করে না। পক্ষান্তরে যারা কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশিত হয় তাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির গায়েও এর ক্ষতচিহ্ন পড়ে। এতে সেগুলো অবক্ষয়পূর্ণ ও ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। পরিশেষে এ সব দুষ্কৃতিময় সত্তা উজ্জ্বল স্বভাব হারিয়ে বিবর্ণ কালো ধোঁয়ার মতো রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থার আলোকে যারা পরিতুষ্ট আত্মার মালিক হয় তাদের কর্মময় জীবনী শক্তির বিকীর্ণ সত্তা উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণই থাকে। এদের বিকীর্ণ সত্তা নিম্ন দিকে না গিয়ে বিপরীত

www.pathagar.com

দিকেই প্রবাহিত হয়। অপরদিকে দুনিয়া মোহ শয়তানের শিষ্যদের কর্মশক্তি হারিয়ে যায়, অতল সাগরের নিম্নের দিকে। ঘটনাটি অনেকাংশে এরূপ। যেমন- নদীনালা এবং সাগরের বিস্তৃত পরিসরে থাকে পানি। পানির মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। নদীর পানি সাগরের দিকে ছুটে চলে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় পানির প্রবাহ থেকে উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুত। এর জন্য স্রোতের মুখে বাঁধ দিয়ে টারবাইন বসানো হয়। এই বাঁধ পানির প্রবাহকে বিপরীতমুখী করে। এর দ্বারা আমরা উপকৃত হই। কিন্তু বাঁধহীন নদীর প্রবাহ সাগরেই তলিয়ে যায়। সেই প্রবাহ আমাদের কোন কাজে আসে না। পক্ষান্তরে একে পুনরায় ফিরিয়ে এনেও কোন কাজ করা যায় না। মানুষের দেহ কাঠামোর কারখানাটি এবং তার শাসক জীবন প্রহরীর ক্রিয়া-কলাপ মহাসাগরের ঢেউ এর মতো গতিময়। মনের মণি কোটায় ভাবাবেগ, কর্মের স্পন্দন সবই ঢেউ-এর ন্যায় ওঠানামা করে। সেখান থেকে এর প্রবাহ ছুটে যায় দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কিন্তু মনের কামাবেগ স্বভাবের বিপরীত হলে সেটি সীমালংঘন করে, এতে কোন বাঁধ থাকে না। ফলে তার জীবনী শক্তি বিপরীত মুখী না হয়ে অতল সাগরেই ঠাঁই নেয়। তার দ্বারা বিদ্যুতের মতো উপকারী উত্তম সত্তা তৈরী হয় না। যা কিছু সৃষ্টি হয় সবই দুষ্কৃতিময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন প্রশ্ন হলো মানব জীবন নিয়ন্ত্রণে রাখলে কি তার দ্বারা বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল সত্তা তৈরী হতে পারে? আমাদের দৈহিক কাঠামোর মূল উপাদান পানি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এতে পানির অংশ ৭৫ ভাগ। নদীর স্রোত থেকে যদি বিদ্যুত উৎপন্ন করা যেতে পারে তবে মানব দেহ থেকে এর চেয়ে উত্তম সত্তা কেন তৈরী করা যাবে না? আমাদের দেহ কাঠামোর মূল উপাদান যে পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তা কোরআন মাজীদে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেন- "আমি প্রত্যেক জীবিত পদার্থকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি।" —(২১-৩১)

"আল্লাহ পানি দিয়ে সর্বপ্রথম জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর কতিপয় স্ব-স্ব উদরে ভর দিয়ে চলে এবং তাদের কতিপয় পদদ্বয় দিয়ে চলে ও তাদের কতিপয় চতুষ্পদ দিয়ে চলে।" - (২৪-৪৫)

"তিনি পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" - (২৫ -৫৪)

সৃষ্টিকর্তার এসব তত্ত্বের সপক্ষে রয়েছে, বৈজ্ঞানিকগণের স্বীকৃতি। তাঁরা মনে করেন আদি প্রোটোপ্লাজম সাগরের লোনা পানির প্রবাহ হতে সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে। এটি আদি জৈব অণু ডি, এন, এ ও আর, এন, এ-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই জৈব অণুর আদি মৌল ও যৌগ হতে উচ্চ তাপে ও চাপে এবং অণু ঘটকের প্রভাবে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রোটোপ্লাজম। যার মাঝে প্রায় ৭৫ ভাগই পানি। মানুষের দেহটি অগণিত সংখ্যক প্রোটোপ্লাজমের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রোটোপ্লাজমে পানি ব্যতীত আরও রয়েছে কার্বন ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য উপাদান। বলতে গেলে মানুষের জড়দেহ একটি মিশ্র পানির কাঠামো। এর মধ্যে আছে জেলির মতো স্বচ্ছ অর্ধভেদ্য চটচটে পিচ্ছিল ও স্থিতিস্থাপক পদার্থের সমাহার। একে একটি সজীব ও প্রাকৃতিক জৈব কারখানা বলা চলে। এই কারখানার মালিক হলো আত্মা। এর স্বভাবের সৎ গুণাবলী বৈদ্যুতিক পাওয়ার ষ্টেশনের নীতির ন্যায়। এ থেকে টিভির প্রেরক যন্ত্রের মতো তড়িৎ চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বভাবের বিপরীত ক্রিয়ায় ধোঁয়ার মতো কালো অপশক্তি নিঃসৃত হয়। একেই আমরা বিকীর্ণ শক্তি বলি। আমাদের দেহ কাঠামোর মধ্যে অনবরত সমুদ্রের মতো ঢেউ চলে। কিন্তু এই ঢেউ বা তরঙ্গকে আমরা ধারণ করতে পারি না। শুধু একে অনুভব করি।

মানুষের জীবন কি? এ সম্পর্কে একজন বৈজ্ঞানিক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর সে বর্ণনার মাঝে আমরা ঢেউকে খুঁজে পাই। এই বৈজ্ঞানিকের নাম কাউন্ড ফিসার লিং। তিনি বলেছেন- "মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন মহা সাগরের একটি বিশাল ঢেউ-এর মতো। মানুষ এক অজানা অন্ধকারময় লক্ষ্যের দিকে ঢেউ খেলে প্রবাহিত হচ্ছে। এই ঢেউকে বাহ্যত শিলার মত অবিচলিত শক্ত ও স্থায়ী মনে হলেও প্রতি মহূর্তে তার গঠন ও গাঠনিক উপাদান বদলে যায়। আমরা ঢেউকে দেখতে পাই এবং তার তর্জন-গর্জন শুনি কিন্তু আমরা তাকে ধারণ করতে পারি না। ঢেউ এর গতি এবং তার গতি পথের দিক অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু তার যা কিছু দৃশ্যমান দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় তা পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। তদ্রূপ মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ঠিক একটি ঢেউ এর মতো মনে হলেও প্রতি মহূর্তে তাদের গাঠনিক উপাদান বদলে যায়। জীবনের গতি ও গতির দিক ব্যতীত বাকী যা কিছু দৃশ্যমান ও স্পর্শনীয় তা পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। আমরা জীবনকে শুধু অনুভব করি কিন্তু ধারণ করতে পারি না। সর্বশেষে নিজের চিন্তা ও জ্ঞান দিয়ে যখন আর কিছু বুঝতে পারি না তখন সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে এক মহা দুর্জ্ঞেয়

www.pathagar.com

রহস্যময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করি। এই স্বইচ্ছায় নিজেকে কোন পরমসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম। এই আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার মানুষের মনে এক অনাবিল পরম শান্তি (সালাম) আনে যা সম্রাটের সাম্রাজ্যের ধনীর ধনরত্ন দিতে পারে না।"

কাউন্ড ফিসার লিং এর ধারণার আলোকে বলা চলে, আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন নামের প্রবাহমান ঢেউকে যদি নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দেয়া যায়। তবে কি এর মূল্যবান জীবনী শক্তি সাগরের অতল দেশে তলিয়ে যাবে না?

পাক কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ। (সূরা আহকাফ রুকু-২)

নদ-নদীর পানির স্রোত বা ঢেউ এর অনুকূলে বাঁধ বসিয়ে যেহেতু বিদ্যুত নামের বিপরীতমুখী প্রবাহ তৈরী করা সম্ভব হয়, তবে মানবদেহের ৭৫ ভাগ পানির অংশ থেকে নৈতিক বাঁধ সৃষ্টি করে কি বিদ্যুতের মতো উপকারী সত্তা সৃষ্টি করা যাবে না? এই সত্তা দিয়ে কি জান্নাতের মতো সুন্দর ও মনোরম জগৎ তৈরী অসম্ভব? তবে জীবন নদীর নিয়ন্ত্রণহীন স্রোত বা ঢেউ যে পরবর্তিতে জীবনের কোন সুফল দিতে পারবে না তা দুনিয়ার নিয়মেই প্রমাণ হয়। যে নদীতে বাঁধ নেই, তার স্রোত তো মহা সাগরের অতল গহবরেই হারিয়ে যায়। এর দ্বারা সমাজ জীবনের যেমন কোন উপকার হয় না তেমনি মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন জীবন ব্যবস্থা দ্বারা তার পরপারে লাভের কোন আশা থাকে না।

গতি এক প্রকার প্রবাহমান শক্তি। এই গতি শক্তি চিরদিন একই অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না। অর্থাৎ কোন গতিই চিরন্তন নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব। তাই একদিন না একদিন গতি স্থিরতায় আসে। আসলে গতি থেমে যাওয়ার নামই মৃত্যু। এই পৃথিবীতে শুধু প্রাণীর বেলায় মৃত্যু আসে এমন নয়। এই বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রতিনিয়তই অহরহ কার্যকারণ নীতিতেই বলা চলে অগণিত অণুর মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর বেলায় বয়সের কোন ধারাবাহিকতা নেই। বৃদ্ধের আগে যুবক কিংবা শিশুও মরতে পারে। কার বেলায় কখন মৃত্যু ঘটবে বা ঘটতে পারে তা কেউ বলতে পারে না। এমনি এক অদৃশ্য নিয়মনীতির তাড়নায় সদাসর্বদাই গতির মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞান এই মৃত্যুদানকারী সত্তাকে cosmic Radiation নামে অভিহিত করেছে। যখন কোন অণুর মৃত্যু ঘটে তখন

www.pathagar.com

সে সত্তা অদৃশ্য হয়ে আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়। তখন এর রূপ কি হয় তা আমরা জানি না। কিন্তু জোড়া তত্ত্বের শর্তে গতির কাঠামো যদি বস্তু হয় তবে তার দ্বৈত রূপ হবে প্রতিবস্তু। সে ধারণার আলোকে বলা যায় এ জগতের অন্তরালে রয়েছে আর একটি স্থির জগৎ। কিন্তু স্থির জিনিস আকারশীল হতে পারে না বিধায় সে জগৎ খুব সূক্ষ্ম জগৎ। কর্মের রূপই গুণশীল আকারহীন জগৎ। এর নাম প্রতিফল জগৎ বা পরকাল। মানুষের গতির চরিত্র থেকে তার প্রতিফল জগৎ যে সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নের উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে।

যেমন- পৃথিবীতে মাতা-পিতার সহ মিলনের ফলে মাতার ডিম্বানুর সাথে পিতার শুক্রকীটের মিলন ঘটে সন্তানের ভ্রুন জন্ম হয়। এই পরিস্ফুটন্ত ডিম্বানুর মাঝে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজম থাকে সক্রিয়। এ সব সক্রিয় ক্রোমোজমের ভূমিকার উপর সন্তান-সন্ততির গঠন, আকার, বর্ণ, লিঙ্গ, স্বভাব ইত্যাদি সকল কিছু নির্ধারিত হয়। অথচ এই ক্রোমোজমের কোথায় যে এই গুণগুলো লুকিয়ে থাকে তা ধরা খুবই কঠিন। কার্যতঃ গুণ দেখার জিনিস নয়। এটি উপলব্ধির ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন পিতা-মাতার বেলায় এই ক্রোমোজমের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেজন্য অসৎ পিতার সন্তান অসৎই হয়। তাই বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানীগণ অপরাধ প্রবণতা রোধ করার জন্য আইনের সাথে সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলছেন। তবে সব অসৎ পিতার সন্তান যে অসৎ হয় এটি পুরোপুরি ঠিক না হলেও যারা ভাল হয় তারা সাধারণত সৎলোকের সান্নিধ্য পেয়েই ভাল হয়। কিন্তু খারাপ হওয়ার সংখ্যাই বেশী থাকে। এরূপ চরিত্রের হওয়ার প্রধান কারণ হলো পিতামাতার ক্রোমোজমের (জীন) গতির ক্রিয়া। একটি মারবেলকে সরল পথে গতি দিয়ে ছাড়লে সেটি আপাততঃ সরল পথেই চলে। কিন্তু বাঁকা পথে গতি দিয়ে ছাড়লে সেটি বাঁকা পথই অনুসরণ করবে। পিতা মাতার মিলন পর্ব গতিহীন নয়। মানুষ প্রয়োজনের মোহেই কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার ফসল দুনিয়ায় প্রজনন বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য ভালো মন্দের গতিশীল কাজ থেকে কিছুই কি সৃষ্টি হয় না? নিশ্চয়ই তাদের থেকে বিকীর্ণ কর্ম সন্তানের জন্ম হয়। এর গুণাগুণ ভালো-মন্দ হওয়ার জন্য চরিত্রই দায়ী।

আমরা খাদ্যবস্তু থেকে শক্তি চুষে নিয়ে কর্মের মাধ্যমে তা ব্যয় করি।

www.pathagar.com

এই শক্তি প্রসব হয় পরমাণুর গর্ভ থেকে। স্বভাবের সীমালংঘন করলে পরমাণুর গর্ভস্থিত বিকীর্ণ সন্তানের আচরণ দুষ্কৃতিপূর্ণ হবে। সেটি ইঞ্জিনের ঘন কালো ধোঁয়ার মতো হবে। তার শরীর জুড়ে থাকবে আলকাতরার পোষাক। রোগ জীবাণুর স্বভাবের প্রকৃতির মতো থাকবে বিকৃত ও ব্যধিগ্রস্ত। এরাই এক সময় জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে অবাধ্য সন্তানের ন্যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ জীবন ও মৃত্যুর সীমান্ত পাড়ে এক ধরণের বাসিন্দার খোঁজ পেয়েছেন। সেগুলো উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণী (ভাইরাস) আবার আগ্রয়দাতা ছাড়া জড় পদার্থ বলা চলে। কিন্তু একবার কোন আশ্রয় দাতা পেয়ে বসলে তখন সে আশ্রয়দাতার দেহ কোষগুলো ধ্বংস করে নিজের বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। আবার আশ্রয় দাতা ব্যতীত হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থায় তার মাঝে কোন উত্তেজনা থাকে না।

সে অবস্থায় তার খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না এবং তখন বংশ বিস্তারও করে না। ঘুমের ভানে এক জায়গায় পড়ে থাকে আজীবন। অথচ বৃদ্ধও হয় না আবার মরেও না। এটিই হলো 'ভাইরাস'। আশ্রয়দাতা পেলে এরা যেভাবে প্রাণী দেহ কোষকে ধ্বংস করে, সেভাবে বস্তু বা প্রাণীর জড় কণার সাথে প্রতিবস্তুর কণা একত্র হলে তারাও পরস্পরকে ধ্বংস করে। সে আলোকে ভাইরাসের দেহ সত্তাকে প্রতিকণাও বলা চলে। এই ধরণের কিছু প্রতিকণার স্বভাবের ন্যায় ভাইরাস মানুষের অসৎ আচরণ থেকেও দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়। এমন এক ভাইরাস নিয়ে বর্তমান বিশ্ব আতংকগ্রস্ত। এর নাম এইডস ভাইরাস। পাশ্চাত্য জগতে এর প্রার্দুভাব অনেক বেশী। কিন্তু আশার কথা হলো এই ভাইরাস সকল মানুষের দেহে আঘাত করে না। শুধু কয়েক শ্রেণীর সীমালংঘনকারী পাপীর দেহেই এরা বংশ বিস্তার করে। এদের মধ্যে সমকামী, উভয়কামী, মাদকাসক্ত, ড্রাগ সেবনকারী (নেশা জাতীয়) উল্লেখযোগ্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন রক্ত ট্রান্সফিউশন, ইন্‌জেকশানের সূচ ইত্যাদি দিয়েও ভাল মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তারাও যেভাবেই সংক্রামিত হউক না কেন তার উৎসটা আসলেই সীমালংঘনকারী অসৎ ব্যক্তির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই ভাইরাসকে পাপী দেহের প্রতিকণা বা পাপ কণাও বলা চলে। যেহেতু পাপীদের দেহেই এর উৎপত্তি স্থল। দুনিয়াতে জীবন ও মৃত্যুর

www.pathagar.com

সীমান্ত পাড়ের বাসিন্দা ভাইরাস নামক প্রতিকণা যদি পাপীর দেহেই জন্ম নিয়ে তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে, তবে যেখানে মৃত্যুর দরজা খোলা থাকবে না, সেই জগতে এরূপ দেহ অস্তিত্ব থেকে পয়দা হওয়া অগণিত সত্তা তার জীবনকে তো অবশ্যিই জ্বালাময় করে তুলবে বৈ কি? তাই আল্লাহ স্বভাবের সীমালংঘনকারীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবী করিম (সা) বলেছেন, "মানুষ যখন পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তখন তাদের মাঝে এমন রোগ-বালাই দেখা দিবে, যার নাম তাদের বাপ-দাদা আগে কখনো শুনেনি।" আজ মানুষ পাপের সমুদ্রে ডুবে গিয়ে এই ভাইরাসের (এইডস) প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোটের উপর যতদিন মানুষ নিজেদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণসীমার মধ্যে না নিয়ে আসবে ততদিন এইরূপ একটার পর একটা দুরারোগ্য জাতীয় জীবাণু সৃষ্টি হতে থাকবে। এসব রোগ জীবাণুর চিকিৎসা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার মতো মানুষের নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরেই থাকবে। এখানে উপলব্ধির বিষয় হলো এই, যেখানে সীমালংঘনকারীর দেহ কারখানায় উৎপন্ন জীবন-মৃত্যুহীন অদৃশ্য প্রতিকণার ন্যায় ভাইরাস জাতীয় পাপ কণা দুনিয়ার জীবনেই কষ্ট দেয়, সেখানে এদেরই জীবনের ব্যধিগ্রস্ত বিকীর্ণ কর্মশক্তি কেন তার যন্ত্রণার কারণ হবে না! সেদিন খুব দূরে নয়। দুনিয়ার জীবন শেষ হলেই তাদের ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আজ হয়তো দুনিয়ার প্রাকৃতিক আইনে তারা আমাদের চারপার্শ্বেই ঘুমিয়ে আছে অথবা মৃত্যুহীন অবস্থায় ঘুরাফেরা করছে। এদের কাছেই হয়তো একদিন ফিরে যেতে হবে। সেদিন কোন সুপারিশ, তদবির এরা শুনবে না।

রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন- "তা আর কিছুই নয় তোমাদের কৃতকার্য সমূহেই তোমাদিগকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।" "পৃথিবীতে যে যা কিছু করবে তার অধিক তাকে দেয়া হবে না।" - (আল-হাদীস)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোযখীদেরকে বলেছেন-"দোযখ কাফিরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে।" (অর্থাৎ দোযখ তাদের সঙ্গেই আছে)

- (পারা-২১ সূরা আনকাবুত রুকু ৬)

তিনি আরও বলেছেন-

"যে ব্যক্তি আমার যেকের হতে বিমুখ রয়েছে; নিশ্চয়ই তার জন্য বড় কষ্টময় জীবিকা রয়েছে।" -(পারা- ১৬ রুকু-৭)

www.pathagar.com

"যদি তোমরা বিশ্বস্ত জ্ঞানে জানিয়া লইতে নিশ্চয়ই তোমরা দোযখ দেখতে পারতে; তখন তোমরা নিশ্চয়ই তাকে এরূপ দেখাই দেখবে যে, চাক্ষুস বিশ্বাস হবে।" -(পারা ৩০ সূরা তাকাসুর রুকু-১)

যেদিন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা ও তার কাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে নতুন বিশ্ব ও তার আইন ঢেলে সাজানো হবে সেদিন আজকের বিকীর্ণ কর্মশক্তির গুণাগুণ আমাদেরকে অবশ্যই ভাবিয়ে তুলবে। তখন হয়তো আবার দুনিয়ায় এসে ভালো কাজ করার ইচ্ছা জাগবে। কিন্তু মার পেট থেকে প্রসব হয়ে গেলে যেমন সেখানে যাওয়া আর সম্ভব হয় না তেমনি ইচ্ছা থাকলেও তা আর সম্ভব হবে না?

বৈজ্ঞানিকগণ সকাল-সন্ধ্যার পালা বদলের মধ্যে আমাদের মন ও দেহ কারখানায় কি যে তৈরী হয় তার খবর বলতে না পারলেও, অন্যান্য বস্তু থেকে যে শক্তি বিকিরণ হয় এর স্বভাব ও গুণাগুণের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণায় যে সকল জিনিসের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিই উল্লেখযোগ্য। তারা বলেন x-ray রশ্মি, বৈদ্যুতিক বাতি, দাড়ি কামানোর ক্ষুর, ওয়াশিং মেশিন ও প্রতিটি বস্তু থেকে কাজে অকাজে শক্তি বিকিরণ হয়। এই বিকীর্ণ শক্তির প্রকৃতি ও গুণাগুণ হলো- কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাবশক্তি। এসব বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে অত্যধিক কম্পন সংখ্যার বিকীর্ণ শক্তি মানুষের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে অল্প হার্জ কম্পনের বিকীর্ণ শক্তি সেদিক থেকে নিরাপদ। কিন্তু আমাদের দেহ বৈদ্যুতিক যন্ত্র না হলেও কিংবা প্রাণহীন জড়বস্তু না হলেও আমরা শক্তি বিকিরণ করি। কোন ধরণের স্বভাবের বিকীর্ণ শক্তি আমাদের পরকালীন জীবন ব্যবস্থা ও দুনিয়ার জীবনের জন্য নিরাপদ হবে তা দুনিয়ার সীমালংঘনকারীর স্বভাবের প্রতিক্রিয়ার ভোগান্তি দেখে অনুমান করা যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ যত কাজ নিষেধ করেছেন, সেসব কাজই অমঙ্গলকর। তাই পাপীর কর্মের ফসল তার বিকীর্ণ সত্তা, উভয় জীবনের জন্য উত্তপ্তকর ও যন্ত্রণাময় থাকবে। আল্লাহ দোযখীদের সম্পর্কে বলেছেন-

"দোযখীগণ আগুন এবং আগুনের মতো উত্তপ্ত পানির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে।" -(আল-কোরআন)

আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যারা তাঁর মর্জি মতো স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ করবে না, তাদের থেকে মঙ্গলদায়ক সত্তাই বিকীর্ণ হবে। এ

www.pathagar.com

ধরণের ব্যক্তিগণই থাকবে সেদিন পরম সুখে। পক্ষান্তরে পাপীরা দুঃখের সাগরে সাঁতার কাটলেও তাদের আর মুক্তির পথ থাকবে না। নিজের ভুল সেদিন বুঝতে পেরে দানা পানি ছেড়ে তজবি নিয়ে বসে পড়লেও সেখানে কোন সওয়াবের কণা তৈরী হবে না। এই দুনিয়াই হলো এর উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এখানে তাদের আসা আর সম্ভব হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা ক্বাফ-এ উল্লেখ করেছেন-

"এখন আমি তোমার হতে পরদা উঠিয়ে নিয়েছি কাজেই আজ তোমার দৃষ্টি শক্তি খুব প্রখর হয়েছে।" -(পারা ২৬ - রুকু - ২)

তখন লোকটি বলবে-

"হে আমাদের প্রভূ! আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন আমরা নেক কাজ করব। নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।" -(পারা ২১ সূরা সেজদাহ, রুকু - ২)

পরকালীন জীবনের শারীরিক দোযখের উপাদান ও দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রের সম্পদ। এ সম্পদ মানুষের দেহ কারখানার স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজের থেকেই উৎপন্ন হয়। এদের চরিত্র সংক্রামক জীবাণুর ন্যায় বিভীষিকাময়, গায়ের রং আলকাতর ন্যায় মলিন। এগুলি উড়ে যায় ঘন কালো ধোঁয়ার ন্যায়। এরূপ সত্তা দিয়ে যে জগৎটি তৈরী হবে তার নাম জাহান্নাম। শারীরিক দোযখের বর্ণনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূপক উপমা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা সহজে তা অনুমান করতে পারি। আসলে দোযখের বর্ণনায় সাপ বিচ্ছুর যে কথা বলা হয়েছে এদের স্বভাব প্রকৃতি ও গঠন দুনিয়ার সাপ বিচ্ছুর মতো নয়। এদের স্বভাব আকৃতি, প্রকৃতিই অন্য রকম। সেগুলি ভাইরাসের মতো সূক্ষ্ম হলেও এরা দুনিয়ার সাপ বিচ্ছুর তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। বেহেশ্তের বর্ণনায়ও এরূপ অনেক রূপক বর্ণনা এসেছে। যেমন তুলনা করা যায় পানীয় হিসেবে শরবতের কথা। সেই পানীয় যদি দুনিয়ার পানীয়ের মতো হতো তবে তা পান করলে অবশ্যই প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়তো। তাই এসবও রূপক বর্ণনা। কিন্তু জাহান্নামে শুধু শারীরিকভাবেই আযাব হবে না, সেখানে মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে। আজকে দুনিয়ার বেলায় যেরূপভাবে মানসিক যন্ত্রণা হয়, সেদিন তিনটি বিশেষ কারণে সেভাবেই মানসিক যন্ত্রণা শুরু হবে। এই তিনটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

www.pathagar.com

প্রথমত : দুনিয়ার স্থান-কালের জন্য অন্তর জ্বালা :

এই যন্ত্রণা এরূপ যেমন একজন যাত্রী অতি ব্যস্ততার মধ্যে ট্রেনে চড়ে বসলো। গন্তব্য অনেক দূরে। কিন্তু প্রয়োজনের জন্য সাথে কি নিতে হবে তা একবারও ভাবেনি অথবা যে জিনিস নিয়েছে, সেগুলি অচল কিংবা যা নিয়েছে তা অপ্রতুল্য। এসব নিয়েই গন্তব্যে পৌছে গিয়ে দেখলো সে চরম ভুল করে এসে পড়েছে। এবার সে তীব্র প্রয়োজন অনুভব করল। কিন্তু এখানে এগুলি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই কিংবা পূর্বের স্থানে ফিরে যাওয়াও আর সম্ভব নয়। এর ফলে দুনিয়ার স্থান-কালের জন্য অনুশোচনায় হৃদয় জুড়ে অনলের তুফান শুরু হয়ে যাবে। এ থেকে শুরু হবে তার অন্তর জ্বালা। এ ধরণের অন্তর জ্বালা এক প্রকার মানসিক আযাব।

দ্বিতীয়ত : স্রষ্টার সাথে সম্পর্কহীনতার অনুশোচনা–

স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে ঈমানের সাথে আমল সম্পর্কযুক্ত। ঈমান ও আমলের একাত্মতা থেকে প্রেমবোধ গড়ে উঠে। কার্যতঃ প্রেমবোধ থেকেই আনুগত্যের শর্ত পূরণ হয়। দুনিযাতে যে যত বেশী খোদা প্রেমিক তাকে ততবেশী ঈমানদার বলা চলে। এর মাধ্যমে পরকালে খোদার দিদার বা সাক্ষাত পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কারণ প্রেমের ঐশী বন্ধনে সৃষ্টিও স্রষ্টার মাঝে পয়দা হয় আকর্ষণ। এর ফলে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণ রিলে হয়। মানুষ যখন খোদার গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় তখন সে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে মানুষ পরিতুষ্ট আত্মার অধিকারী হয়। এরূপ আত্মা খোদার সৌমহনী ক্ষমতার কিঞ্চিত অধিকার লাভ করে। সে আত্মা অভাববোধকে জয় করে সার্বিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে। যার কোন অভাব থাকে না, সে কোন পীড়াও অনুভব করে না। এরূপ গুণশীল আত্মার মূল বাহন দেহ কারখানা থেকে বিকীর্ণ হবে উত্তম মানের সত্তা। যা পরকালের সওদা। এই সওদা অচল নয়। কিন্তু যারা খোদার সাথে সম্পর্কহীন থাকে তাদের কর্মশক্তির বিকীর্ণ সত্তা অচল মানের থাকে। এই অচল মুদ্রা পরকালীন জীবনের জন্য আযাবের উপাদান। যখন দোযখ নামের জেলখানায় এদের দ্বারা আযাব শুরু হবে তখন স্রষ্টার সাথে সম্পর্কহীনতার জন্য চরমভাবে মানসিক আযাবও আরম্ভ হবে। এই প্রকার আযাব ও মানসিক দোযখ।

তৃতীয় প্রকার মানসিক জ্বালা হলো পরকালীন সম্পদহীনতার জন্য অনুশোচনা–

www.pathagar.com

এই প্রকার মানসিক জ্বালা জাহান্নামবাসীদের সর্বক্ষণই থাকবে। তবে প্রথম দিকে জান্নাত বাসীদেরও থাকবে। কিন্তু পরে অবশ্য আল্লাহ তাদের সে অনুশোচনা দূর করে দিবেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ করার জন্য নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে সৎ ও সুন্দর গুণাবলীতে বলীয়ান হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এই সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল নিহিত। এর মাধ্যমেই আখেরাতের মূল্যবান সম্পদ তৈরী হয়। কিন্তু যারা দুনিয়ার জীবনে একেবারে আল্লাহর আদেশ নিষেধকে তোয়াক্কা করেনি তারা তো হবে একেবারে সম্পদহীন। অপরদিকে যারা অবহেলায় আমল করতে বার্ধক্যবোধ করতো তারাও পুরাপুরি সম্পদশীল হতে পারবে না। এরা নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী। যখন পরকালের সম্পদহীনতার জন্য আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার গুরুত্ব বুঝে আসবে তখন মনের কোণে লজ্জা ও অবাধ্যতার ঘৃণাবোধ জাগবে। এই ঘৃণাবোধ একপ্রকার মানসিক আযাব এবং তার জন্য সম্পদহীন হওয়াতেও অনুশোচনার অনল হৃদয়কে করবে ক্ষত-বিক্ষত। এক প্রকার যন্ত্রণা ও মানসিক দোযখ।

আল্লাহ বলেন- "প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে সে তা নিজের জন্যই করে; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।"

"হ্যাঁ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে, বস্তুতঃ এ রূপ লোকই দোযখী হয়, তারা সেখানে অনন্ত কাল থাকবে। – (আল- কোরআন)

"কেউ কারও বোঝা বহন করবে না; যদি কারও উপর গোনাহর বোঝা চাপিয়ে থাকে এবং সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য কাকেও ডাকে, তবে সে তার বোঝার কোন অংশই নিজের মাথায় তুলে নিবে না; সে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনই হউক না কেন।" -(আল-কোরআন)

হযরত ইমাম গাজ্জালী (র) কিমিয়ায়ে সা'দাত গ্রন্থে তিন প্রকারের আত্মিক দোযখের কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো- পার্থিব আকাংখিত দ্রব্য হতে বিচ্ছেদ জনিত অগ্নি। লজ্জা বা অপমান জনিত অগ্নি। আল্লাহ তা'আলার অনুপম সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন অনুতাপ জনিত অগ্নি।

মূলতঃ মানুষ যখন পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন তার চোখের পর্দায় অপার্থিব জগতের সম্পদই মূল্যবান মনে হয়। এতে

www.pathagar.com

পার্থিব জগতের সম্পদের প্রতি তার কোন মায়াবোধ থাকে না। কিন্তু পার্থিব জগতের সম্পদের মোহে যেহেতু সে পরকালের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলো তাই সে পরকালের সম্পদহীনতার জন্য আসফোস করবে, অনুশোচনার অনলে পুড়ে মরবে। সে সময় পৃথিবীর ব্যর্থ জীবন ব্যবস্থার সময়ের দিকে ফিরে যাওয়ার আকাংখা বোধ জাগবে। কিন্তু মাতৃগর্ভ থেকে প্রসব হওয়ার সময় যেমন কোন অভাব নিয়ে আসলে তা পূরণের জন্য সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় তেমনি দুনিয়ায় আসতে চাইলেও তার পক্ষে সে অভাব পূরণ করে নেওয়ার জন্য এখানে আসা সম্ভব হবে না। তাই পৃথিবীর ফেলে আসা সময়ের জন্য অনুশোচনায় ফেটে পড়বে। বার বার আকুল ব্যাকুল হয়ে ফরিয়াদ জানাবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে বিরহের অনলেই পুড়তে থাকবে। ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গেলে 'মৃত্যু দূত'কে ডাকবে জীবন বায়ু বের করে নিতে। এরও যখন খবর থাকবে না, তখন আল্লাহর কাছে বেঁহুশ হয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করবে। কিন্তু মৃত্যুর দুয়ারে চিরদিনের জন্য তালা লেগে যাবে। আল্লাহ বলেন-

"আমি তা'দিগকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব, তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল তা তাদের ঐ সব কৃত কার্যের ফল।"

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে তা নিজের জন্যই করেছে।"

-(পারা-২৪ সূরা হা-মীম আস- সাজদাহ)

"যে ব্যক্তি আমার যেকের হতে বিমুখ হয়েছে, নিশ্চয়ই তার জন্য বড় কষ্টময় জীবিকা রয়েছে।" -(পারা-১৬ রুকু-৭)

"তা এজন্য যে তারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিকতর ভালবেসে ছিল। এইরূপ হলে তার শাস্তি বড়ই ভীষণ হবে।"

-(পারা ১৪ রুকু-১৪)

বর্তমান বস্তুজগৎ-এর সকল আকার-আয়তনশীল পদার্থ অসীম শূন্যে সাঁতরাচ্ছে। একে কোথাও খুঁটি পুতে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কতো দিন এভাবে আর সাঁতরাবে? গতি চিরন্তন হওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুক্তিহীন। থার্মোডিনামিক্সের নিয়ম অনুসারেই বিশ্ব ছুটে চলছে অনিশ্চয়তার দিকে। তাই এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী। এ জগৎ (পৃথিবী) থেকে অসীম দূরে বিশাল দ্বীপ জগতের মতো নীহারিকার জগৎ রয়েছে। এর কোনটিতে রয়েছে ঘন কালো ধোঁয়ার মতো অবস্থা। পক্ষান্তরে আরও অসংখ্য নীহারিকা রয়েছে আলোক উজ্জ্বল। এগুলো এতো বিশাল বিশাল যা

www.pathagar.com

আলোকবর্ষের হিসেবেও মাপা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার এদের একটি হতে অন্যটির দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ আলোক বর্ষের অধিক। সে সব দ্বীপ জগতের উপাদান আমাদের পৃথিবীর বিকীর্ণ শক্তির অংশ যে নয় এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তবে শক্তির অবিনশ্বরতার আলোকে এ বিশ্বাস করা যায় যে, এর সাথে বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক আছে। তাছাড়া বেহেশ্‌ত, দোযখের রূপ-চরিত্র, আকার আয়তনের সাথেও এর অনেকটা মিল রয়েছে। আমাদের অসৎ কর্মের বিকীর্ণ শক্তির মাধ্যমে যে শারীরিক আযাব হতে পারে তা সিফলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি রোগ দিয়েই প্রমাণ করা যায়। আমাদের দেহের কোষকলার স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ টিউমার পিন্ডের সাথে সুস্থ কোষকলার কোন সম্পর্ক থাকে না। এটি প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে স্ফীত হওয়ার জন্য সুস্থ কোষকে চেপে ধরে তার স্থলে জায়গা করে নেয়। এর ভিতরে ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির মাত্রার কোন সুশৃঙ্খলতা থাকে না। সুস্থ কোষের স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ এ ধরণের কোষ কলার (নিজে দেহের বিকীর্ণ সত্তা) দ্বারা যদি পুরা দেহ তৈরী করে তার ভেতর আযাবের উপাদান লাগিয়ে দেয়া হয় তবে দেহের স্ফীতির সাথে সাথে আযাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমাদের দুনিয়ার জীবনে, আমাদেরই স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ থেকে যে এরূপ সত্তা তৈরী হতে পারে এর দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরকালের দেহ সত্তার উপাদান জড় পদার্থের ন্যায় স্থূল না হলেও তা যেরূপেই হউক না কেন, সেটি টিউমার পিন্ডের গঠন ও বৃদ্ধির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েই চলবে। তাই দোযখবাসীর এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় এবং তা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে আযাবের মাত্রাও বৃদ্ধি হয়ে চলবে। আল্লাহ, কোন পথে চললে এ ধরণের সত্তা তৈরী হতে পারে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দ্বীন ইসলামই মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এর মাঝেই মানব জাতির কল্যাণের শিখা প্রজ্জ্বলিত। কাল হাশরে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি আমলের (কাজের) সত্তা পরিমাপ করা হবে। তখন যাদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশী হবে; তারাই হবে জাহান্নামী।

আল্লাহ বলেন- " সেদিন নিশ্চিত রূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতপর যার আমলের ওজন ভারী হবে; সেই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে; তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। -(আল-আ'রাফ)

"সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক

www.pathagar.com

পৃথকভাবে বেরোবে। অতপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।" – (আয-যিলযাল-৬-৮)

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেরকৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে। – (আলে-ইমরান - ৩০)

জগৎ সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা একদিন সৃষ্টি হবে এর কোন কিছুই বিলীন হবে না। মানুষ আর জ্বীন ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীই পরকালে সুখ-দুঃখের অংশীদার না হলেও তাদের মৌলিক সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়ার কোন নিয়ম নেই। সেদিনের বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়মনীতি আজকের মতো হবে না। সুখ-দুঃখ সেদিন আলাদা হয়ে যাবে। জাহান্নাম নামের দুঃখের জগতের গন্ধ জান্নাতবাসীদের নাগালের বাইরে থাকবে। সেই জান্নাত পরম সুখ শান্তির স্থান। বিজ্ঞানের আলোকে জান্নাতের সুসংবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পাওয়া গেলে বিশ্বাসের খুঁটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে অনেকের জন্য সহজ হবে। তা না হলে দিক ভ্রান্ত নাবিকের মতো জীবন নদীর শেষ ঠিকানা বা পথ হারিয়ে অন্ধকার জাহান্নামেই ঠাঁই নিতে হবে। সেই বিপদে যেন আমাদের পরতে না হয় সে কামনাই আমাদের সকলের হওয়া উচিত।

জান্নাতের সুখ শান্তির বর্ণনা

এক লোক শীতের রাতে কনকনে ঠান্ডায় লেপ কাঁথা ছুড়ে ফেলে আযান শুনার সাথে সাথে অযু করে স্রষ্টার আনুগত্যের সাড়া দিতে, কল্যাণের জন্য মসজিদে গিয়ে আজীবন প্রার্থনা করেছে। দুনিয়ার সকল অন্যায়, মোহ, মায়া, কাম, ক্রোধ ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের পথে চলেছে। ক্ষিধের জ্বালায় পেঠে পাথর বেঁধেছে তবু চুরি করেনি, ঘুষ খায়নি, সুদ খায়নি, মানুষের সাথে প্রতারণা, ছল চাতুরী করেনি। পোষা প্রাণীর মতো আত্মসমর্পন করেছে খোদার কাছে। রাতের আঁধারে নিদ্রা ত্যাগ করে খোদাকে একান্ত গোপনে স্মরণ করেছে অন্তর দিয়ে, নিজের ভুল ভ্রান্তির জন্য আসামীর মতো দু'হাত করজোড় করে মাফের আশায় চোখ থেকে পানি ফেলেছে টিপে টিপে। পক্ষান্তরে যারা সারা জীবন স্রষ্টার ডাকে সাড়া দেয়নি, অন্যায়, অসত্যের পথে জীবন কাটিয়েছে, তাদের উভয়ের পরকালীন জীবন যদি একি রকম হয়, তাহলে সৃষ্টির বিধানেই তা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে

www.pathagar.com

হবে। বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃতিতে কোন প্রকার অসঙ্গতি সে ঠাঁই দিতে রাজি নয়। যখন কোন স্থানের বায়ু গরম হয়ে ওঠে তখন তা হালকা হয়ে ওপরে ওঠে যায়। এ সময় বাইরের ঠান্ডা বাতাস সে স্থান দখল করতে ছুটে আসে। এখানেও দেখা যায় গরম আর ঠান্ডা এক সাথে মিলে মিশে চলেনি। ফুলে থাকে সুগন্ধ আর পায়খানায় থাকে দুর্গন্ধ। এখানে ফুলের পরিবেশে থাকে ফুলের মতো প্রাণী আর পায়খানার পরিবেশে থাকে সেই শ্রেণীরই প্রাণী। তাই পরকালীন জীবনে ভালো মন্দের পারিপার্শ্বিক অবস্থান একত্রে যে হবে না তা মহা মহিয়ান সৃষ্টিকর্তা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যায় অসত্যের পথে যারা জীবন কাটাবে তাদেরকে জানালেন, হুঁশিয়ারী সংবাদ আর ন্যায় ও সত্যের পথে যারা চলবে তাদেরকে দিয়েছেন, সুসংবাদ।

"দুষ্কৃতিকারীরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের সমান করে দেবো? এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? তারা কি মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছে।" -(আল-কোরআন)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।'

-(আল-কোরআন)

"জান্নাতকে পরহেজগার লোকদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে আর দোযখে পথভ্রষ্ট লোকদের সামনে পেশ করা হবে।" -(শোয়ারা ৯০-৯১)

ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়ার সাথে সাথে পরম করুণাময় জান্নাতবাসীকে কি কি উপহার দিবেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন। জান্নাতে এতো সুখ, এতো শান্তি রয়েছে যা কোন মানুষের পক্ষেই এই ধুলির ধরায় থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন-

"আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সুখের স্থান নির্মাণ করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কোন দিন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারেনি।" -(আল-কোরআন)

"আর খোদার সামনে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক লোকের জন্যে দু'টি করে বাগান আছে। তোমাদের খোদার কোন কোন পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করবে? (সে বাগান) সবুজ শ্যামল ডাল পালায় ভরপুর। দুটি বাগানে দু'টি ঝর্ণা ধারা সদা প্রবাহমান। -উভয় বাগানে

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি ফলের দু'টি রকম হবে। জান্নাতের লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসবে যার অভ্যন্তর মোটা রেশমের তৈরী হবে। বাগানের বৃক্ষশাখাগুলো ফলভারে নত হয়ে আসবে। সেখানে আরও থাকবে লজ্জায় দৃষ্টি অবনতকারিণী-পরমা সুন্দরী। ইতিপূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বীন। তারা হবে অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী রক্ষিত মণি মাণিক্যের মতোই। ভালো কাজের পুরস্কার ভালো ছাড়া আর কি হতে পারে?

সে দু'টি বাগান ছাড়াও দেয়া হবে আরও দু'টি বাগান। ঘনো সবুজ শ্যামল--- সতেজ বাগান। --- দুটি বাগানে দু'টি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্তমান থাকবে। -- তাতে বেশুমার ফলমূল, খেজুর, আনার প্রভৃতি থাকবে। -- (এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে) সতী সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী। --- তাঁবুতে অবস্থানরতা হুরপরী। এসব জান্নাতীদেরকে এর আগে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বীন। এ জান্নাতবাসীগণ সবুজ গালীচা এবং সুন্দর ও মূল্যবান চাদরের উপর ঠেস দিয়ে বসবে।"

– (আর রহমান ৪৬ - ৭৬)

"যারা আল্লাহকেই একমাত্র মাবুদ বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেই বিশ্বাসের উপর অটল রয়েছে তাদের নিকট ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে আসবে এবং তাদিগকে বলবে যে, তোমাদের কোন ভয় নেই। কোন চিন্তা নেই। তোমরা বেহেশতের সুসংবাদ শ্রবণ কর, যা তোমাদিগকে দেয়া হবে। আমরা দুনিয়াতে তোমাদের বন্ধু ছিলাম এবং আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু থাকব। সেখানে তোমরা যা কিছু আশা করবে তা সবই পাবে। ইহাই হবে তোমাদের প্রতি আল্লাহর মেহমানদারী। – (৪১- ৩০)

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎ কার্য করেছে আল্লাহ তায়ালা তাদিগকে এমন জান্নাতে স্থান দান করবেন। যার নিম্ন দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত, বেহেশতীগণ স্বর্ণের কাঁকন পরিধান করবে ও মতির অলংকার ও রেশমী বস্ত্র সমূহের দ্বারা বিভূষিত হবে। – (২২- ২৩)

"মুত্তাকীগণ আখেরাতে অতি উত্তম আশ্রয় লাভ করবে। তা হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আরাম। তাদের জন্য জান্নাতে আদনের দরজা সমূহ উম্মুক্ত রয়েছে, উহাতে তারা পরম আরামে ঠেস দিয়ে বসে নানা প্রকার ফল, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য ফরমায়েশ করবে। তাদের সামনে নিম্ন অবনতা অসামান্য রূপবতী অল্প বয়স্কা হুরগণ অবস্থান করবে। মুমিন

www.pathagar.com

বান্দাদিগকে মহা পুরস্কার দেয়া হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে ছিল ইহাই সেই অফুরন্ত নেয়ামত। -(৩৮ ঃ ৪৯-৫৪)

"তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল তারা জাহান্নামের আযাব হতে দূরে থাকবে। যারা দোযখের আযাবে গ্রেফতার থাকবে; তাদের চীৎকার ও ক্রন্দন এরা শুনতে পাবে না। অধিকন্তু তাদের মন যা চাইবে, বেহেশতের মধ্যে তারা তাই পাবে। তাদের সুখ অনন্ত কাল স্থায়ী হবে, কোনরূপ ভয় বা আতঙ্ক তাদিগকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ফেরেস্তাগণ এসে তাদের সহিত সাক্ষাত করে বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তা হলো এই দিন।

- (২১ঃ ১০১-১০৩)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার সৎ ও নেক আলমকারীর দুনিয়ার কর্মের প্রতিফল হিসাবে জান্নাতে সুখ দিবেন। এই সুখের উপাদান এই দুনিয়া থেকেই পাঠানো হয়। আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমেই সেগুলো তৈরী হয়। হাত পা নাক কান চোখ মুখসহ সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ হতেই সে সত্তা তৈরী হয়। কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় জান্নাতের সুখের খবর বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (সা) নিজেও জান্নাতের সুখ শান্তির কথা বর্ণনা করেছেন। রাসূলের (সা) কথা গুলো ও হাদিস হিসাবে সংকলিত করা হয়েছে। হাদীসের এ সব সন্নিবেশিত বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতে চন্দ্র বা সূর্যের আলো থাকবে না এবং কোন প্রকারের আলো জ্বালাবার প্রয়োজনও হবে না। আল্লাহ্ পাকের আরশের জ্যোতিতে তা সর্বদাই সমভাবে আলোকিত থাকবে। জান্নাতে শীত বা গ্রীষ্ম কিছুই থাকবে না, তা বর্তমান বিশ্বের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক আরামের থাকবে।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন "সেখানে অধিক শীতও থাকবে না; অধিক গ্রীষ্মও থাকবে না। -(৭৬- ১৩)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীগণ যত অধিক পরিমাণে আহার করুক না কেন তজ্জন্য তাদের কোন অসুখ বা অশান্তি হবে না। একটা সুগন্ধিযুক্ত আরাম দায়ক ঢেকুর ও সুঘ্রাণ যুক্ত ঘর্ম তা নিঃস্বরণ করবে। তাদের পায়খানা বা প্রস্রাব সহ কোন প্রকার পয়ঃপ্রণালী প্রয়োজন হবে না। জান্নাত বাসীদের দৈহিক রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাদের কোন প্রকার গোঁফ দাড়ি বা অন্য কোন প্রকার লোম থাকবে না। প্রত্যেক পুরুষ ৩৬ বৎসরের যুবক এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক ২৫ বৎসরের বয়স্কা যুবতী সদৃশ

www.pathagar.com

হবে। তাদের এই বয়স কখনো বাড়বে না অর্থাৎ তাদের রূপ এবং যৌবন কখনও ক্ষুণ্ন হবে না, বা কখনো তারা বৃদ্ধ হবে না। তাদের প্রত্যেকেরই সহবাস ক্ষমতা একশত গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যেক বার সহবাসের পর পুরুষগণ যৌবন এবং স্ত্রীলোকগণ কুমারীত্ব লাভ করবে। তাদের সহবাসের আনন্দ ও একশত ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সহবাসের পর এক প্রকার বিশেষ বায়ু প্রবাহের দ্বারা তাদের বীর্যপাতের কার্য সমাধা হবে সুতরাং তাদের শরীর অপবিত্র হবে না এবং তাদের গোসল করার প্রয়োজন হবে না। জান্নাতবাসীনী স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব হবে না। বেহেশতবাসীগণের খেদমতের জন্য তিন শ্রেণীর খাদেম থাকবে। যথাঃ ফেরেশতা, হুর, গেলমান। এর মধ্যে জান্নাতবাসী প্রত্যেক পুরুষের আপন স্ত্রী ছাড়াও অতিরিক্ত ৭০ জন করে হুর প্রদান করা হবে। তারা এতই সুন্দরী ও লাবণ্যবতী হবে যে, ৭০ পরদা কাপড়ের ভেতর হতেই তাদের রূপ বিজলীর মত ফুটে বের হবে। তাদের চেহারা এমন স্বচ্ছ হবে যে, তদ্বারা আয়নার কাজ চলবে।

হুরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন যে, বেহেশতবাসীগণকে পুরস্কার স্বরূপ এরূপ হুর সমূহ দান করা হবে যারা নিম্নে দৃষ্টি কারীনি এবং যাদিগকে কখনও কোন মানব বা জ্বীন স্পর্শ করেনি। -(৫৫-৫৬)

বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন-

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমতা এবং বেহেশতের দিকে ধাবিত হও যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার সমতুল্য এবং যা এমন লোকের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ঈমান এনেছে। হাদিসে বলা হয় এই রূপ প্রশস্ততার বেহেশত শুধু একজন বেহেশত বাসীকেই দেয়া হবে।

আল্লাহ পাকের মহা পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের সূরা আদ দাহরে বেহেশতীগণের নেয়ামত সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

"পুণ্যবান ব্যক্তিগণ এক অপূর্ব পানীয় পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে।" -(আয়াত সূরা দাহর)

"আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এক বিশেষ প্রস্রবণ হতে তা পান করবে, যা তদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলবে। - (আয়াত ও সূরা দাহর)

" যারা আল্লাহকে ও কেয়ামতের ভয়াবহতাকে ভয় করে, তাদের মানত

www.pathagar.com

পূর্ণ করে এবং আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে দারীদ্র ও ইয়াতিম দিগকে আহার করায় (এরং বলে) (আয়াত ৭-৮। "আমরা তোমাদের নিকট থেকে বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ লাভের আশায় তোমাদিগকে আহার করাইনি, বরং আমরা শুধু আল্লাহর মুহব্বতে এবং সে কঠিন দিনের ভয় রাখি।" (বলেই আহার করাই তোমাদিগকে)" -(আয়াত ৯-১০)

"অতপর আল্লাহ তাদিগকে সেই কঠিন দিনের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করবেন এবং তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে স্ফুর্তি আনন্দ উদ্যান এবং রেশমী পোষাক সমূহ দান করবেন।" -(আয়াত ১১-১২)

"তারা তার ভিতরে উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং সেখানে অধিক শীত ও অধিক গ্রীষ্ম অনুভব করবে না।" -(আয়াত ১৩)

"বাগানের ছায়া সমূহ তাদের জন্য ঝুকিয়ে রাখা হবে এবং বৃক্ষের ফলও পুষ্প গুলোকে নিম্ন গামী করে রাখা হবে।" -(আয়াত ১৪)

"এবং তাদের জন্য রৌপ্যের পাত্রের এবং সোরাইতে তাদের ইচ্ছা মত পানীয় পরিবেশন করা হবে।" -(আয়াত ১৫- ১৬)

"সেখানে তাদিগকে জানজাবিল নামক উৎকৃষ্ট পানীয় দান করা হবে এবং সানসাবীল নামক আরও একটি প্রস্রবণের পানীয়ও তাদিগকে পরিবেশন করা হবে।" -(আয়াত ১৭-১৮)

"তাদের মধ্যে চির কিশোরগণ সর্বদা ঘুরাফেরা করতে থাকবে। তুমি তাদিগকে দেখলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফল বলে মনে করবে।" (আয়াত ১১)

"যখন তথায় (বেহেশ্‌তে) দৃষ্টিপাত করবে তখন অবর্ণনীয় সম্পদ সমূহ দেখতে পাবে।" -(আয়াত ২০)

"তাদের পোষাক সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং পুরু রেশমের জামা এবং তারা ভুষিত হবে রৌপ্যবলয়ে তাদের প্রভু তাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" - (আয়াত -২১)

"(তোমাদিগকে বলা হবে) এটাই তোমাদের বিনিময়।"-(আয়াত- ২২)

জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল মূল সম্পর্কে বর্ণনায় রয়েছে যে বেহেশ্‌তের বৃক্ষগুলোর বাকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। সেখানের প্রত্যেকটি বৃক্ষের বোধশক্তি ও চলন শক্তি রয়েছে। কোন বেহেশত্‌ যদি কোন ফল ভক্ষণের ইচ্ছা করে সেই ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনি সেই ফলের শাখা তার দিকে ঝুঁকে এসে তার মুখের সামনে হাজির হবে। বেহেশ্‌তের বৃক্ষ গুলোর মূল ওপর দিকে এবং শাখা নিম্ন দিকে থাকবে এবং

www.pathagar.com

ফলের কোন রূপ খোসা বা বীজ থাকবে না অর্থাৎ উহার কোন অংশই ফেলে দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

আল্লাহ পাক ঈমানদার বান্দাগণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে–

"যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনে সৎ কাহ করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎ কাজের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতুল মা'ওয়া দান করবেন। তাতে উচু উচু বালা খানা এবং আরাম আয়েশের জন্য অফুরন্ত ব্যবস্থা থাকবে। এটাই হবে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমানদারী।"

জান্নাত বাসীগণের শারীরিক সৌন্দর্য সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সর্ব প্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের সৌন্দর্যের পরিমাণ চন্দ্রের মতো উজ্জল হবে। এবং পরবর্তিগণের দেহের সৌন্দর্য নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জল হবে।

আমাদের এ কথা স্বরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়া এবং পরকালীন বস্তু সমূহের কেবল মাত্র নামেরই মিল রয়েছে। তাছাড়া এখানে শুধু সাদৃশ্য মূলক অস্তিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে পরকালের অনেক বস্তু অবিকল বিদ্যমান না থাকলেও তার মতো সাদৃশ্য মূলক অন্য বস্তু এখানে বিদ্যমান আছে। ইমাম গাজ্জালী (রহ) জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায় বিভিন্ন বস্তু সমূহ এবং প্রাণীকে দুনিয়ার বস্তু ও প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

অনন্ত অসীম জগতের মাঝে আমরা একটি বিন্দুর ন্যায় ও নয়। সে তুলনায় আমাদের জ্ঞান সুইয়ের আগার পানির পরিমাণ ও নয়। আমাদের অন্তর পরিবেশের সাথে এতোই মিলে চলে যে, আমরা একে ত্যাগ করে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না। তাই পরিবেশের বাইরের কোন বিষয়ের জ্ঞান ও স্বাদের কথা উপলব্ধিতে টিকতে চায় না। অথচ জান্নাতে যে কি সুখ আছে তা কল্পনাই করা যায় না। সমুদ্র সন্মান পানিও যদি কালি হয় তবু এর সুখ স্বাচ্ছন্দ লিখে শেষ করা যাবে না। এতো সুখ যেখানে আছে, তার সম্পর্কে আমাদের জানা হলে আমল করা সহজ হবে। আমরা যদি বিজ্ঞানের সাথে জান্নাতের ধর্মীয় বর্ণনা ও ঈমান ও আমলের সম্পর্ক পাশাপাশি চিন্তা করতে পারি তবে বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নেয়া আরও সহজ হতো। তাই সে সম্পর্কটি খোঁজাও মঙ্গলকর।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জান্নাতের অবস্থান ও সুখ-শান্তির সম্পর্ক

জান্নাতের বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক তলিয়ে দেখার আগে, জান্নাত আছে কি নেই, সে বিষয়টি যাঁচাই-বাছাই করে দেখার প্রয়োজন। যারা আস্তিক ও ধর্মের রীতিনীতিতে বিশ্বাসী এবং আমলকারী তাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব জগতের শুরু ও শেষ আছে। তারা মনে করেন, এ জগৎ সৃষ্টির পেছনে একজন মহা পরিকল্পকের মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সৌর পরিবারের পৃথিবী নামক এ গ্রহ ছাড়াও সাত-আসমান যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবি তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এ বিশ্ব জগতের মালিক ও শাসক। এই জগৎ দুই স্তরে বিভক্ত যেমন ইহকাল ও পরকাল। পরকালের কার্যক্রম শুরু হবে দুনিযার জীবন শেষ হলে। সে জগৎ আবার দুই স্তরে বিভক্ত। এর একটিতে আছে পরম সুখ, তার নাম জান্নাত এবং অপরটিতে আছে চরম দুঃখ, তার নাম জাহান্নাম। সে জগৎ চিরস্থায়ী। কিন্তু দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর শুরু আছে, শেষ আছে। এখানে সুখ-শান্তি, দুঃখ–কষ্ট একি পরিবেশে বিরাজ করলেও পরকালের বিধানে সে ব্যবস্থা নেই। ঈমানদার এসব বিষয় নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে। কিন্তু অন্য একদল আছে সন্দেহবাদী। তারা মনে করে পরকাল নামের জগৎ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। অথবা থাকলেই বা কি? মরলে পরে কি হবে এ নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে নাস্তিক ও জড়বাদীরা মনে করে, এই বিশ্বের বস্তুসমূহ সময় আদ্যান্তহীন। এদের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এগুলো আপনা হতেই সব সময় বিরাজ করছিল এবং অনাদিকাল বিরাজ করবে। পরকাল বলতে কিছু নেই। মানুষ উদ্ভিদ ও পশু শ্রেণীর মতোই। এখানেই তার উৎপত্তি। এখানেই তার শেষ। ধর্মের রীতিনীতি হলো মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতার লক্ষণ। এর কোন বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ নেই। যার প্রমাণ নেই, একে বিশ্বাস করাও মূর্খতা বৈ কি?

উপরের তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জন্য কোন দলিল, প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী। এরা ধর্মের কথা সহজ ভাবেই মেনে চলে। গায়েবে বিশ্বাস করাই ধর্মের শর্ত। যারা এ শর্ত মেনে চলে, এদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই। যত সব সমস্যা অন্য দুই শ্রেণীর লোক নিয়ে। এরা না দেখে কিছুই বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

www.pathagar.com

এরা প্রয়োজনে মাতা-পিতাকেও বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তাই এরা পারিবারিক সম্পর্কের ধার ধারতে চায় না। এরা প্রকৃতির পোষাক পড়ে পঙ্গপালের মতো জীবন যাপন করতে ভালবাসে। কিন্তু পরকাল বলতে যে একটা জগৎ আছে, সেটি আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে না পারলেও যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় বিশ্লেষণ করে দেখানো এখন আর কঠিন কিছু নয়। জোড়া রহস্যের নিগূঢ় তাত্ত্বিক ধারণা, গতি জগতের দ্বৈত রূপ স্থিতি জগৎ কিংবা বস্তুর দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তুর জগৎ অথবা Negative dimenssion এর জগৎ হিসাবেও আজ পরকালকে চিন্তা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে শক্তির নিত্যতা সূত্রের বিনাশহীন ধারণা থেকে কর্মের প্রতিক্রিয়ার জগৎ হিসেবেও পরকালকে চিন্তা করা যায়। যেভাবেই আমরা ভাবি না কেন এর মাঝে পরকালের সন্ধান পাওয়া কঠিন নয়। অযৌক্তিক নয়।

এ পৃথিবী ও এ বিশ্ব ব্যবস্থা যে চিরন্তন নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় থার্মোডিনামিক্সের ২য় সূত্র থেকে। এই সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো, এ বিশ্ব একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে ক্রমশঃই ধাবিত হচ্ছে। এর নাম অনিশ্চয়তাবাদ। এ বিশ্বে যখন তাপ সমতা দেখা দিবে তখন তাতে কোন ভৌতিক পরিবর্তন হবে না। এ অবস্থায় বিশ্ব আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মতে স্থান-কাল ও বস্তু পরস্পর নির্ভরশীল। কাজেই বিশ্বের আরম্ভ ও সময়ের শুরু একি সময় হয়েছিল। সুতরাং এ বিশ্বের শুরু এবং শেষ আছে। এসব যুক্তি প্রমাণ থেকে সে বিশ্বাসই জন্মে যে, এ বিশ্ব চিরন্তন নয়। এর ধ্বংস আছে। আবার সেটি নতুন ভাবে রূপ নিবে। যখন নতুন সাজে আবার বিশ্ব কাঠামো সৃষ্টি হবে তখন বর্তমান প্রাকৃতিক আইনের পতন ঘটবে। শুরু হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাকৃতিক নীতিমালা। সেই বিশ্বের যেখানে পরম শান্তি থাকবে সেটির নাম জান্নাত।

আমাদের সৌরজগতের পৃথিবী নামক গ্রহটি সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে তার ঘর সংসার ও প্রকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু সূর্য যদি এক মাসের জন্য তার আহার (শক্তি) দেয়া বন্ধ রাখে, তবে এই পৃথিবী কাঁদতে শুরু করবে। ক্রমশঃ পেটের ক্ষিধেয় অবশ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে সব কিছুতে ঘুম ঘুম ভাব দেখা দিবে। তারপর পৃথিবীর একদিন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে আসবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী ও অন্যান্য উপাদানের বিকীর্ণ

www.pathagar.com

কর্মশক্তি দিয়ে গড়ে উঠছে পরপারের জগৎ। তৎমধ্যে এখানের ঈমানদার নেক আমলকারীর বিকীর্ণ শক্তি দিয়েই তৈরী হচ্ছে তার সুখের বাসর 'জান্নাত'। এখানে কেউ যদি ক্ষণিকের জন্য নেক আমল বন্ধ করে দেয়, তবে তার সুখের নীড় তৈরী সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে। সেখানের রাজ মিস্ত্রিরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। অপেক্ষায় থাকে রসদের অভাবে। তারপর পুনরায় যখন আমল করা শুরু করে দেয় তখন রাজমিস্ত্রিগণ (ফেরেশ্‌তাগণ) আবার কাজে লেগে যায়। এভাবেই চলে দুনিয়ার নেক সত্তা দিয়ে পরপারের জগৎ তৈরীর কার্যক্রম। এ তত্ত্ব ধর্মেরই সারকথা। কিন্তু এ কার্যক্রম আমাদের পক্ষে দেখে আসা সম্ভব নয়। একে যান্ত্রিক ভাবেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখানো আমাদের নাগালের বাইরে। যে জিনিস দেখা যায় না, এবং পরীক্ষা করে বের করা সম্ভব হয় নয়, সেখানে দর্শন ও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যমে হলেও কোনভাবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একটা চূড়ান্ত যুক্তিকে যখন আর কোন না কোনভাবে পরাস্ত করা সম্ভব হয় না, তখন তার ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। বর্তমানে এ রূপ এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরকালের বিশ্বাসকে জড়ালোভাবে স্বীকার করে নেয়ার সন্ধান দিচ্ছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, এ বিশাল বিশ্ব জগতে শুধু বস্তু কণার নীহারিকাই বিরাজ করছে না, তার সাথে প্রতিবস্তুর কণার নীহারিকাও রয়েছে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক।এই অর্ধেক সংখ্যক নীহারিকা ঘন কালো ধোঁয়ার আড়ালে থাকায় দেখা যায় না। আমরা বলতে পারি না এর সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। তাছাড়া সে জগৎটি বস্তু জগতের দ্বৈত রূপের জগৎ থাকায় একে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এর মাঝে পরপারের জগতের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। তাকে অস্বীকার করার মতো কোন যুক্তি দেখানো যাবে না। হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায় জান্নাত জাহান্নামের ওপরেই রয়েছে। অপরদিকে জাহান্নাম ঘোর নিশি দ্বীপের মতোই এবং জান্নাত উজ্জ্বল ও আলোকময়। জান্নাতের অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানের হাতে এর চেয়ে বেশী কিছু আশাও করা যায় না। তবে আমাদের পৃথিবী হতে সুদূর বিশ্বে একেকটি জ্যোতিষ্কের আয়তনের পরিমাপের হিসেব শুনে মনে হয় না এগুলো যে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা বিশ্বের তুলনায় সরিষার দানার মতো এ পৃথিবী যেহেতু অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি সুতরাং শত শত আলোক বর্ষের পরিমাপের একেকটি জ্যোতিষ্ক এমনি সৃষ্টি করা হয়নি। হাদীসে আছে

www.pathagar.com

একজন নিম্ন দরজার বেহেশতী এই পৃথিবীর দশটির সমান একটি বেহেশত পাবে। আর উচ্চ দরজার বেহেশতীর আবাসস্থল যে কত বড় হবে তা কল্পনাই করা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো এ বিশাল নক্ষত্রের জগতের সাথে কি জান্নাতের সম্পর্ক আছে? আমরা তার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ কোন যুক্তি না দিতে পারলেও ওপরের ধারণা থেকে একটা চূড়ান্ত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছতে পারি। তবে এগুলো যে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন যুক্তি কেউ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে মানব চরিত্রের আচার-আচরণের সাথে যে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি জড়িত এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ দুনিয়ার জীবনে এর শত সহস্র প্রমাণ দেয়া সম্ভব। আমরা যদি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমাদের আচার-আচরণের সাথে কষ্ট ও শান্তি জড়িত আছে, তবে পরকালের বিশ্ব ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ গতির সাথে বিপর্যয় ও সাফল্য যে জড়িত এর দৃশ্য সাধারণ মানুষের চোখেই ধরা পড়ে। এর জন্য নিক্তির কোন প্রয়োজন পড়ে না।

আমাদের জীবন নদীতে ঢেউ বা গতির খেলা চলে। এই গতি বা ঢেউয়ের প্রকাশ হয় আচার-আচরণের মাধ্যমে। মানুষের আচার–আচরণ দু'ধরণের। যেমন সাধারণ আচরণ ও জটিল আচরণ। সাধারণ আচরণগুলো অন্যান্য প্রাণীর আচার-আচরণের ন্যায়। যেমন আমরা আহার করি অন্যান্য প্রাণীরাও আহার করে। আমাদের পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, তারাও করে। আমাদের যৌন ক্ষুধা আছে। অন্যান্য প্রাণীরাও এ ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের জটিল আচরণ হলো বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি। মানুষ বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের মাঝে এই উপলব্ধি জ্ঞান নেই। মানব প্রকৃতিতে চিন্তাশক্তির উন্মেষ মহামনের (আল্লাহর) পরিকল্পনার ফসল। এ শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির রহস্য তথা বিশ্বাসের বা ঈমানের পথ ধরে মানুষ চরিত্র গঠনের দিক নির্দেশনা পায়। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। খোদার খলিফা বা প্রতিনিধি। পরিশেষে আমাদের বিশ্বাস থেকেই কর্মের পথ নির্ধারিত হয়। এ থেকে সৃষ্টি হয় কর্মফলের সত্তা। এটি চিরন্তন সত্য ও যুক্তির কথা। কোন গতিযানের চালক, গতির সীমালংঘন করলে যেমন তার মাঝে বিপর্যয় দেখা দেয়, তেমনি মানব আচার-আচরণ একটি সঠিক বিশ্বাসের উপর

www.pathagar.com

স্থির না রাখলে, সেটিও সীমালংঘন করে। তাই সীমালংঘনশীল গতির জন্য মানব জীবনের একূল ওকূল বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়ে পড়ে।

একজন পুরুষ লোক যখন প্রাণী হিসেবে অন্যান্য প্রাণীর মতো যৌন জৈবিক সাধারণ আচরণের সন্ধিক্ষণে তার সহধর্মীনীর সাথে প্রেম নিবেদন করে, তখন মিলনের চূড়ান্ত সময়ে তাদের থেকে উত্তরাধিকারী প্রজন্মের উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ ঐ প্রজন্মের মাঝে তাদের আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। পিতা মাতার স্বভাব, চরিত্র, বর্ণ ও মনমানসিকতা সবি ঐ সন্তান-সন্ততির মাঝে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই সাধারণতঃ ধর্মীয় মূল্যবোধহীন বিকৃত আচরণের পিতা মাতার সন্তান-সন্ততি তাদের অনুরূপ স্বভাব চরিত্রই পেয়ে থাকে। এসব গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য যে জিনিসের মধ্যে লুকানো থাকে তার নাম ক্রোমোজম। আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীর কোষের মাঝে ঐ ক্রোমোজমকে সনাক্ত করতে পারলেও ক্রোমোজমের যে অংশে ঐ পৃথক পৃথক গুণগুলো লুকিয়ে থাকে তা দেখতে পারি না, কিংবা এর মধ্যে চরিত্র অথবা গুণের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। মূলতঃ গুণ হলো স্বীকৃতির জিনিস। এটি বিশ্বাস ও উপলব্ধির ব্যাপার। অথচ 'গুণ' গতি বা আচরণের প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টি হয়। যেমন উনুনে হাড়ির মধ্যে পানি বসিয়ে তাপ দিলে, পানি গরম হবে। তাপে পানি ও হাড়ির সূক্ষ্ম পরমাণুর গতি বৃদ্ধির ফলেই তার স্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তন হয়ে গরম অনুভব হয়। কিন্তু এই গরম বোধ হওয়ার অনুভূতিটি স্বীকৃতির ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে 'গরম' নামের বৈশিষ্ট্যটি কেউ দেখতে পারে না। আচরণ দেখে বুঝা যায় সেটা কোন প্রকৃতির গুণ নিবে। আমাদের আচরণের ওপরও তাই কর্মের গুণ নির্ভর করবে। পৃথিবীতে আমাদের সাধারণ আচরণের উত্তরাধিকারী প্রজন্মের চরিত্র ভাল না হলে পিতা-মাতাসহ সমাজ জীবনের অন্যান্যরাও কষ্ট পায়, ব্যথা পায়। অন্যদিকে উত্তম চরিত্রের হলে সুকৃতি বাড়ে, পিতা-মাতা ও সমাজ উপকৃত হয়। এরা পিতা-মাতার সাধারণ আচরণ থেকে মাতৃবাস হয়ে পৃথিবীতে আসে। তাদের চরিত্রের প্রভাব এদের গায়েও লাগে। সন্তানের চরিত্রের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রভাব মাতা পিতাকে আনন্দ সুখ অথবা যন্ত্রণা দিতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের জটিল আচরণ হলো বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগানোর বেলায় ন্যায়-অন্যায় পরাক করে

www.pathagar.com

চলতে হয়। বিবেক নামের এক প্রহরী আমাদের সেই কাজটুকুই করে দেয়। যাদের মাঝে এর সবগুলো বৈশিষ্ট্য পুরাপুরি ঠিক থাকে তারা এ বিশ্বের প্রভু বা মালিকের আনুগত্য স্বীকার করে। তাঁর আদেশ নির্দেশ মেনে চলে। স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর করুণা প্রকাশ করে। তখন এই জটিল আচরণ সত্তা পয়দা হয়। এর মাতৃবাস হলো মন ও দেহ কোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম কুটুরী। এগুলো সেখান থেকে প্রসব হয় ঢেউ বা তরঙ্গের আকারে। একটি সূক্ষ্ম তরঙ্গের মাঝেও তার চরিত্রের গুণগুলো বা কর্মের ছাপ লেগে থাকে। এই সম্পদ পরপারের নিয়ামত তৈরীর কাজে লাগবে। কিন্তু যারা চিন্তা ও বিবেককে একযোগে কাজে লাগাতে পারে না তাদের বিশ্বাস স্থির থাকে না। এতে চরিত্র বলতে কোনো বৈশিষ্ট্য তার মাঝে পাওয়া যায় না। তখন এরা দুনিয়ার মোহবিষ্ট হয়ে পড়ে। দুনিয়ার মোহ জীবন পদ্ধতির ওপর শয়তানের আচরণ ভর করে। ফলে তারা তারই শিষ্য হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তাদের কর্ম থেকে নিকৃষ্ট মানের সত্তা পয়দা হয়। এগুলো রোগ জীবাণুর মতো আমাদের দেহ ও আত্মার বৈরী সত্তা। উল্লেখিত দৃষ্টান্তের আলোকে বলা যায় আমাদের সাধারণ আচরণের সন্তান সন্ততির মাঝে যেমন ভালো মন্দ গুণ বিরাজ করে তেমনি জটিল ফলে আচণর অদৃশ্য সন্তানের মাঝেও দু'ধরণের গুণই বিরাজ করে। তবে এদের চরিত্র একটু ভিন্ন। এরা জন্মের সময় পৃথক হয়ে যায়। তাই একি জিনিসের মাঝে দুই গুণ থাকে না। এই সত্তাগুলো নিজেরদের চরিত্র অনুযায়ী তার পিতাকে আনন্দ-ভালবাসা, সুখ-শান্তি দিবে অথবা খারাপ চরিত্রের হলে জ্বালাতন করবে, কষ্ট দিবে। এ পর্যন্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো বিকীর্ণ শক্তি। বিকীর্ণ শক্তির স্বভাব ভালো-মন্দ যে হতে পারে তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের এ জগৎ গতির জগৎ। যেখানে আবর্তন নেই, সন্তরণ নেই, সেই স্থিতি জগতে এ সত্তার গুণাগুণ প্রকাশ পাবে। কারণ দুনিয়ার বর্তমান প্রাকৃতিক আইন চালু অবস্থায় সেগুলো গুপ্তই থাকবে, তাই এ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দুনিয়াতে যতটুকু জানা ও দেখা সম্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে যারা ধর্মীয় অনুশাসনহীন অন্যায় ও অসৎ পথে চলে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় লিপ্ত থাকে, তাদের এ আচরণ থেকে পৃথিবীতেই যেসব বৈরী সত্তা পয়দা হয়, এগুলো এ জীবনে কষ্ট দেয়, বেদনা দেয়।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে এইডস, সিফলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি জীবাণু প্রধান। কিন্তু উত্তম ও আদর্শ চরিত্রের লোকের মধ্যে এই রোগ হওয়ার প্রশ্নই দেখা দেয় না। এ থেকেই অনুমান করা যায়, উত্তম আমলের সত্তা মঙ্গলদায়ক ও শান্তিদায়ক হবে।

ঈমানী শক্তি আদর্শ মানব গড়ার মূল ভিত্তি। যারা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর আদেশ নির্দেশ মেনে চলবে তারাই আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে ওঠবে। সেজন্যই ঈমানী শক্তি মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যারা ঈমান ও উত্তম আমলের ধার ধারে না তাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন-

"তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।"—(পারা ২৬ সূরা আহকাফ, রুকু-২)

"কিয়ামতের দিন মানুষ সৎ কর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।"—(আল-কোরআন)

"তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল তারা জাহান্নামের আযাব হতে দূর থাকবে।" —(আল-কোরআন)

"যারা আমার নির্দশন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের আমল নিষ্ফল; তারা যা করে তদানুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।"

—(সূরা আহকাফ, পারা ৯, আয়াত-১৪৭)

রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষ, কবরের আযাবের উপাদন এই পৃথিবী থেকেই সংগে নিয়ে যাবে। যেমন- তা আর কিছুই নয়, তোমাদের কৃত কার্যসমূহেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।"

—(আল-হাদীস)

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট জগতের মধ্যে মহাকাশের কোন ঠিকানায় আমাদের দুনিয়ার কর্মের বিকীর্ণ সানগুলো জমা হয়ে, নতুন সাজে ঘর তুলছে তা আমরা জানি না। এই মহাকাশের বিস্তৃতি এতো অসীম যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর

www.pathagar.com

থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত মহাকাশের এমনও তারা আছে যার আলো এখনও এসে পৃথিবীতে পৌঁছেনি। অথচ আলোর গতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। মহা বিশ্বের বিশালত্বের মাঝে পৃথিবী একটি সরিষা দানার মতোও নয়। কিন্তু এ বিশাল সৃষ্টি কার জন্য? এ সৃষ্টি কি অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? তার পেছনে কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই? আমরা গতির জগতে, গতির ধাঁধাঁয় পড়ে, না পাচ্ছি এই জগতের কূল-কিনারা, না দেখতে পাচ্ছি স্থির কোন জিনিস। তাই ওপরের প্রশ্নের কোন সূত্র দেয়া সম্ভব হয় না। তবে এটুকু বলতে পারি, যখন এ গতির জগতের গতি স্থির হয়ে যাবে তখন এ বিশ্ব অবশ্যিই নতুন কিছু উপহার দেবে।

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার একটি নমুনা তুলে ধরে ছিলেন।

তা এ বইয়ের গতি ও স্থিতি জগৎ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত এ ধরনের তাত্ত্বিক কথার কোন আগা- গোড়াই টের করতে পারতাম না। কিন্তু বার বার যখন হৃদয় নয়নের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তার মাঝে চোখ বুলাতে ছিলাম তখন গতি আর স্থিতির দৃশ্য মনের আরশিতে ভেসে উঠল। এরপর দেখি এই মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে রয়েছে। তরঙ্গ আর তরঙ্গ। এ তরঙ্গের ঝাঁক বা পুটুলী থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এই কঠিন পদার্থ। এসব কঠিন জিনিস এখনও খায় তরঙ্গ আবার ত্যাগ বা বিকীর্ণও করে তরঙ্গ। মানুষের আচরণ যদি সীমালংঘন করে তাহলে তার বিকীর্ণ তরঙ্গ অবক্ষয় হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আচরণ যদি সরল গতির হয় তবে তার বিকীর্ণ তরঙ্গ উৎকর্ষতা লাভ করবে। এই উৎকর্ষ তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ উড়ে গিয়ে ধরা পড়বে স্রষ্টার মহাসৃষ্টির ওপার জগতের গ্রাহক যন্ত্রে। এ থেকেই সৃষ্টি হবে, তার সুখময় জগৎ। প্রকৃতির অসীম রহস্যের লীলা ভূমিতে মানুষগুলো জীবন্ত মেশিন। এই মেশিন টি'ভির প্রেরক যন্ত্রের মতো তরঙ্গ পাচার করে। ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানব আত্মা দেহের কর্মশক্তিকে বিদর্শন বা স্ক্যানিং করে দেয়। এই স্ক্যানিং বিন্দু বা তরঙ্গ এক রকম নয়, আলোক তরঙ্গতে যেমন খাটো তরঙ্গ (Short wave), মাঝারি তরঙ্গ (Medium wave) এবং লম্ব তরঙ্গ (Long wave) থাকে তেমনি এরও রয়েছে অনেক রূপ, অনেক প্রকৃতি। কোন প্রকৃতির তরঙ্গ স্রষ্টার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে, সেটি খোদাই ভাল জানেন। তাই তিনি জারী করেছেন, জীবন

www.pathagar.com

নীতির বিধান। সেজন্য ঈমান ও আমলের মাঝে আছে এক মহা রহস্যময় শর্ত। এ দুই শর্ত এক না হলে আমলের বিকীর্ণ কর্মশক্তি গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। এতে তার সুখময় সংসার তৈরী না হয়ে সেগুলো অবক্ষয় হয়ে যাবে। এর দ্বারা তৈরী হবে নিকৃষ্ট এক নিশি জগৎ। তাই ঈমান ও আমলের মহা রহস্যময় শর্তের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক বিরাজমান। সেই রহস্য না ধরতে পারলে আমলের গুরুত্ব কমে যায়। বার বার অনীহা ও বার্ধক্য দেখা দেয় নেক কাজে। অতপর ঈমান ও আমলের রহস্যময় শর্ত কি সেটি আমাদের জানার বিষয়।

ঈমান ও আমলের রহস্যময় শর্ত

দ্বীন ইসলামের মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে মনে ও মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান। ঈমান চরিত্রের মানসিক ভিত্তি। দ্বীনের কথা গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমনিভাবে আকড়ে ধরা যেন শত প্রতিকূল অবস্থায়ও এর মাঝে কোন সন্দেহ বা দুর্বলতা প্রকাশ না হয়, তবেই ঈমানের শর্ত মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। ঈমানের শর্ত পূরণ না হলে মানবিক ক্রিয়াকান্ড ও কাজকর্ম বিছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। আমরা অনেক সময় বলি লোকটি চরিত্রহীন। এতে এ কথাই বুঝাই যে, লোকটির কোন ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই। মূলতঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো চরিত্রের মাপকাঠি। মানুষের মনের চিন্তাধারার ওপর জীবনের সকল কাজকর্ম ও চলন-বলন নির্ভরশীল। ঈমানের শর্ত পূরণ হলে তার কর্মকান্ড সুবিনাস্ত ও সুসংহতভাবে সম্পাদিত হয়। মানব জীবনের প্রতিটি কাজ কর্মকে বলা হয় আমল। এই আমল কবুল হওয়া না হওয়ার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মের ক্ষেত্রে নিগূঢ় রহস্য বিরাজমান। আমরা খাদ্য থেকে দৈহিক শক্তি পাই। এ শক্তি আমরা কর্মের (আমলের) মাধ্যমেই বিকীর্ণ বা ব্যয় করি। সে বিকীর্ণ কর্মশক্তি তরঙ্গ বা ঢেউ এর ন্যায় প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির শিরা উপশিরাতে গুপ্ত বা অদৃশ্য সৈনিক আছে, আছে অদৃশ্য বা গুপ্ত স্নায়ু পথ। এ পথে নিয়ন্ত্রণ হয় তার সমস্ত ক্রিয়াকান্ড। এ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে না বলে তার খবর আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয়। আমাদের ঈমান ও আমলের কর্মকান্ড যদি একই শর্তে না থাকে তবে সেই বিকীর্ণ ঢেউ

www.pathagar.com

প্রকৃতির স্নায়ু ব্যবস্থার অসমান্তরালে চলতে থাকে, ফলে সেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কিন্তু ঈমান ও আমলের শর্ত এক হলে সে সত্তার (বিকীর্ণ কর্মশক্তি) মধ্যে এমনি এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য জমা হয় যার জন্য সে সত্তা প্রকৃতির গুপ্ত স্নায়ু ব্যবস্থার সাথে সমান্তরালে চলতে পারে। এতে থাকে ইলেকট্রো- মেগনেটিভ ওয়েভের ন্যায় গতি সম্পন্ন 'পাখা'। এ 'পাখা' এতো দ্রুত কাপুনি দেয় যার জন্য তার মাঝে আলোর চেয়েও বেশী গতি থাকে। এই গতিতে সেগুলো নিজ জগৎ থেকে উর্ধ্ব জগতে চলে যায়। সমান্তরালে চলার ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। টিভির প্রেরক যন্ত্র যেমন কোন চিত্রকে স্ক্যানিং বা বিদর্শনের মাধ্যমে বিন্দুতে রূপান্তরিত করে শূন্যে ছেড়ে দেয়। তারপর সেগুলি গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। সেদিক থেকে মানুষের দেহ রাজ্যটি হলো একটি জীবন্ত স্ক্যানিং মেশিন। আত্মাই এর চালক। এই যন্ত্র দিয়ে টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্রের স্ক্যানিং সিস্টেমের মতো তরঙ্গের দানা বের হয়ে উড়ে যায় শূন্যে। চালকের চরিত্র হলো এই মেশিনটিকে সুবিনাস্ত ও সুসংহত ভাবে চালানোর কৌশল। কিন্তু চরিত্রের মূলনীতি গড়ে ওঠে ঈমানের মাধ্যমে। যদি উভয় শর্ত একযোগে চলে তাহলে প্রকৃতির গুপ্ত ব্যবস্থার পথ ধরে ব্যক্তির কর্মের বিকীর্ণ সত্তা সমান্তরালে চলতে পারে। অথচ এই শর্তগুলোর কোন একটিতে গোলমাল থাকলে পুরা সিস্টেমটির কার্যক্রমে গোলমাল থেকে যায়। যেমন ঈমান না থাকলে আমল ভালো হলেও এর দ্বারা কোন কাজে আসবে না। এ ছাড়া ঈমান বা বিশ্বাস কিছুটা দৃঢ় হলেও আমল খারাপ থাকলে তার কোন মূল্য হবে না।

আল্লাহ বলেন–"যে কেউ ঈমান আনতে অস্বীকার করে তার যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে।"

—(আল-মায়েদাহ-৫)

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কিসের বাধায় মানুষের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আমরা জানি আমাদের দেহ কোষের সূক্ষ্ম কণাতে জ্যোতি বা আলোক আছে। সাধারণতঃ জ্যোতি বা আলোকের ধর্ম সরল পথে চলা। কিন্তু সরল পথে চলার কথা থাকলেও অনেকের আচরণ বা গতি সহজ সরল হয় না। এর মূল কারণগুলো হলো লোভ, মোহ,কাম, ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা।

www.pathagar.com

মানুষের সরল জীবন যাপনে এগুলো যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন সে বাঁকা পথে চলে।

আল্লাহ্ বলেন— "হে মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে, তা থেকে খাও এবং কোনো ব্যাপারে শয়তানের আনুগত্য করো না; কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো তোমাদেরকে পাপাচার, নির্লজ্জতা এবং খোদার সম্পর্কে যা তোমরা জানো না এমন কথা বলবার নির্দেশ দেয়।"

—(আল-কোরআন)

"আসল ব্যাপার এই যে, যারা আমাদের সাথে (আখেরাতে) মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমাদের নির্দেশগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে; তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐ সব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তার (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্ম পদ্ধতির দ্বারা) করেছে।"

—(ইউনুস ৭-৮)

পৃথিবীর জড়বস্তুর কণাগুলো চক্র বক্র এবং এপাশ ওপাশ গতিতে চলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এসবের মধ্যে থাকে অতৃপ্তি। এ ক্ষেত্রে অনেক পেয়েও সুখ পাখিকে ধরা যায় না। কিন্তু যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ নেই সে না পেয়েও থাকে সুখী। তাই সে বিশৃঙ্খল জীবনের ধার ধারে না। প্রকৃত পক্ষে যারা জড়তার মোহে পড়ে যায় তাদের আচরণ সহজ সরল হয় না। তখন শয়তানের কুদৃষ্টি তাকে আছড় করে। এর ফলে নৈতিক মূল্যবোধ লোপ হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রবৃত্তিও লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। তখন জীবন ব্যবস্থার কোন নীতি থাকে না। যখন যা মন চায় তখন তাই করে। এরূপ মানুষের জীবন নীতি থাকে না। যখন যা মন চায় তখন তাই করে। সে জন্য মানুষের জীবন্ত স্ক্যানিং মেশিনের আচরণে দেখা দেয় বৈরীভাব। এর ফলে এই যন্ত্র দিয়ে যে শক্তি বের হয় তার নৈতিক মান নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এগুলো প্রকৃতির সিস্টেমের সাথে সমান্তরালে চলতে পারে না। কারণ পরম সত্তার (আল্লাহর) সাথে প্রেম বা আকর্ষণ না থাকায় এ বিকীর্ণ শক্তির 'তড়িৎ পাখা' হারিয়ে ফেলে। এতে এই কণাগুলো খোদার নির্ধারিত সূক্ষ্ম গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এ ধরণের নিকৃষ্ট

কণাগুলো মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে এমন এক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিতে থাকে, যা দিয়েই সৃষ্টি হয় তাদের জন্য মহা কষ্টের স্থান। এরি নাম জাহান্নাম।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, টিভির গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের মাঝে যোগসূত্র না থাকলে, প্রেরক যন্ত্রের স্ক্যানিং বিন্দুগুলো গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এর ফলে গ্রাহক যন্ত্রের বিন্দুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় না। এগুলো গ্রাহক যন্ত্রে ধরা না পড়লেও শূন্যেই বিরাজ করতে থাকে। পক্ষান্তরে প্রেরক যন্ত্রের বিদর্শন বিন্দুগুলো যদি সুচারু ও প্রযুক্তিগত না হয় তবে সেগুলোও গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। সে জন্য গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের মাঝে সমতা ও যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। এ বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এবং নীতিগত বন্ধন থাকা প্রয়োজন। আমরা যদি টিভির গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য করি তবে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

টিভির প্রেরক যন্ত্র একটি চলন্ত চিত্রকে অসংখ্য বিন্দুতে বিভক্ত করে। একে বলা হয় স্ক্যানিং বা বিদর্শন। ইলেকট্রন রশ্মিকে দৃশ্যের প্রতিচ্ছবির উপরে বাম দিক থেকে বিন্দুগুলোর ওপর দিয়ে লাইন বরাবর নিয়ে যাওয়া হয়। এই রশ্মিটি দৃশ্যের আলো ছায়ার তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক অনুজ্জ্বল বিন্দুগুলোকে কম জোড়ালো বিদ্যুতের ঝলকে পরিবর্তিত করে। তারপর আবার ঠিক পরের লাইনটি এভাবেই বিন্দুতে পরিণত করে পাঠানো হয়। এরূপ একটির পর একটি বিন্দুর সাহায্যে সমগ্র দৃশ্যটি অসংখ্য সূক্ষ্ম ঝলকে বিভক্ত হয়ে তরঙ্গাকারে প্রচারিত হয়। এদিকে টিভির গ্রাহক যন্ত্র বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুত ঝলককে বিভিন্ন আকারের আলোক বিন্দুতে পরিণত করে। এ কাজ এতো দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, চলমান দৃশ্য প্রদর্শনের সময় টিভির পর্দায় এ বিন্দুগুলো মিশে একাকার হয়ে যায়। এমনি অসংখ্যক বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত ছবিই আমরা টিভির পর্দায় দেখে থাকি। মূলতঃ এখানে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের যান্ত্রিক কৌশলেই প্রতিচ্ছবি আলোক বিন্দুতে পরিণত হওয়ায় উজ্জ্বল ও দৃশ্যমান চিত্র দেখা যায়। কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র না থাকে তাহলে প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে না। আবার একটি ভালো থাকলেও অন্যটি খারাপ হলে কোন লাভ হবে না। এ থেকে বুঝা যায় প্রেরক যন্ত্রের ত্রুটির জন্য গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবস্থা যতই ভালো

www.pathagar.com

হোক না কেন তার পাঠানো আলোক রশ্মি গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। আমরা সাধারণ লোক যখন কোন প্রেরক যন্ত্রের সামনে না গিয়ে কথা বলি তখন আমাদের রেডিও ওয়েভ থাকে না বিধায়, সেগুলো কোন রেডিও বা বেতার যন্ত্রে ধরা পড়ে না। তাই রেডিও ওয়েভ সৃষ্টির জন্য যান্ত্রিক কৌশলের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে গিয়ে কথা বললে ঐগুলো বেতার যন্ত্রে ধরা পড়বেই। কিন্তু রেডিও ওয়েভহীন যে সব শব্দ আমরা করি, এগুলো কি ধ্বংস হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। কারণ শক্তির ধ্বংস বা ক্ষয় বলতে বিজ্ঞানে কোন কথা নেই। কার্যতঃ শক্তির শুধু গুণগত মানের পরিবর্তন হয়ে থাকে। মানুষের জীবনী শক্তির বিকীর্ণ সত্তার বেলা ও একই কথা প্রযোজ্য। এরও কোন ধ্বংস বা ক্ষয় নেই। ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে যে সত্তা বিকীর্ণ হয়, সেগুলোতে প্রকৃতির গুপ্ত বিধানের সাথে চলাচলের সঙ্গতিপূর্ণ গুণ থাকে। প্রকৃতির কাজ এ কূল ভাঙ্গা ও কূল গড়া। সৃষ্টির বিধানে দুনিয়ার বাইরে আমাদের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে যে কূল গড়ছে সেটিই পরজগৎ। পক্ষান্তরে প্রকৃতির বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সত্তাকে বলা যায় নেক বা পুণ্য। অপরদিকে অসঙ্গতিপূর্ণ সত্তার নাম পাপ বা গোনাহ্।

আল্লাহ বলেন- "যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎ কাজগুলো হবে ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড় ঝঞ্ঝার দিনে প্রচন্ড বায়ু বেগে সে ভষ্মস্তূপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে, ঠিক সে সৎকাজ গুলোর কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল" —(ইব্রাহীম-১৮)

"তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন ইস্‌লাম থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের সকল স ৎকাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" —(বাকারাহ-২৭১)

খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব নিবীড়। ঈমান হলো একত্ববাদের মজবুত প্রেম। এই প্রেম থেকে সৃষ্টি হয় আর্কষণ। অতপর এই আকর্ষণ থেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নিবীড় সম্পর্কের যোগসূত্র পয়দা হয়। ফলে মানব আত্মার মাঝে স্রষ্টার গুণের কিঞ্চিত প্রকাশ ঘটে। এতে প্রাণ হয়ে যায় সজীব ও সতেজ। তখন দৈনন্দিন কর্ম বা আমল দ্বীনের নীতি বিরুদ্ধ হয় না। মূলতঃ নেক আমলগুলো হলো স্থিতি কণা বা নেক রশ্মি উ

www.pathagar.com

ৎপাদনের প্রক্রিয়া। ইলেক্ট্রোন রশ্মি যেমন প্রতিচ্ছবিকে বিদ্যুতের ঝলকে পরিণত করে তেমনি ঈমানী শক্তির ঢেউ কর্মের বিকীর্ণ শক্তিকে জ্যোতিপূর্ণ ঝলকে পরিণত্র করে খোদার ব্যবস্থাপনার গ্রাহক যন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকে। এসব নেক রশ্মি দিয়েই পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দার সুখের সংসার তৈরী করবেন। এমন জ্যোতিপূর্ণ জগতে রাত থাকবে না, সূর্য থাকবে না, রোগ যন্ত্রণা, মৃত্যু ক্ষুধা বলতে কিছুই থাকবে না। সময় সেখানে হবে স্থির। গতির ঘটবে মৃত্যু। জড় আকার বা জড় পদার্থের কোন বাতাস সেখানে থাকবে না।

কোরআন ও বিজ্ঞানের যুক্তি ছাড়া কোন কথাই স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। 'নেক' সত্তা খোদার নিকট জমা থাকে। আবার নেক আমল যথাযথ মানের না হলে সেগুলো খোদার নিকট পৌঁছে না। এরূপ আমল শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। আমাদের হাত, পা, নাক, কান, মুখ, জিহবা ইত্যাদির মাধ্যমে নেক ও গোনাহ হয়। তাহলে এই নেক বা গোনাহ্ কি? আমি দীর্ঘ আলোচনায় নেক বা গোনাহকে কর্ম জীবনের বিকীর্ণ শক্তির সাথে তুলনা করেছি। আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় বিকীর্ণ শক্তির মতো গুণশীল কণাকে বলেছি নেক বা সওয়াব। পক্ষান্তরে অস্বচ্ছ ও অনুজ্জ্বল কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তিকে বলেছি গোনাহ বা পাপ।

দুনিয়াতে মানুষ যখন কর্মে লিপ্ত থাকে তখন তার কর্মের প্রতিচ্ছবির দানাগুলো আলোক রশ্মি গায়ে মেখে মহা শূন্যের দিকে নিয়ে যায়। আলোক রশ্মি প্রতিবিম্বগুলো কর্মের বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি। একবার যে আলো ছবি তুলে নিয়ে যায়, সে আর কোন দিন ফিরে আসে না। তার দৌড় যে কোথায় গিয়ে থামে তাও আমরা বলতে পারি না।

এগুলো হয়তো প্রকৃতির গায়ে টেপ হতে থাকবে। যার নাম হয়তো আমল নামা। আজ আমরা ঈমান ও আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছি না বলে, কোন কাজেই গুরুত্ব দিয়ে করতে পারছি না। কিন্তু যে দিন পুণ্য উপার্জনের দরজায় তালা লেগে যাবে সেদিন হয়তো আফসোস করব। তখন অনুশোচনার মানসিক পীড়ায় কাতর হয়ে দোযখের অগ্নির উত্তাপ ভোগ করতে হবে। সেদিন তো মৃত্যু হবে না, সময় যাবে না, তখন উপায় কি হবে! পরকালে কেন সময় যাবে না সে আর এক রহস্যের কথা। তাই সময় স্থির হওয়ার আগেই পৃথিবীতে পুণ্য সত্তার সন্ধানে বের হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

পরকালের সময় স্থির কেন?

পরকালে সময় যাবে কি, যাবে না, চন্দ্র সূর্য উঠবে কি উঠবে না, এরূপ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। সময় খুব জটিল জিনিস। এর না আছে কোন আকার, আকৃতি, না আছে কোন স্ট্যান্ডার্ড মাপ। সর্বত্রই এর লোকাল স্বভাব। আছে তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিমাপ। বর্তমান বিশ্বে যেখানে আবর্তন আছে, সেখানে ঘড়ির কাঁটার মতো সময় বার বার ঘুরে ফিরে আসে। মনের ঘড়িতেও এক ধরণের আবর্তন হয়। এই আবর্তনের কারণ কোন প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা। অথচ মনের ঘড়িতে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া না হলে সেখানে সময় যায় না, আবর্তনও হয় না। তাই সময়ের হিসাব দু'দিক থেকে কার্যকরী। যখন এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যসহ আকাশের যাবতীয় তারকাগুলোর গতির ঝরণা বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন ঐগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে খসে পড়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। এতে করে বিশ্ব আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে হাশরের বিশাল মাঠে পরিণত হবে। তারপরে নতুন যে বিশ্ব ব্যবস্থা গঠিত হবে সেখানে থাকবে না চন্দ্র, সূর্য কিংবা থাকবে না সূর্যের মতো কোন আবর্তনশীল নক্ষত্র। কার্যতঃ ঐদিন আবর্তনশীল গতির মৃত্যু ঘটবে। রাতের জায়গায় শুধু রাত্রি আর রাত্রি বিরাজ করবে। দিনের জায়গায় শুধু দিন। যেখানে রাত থাকবে, সেখানের আকাশ থাকবে কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ায় ঢাকা। কোনদিন সেখানে সূর্য উঠবে না। অপরদিকে যেখানে শুধু দিন থাকবে, সেখানের আকাশ খোদার আরশের জ্যোতিতে থাকবে সর্বক্ষণই আলোকিত। গতির সম্পর্কের কোন উপাদান সেখানে থাকবে না। অর্থাৎ সেখানে পদার্থ বলতে কিছুই রবে না। মৃত্যু থাকবে না। ফলে গতির দ্বৈত প্রকৃতি স্থিরতাই সেখানে বিরাজ করবে। তখন বস্তুর দ্বৈত রূপের নতুন বিশ্ব কাঠামোতে আমরা লাভ করব চিরস্থায়ী জীবন। আবর্তনহীন, গতিহীন, স্থিরতার মাঝে যেহেতু জীবন চাকা ঘুরবে, সেজন্যই সেখানে আবর্তনশীল সময়ের কোন হিসেব থাকবে না। ফলে সময় সেখানে হবে স্থির। সেদিন কারও পক্ষে আর চান্দ্র মাস কিংবা সূর্য কেন্দ্রিক বছরের হিসেব নিতে হবে না। কিন্তু সেখানে আবর্তনের

www.pathagar.com

সময় স্থির হলেও অনেকের মনের ঘড়িতে সময় ওঠানামা করবে। কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া না হলে এই সময়েরও কোন হদিস থাকবে না। সেদিন যাদের মনের অনুভূতিতে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ছোঁয়া পড়বে, সেই শুধু সময়ের ওজন করতে পারবে। কিন্তু সেই রাজ্যে যেহেতু কারও মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, সেজন্য এদের কাছেও সময় যেতে চাইবে না। তাই পরকালে 'সময়' সব দিক থেকে স্থির মনে হবে। এ পৃথিবীতে রাত যায়, দিন আসে। সাময়িকের জন্য হলেও মৃত্যু সকল প্রকার কষ্টকে (পৃথিবীর রোগ বালাই) দিয়ে দেয় পরিত্রাণ। তাই কেউ যদি রোগ যন্ত্রণায় ভোগতে ভুগতে অতিষ্ঠ হয়ে যায় তখন সে নিজেই মৃত্যুর প্রার্থনা করে। আমরাও বলি এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু পরকালে যেহেতু মৃত্যু হবে না, সেজন্য যাদের মনের অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া চেপে বসবে তাদের কাছে সময় অসীম মনে হবে। অন্যদিকে যারা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে, তাদের মনে সময় জ্ঞান তো জাগবেই না, সেই সাথে আবর্তনের সময় অচল থাকায় সে সময়ের কোন টেরই পাবে না।

এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পরকালে যে স্থিরতা বিরাজ করবে এর প্রমাণ কি?

গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব, এটি বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা, দর্শনের কথা। আমাদের সামনে দিয়ে যখন কোন গাড়ি চলে যায়, তখন আমরা মনে করি এই গাড়ি কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে। এটা সত্য যে, এই গাড়িটি এক সময় স্থির অবস্থান থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। আবার সেটি তার গন্তব্যে পৌছে দাঁড়িয়ে যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তায় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও সেটি দাঁড়াতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য যান্ত্রিক ক্রটি দূর করে আবার গতি সচল করা সম্ভব। কিন্তু গতিশীল বিশ্বে এ যুক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রগুলো যদি একবার তার গতি হারিয়ে বসে তাহলে তাদেরকে কেউ মাথায় নিয়ে বসে থাকতে পারবে না। বরঞ্চ এই গতির জগৎ উদ্দেশ্যের গন্তব্য স্থানে পৌছলেই তার মাঝে স্থিরতা এসে যাবে, এটিই যুক্তির কথা। গতির দ্বৈত প্রকৃতি হলো স্থিরতা, সেজন্য সেটিই

www.pathagar.com

হওয়া স্বাভাবিক। যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা চলে না, সেটি তাত্ত্বিক হলেও বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়। বিজ্ঞানিক আইনস্টাইন আমাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে উর্ধ্বলোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন- "অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ টেনে নীচে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছুই থাকবে না।"

বিশ্বের আদি, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন পর্যায়ের মধ্যে বর্তমানের ধারণা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নেই। এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে পরম স্থিতি থেকে গতি, তারপর আবার স্থিতিতে চলে আসা বিজ্ঞানের যুক্তিতে যেমন আকাট্য তেমনি দর্শনের যুক্তিতেও সেটি ওজন করার মতো। পৃথিবীতে জন্ম লাভ করলে তাকে তখন থেকেই 'সময়' ফাঁকি দিতে থাকে। কারও পক্ষে সময়ের গতিকে উল্টো দিকে ঘুরানো সম্ভব হয় না। মোটের উপর সময় সকলের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন- "হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময়-কালও নির্ধারিত আছে।"

—(ওয়াকেয়া ৫১-৫২)

"গর্বিত কাফেরদের জন্যে ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে অবস্থান করতে হবে চিরকাল।" —(সূরা যুমার)

"তাদের প্রভু (আল্লাহ) তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন বাগ-বাগিচার বাসস্থানের সুসংবাদ দেন- যেখানে তাদের জন্য চিরন্তন সুখ-শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করবে। নেক কাজের প্রতিদান দেবার জন্য তাঁর কাছে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে।" —(তওবাহ ২১-২২)

আমাদের দুনিয়ার জীবন মূলতঃ পরকালীন জীবনের মাতৃগর্ভ। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু পরপারের জীবন চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কাজকর্মের সকল ফলাফল সেখানে প্রকাশিত হবে। সেদিন ভালো মন্দের আলাদা আলাদা জগৎ থাকবে। গতি আর স্থিতির ব্যাপারটি আকাশের উল্কা পিন্ডের মতো। নির্মল আকাশের দিকে তাকালে গ্রহ-নক্ষত্রের উপস্থিতির ফাঁক থেকে কোথাও কিছু নেই, এমন স্থান হতে হঠাৎ একটা আলোর পিণ্ড যেন ছুটে আসে নীচের দিকে। সেটি

www.pathagar.com

পৃথিবীর কাছাকাছি এসে যখন মিলিয়ে যায় বায়ুর গর্ভে তখন আর তাকে দেখা যায় না। বায়ুর সাথে উল্কা পিন্ডের ঘর্ষণে সেটি হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় তার আসল রূপ ও চরিত্র রূপান্তর হয়ে পড়ে। যার জন্য তাকে আর পৃথকভাবে দেখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় একে দেখা না গেলেও সে তো নতুন রূপেই সেখানে থাকে। এক সময় এই বিশ্ব ভুবনে কোথাও কিছু ছিল না। স্রষ্টা সেই আসরে ছিলেন নিজ আসনে। তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন, গতির বিধান। এ বিধানের আইনেই 'প্রকৃতি' নামের নীতি জারী হয়। যখন কোথাও কিছু ছিল না তখন স্থির অবস্থান থেকে উল্কা পিন্ডের মতো এ বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়। এর উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরীত এক পরম সত্তা। এ সত্তা কোথাও হতে তিনি আমদানী করেননি। আল্লাহর ইচ্ছার পরিকল্পনার ফসলই এটি। সেখান থেকেই উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়। শেষ মেষ পরপারের কাছাকাছি এসে সেই যাত্রা, উল্কা পিণ্ডের মতোই মিলিয়ে যাবে। তারপর তাঁর হুকুমেই নতুন সাজে আবার সেটি গজিয়ে উঠবে। তখন আর গতি থাকবে না। সেজন্য গতির মৃত্যুর সাথে সাথে আবর্তনশীল সময় হয়ে যাবে স্থির। আমরা যখন সময়ের আদি-গোড়া নিয়ে চিন্তা করি তখন আমাদের চারপাশে এসে ভীড় করে পুনরুত্থান ও মৃত্যুর জিজ্ঞাসা। পৃথিবী সৃষ্টির পর যখন তার ঘরে মানুষ বাস করতে শুরু করে, তখন থেকেই এই জিজ্ঞাসা। এর সমাধানও অনেক জ্ঞানী-গুণীগণ দিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে পাক কোরআনের হৃদয় জুড়ানো কথা মালায় রয়েছে তার উত্তর। সে সব তালাশ করে দেখলেই আমাদের পক্ষে মহাবিশ্বের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবি জানা সম্ভব। সেই সাথে জানা যাবে সময়ের কথা, জীবন, জগৎ, একাল ওকালের কথা।

পুনরুত্থান এর ধারণা

এ পৃথিবীতে জন্মিলেই মৃত্যু পিছু ধাওয়া করতে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'মৃত্যু দূত' জীবন কেড়ে নেয়। সেজন্য কারও পক্ষে চিরস্থায়ীভাবে পৃথিবীতে থাকা সম্ভব হয় না। একদিন না একদিন সকলকে চলে যেতে হয়। তবে কেন এই আসা যাওয়ার পালা বদল? এর নেপথ্যে কি কোন উদ্দেশ্য নেই?

www.pathagar.com

জন্ম, মৃত্যুর পালা বদলেই কি জীবনের সমাপ্তি ঘটে? ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না, মানে না। কারণ বিজ্ঞানের হাতে ধ্বংস না হওয়ার পেছনে অনেক যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। আবার বিজ্ঞান পুনরুত্থান হওয়াও বিশ্বাস করে। মানুষের কামনা, বাসনার স্বপ্ন অফুরন্ত। মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণেও তার আশা থেকে যায়। তাই দুনিয়ার জীবনে সৃষ্টির পূর্ণতা নেই। কেন জানি পৃথিবীর সব কিছুর মাঝেই থাকে বাঁচার আশা। এ বাঁচার আগ্রহই মানুষকে স্রোতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যতোই দিন যেতে থাকে ততই তার সময় ফুরিয়ে আসতে থাকে। বার্ধক্যের পর্যায়ে এসে সবাই যেন শিশুর মতো হয়ে যায়। তখনও তার আশা সে মরবে না। সেজন্য মৃত্যুর আগেও কেউ কল্পনা করে না, এখনি সে চলে যাবে। তবু চলে যেতে হয়। একবার দম চলে গেলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। যারা বেঁচে থাকে তাদের মনে লোকটির শূন্যতা হাহাকার করতে থাকে। তাই মৃত্যুটা যেন অপূর্ণতার শোক। এর যদি পূর্ণতাই থাকতো তাহলে কোন অতৃপ্তি কাউকে গ্রাস করতে পারতো না। আমাদেরকে যেহেতু আশা, ভরসার অপূর্ণতা নিয়ে চলে যেতে হয় সেহেতু ধরে নেয়া যায়, জীবন নদীর স্রোত এখানেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। মহা সাগরের জলরাশির স্পর্শ না পেলে যেমন নদীর স্রোত চলতেই থাকে তেমনি জীবন নদীর স্রোত কলকল রবে ছুটে চলে পূর্ণতার দিকে। সাগরের যেমন ঠাঁই নেই, পূর্ণতার মাঝে যেমন বাড়া কমার প্রশ্ন নেই তেমনি এ জীবন যে মহাসাগরে গিয়ে ঠাঁই নেবে সেখানেও শেষ নেই। তাই সৃষ্টির অপূর্ণতা আমাদেরকে পুনরুত্থানের নীতি কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। তাছাড়া সৃষ্টির অবিনশ্বরতা বা ধ্বংসহীনতাও পুনরুত্থানের বিশ্বাস জন্মায়।

আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন– "(হে মানুষ) কিভাবে তোমরা অস্বীকার করতে পার, অথচ তোমরা ছিলে মৃত; অতপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবিত করবেন এবং অবশেষে তোমরা সকলে তার নিকট ফিরে যাবে।" —(২ঃ২৯)

"এরপর একদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং আবার কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" —(১ঃ১৫-১৬)

www.pathagar.com

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। অতপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। এ পুনরাবৃত্তি তার পক্ষে খুবই সহজতর।" —(আর রূম-২৭)

মুসলমান হিসেবে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। মৃত্যুর সাথে সাথে যে কেউ বেহেশতে যেমন সচরাচর চলে যেতে পারে না তেমনি দোযখেও চলে যাবে না। তবে বেহেশত; দোযখের স্বাদ মৃত্যুর পর থেকে কবরের জীবনে পেতে থাকবে। যতদিন এ পৃথিবীর আয়ু আছে ততদিন মৃত ব্যক্তি কবর নামক রহস্যময় জগতে বাস করতে থাকবে। এই ক'দিনে দেহ পৃথিবীর মাটিতে পচে গলে মিশে গেলেও আত্মা সেই কবর রাজ্যে জীবিত থাকবে। যেদিন এ গতিশীল বিশ্বের অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন থেকে নতুন বিশ্ব সৃষ্টির পালা শুরু হবে। সৃষ্টির এ বিপর্যয়কে বলা হয় কেয়ামত বা মহাপ্রলয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন—

"সেদিন আমি আকাশ মন্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেরূপ কাগজের তাড়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিরাম তদ্রুপ তা পরেও করব। তা আমার ওয়াদা। নিশ্চয়ই আমি সংঘটিত করব'।"

—(২১ ঃ ১০৪)

"এবং সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর পুনরায় তৎমধ্যে ফুৎকার করা হবে; তৎপর তখনই দন্ডায়মান দেখতে থাকবে।" —(৬৯ ঃ ৬৮)

"অতপর যখন শিঙ্গায় একই ফুৎকার করা হবে এবং পৃথিবী ও পর্বতরাজি উত্তোলন করা হবে; তৎপর তাকে একই বিচূর্নে বিচূর্ণ করা হবে। সেদিন আকাশ বিচূর্ণ হয়ে তা বিকল হয়ে যাবে।"

—(৩৯ ঃ ১-১৫, ২৫ -২৬)

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির এই সুন্দরতম আবাস ভূমি নষ্ট হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। বস্তুর সূক্ষ্মতম কণা কিংবা শক্তির পাতলা মিহিদানা থেকেই যাবে। সেই সত্তাতে আবার একদিন সজীবতা আসবে। জেগে উঠবে নতুন বিশ্ব। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এবং বর্তমান বিশ্বের প্রলয় সম্পর্কে বিজ্ঞানের ভবিষ্যত বাণী হলো- এই বিশ্বের প্রতি ঘন

www.pathagar.com

সেন্টিমিটারে প্রায় একশত নিউট্রোনো বিরাজ করে। সেগুলো আলোর গতিতে চলে। মানুষের শরীর ও পৃথিবীর মধ্য দিয়ে তা অনায়াসে চলাচল করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণের ধারণা এ কণার আর্কষণের ফলে এ বিশ্ব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এদের আকর্ষণের ফলে এ বিশ্ব আবার সংকোচিত হয়ে আদি মহা বিস্ফোরণের পূর্বে বিশ্বের যে অবস্থা ছিল আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। পুনরায় আবার মহা বিস্ফোরণের ফলে নতুন আর এক বিশ্বের সৃষ্টি হবে।"

—(আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন পৃষ্ঠা-৭৫)

কোরআন ও বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে এ বিশ্বের প্রলয় ও নতুন বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু নতুন বিশ্বের নিয়ম নীতি কি এ দুনিয়ার মতোই হবে? সেখানে কি সূর্যের মতো সূর্য থাকবে, চাঁদের মতো চাঁদ থাকবে? অন্ধকার আর আলো কি একসাথে থাকবে? আমাদের আকার, আকৃতি, প্রকৃতি কি দুনিয়ার মতোই হবে? নিঃসন্দেহে বলা যায় কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতীত সে বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ গতির জন্য উৎকর্ষতা এবং বিপর্যয় ঘটে থাকবে। অর্থাৎ গতিশীল সত্তা সুষম গতিতে না চললে এর মাঝে ধ্বংস ও বিপর্যয় দেখা দেবে। এরাই সীমালংঘকারী। আবার নিয়ম নীতিপূর্ণ সরল ও সুষম গতির জন্য উৎকর্ষতা ও পুরস্কার থাকবে। তাই নতুন বিশ্ব আর এখানের অবস্থায় থাকবে না। বিজ্ঞানীগণের ধারণা- এ বিশ্বের ধ্বংসের পর মোট ভরশক্তির পরিমাণ ঠিকই থাকবে, তবে রূপের পরিবর্তন ঘটবে। এ ভর-শক্তি অনন্ত কাল ধরে একটানা নিস্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করবে না। কিন্তু নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হলে তার জন্য নতুন ব্যবস্থাও প্রবর্তন হবে। —(আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন-৭৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন—

"যেদিন পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে এবং তারা অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখীন হবে।"

"আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমি

www.pathagar.com

তাতে অসমর্থ নই যে, আমি তোমাদের গঠন পরিবর্তন করে দিব। এবং তোমাদিগকে এমনভাবে গঠন করব যা তোমরা অবগত নও; এবং অবশ্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি অবগত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপলব্ধি করতে পারছ না।" —(৫৫ঃ৬-৫২)

বিজ্ঞানের অগাধ বিশ্বাস গতি আদ্যান্তশীল। এ বিশ্বে গতি এবং সময়ের শুরু একি সময় হয়েছিল। গতি ও সময়ের সূচনার আগে সর্বত্রই ছিল পরম স্থিতি অবস্থা। সেই পরম স্থিতি অবস্থায় বিশ্ব কেমন ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তারপর গতির যাত্রা শুরু হলে সেই অবস্থাতে পরিবর্তন আসে। আজকের এ বিশ্বের আকার আকৃতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এতে লেগেছে অনেক যুগ, অনেক সময়। যার হিসেবে আমাদের পক্ষে দেয়া কঠিন। আবার যেদিন এ বিশ্বের গতির চাকাটি বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর প্রলয় ও ধ্বংসের পর নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হবে, নতুন আইন জারী হবে। সে আইন সম্পর্কে এ মুহূর্তে বাস্তব ধারণা পাওয়া আশাতীত।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় গতি অবস্থান্তে তিন রূপ থাকে। যেমন আদি, চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়। তাই মানব জীবনের পর্যায়ক্রমিক পালা বদলের মধ্যে গতির নিয়মেই জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান থাকবে। ফুলের কলি না ধরলে যেমন ফল হয় না তেমনি বীজ না হলে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নয়। ফল যখন পেকে যায় তখন সেটি গাছ থেকে ঝরে পড়ে। এই ফলের ওপরের অংশ নিচিহ্ন হয়ে গেলেও বীজ থেকে নতুন গাছ হতে পারে। পাকা ফল যেমন গাছে থাকে না, তেমনি মানুষের দুনিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ হলে সেও চলে যায়। এই চলে যাওয়ার পথ করে দেয় মৃত্যু। মৃত্যুর সাথে পুনরুত্থানের সম্পর্ক খুব নিকটের। মূলতঃ মৃত্যু কি? এ প্রশ্নের সমাধান পেলে পুনরুত্থান সম্পর্কে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘুচিয়ে নেয়া আরও সহজ হবে।

www.pathagar.com

মৃত্যু কি?

মৃত্যু কি সকল কিছুর অবলুপ্তি ? না সাময়িক কর্মচ্যুতি? কোন কিছুর অবলুপ্তি বা বিনাশঘটা প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মে রূপান্তর চলে, পুনঃ বন্টন চলে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হওয়া এ জাগতিক বিশ্বের কোথাও কোন নিয়ম প্রচলিত নেই। তাই মৃত্যুকে বলা হয় সাময়িক কর্মচ্যুতি বা মহানিদ্রা। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হলে নিজের মধ্যেই ভাবতে হবে বেশী করে। কারণ এর মধ্যে মৃত্যুর আলামত লক্ষ্য করা যায়। মানুষ বহুকোষী প্রাণী। জীবিত অবস্থায় এর প্রতিটি কোষে থাকে প্রাণ উদ্দীপনা। ইটের সারির মতো এই জীব কোষগুলো স্তরে স্তরে একত্রিত হয়ে যে কাঠামো গড়েছে সেটিই আমাদের দেহ। মৃত্যু সৈনিক প্রতি মুহূর্তে দেহকোষের কোন না কোন অংশ থেকে এদেরকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুতি দিয়ে থাকে। এ যুদ্ধ এতো দ্রুত ঘটে যে তা আমরা টের করতে পারি না। বয়সের দিক থেকে কে আগে মরবে, কে পরে মরবে এরূপ কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তাছাড়া আংশিক কর্মচ্যুতি এবং তার সাথে সাথে পুনঃ জন্মের জন্য এতে কারও অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিনষ্ট হয় না। আমাদের স্নায়ু ব্যবস্থাতে Inhibiatory Impulse (বাধা দানকারী তাড়না) ও Inspiritory Impulse (অনুপ্রেরণাকারী তাড়না) কাজ করে। যখন কোন অঙ্গের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হয় তখন মনের নির্দেশ মস্তিষ্ক হতে Inhibitory Impulse প্রেরীত হয়। এতে ঐ অঙ্গের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে। কিংবা ঐ কাজ থেকে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট অংগকে ফিরিয়ে আনা হয়। যেমন কারও হাত যদি অসাবধানতাবশতঃ আগুনে ঢুকে পড়ে, তখন ঐ অঙ্গের afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না) এর সাড়া পেয়ে তাকে দুর্ঘটনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মনের নির্দেশে মস্তিষ্ক থেকে Inhibitory Impulse প্রেরীত হয়। ফলে হাতটি ঐ কাজ থেকে কর্মচ্যুতি নিয়ে দূরে সরে আসে। আমাদের স্নায়ু ব্যবস্থার Inhibitory Impulse এর কাজ খুব সাময়িকই ক্রিয়াশীল থাকে। সে কারণে হাতটি দীর্ঘক্ষণ কর্মহীন থাকে না। পক্ষান্তরে আরও দেখা যায়, খেতে খেতে পেট ভরে গেলেও খাদ্য খাওয়া বন্ধ রাখার

www.pathagar.com

জন্য Inhibitory Impulse সাময়িকের জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু পেট খালি হলেই Inspiritory Impulse এর কাজ শুরু হয়ে যায়। এ কাজগুলো এতো দ্রুততর ঘটে, যার সম্পর্কে আমাদের কোন খবর রাখা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জগতের প্রকৃতির বিধানে এরূপ এক রহস্যময় বিধান চালু আছে। অর্থাৎ এ মহাবিশ্বেরও একটি অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জু আছে। যার নিয়ন্ত্রণ ভার আল্লাহর হাতে। এই স্নায়ু রজ্জুর মূল ভান্ডার যেখানে তার নাম 'আরশ'। আল্লাহর নির্দেশেই সকল কাজ সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন কোন ব্যক্তির দুনিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহর নির্দেশে আরশের (মহা মস্তিষ্ক) থেকে যে Inhibitory Impulse আসে এর দ্বারা ব্যক্তির দুনিয়ার কাজের সাময়িক কর্মচ্যুতি ঘটে। এতে আত্মার বাহন (জড় কাঠামো) প্রাণের দীর্ঘক্ষণ অবর্তমানে পড়ে থাকায় তা পচে গলে শূন্যে ও জমিনের মাটিতে মিশে যায়। পক্ষান্তরে আত্মাকে ধরে নেয় 'মৃত্যু দূত' নামের ফেরেশতা। তাঁর নাম আযরাঈল (আ)।

আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য নেয়া আর না নেয়ার জন্য একটি চক্র চলে। একে বলা হয় Feed back machanism। সে দিক থেকে আযরাঈল (আ) এর কাজটি Life back machanism এর মতোই। আয়ুর নাটাইটা যখন খালি হয়ে যায়, তখন দুনিয়ায় কারও পক্ষে এক পা নড়া সম্ভব নয়। সে মুহূর্তে Negative সংকেত বা afferent Impulse বইতে থাকে। এর ফলে Inhibitory Impulse এর ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে দুনিয়ার জীবনে নেমে আসে সাময়িক কর্মচ্যুতির পালা। একেই বলা হয় মৃত্যু। দুনিয়ার জীবনের জন্য এ সময়টা একটু লম্বা চওড়া বিধায় আত্মার অবর্তমানে তার বাহন পচে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কালের আবর্তে আবার যখন স্রষ্টা তাঁর বিশ্ব ব্যবস্থায় Inhibitory Impulse এর ক্রিয়া রহিত করবেন, তখন Imspiritory Impulse এর সাড়া জাগবে, ফলে এ বিশ্বের সবকিছু পুনঃ গঠিত হয়ে যে যার বাহনের মধ্যে চলে আসবে। এদিক থেকে সাময়িক কর্মচ্যুতি বা মহানিদ্রার অবসানের নাম পুনরুত্থান।

'আল্লাহ বলেন " আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখো, যমীন মৃত হবার পর কি ভাবে তিনি জীবন দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকেও জীবন দান করবেন। তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।" –(আর-রূম –৫০)

www.pathagar.com

"তোমরা মৃত ছিলে, খোদা তোমাদের জীবিত করেছেন। তিনি আবার তোমাদের মৃত করবেন, আবার জীবিত করবেন। পুনরায় তাঁর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" – (আল বাকারাহ-২৮)

"এবং যখন ইব্রাহীম বললেন ঃ প্রভু কেমন করে তুমি মৃতকে পুনর্জীবিত কর, তা আমাকে দেখাও। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি (ইব্রাহীম) বললেন ঃ নিশ্চয়ই (বিশ্বাস হয়) তবে দেখালে অন্তরে শান্তি পেতাম। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তাহলে (বিভিন্ন শ্রেণীর) চারটি পাখী এনে তোমার অনুগত হতে শিক্ষা দাও। তারপর তাদিগকে মাথা কেটে রেখে গোশতগুলো টুকরা টুকরা করে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে আস। তারপর তাদের নাম ধরে ডাকো। দেখবে তারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়ে আসবে। এবং জানো যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।" – (২ ঃ ২৬০)

আমাদের দেহ রাজ্যের শাসনভার স্নায়ু মন্ডলীর হাতে। মনের আজ্ঞাধীন হয়ে সে তার দায়িত্ব পালন করে। এর কারুকার্য এতো কঠিন যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Nervous হতে হয়। সে তুলনায় আল্লাহ্র রাজ্যের স্নায়ু রজ্জুর ব্যবস্থাপনা আরো কতো যে জটিল তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। সেজন্য আল্লাহর রাজ্যের স্নায়ু রজ্জুর Inhibitory Impulse এর কার্যের সাথে মৃত্যুর সম্পর্কটি ও রহস্যময়। তাই ক্ষেত্র বিশেষে রূপক উদাহরণই প্রযোজ্য। তবে গবেষণার বেলায় মূলের দিকে কিছুটা হলেও ধাবিত হতে হয়। তা না হলে মৃত্যু আর পুনরুত্থানের সম্পর্কটি সহজ সাধ্য ভাবে উপস্থাপন করা কঠিন।

গতি, স্থিতি, মৃত্যু ও পুনরুত্থান এ সব নিয়ে যখন ভাবনা জাগে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ মহাবিশ্বের সূচনা কোত্থেকে হলো? সব কিছুর যেখানে মূল, সেখানে ফিরে যেতে পারলেই যেন জানার আর কিছু থাকে না। ফলে বর্তমানকে খুব কঠিন ভাবে মূল্য দেয়া সম্ভব হয়। তখন পথ চলা যায় সহজ ও সুন্দরভাবে। মূলতঃ সহজ সরল পথেই মানব জীবনের সার্থকতা। বিশ্ব এতো বড় যে তার তুলনা হয় না। ফলে মৃত্যুর রহস্যকেও অনুধাবন করা সহজ নয়।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সূচনা কোত্থেকে

দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আমরা যে বিশ্ব কাঠামো দেখি, এই বিশ্ব কখন, কি ভাবে, কোত্থেকে এল। এর কি কোন সূচনা নেই। নদীর উৎস পাহাড় বা হ্রদ। এর শেষ আশ্রয়স্থল সমুদ্র বা সাগর। এই নদী কেউ মাটি খুঁড়ে বানায়নি। প্রাকৃতিক নিয়মেই তার জন্ম। সাগর বা সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। এই বাষ্প একসময় মেঘে রূপ নেয়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টি রূপে অনবরত পাহাড়ের গায়ে ঝরতে থাকে। সেই স্রোত থেকেই নদীর জন্ম। কিন্তু এই সাগর, এই পাহাড় ও পানি কোত্থেকে এল? কে বানাল? এ সব অগণিত প্রশ্নের বোঝা চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলে। মরুভূমির মতো হৃদয়েও অনেক সময় বৃষ্টি নামে। সেখানের পানি হয়তো সহজেই বালির ফাঁক দিয়ে চলে যায় পাতালে। তারা ওপরের প্রশ্নের উত্তর বের করতে না পারলেও সময়ে সময়ে ভাবে। কিন্তু জ্ঞানী ও ধৈর্যশীলগণ বসে থাকে না। তারা এ সব প্রশ্নের আগা-গোড়া খুঁজতে গিয়ে রাতের ঘুমকে দিয়েছেন বনবাস। মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে তুলেছেন ঝড়। নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় নিউট্রন যেভাবে নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে, পারমাণবিক শক্তি বের করে, তেমনি মানব মনের মনন বুদ্ধি শক্তি বস্তুর রেণু–কণার ভেতর থেকে বের করার চেষ্টা করছে তার সূচনা কাল, হন্যে হয়ে খুঁজছে বস্তুর ভেতরে তার আদি উপাদান। তালাশ করছে কিভাবে, কোত্থেকে এই সৃষ্টি জগতের বস্তু নামের আয়তনশীল পদার্থের আদি মৌল সৃষ্টি হলো? ভাবছে বস্তুর আদি মৌল কি জিনিস এবং একে দেখতেই বা কেমন ইত্যাদি .... ইত্যাদি পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে দেখা যায়, এক পাহাড় পরিমাণ প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষকে সব সময় ভাবনার খোরাক দিয়ে বন্দি করেছে নির্জন কুটিরে। মানুষের চেষ্টার শেষ নেই। তার জানার সাধ অনেক। সে আকাশেও উড়তে চায়, আবার পাতাল পুরীর রহস্যও জানতে চায়। জানতে পারলেই যেন তারা তৃপ্তি অনুভব করে, আনন্দ পায়। মূলতঃ জানার আগ্রহের মাঝে রয়েছে অসীমের রহস্য, তাঁর নিগূঢ় সত্য খুঁজে পাওয়ার পথ। এই পথ আবিষ্কার করতে পারলেই মানুষের সৃষ্টির রহস্য জানার বাকি থাকে না।

www.pathagar.com

এই বিশ্ব জগৎ অসীম। এর কূল কিনার পাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। কতো দূর পর্যন্ত যে এর বিস্তৃতি তা বলা কঠিন। মাকড়সার জালের মধ্যে মাকড়সা যেমন ঝুলে থাকে, তেমনি আমরা এই শূন্যে ঝুলন্ত পৃথিবীটার মধ্যে ঝুলে আছি। এর ওপরে কিংবা নীচে যাওয়া আমাদের সম্ভব হয় না। আমাদের বাসস্থান ও জীবনের গন্ডি খুব সীমাবদ্ধ। তাই সসীম কখনো অসীমকে ধরতে পারে না, স্পর্শ করতে পারে না। সসীম যদি অসীমকে ধরতে পারে তবে অসীম বলতে কিছু থাকতে পারে না। সেজন্য মানুষ সৃষ্টির আদি অবস্থা, এর সূচনা কাল, তার বাস্তব নমুনা ইত্যাদি কোন কিছুর ধারণা দিতে সক্ষম নয়। যেহেতু মানবজাতি সৃষ্টির যাত্রা শুরু হওয়ার মুহূর্তে জন্ম লাভ করেনি, অন্যদিকে ঐ মুহূর্তের কোন বাস্তব চিত্র এখন আর মানুষের হাতে নেই। এ বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের জন্মের আগে অনেক কিছু ঘটেছে। অনেক কাল অতিক্রম করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা স্থান-কালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিধায় আমরা যখন ছিলাম না তখন কি ঘটেছে, তা আমাদের জানার কথা নয়। তবু মানুষ চেষ্টা করেছে, সৃষ্টির রহস্যের দুয়ার খুলে তার ভেতরে ঢুকে কিছু আনার জন্য। কিন্তু সৃষ্টির মালিকের ক্যাটালগ বা গাইড বুক না পড়ে যারা চেষ্টা করেছে কিছু পাওয়ার জন্য তারা সার্থক না হয়ে ব্যর্থই হয়েছেন বেশী।

এক দল দৈব বুদ্ধিশীল বস্তুবাদী মানুষ ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে এ বিশ্বের সূচনাকে মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব নামের এক কাল্পনিক ব্যাখ্যার ধোঁয়া তুলে তার যাত্রা শুরু করেছেন। তাদের বিশ্বাস এ জগৎ সৃষ্টি হওয়ার আগে কোথাও কিছু ছিল না। তখন সর্বত্রই অসীম শূন্যতা আর শূন্যতা বিরাজ করছিল। তারা সে সময়কে শূন্য সময় মনে করেন। তাদের ধারণা সেই অস্তিত্বহীন শূন্য পরিবেশে দৈবক্রমে এর কোন এক বিন্দুতে আদি ভর শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন ঘটে। তারপর প্রবল অভ্যন্তরীণ তাপে ও চাপে সেই ভর শক্তিতে হঠাৎ এক মহা বিস্ফোরণ ঘটে। সেই থেকে এই ভর-শক্তি অস্তিত্বহীন বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন থেকেই শুরু হয় বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও তার সম্প্রসারণ।

www.pathagar.com

অন্যদিকে কট্টর বস্তুবাদী বানর শ্রেণীর লোকেরা মনে করে আদি হতেই এই বিশ্বে ভর-শক্তি মওজুদ ছিল। তাদের বিশ্বাস বস্তুর আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন। এর কোন স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক নেই। তাদের ধারণা হলো, যেমন হঠাৎ একটি পাখি এসে মাটিতে পড়ে গেল। পাখিটি জীবিত। পৃথিবীর বেলায় পড়তে পারে। কারণ এখানে রং বেরংগের পাখি আছে। তারা অনেক বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু চাঁদের বেলায় কিংবা সূর্যের বেলায় পাখি আসা কি করে সম্ভব? সেখানে তো পূর্ব হতেই জীবন ধারণের পরিবেশ নেই। আবার একেবারে শূন্যস্থানে পাখিটা জন্ম হবে কি ভাবে? তবু তারা মনে করে এগুলো আদি কাল থেকেই ছিল। যার যার প্রয়োজনে সব লেগে লেগে এই জগৎ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এ দু'শ্রেণীর দ্বৈব বুদ্ধিশীল মানুষের তত্ত্বের মাঝে অনেক ফাঁক আছে বলেই কিছু প্রশ্নের জন্ম হয়। যেমন শূন্য পরিবেশে কোন এক বিন্দুতে যে সকল আদি ভর-শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন হয়েছিল, এই শক্তি আসলো কোত্থেকে? আরও প্রশ্ন দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপ সৃষ্টি হওয়ারই বা কারণ কি? দ্বিতীয়তঃ বস্তুর আদি মৌল ও গতি সৃষ্টি হলো কোত্থেকে? এর স্রষ্টা কে? ইত্যাদি ..... ইত্যাদি। কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে তারা অপারগ। তারা বলে এটা এমন এক প্রশ্ন যার উত্তর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যে জিনিসের মাঝে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে সেটি কোন কালেও বিজ্ঞান সম্মত বলে স্বীকার করা যায় না। বরঞ্চ এখানে এসেই তারা পরাজয় বরণ করে হতাশায় আর দুঃশ্চিন্তায় ভোগে।

বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যেভাবে কোন বিষয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মনে করি' কিংবা 'ধরি' এরূপ ধার করা অস্তিত্ব কল্পনা করে যাত্রা শুরু করে অগ্রগতির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়, সেভাবেও যদি তারা বিশ্বের আদিতে অনন্ত অসীম মহাপ্রজ্ঞাবান স্রষ্টাকে এনে হাজির করে, বিশ্বের সূচনা তাঁকে দিয়ে আরম্ভ করে, তাহলেও দ্বৈব চিন্তা, মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব ইত্যাদির মতো কোন খোঁড়া যুক্তি ছাড়াই তার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হতো। তারপর এমন এক সময় আসত যখন ঐ কল্পনার সত্তা চরম বিশ্বাসের বিষয় বস্তুতে রূপ নিত। তখন আর তাঁকে না দেখেও স্বীকার

www.pathagar.com

করার অফুরন্ত যুক্তি প্রমাণ তার হৃদয়ের দৃষ্টি শক্তিতে সত্যের আলোয় ঝাঁঝ ধরে যেত। অথচ এরা খোদার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বিশ্বের সূচনার কথা ব্যাখ্যা দিতে চায়।

আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "আমিই আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করেছি নিজ শক্তি বলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।"– (৫১ ঃ ৪৭)

"তিনিই আদি ও তিনিই অন্ত; তিনি ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।"

– (৬ ঃ ১০৩)

এ বিশ্ব গতিশীল। কার্য কারণ ব্যাখ্যার মতে গতির জন্য স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন। এ বিশ্বের প্রতিটি জ্যোতিষ্কের বাইরে যেমন রয়েছে গতি তেমনি তার ভিতরের পরমাণুর কাঠামোর মাঝেও আছে গতি। বিজ্ঞানীদের ধারণা শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই পদার্থ কিংবা গতির মন্থরতাই বস্তু। সে কারণে যখন এই বিশ্বে গতি ছিলো না তখন পদার্থ বা বস্তু কিংবা শক্তির (পদার্থের মৌল উপাদান) কোন বালাই ছিল না। কিন্তু বিস্ফোরণবাদীরা পদার্থের মৌল উপাদান শক্তিকে constant হিসেবে ধরে নেয়। তারা মনে করে স্রষ্টা থাকলেও পদার্থের মূল উপাদান মওজুদ ছিল। তাদের দৃষ্টিতে খোদা কার্পেন্টার গড। মিস্ত্রি যেমন কাঠ, লোহা, সংযোগ করে বিভিন্ন উপাদান তৈরী করে, তাদের দৃষ্টিতে খোদাও তেমনি। কিন্তু মুসলিম দর্শনে খোদা বস্তুর উপাদান ও বস্তুর স্রষ্টা। পরম স্থিতি অবস্থায় এ বিশ্বের স্রষ্টা ছিলেন নিরাকার, স্থিতিশীল ও অনন্ত, অসীম। তিনি তখনও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন। যার কিনার থাকে সেটিই হয় আকারশীল। কিন্তু নিরাকার কখনো কিনারশীল হয় না। তাই তিনি অসীম ও অনন্ত। ফলে গতি, সময় ও বস্তুর স্রষ্টা নিরাকার অনন্ত, অসীমের বেলায় হওয়াই বিজ্ঞান সম্মত। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে মানুষের ধারণা ছিল বস্তুর আদি মৌল ও গতি চিরন্তন। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। এই তত্ত্বের স্বীকৃত ব্যাখ্যা হলো গতি, সময় ও বস্তুর সূচনা একি সময় হয়েছিল। তাই এ বিশ্বে আদি হতে এ সব বিরাজ করেনি। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে প্রাণে পোষণ করলেও যে প্রশ্ন আমাদেরকে অস্থির

www.pathagar.com

করে তুলে, তাহলো পরমস্থিতির জগতে যখন বস্তুর কোন মৌলিক সত্তাই ছিল না, তাহলে এ জিনিস কোত্থেকে, কিভাবে আসল? বিশ্ব বিধাতা এ উপাদান আনলেন কোত্থেকে? ধর্মের বাণীতে মানব জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমরা যেহেতু আদিতে ছিলাম না, সে কারণেই আমাদেরকে ধর্মের গণ্ডিতেই তার সমাধান খুঁজতে হবে। অন্যত্র এর সমাধান খুঁজার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে পরমস্থিতি ও পরম গতির মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সাঁতরাতে থাকলে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়।

মুসলিম দার্শনিকগণের বিশ্বাস এ বিশ্ব আদিতে আল্লাহর মানসে স্থির অবস্থায় বিরাজমান ছিল। তখন না ছিল ভর, না ছিল সময় ও গতির কোন অস্তিত্ব। ছিল না শক্তির (পদার্থের আদি মৌল) কোন নিজস্ব উপাদান। তখন বিশ্ব মাতৃকোলে পরম স্থিতি নামের অস্তিত্বহীন জগৎটি ছিল আল্লাহর মালিকানাধীন। স্রষ্টা যখন নিজকে প্রকাশ করার ব্যগ্রতায় সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার রূপ নিজ ধ্যানে আনলেন তখন পরম স্থিতির সাগরে তরঙ্গ বা ঢেউ এর ন্যায় ঝড় ওঠে। গতির স্পন্দন শুরু হলে পরমস্থিতির জগৎটি অবস্থান্তর হয়ে পরমগতির জগতে রূপ নেয়। আসলে ঢেউ বা তরঙ্গ গুদামে রাখার জিনিস নয়। সেটি মন থেকেই উদয় হয়। আল্লাহ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'উহা হউক' এমনি তা গঠিত হয়। অর্থাৎ খোদা 'কুন ফাইয়াকুন' বললেই সব হয়ে যায়। তবে অবশ্যিই স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের মতো খোদা শব্দ করে কথা বলেন না।

আমাদের ইচ্ছার ব্যগ্রতা মন থেকে নিজ সত্তাতে (দেহে) ঢেউ এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এই মহা বিশ্বের মালিকের ইচ্ছার ব্যগ্রতা তাঁর মালিকানাধীন পরমস্থিতির রাজ্যে ঢেউ এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিজের অনুরূপ ইচ্ছার ব্যগ্রতা দিয়েই পয়দা করেছেন। মানুষের মনের বৈশিষ্ট্য খোদার কিঞ্চিত গুণের প্রকাশ। তাই মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। এ জন্য তাদের চিন্তা চেতনা সৃষ্টি ধর্মী। সে আলোকেই বলা যায়, সৃষ্টির আদি উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির ফল। যার স্বরূপ ঢেউ বা তরঙ্গ। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁর নাম নূর। একেই

www.pathagar.com

হয়তো বলা হয়েছে নূরে মুহাম্মাদীর নূর। বিজ্ঞানের ভাষায় হয়তো তার নাম কসমিক স্ট্রিং। এর রয়েছে তরঙ্গ ধর্ম। মনের অভিব্যক্তি প্রাথমিক ধাপে তরঙ্গের ন্যায়ই ছুটে চলে। এটি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। সে প্রক্রিয়াটি অন্য অধ্যায়-এ বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টার গুদামে বা শূন্য রাজ্যে কোন ভর-শক্তি জমা ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বের আদি শাসক। অসীম শূন্য খাদ্যের পরম সত্তা, সেই জগতের মালিক।

মনে যখন খেয়াল জাগে তখন তার নির্জন বাসে উঠে স্পন্দন। এ স্পন্দন ঢেউ এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ঢেউ গর্জনে কেঁপে তুলে তার চারপাশ। এ ঢেউ ছুটতে ছুটতে এক সময় কিনার খুঁজে। কখনো প্রবল বেগের মাঝে বাউকুড়ানীর মতো শুরু হয়, এতে সমাবেশও ঘনায়ন ঘটে। তা থেকে রূপায়ণও শুরু হয়। সেই রূপায়ণ বিবর্তনের এক পর্যায়ে এ বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। বর্তমানের এ বিশ্ব কাঠামো ও বস্তুর গঠন যত শক্তই মনে হউক না কেন তার প্রতিটি কঠিন আবরণের ভেতরে সে ঢেউ বা তরঙ্গ এখনো লুকিয়ে আছে। আমরা খালি চোখে তা দেখতে না পারলেও অতিমানবর্গণ তা ইন্দ্রিয় চোখেই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। হযরত ঈসা (আ) তাই জীবনে কখনো ঘর বাঁধেননি। তিনি সর্বত্রই শুধু ঢেউ এর তর্জন-গর্জন শুনতে পেতেন।

আমাদের মুখের উচ্চারণ বা শব্দ প্রকৃতিতে ঢেউ এর ন্যায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু মনের কথা প্রকৃতিতে সহসা ধ্বনিত না হলেও তার সংকেত মস্তিষ্কে আরোপিত হয় ঢেউ এর ন্যায়। মনের শব্দ মস্তিষ্কে যেতে প্রথমে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মুখের কথা ধ্বনিত হতে মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের মুখ বসে থাকতে পারে নিশ্চুপ হয়ে কিন্তু মন কখনো সজাগ অবস্থায় ভাবনাহীন বসে থাকতে পারে না। সে সব সময় কিছু না কিছু কাজ চায়। আমাদের মনের ভাবনার দানাগুলো দেখতে না পারলেও সেগুলো অস্তিত্বহীন থাকে না। আমরা ভাল মন্দ অনেক কিছুই ভাবি। আমাদের অভাববোধ আছে। এর জন্য মনে তাড়না জাগে। আমাদের অভাববোধের তাড়না (Negative Impulse) থেকে খোদার

www.pathagar.com

নির্দেশে সেই সত্তা (নিজের অস্তিত্ব) থেকে নতুন জাতের উদ্ভব হয়। এর নাম Negative সত্তা। তাছাড়াও ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ-বালাই, মৃত্যুর প্রহরী আমাদের পাশেই লেগে থাকে। সে জন্য মানুষ সব দিক থেকে পূর্ণ নয়। তার মাঝে সব সময়ই অভাব বোধ কাজ করে। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে অভাবহীন। কিন্তু স্রষ্টার কোন অভাববোধ নেই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-বালাই, মৃত্যু ইত্যাদি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি চির ভাবনাহীন। তবু তাঁর মাঝে প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতা আছে। আছে সৃষ্টি প্রেম। তাই সৃষ্টি ধর্মী প্রেম দোষের কিছু নয়। সেজন্য মনের সাথে প্রেমের একটা নিবীড় সম্পর্ক আছে। প্রেমহীন মানুষ তাই মরুভূমির মতো। কিন্তু এ প্রেম হতে হবে সৃজনশীল, শুদ্ধ ও কুচিন্তামুক্ত।

পরম স্রষ্টার প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতার দানাগুলোই বিশ্বের আদি সত্তা। খোদার অসীম ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনার ফসল এ বিশ্ব জগৎ। এটি কোন দৈব চিন্তা বা দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে খোদার কথা বলার ব্যাপারটি আমাদের মতো নয় এবং শোনার বিষয়ও এমন নয়। এরূপ ধারণা সীমবদ্ধতার ব্যাপার। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়ে পরিকল্পনার নক্সার মতো সৃষ্টি হয়ে যায়।

স্রষ্টার বেলায় বস্তু বা অন্যান্য অদৃশ্য উপাদান সৃষ্টি করতে কোন কিছুর মাধ্যম নেয়া প্রয়োজন পড়েনি, তিনি যেমন বস্তুর স্রষ্টা তেমনি তার উপাদানেরও স্রষ্টা। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার দ্বার প্রান্তে এসে আজ আমরা সেই সত্যের সন্ধান পেতে শুরু করেছি। আধুনিক বস্তুর সংগায় এখন বস্তু কণিকার আকারেও থাকতে পারে আবার ঢেউ এর ন্যায়ও থাকতে পারে। কালক্রমে বস্তু এখন কাল্পনিক ছায়ায় রূপ নিয়েছে। বস্তু যখন ঢেউ এর আকারে থাকে তখনও তার মাঝে তার আদি গুণাগুণ বজায় থাকে। শোষণ ও বিকিরণের বেলায়ও বস্তুর মূল সত্তা ঢেউ বা তরঙ্গ ঝাঁকের ন্যায় চলে। বিজ্ঞানের নথি পত্রে এখন জড় আর চৈতন্য শক্তির মধ্যে খুব বেশী তফাৎ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই ধারণা শেষমেষ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন সকল কিছু এক মহাশক্তি থেকে ফিরে এসেছে। তাঁরি প্রকাশের প্রেমবোধ থেকেই যেন এই জাগ্রত বিশ্বের সূচনা। ঢেউ থেকেই বিশ্বের

www.pathagar.com

যেন হলো সূচনা। ঢেউয়ে যেমন স্থির থাকা যায় না। তেমনি এর সূক্ষ্ম অস্তিত্ব মনে স্থির করে নেয়া সম্ভব হয় না। তাই বিশ্বাসের মূল অনেকের হয়তো নড়বড় করতে পারে।

সৃষ্টি তার বাণিজ্য শেষ করে পূত পবিত্র ভাবেই স্রষ্টার দিকে ফিরে যাবে সেটিই স্রষ্টার কামনা। কিন্তু ঢেউ এর বেলায় যদি ফিরে যাওয়ার মতো কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সে তো শুধু চলতেই থাকবে। তাই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা সৃষ্টির বিধানের আলোকে বৈধ। সেটি বৈধ হলেও তাকে অনুসরণ করা অন্য সৃষ্টির জন্য বৈধ নয়। পক্ষান্তরে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির সাথে আকার সৃষ্টির এক নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই দেখা প্রয়োজন এই প্রতিবন্ধক কি? এবং এর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কতটুকু? তা না হলে শয়তানের সাথে (প্রতিবন্ধক) আমাদের পরিচয় উহ্য থেকে যাবে।

শয়তানের অস্তিত্ব

ভাবনাই মানুষের মনের খোরাক। এটি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তারা আকাশ আর পাতালের মধ্যে যা কিছু আছে তা নিয়েই চিন্তা করে। মানব মন কখনো কাজহীন বসে থাকে না। মন যখন ভাবনার আসরে বসে, তখন সে ভাবে স্রষ্টা কেনই বা শয়তান সৃষ্টি করলেন? এই অভিশপ্ত শয়তান না থাকলে তো আমাদেরকে আর দোষখী হতে হতো না। খোদা কেনই বা এই শয়তান সৃষ্টি করে ভুল করতে গেলেন?

আমরা না বুঝে, না চিন্তা করে যতই ভাবি না কেন, শয়তানের জন্ম বা সৃষ্টি হওয়া অনর্থক নয়। শয়তান সৃষ্টি হওয়ার অনুকূলে সৃষ্টির সম্প্রসারণ ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করা এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার অন্তর্নিহিত গোপন ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পরীক্ষা পাশের প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি। মাঠে বল খেলতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হলে যেমন জয় পরাজয় ঠিক করা সম্ভব নয় তেমনি প্রতিপক্ষ ব্যতীত ভালো খেলোয়াড় হওয়াও চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে

www.pathagar.com

হবে যে, প্রতিপক্ষের নীতি কৌশল ও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তার অনুকূলে খেলতে থাকলে জয়ের সম্ভবনা হারাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বরং প্রতিপক্ষের জয় অনিবার্য। পরিশেষে প্রতিপক্ষের মতোই তাকেও পুরস্কার পেতে হবে। আল্লাহ বলেছেন- "প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করব এবং এ ফলাফল লাভের জন্যে তোমাদেরকে আমাদের নিকটেই ফিরে আসতে হবে।"

– (সূরা আম্বিয়া-৩৫)

"আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু এজন্যে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট।"

– (সূরা মূলক-২)

"হে আদম সন্তান, শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে, যেমন তোমাদের পিতামাতাকে বেহেশত হতে বের করেছিল। তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ কেড়ে নেয়া হল এবং তাদের লজ্জাস্থান বে-আবরু হয়ে পড়ল।"

– (আল-কোরআন)

"শয়তান বলল, আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ বললেন যে, তোমার জন্য অবকাশ। ইবলিস বলল, তুমি যখন আমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছ তখন তোমার বান্দাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম হতে বিচ্যুত করবার জন্য ওৎ পেতে থাকব তারপর সামনে হতে, পেছন হতে, ডান হতে, বাম হতে আক্রমণ করব। সুতরাং তুমি দেখবে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ পাক ইবলিসকে বললেন, এখান হতে ঘৃণিত এবং বিতাড়িত হয়ে যা। যারা তোর অনুগত হবে তাদের সকলের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" – (সূরা হজর)

সাদৃশ্য অসাদৃশ্যের গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত যেমন কোন জিনিসের মান পরীক্ষা করা সম্ভব নয় তেমনি অন্ধকার ব্যতীত আলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা ও কঠিন। অপরদিকে শুধু উত্তমকে উত্তম বলে স্বীকৃতি

www.pathagar.com

দেয়া সম্ভব নয় মন্দ ব্যতীত। সে জন্য সত্য ও উত্তমকে প্রকাশ করার জন্য অহংকারী সৃষ্টির করা সৃষ্টি বিধানের আলোকে আবশ্যক ছিল। খোদার গুণাবলীতে অহংবোধ নেই। সরলতা ছাড়া গরলের কোন অস্তিত্ব নেই। অহংকার অনুগত্য বিরোধী হয় এবং অহংবোধ লাগামহীন প্রবৃত্তির দাসত্বের বাহন। অহং শক্তি নিজকে ভাবে অসীম ও বুযুর্গ কিন্তু তার মাঝে অসীমত্বের কোন বালাই নেই, নেই কোন বুযুর্গীর গন্ধ। তবে 'প্রবৃত্তি' সৃষ্টিকে সম্প্রসারণের উদার ভূমি। একে খোদার পথে বশ মানাতে পারলে সৃষ্টিতে উৎকর্ষতা আসে। কিন্তু শয়তানের পথে চললে, তার পরিণতি খারাপ দাঁড়ায়। শয়তান যেমন বাঁকা পথ ধরতে দ্বিধা করে না, এরাও তাই করে। এরা যা করে একেই মনে করে উত্তম। তারা অন্যের কথার চেয়ে নিজের কথার মাঝেই বেশী বুযুর্গী আছে মনে করে।

শয়তান যখন বাঁকা পথ ধারণ করেছিল তখন সৃষ্টির মাঝে নতুন দিগন্ত সূচীত হয়। এই শয়তান যদি প্রবৃত্তির পাগল না হতো তাহলে বিশ্বের সম্প্রসারণ ও তার উৎকর্ষতার দিগন্ত পথ সূচীত হতো না। তবে এই শয়তান সৃষ্টি হওয়াতে সৃষ্টির কিছু অংশ যে বিপর্যয়শীল হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে শয়তান বলতে কোন কিছু আছে কি না এ প্রশ্নের জন্ম হওয়াও স্বাভাবিক। ধর্মের পরিসরে এ শয়তানকে আমরা যে ভাবে চিনি, জানি, বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিসরে এর কোন অস্তিত্ব আছে কি নেই তাও চিন্তা ভাবনা করে দেখা প্রয়োজন। এ সব ক্ষেত্রেও যদি শয়তানের শয়তানী প্রমাণ হয়, তবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ আবিষ্কার করা সহজ হবে।

এ বিশ্ব অসীম। এর কোন কিনার বা সীমানা নেই। কিনার বা বাঁধা ব্যতীত কেউ মূলের দিকে ফিরে আসতে পারে না। কোন ঢেউ বা তরঙ্গ যদি কিনার না পায় তবে সেটি চলতেই থাকবে। শব্দের যেমন বাঁধা ব্যতীত প্রতিধ্বনি হয় না তেমনি বাঁধাহীন সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। সেজন্য একটি বাঁকা পথ বা কিনার সৃষ্টি করা। স্রষ্টার সৃষ্টি বিধানে ভুল বলে কোন কথা নেই। এই কিনার বা বাঁকা পথ না

www.pathagar.com

থাকলে তরঙ্গ বা ঢেউ যেরূপ চলতে থাকে তেমনি আদমের অবস্থাও সেরূপ হতো। এখানে কিনার বা বাঁকা পথটি হলো শয়তানের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। শয়তান বাঁকা পথের অনুসারী হয়ে স্রষ্টার কাছে অবকাশ চেয়েছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল আদমের জাতকে তাঁর অনুগত্যের ছোবল দিয়ে তার পথের অনুসারী করে নেবে। তখন আল্লাহ শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য মঞ্জুর করলেন জাহান্নাম।

খোদা আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেশতা জাতিকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন। এতে সকল ফেরেশতা সেজদা করলেও ফেরেশতার সরদার (জ্বীন জাতি থেকে পয়দা) আযাজীল তাঁকে সেজদা করেনি। তার সেজদা না করার কারণ ছিল অহংবোধ বা অহংকার। ফলে সে খোদার নির্দেশ অবমাননাকারী হিসেবে অভিশপ্ত হলো। তখন থেকেই শয়তান, আদম ও আদমের জাতের প্রতি প্রতিশোধের ক্রোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে লেগে আছে। আদম ও হাওয়া মানব জাতির আদি পিতা-মাতা। তাঁরা ছিলেন বেহেশতে। সেখান থেকে শয়তানের ফন্দি ফিকিরে প্রবৃত্তির দাসত্বের ছোবল খেয়ে বিতাড়িত হলেন নিম্ন জগতে। তখন থেকে এখনো আমাদের অন্তরে প্রবৃত্তির সেই ছোবল লেগে আছে। শয়তানের প্রবৃত্তি আর পশু প্রবৃত্তি একই স্তরের। মানুষের মাঝেও এই গন্ধ তখন থেকেই লাগানো। কিন্তু মানুষ যদি এ থেকে ধুঁয়ে মুছে পবিত্র হয়ে খোদায়ী প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে চলে তখন তার মধ্যে খোদায়ী গুণ পয়দা হয়। এতে পশু প্রবৃত্তির যাবতীয় গন্ধ, ময়লা, আবর্জনা থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির (আদম জাতের) যখন নীতিগত সম্পর্ক বজায় থাকে তখন শয়তান আদমের জাতের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এতে বরং শয়তান নিজেই জ্বলতে থাকে। কিন্তু সৃষ্টি যদি স্রষ্টার সাথে নীতিগত সম্পর্ক ছেদ করে, তখন ঐ সৃষ্টি থেকে পয়দা হয় শয়তানের জাত। এর ফলে শয়তানের গায়ে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। তাই শয়তান হরহামেশা খোদার সাথে আদম ও আদমের জাতের নীতিগত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেষ্টা করে। মূলতঃ শয়তান নিজের প্রবৃত্তির চেতনায় বিশ্বাসী। সে জন্য সে

www.pathagar.com

নিজের প্রবৃত্তির লালসা মিটানোতে ব্যস্ত থাকে। শয়তান চির অভিশপ্ত। আজীবন সে অনলে জ্বলবে। সে সর্বদাই লেগে আছে নারী-পুরুষ ও খোদায়ী শক্তির পেছনে। পরম করুণাময়ের অপার অসীম সৃষ্টির গোপন সাগরে শয়তান যে কোথায় কিভাবে থাকে বা আছে, সেটি বুঝা খুব কঠিন। আত্মার জন্য আত্মার জগত বা রূহানী জগত যেমন রয়েছে তেমনি এ দুনিয়ার জগৎ হলো জড় ও আত্মার সম্মিলিত জগৎ। শয়তান এ দুনিয়ার জগতেও আমাদের পেছনে লেগে আছে। সে শুধু আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশত হতে নিম্ন জগতে নিয়ে এসেই ক্ষান্ত হয়ে থাকেনি। কি ভাবে কোন দিক দিয়ে যে সে আমাদেরকে ছোবল দেয়, তা বুঝা বড় কঠিন। সে আমাদের পেছনে লেগে থাকাতে তার লাভ কি? নিশ্চয়ই এতে তার কোন না কোন স্বার্থ আছে। সে বাঁচার জন্যই হোক কিংবা তার দল বল সমর্থন বৃদ্ধির জন্যই হোক, সে তার এন,জি,ও-র দপ্তর খোলা রেখেছে। স্বার্থ তো নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে সে এতো সাহায্য সহযোগিতাসহ প্রহরীর মতো লেগে থাকবে কেন? নিম্নের একটি উদাহরণ থেকে আমরা এর সত্যতার আভাষ পেতে পারি। যেমন, আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাব, এর ভেতরে আছে একটি Posative Phase, একটি Negative Phase ও একটি Neutral Phase। এ তিনটি Phase এর সাথে লাগানো থাকে একটি কুন্ডলীকৃত তার। কার্যতঃ এ তিনটি phase এর সাথে কুন্ডলীকৃত তারটি ধীর ভাবে লেগে থাকলে যখন তড়িৎ প্রবাহ এর মধ্যে পতিত হয় তখন বাঁকা কুন্ডলীকৃত মাধ্যমটি দিয়ে এক উজ্জ্বল সত্তা বিকিরণ হয়। কিন্তু এ কুন্ডলীকৃত তারটি যদি একটির সাথে অথবা দু'টির সাথেও লেগে থাকে তবে এর ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল সত্তার বিকিরণ হয় না। অথচ লেগে থাকলে সেটির গা জ্বলে জ্বলে যে উজ্জ্বল সত্তা বের হয়ে আসে এর নাম আলোক। এ আলোক জড় পদার্থের মৌল আদানের গর্ভে বাস করে। তাই আলোক না হলে জড় পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার আশা করা যেত না। এখানে বাঁকা কুন্ডলীকৃত মাধ্যমটি না থাকলেও আলোক বের হওয়ার পথ ছিল না। এই কিনার বা সীমানা না পেলে Posative phase দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধু

www.pathagar.com

চলতেই থাকত। সে কোন অবস্থাতেই Negative phase এর সাথে মিলিত হতে পারত না। অথবা এ system এর বাইরে মিলিত হলে সৃষ্টির বিকাশ ঘটতো না। বিপর্যয় ও সংঘর্ষই লেগে থাকত। এই উদাহরণ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির বিকাশের জন্য শয়তানের প্রয়োজন আছে।

আমরা যদি এ সাদৃশ্যমূলক ব্যাখ্যাটি স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের সাথে নীতিগত সম্বন্ধ অনুযায়ী সেট করি, তাহলে দেখব, জাগতিক বিশ্বের অস্তিত্ব দাঁড় করাতে শয়তানের অস্তিত্ব সৃষ্টি করা ছিল অপরিহার্য। এর সাথে সৃষ্টির উৎকর্ষতা, সৃষ্টির সম্প্রসারণ, সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার নিগূঢ় অতি রহস্যময় সম্পর্ক যুক্ত। এ উদাহরণ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির অস্তিত্বের সূক্ষ্ম পর্দায় নিশ্চয়ই শয়তান নামের এক বাঁকা কুমন্ত্রণাকারী বসে আছে। সে আসলেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে নীতিগত সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। জড় পদার্থের পরমাণুর কাঠামোর ভেতরে শয়তানী সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক ধরণের কণার আনাগোনা করতে দেখা যায়। বিশ্ব সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন কোথাও একে অপরের সাথে আত্মিক সুসম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব আছে তেমনি বস্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই রূপই সুষম সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব বিরাজমান। পরমাণুর ভেতরে শয়তানী সত্তার যে আনাগোনা সেটিও বস্তুতাত্ত্বিক সুসম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের আওতায় পড়ে। এ বিষয়টির একটি বাস্তব ব্যাখ্যা শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পারে। শয়তানকে চোখে দেখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি হাতে ধরাও সম্ভব নয়। তাই একে কিছু রূপক ও সাদৃশ্যমূলক ব্যাখ্যা দিয়েই প্রমাণ করতে হবে। তার দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীকে হাজির করে তাদের জবানি শুনেই তার খোঁজ খবর রাখতে হবে।

আমাদের চারপাশে আছে বস্তু বা পদার্থ। আমাদের দেহ ভুবনটিও বস্তু বা পদার্থের সমষ্টি। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ চারটি মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত। এ চারটি কণা হলো নিউট্রন (+ আদান), প্রোটন (নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ আদান), ইলেকট্রন (- আদান) এবং নিউট্রিনো। একটি পরমাণুর

www.pathagar.com

ভেতরের নিউট্রন ও প্রোটনের চারপাশে ইলেকট্রন কণিকা থাকে সর্বদায় ঘূর্ণায়মান। অপর দিকে নিউট্রিনো তার নিজস্ব বিপরীত মুখী বল দ্বারা অন্যান্য কণাকে তার দিকে টানতে চেষ্টা করে। পরস্পরের বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে পরমাণুর আকৃতি। আমাদের দৈহিক সত্তার মাঝে অগণিত পরমাণুর দানা ইটের সারির মতো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এ কাঠামোটি তেজদীপ্ত আত্মার আত্মিক ক্ষমতা বলে জীবন্ত থাকে। মূলতঃ আত্মিক সত্তা সৃষ্টির কৌশলের সাথে দেহ সত্তা সৃষ্টির একটি নিবীড় সম্পর্ক আছে। আত্মা যদি কখনো রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এতে তার প্রভাব দেহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেই সাথে দেহ যন্ত্রও বিকল হতে বাধ্য হয়। এ সব যোগসূত্র ও সম্পর্ক এটাই প্রমাণ করে যে, আত্মিক সত্তার সৃষ্টিগত কৌশলের সাথে দৈহিক সত্তা সৃষ্টির সম্পর্ক না থেকে পারে না।

আত্মিক পর্যায়ে শয়তানের সাথে আদম (আ) 'বিবি হাওয়া ও খোদার শক্তির রয়েছে বৈরী সম্পর্ক। শয়তান নীতিগত ভাবেই মানব গোষ্ঠিকে তার শিষ্যত্ব বরণ করার জন্য আকর্ষণ করে বা টানে। এতে সে খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রতিদ্বন্দী বল প্রয়োগ করে সকলের ক্ষেত্রেই। দৈহিক সত্তার ভেতরে নিউট্রিনোর প্রসঙ্গটিও তেমনি। এখানেও নিউট্রিনো সবার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই শয়তানী কার্যকলাপের সাথে নিউট্রিনোর চরিত্রের সম্পর্ক আছে মনে হয়। মানব মনের কর্মপ্রেরণা বা অভিব্যক্তির রূপায়ণ ঘটে তার অঙ্গের মাধ্যমে। অঙ্গ যখন মনের আবদার পালন করে তখন অঙ্গের পরমাণুর গা ভেদ করে কিছু কর্মশক্তি বিকিরণ হয়। কে জানে কু প্রবৃত্তির দাসত্বের বশে কোন কর্ম সম্পাদন করলে পরমাণুর গা ভেদ করে খারাপ কিছু তৈরী হয় কিনা? ধর্মের ভাষায় 'গোনাহ' একটি পাপসত্তা। এর রূপ চরিত্র অনুজ্জ্বল ও দুষ্কৃতিপূর্ণ। আমাদের দেহের পরমাণু নামক বাল্বের ভেতরে নিউট্রিনোর বিধান ও চরিত্র যদি বৈদ্যুতিক বাল্বের কুন্ডলীকৃত তারটির অনুরূপ হয় তবেই এর সাথে শয়তানের সূক্ষ্মাতীত দেহের সম্পর্ক থাকতে পারে। শয়তান যেমন মানুষের মনে ছোবল দিতে পারে তেমনি দেহের শিরা, উপশিরা দিয়েও হাঁটতে পারে। তার সূক্ষ্ম দৈহিক আবরণ কি আমাদের দেহ কোষে জাল পেতে রয়েছে কিনা, তা কেমন করে বলি।

www.pathagar.com

তবে সব ক্ষেত্রেই যেহেতু তিনের সাথে একের দ্বন্দ্ব বা বিপরীত সম্পর্ক আছে দেখা যায় তাহলে নিউট্রিনো হয়তো বা দেহাবরণের মাঝে শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমরা কোন বিষয়ই চূড়ান্ত করতে পারি না। কারণ শত চেষ্টা করলেও আমাদের দেখার ও জ্ঞানের আপেক্ষিকতার মোহ দূর করা সম্ভব হয় না। তাই সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিমাপ আল্লাহই ঠিক করতে পারেনা। তিনিই সকল বিষয়ে হাফেজ।

এ বিশ্ব চিরন্তন নয়। এর শুরু ও শেষ আছে। বিজ্ঞানীগণের বিশ্বাস এ সুন্দর সৃষ্টি কাঠামো একদিন নিউট্রিনোর বিপরীত মুখী আকর্ষণের ফলে প্রলয়ের চেতনার উন্মাদনা শুরু করবে। তখন শব্দ বোমা বিস্ফোরিত হবে। শিঙ্গার প্রচন্ড ধ্বনিতে চারদিক কেঁপে উঠবে। পাহাড়, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। আকাশ সেদিন বিকল হয়ে পড়বে। পানিতে আগুন ধরে যাবে। অতপর সকল কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে রেণু রেণু হয়ে পড়বে। কিন্তু কোন কিছুই শেষ হয়ে যাবে না। পানি থেকে বাষ্প যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় তেমনি হয়তো এ বিশ্বের অবস্থা আরও রেণু-রেণুতে পরিণত হবে। তারপর সেই সুপ্ত বীজতলা থেকেই নতুন বিশ্ব গজিয়ে উঠবে। আজ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-বালাই এর উপাদান এক সাথে বা পাশাপাশি চরিত্র নিয়ে একি ঘরে বসবাস করে। কিন্তু বর্তমান প্রকৃতির নিয়ম-নীতি অচল হলেও সে দিন এর কোনটিও ধ্বংস হবে না। বরং ভালোর জায়গায় ভালো চলে যাবে আর মন্দ ও কষ্টের জায়গায় শুধু তারাই থাকবে। সেদিন শয়তান ও তার দলবলকে দুষ্কৃতির রাজ্য আকর্ষণ করে উদরে টেনে নেবে। সেদিনের বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের যেমন বাস্তব ধারণা নেই তেমনি বিশ্বের আদি অবস্থা কেমন ছিল তাও আমরা বলতে পারি না। অথচ আমাদের মন আদি গোড়া খোঁজার উস্তাদ। আমরা অনেক সময় অনেক কথা ভাবি যার কোন আদি বা শেষ থাকে না। এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন জানি আমাদের মনে উদয় হয় আল্লাহর আগে কি ছিল? কিন্তু যার আদি বা শেষ নেই সেখানে কিনার খোঁজাও বোকামীর লক্ষণ। তবে সসীমের (মানুষের) মনে এ প্রশ্নও আল্লাহকে অসীম প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ই আদি সত্তা

দুই বা ততোধিক মানুষ যদি একত্রে দৌড় শুরু করে তখন কে আগে, কে পরে তা বলা সম্ভব। পৃথিবীতে সন্তানের জন্মের আগে পিতা-মাতার জন্ম হয়। তাদের আগে এদের পিতা-মাতার জন্ম হয়। এভাবে চলতে চলতে তার একটা আদি বা শেষ পাওয়া যায়। কিন্তু সকল আদির আগে কে বা কি ছিল, এ ধরণের প্রশ্ন করলে তার কোন উত্তর দেয়ার থাকে না। এ ক্ষেত্রে বরং সমাধান হবে সকল আদিরই এক ও অভিন্ন চিরন্তন মূল আদি বলতে এক পরমসত্তা ছিল। যার আগে কল্পনা করার কিছু নেই। তবু আমাদের মন অনন্ত অরণ্যের সীমাহীন শূন্য সাগরে হারিয়ে যেতে যেতে তারও কিনার পাওয়ার চেষ্টা করে। অথচ এসব চেষ্টা, তদ্বীরের কোন অনন্ত নেই, শেষ নেই। যার শেষ নেই, সেখানে অসীম বিরাজ করে। অসীমকে না জানতে পারলে মানুষের ভাবনার সীমা সংকোচিত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ সসীম হলেও তার ভাবনার ডানা থাকে অসীমের দিকে প্রসারিত। মানুষের এই চেতনাবোধ নিজ জাতি সত্তার প্রকৃতির বিধানের রহস্যময় লীলাখেলা। এই শক্তিই অসীমকে পাওয়ার রাস্তা ধরিয়ে দেয়। সেজন্য মানুষের মনে আল্লাহ আছেন কি নেই, কিংবা তাঁর আগে বা পরে কি ছিল, এসব অন্তহীন রহস্যের কথা বা প্রশ্নের উদয় হয়। এই জিজ্ঞাসা মানুষের প্রকৃতি সুলভ স্বভাব। মানুষ যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রকৃতি স্রষ্টার কুদরতে গড়া। এর মধ্যে দ্বৈবের কোন হাত নেই, ডারউইনের বিবর্তন নীতির কোন গন্ধ নেই। কোরআন মাজীদে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

"যে প্রকৃতির উপর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। সেটিই আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি।– (আল-কোরআন)

আল্লাহর প্রকৃতির সাজানো স্বভাব থেকেই আমরা পেয়েছি অজানাকে জানার স্পৃহা, প্রভুপ্রীতি, আশার অসীমত্ব, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদি। সেজন্য মানুষ হিসেবে আমরা অসীমকে জানতে চাই। তাঁর ঠিকানা খুঁজি। অসীম পর্যন্ত ভোগ করতে চাই। চাই সাগরের মতো কূলহীন যৌবন। চাই প্রেম-ভালবাসার অসীম দরিয়ায় আজীবন সাঁতার কাটতে। চাইনা কখনো বার্ধক্য কিংবা রোগ ব্যাধি। চাই অসীম সুখ, পরম শান্তি। সুস্থ বিবেক হলে

www.pathagar.com

চাই প্রভুর পদতলে আপাদ মস্তক অবনত রাখতে। সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য জানার ইচ্ছা এবং তার সঠিক সন্ধান পাওয়ার মাঝে মানব জীবনের পরম সুখ-শান্তি, আনন্দ-ভালবাসা সবি নিহিত। শিশু যখন দোলনার জীবন পাড়ি দিয়ে বয়সের তরী বেয়ে যৌবনের দিকে এগুতে থাকে তখন তার মনের নিভৃতকুঞ্জে এক অজানা প্রশ্ন এসে ভীড় করে। সে ভাবে এই সুন্দর পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র, এই আকাশ কে বানাল? ভাবনার অসীম সাগরে যেখানেই ঠাঁই পাওয়ার জন্য নঙ্গর করা যায় সেখানেই অনেক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব পথের সাদৃশ্যহীন, অযৌক্তিক মতার্দশ তার প্রশ্নের সমাধানকে আরও ভারী করে ফেলে। তখন সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধির তাড়নায় অনেকের আরও জানার স্পৃহা জাগে। সেই স্পৃহা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মনের আঙ্গিনাকে প্লাবিত করে। তার কলকল রব বেতার তরঙ্গের মতো মনের নিভৃতে সত্যের সন্ধান দিতে থাকে। এই পথ ধরে এগুতে থাকলেই এক সময় স্রষ্টার পরিচয় জানা হয়। তাঁর নৈকট্য, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার স্পর্শে মন হয় উদার। ফলে মানবিক ক্রিয়াকান্ড হয় আর্দশিক। তাই নৈকট্য-প্রীতি মানুষের সহজাত স্বভাব। সেজন্য স্বামী চায় স্ত্রীর ভালবাসা, স্ত্রীও চায় স্বামীর আদর। সন্তান চায় পিতা-মাতার স্নেহ। প্রজা চায় রাজার করুণা। রাজা চেষ্টা করে প্রজার শান্তির পথ আবিষ্কার করার। এ সবি মূল স্বভাবের অংশ। কিন্তু তার আসল কাজ হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক বের করে মুক্তির পথ তালাশ করা। যারা প্রকৃত পক্ষেই সঠিক পথের সন্ধান পান তারা স্রষ্টার মারেফাত (তত্ত্ব জ্ঞান) লাভ করেন। কিন্তু এরপরও অনেকের জানার স্পৃহা ফুরাতে চায় না। আরও জানতে চায়, আরও বুঝতে চায়। এভাবে আরও জানতে গিয়ে অনেকের মাথায় জাগে এক অদ্ভূত চিন্তা। এই চিন্তার ফাঁদে পড়লে মানুষ অসীমের কিনার না পেয়ে নিজেই হয়ে যায় বন্দি। কিন্তু মানুষের স্বভাব বন্দিশালা মেনে নিতে চায় না। তাকে সেখান থেকে বের হতে হবে, কে যেন বারবার তাগাদা করে। সময় নেই, অসময় নেই, এই চিন্তার বোঝা মাথায় ভাবনার পাহাড় তুলে দেয়। সে ভাবনা আর কিছু নয়, এ যেন এক কিনারাহীন সাগর। তবু মানুষ কেন জানি তা জেনেও তার কিনার খুঁজে, ভাবে আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল?

www.pathagar.com

কেন মানুষের মনে এই চিন্তার উদয় হয়। কেনই বা মানুষ মাকড়সার মতো ছোট্ট একটি পরিসরে বাস করে একের পরে আরও কিনার খুঁজে? সে আর এক রহস্যের কথা। কেউ যদি প্রশ্ন করে এক কোটির আগের সংখ্যাটি কতো? যে কেউ এক কোটি থেকে এক বাদ দিয়ে তার উত্তর দিতে পারবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে তার আগে কি ছিল জিজ্ঞেস করা হলে প্রতিবারই এক বাদ দিয়ে তার উত্তর দেয়া যাবে। কিন্তু শেষাবধি একের মাথায় এসে জিজ্ঞেস করা হলে এর তো আর সংখ্যার মানে (মূল্যশীল) কোন উত্তর দেয়া যাবে না। কেন দেওয়া যাবে না, সে কথা আমাদের অজানা নয়। আমরা জানি একের আগে কোন মূল্যশীল সংখ্যা নেই। তাই 'এক' হলো সকল মৌলিক সংখ্যার আদি মূল। এই 'এক' কোন যোগফল বা সমষ্টির ধার-ধারে না। আবার 'এক' (১) কে ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করলেও তার কোন মৌলিকত্ব থাকে না। এ রূপ চিন্তা করাও অযুক্তিক। তবু·এর পরও কেন জানি আমরা ভাবি। অথচ এই ভাবনার যেখানে শেষ সেখানে পাওয়া যায় শূন্য (০) কে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই শূন্যের কোন Value নেই। নেই এর কোন কার্য-কারণ ভিত্তি। একটি শূন্য যেমন মূলহীন তেমনি কোটি শূন্যও মূলহীন। অর্থাৎ ০ থেকে অস্তিত্বে আসা অবাস্তব। এর কোন মৌলিকত্ব নেই। কারণ ০ (শূন্য) কে ভাঙ্গলে যেমন তার ভেতরে একের (১) অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ০ + ১ = ১, এই এক (১) ভাঙ্গলেও (০) শূন্যের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। তাকে যত ভগ্নাংশেই রূপান্তরিত করা হউক না কেন এক (১) এর ভেতর থেকে শূন্যকে আর প্রসব করানো সম্ভব নয়। কিন্তু এক (১) থেকে যদি দুই (২) সংখ্যাটি অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে তার মাঝে একের মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।

যেমন ২ = ১ + ১। পক্ষান্তরে এক (১) যদি নিজের মৌলিকত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগত অস্তিত্ব ঠিক রেখে নিজের বুৎপত্তি ক্ষমতা বলে অনস্তিত্বের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টির সূচনা করতে পারেন তাহলেই সেটি হবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

কিন্তু সেই 'এক'ও হতে হবে নিরাকার ও চিরঞ্জীব। কারণ এক যদি

www.pathagar.com

আকারশীল হয় তাহলে তার পক্ষে নিজের আকার ঠিক রেখে দ্বিতীয় আকার সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব তেমনি এতে প্রজ্ঞার পরিচয় থাকে না। আমরা যদি আকারের ধারণায় মনে করি, এই বিশ্বের পরম সত্তা সূর্যের মতো। তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে আকারের মাঝে তো গতি বিরাজ করে তাহলে এই গতির স্রষ্টা কে? একটি গাড়ী স্থির থাকলে তার কোন চালক ও তেল-মবিল প্রয়োজন হয় না। যখন গতিশীল হয় তখনই তার চালক ও খাদ্যের দরকার হয়। প্রত্যেক আকারের ভেতর নিত্যই গতির খেলা চলছে। যে জিনিস গতিশীল সে জিনিস ক্ষয়শীল। গতিশীল জিনিসের মাঝে-ক্ষয় বৃদ্ধি, ঘুম-নিদ্রা-বিশ্রাম ইত্যাদি সবি থাকে। সেদিক থেকে সূর্য তার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকিরণ করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তাই স্রষ্টার বেলায় এরূপ গুণ থাকা যুক্তিহীন। আল্লাহ্ অবয়বহীন ও চিরঞ্জীব। তাঁর বেলায় ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কোন উপমাই চলে না। মৃত্যু ক্ষুধা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু গতিশীল আকারধারী জিনিসের বেলায় অবয়বহীন ও চিরঞ্জীবি হওয়া তার সত্তাধীন নয়। অর্থাৎ গতিশীল জিনিসের স্থায়িত্ব তার নিজের হাতে নয়। কিংবা এককভাবে সে কোন জিনিসের স্রষ্টাও হতে পারে না। সকল ক্ষেত্রে সে মুখাপেক্ষী থাকে। বরঞ্চ এসব জিনিসের একজন স্রষ্টা ও চালক থাকতে হবে। তাই সূর্যের মতো জিনিস কেন, কোন গতিশীল সত্তাই স্রষ্টা হওয়ার দাবী করতে পারবে না। কেউ এরূপ চিন্তা করলে তা হবে যুক্তিহীন। যিনি গতিশীলও নন, আকারশীল ও নন, তিনি চিরঞ্জীী, ও অবয়বহীন, তিনিই এই গতির জগতের স্রষ্টা ও চালক। পাক-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ সূর্য সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন চাঁদ ও তারা। আর এ সবই আইনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। – (৭ : ৫৪)

বিশ্বের সকল আকারশীল জিনিস মাত্রিক বস্তু। আকারের প্রশ্ন আসলেই তার কিনার থাকে; তাকে ছুঁয়া যায়, স্পর্শ করা যায়, ওজন করা যায়।

এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা ও ওজন মাপা যায়। তার সাদৃশ্যও থাকে। এক মুষ্ঠি খামিরকে না ভেঙ্গে যেমন দুই বা ততোধিক কিছু বানানো সম্ভব নয় তেমনি– স্রষ্টা আকারশীল হলে তার পূর্বের আকার ঠিক রেখে অন্য আকার সৃষ্টি করারও সীমাবদ্ধতা এবং পরিবর্তনের আশংকা থাকে। এসব যুক্তি

www.pathagar.com

প্রমাণের সিদ্ধান্ত হলো বিশ্বের 'আদি সত্তা ছিল নিরাকার ও স্থির। অপরদিকে নিরাকারের কোন মাত্রা থাকে না। মাত্রাহীন সত্তা একের অধিক হতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির মাত্রা বা কিনার আছে। যেগুলোর কিনার আছে সেটি হয় আকারশীল। অন্যদিকে আকারশীল জিনিস ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যে সত্তার কিনার নেই, সে সত্তা নিরাকার থাকে বলে সেই সত্তা একের অধিক হতে পারে না। কারণ কিনার ছাড়া কোন জিনিসকে পার্থক্য করা সম্ভব নয় বিধায় একাধিক্য প্রমাণ করা যায় না। সে সত্তা একাধিক্যও হয় না। অতপর এ ব্যাখ্যা বিশ্বের 'আদি সত্তাকে' নিরাকার ও একক বলে প্রমাণ করে। মূলতঃ নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহই কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত নিজ ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এই অস্তিত্বশীল বস্তু জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এর মূল উপাদান অনস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অনস্তিত্ব জগতের কোন আকার আকৃতি নেই। এ জগৎ ও তার বাসিন্দারা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে বলেই তাদের মনে অনেক সমস্যা বা প্রশ্ন উদয় হয়। আমরা ভাবি এ বিশ্বের প্রাকৃতিক উপাদান কোত্থেকে হলো? এর মনোরম শোভা বিচিত্র রূপ, গন্ধ ইত্যাদি আমাদেরকে কোন সময় ভাবনাহীন বসে থাকতে দেয় না। মিস্ত্রি কাঠ লোহা ব্যতীত চেয়ার টেবিল বানাতে পারে না। কুমার মাটি ছাড়া হাড়ি তৈরী করতে পারে না। শিল্পী তুলি আর রং ব্যতীত ছবি আঁকতে পারেনা। সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবোধ হয়। কিন্তু স্রষ্টার বেলায় প্রয়োজন বোধ হয় না। তিনি মুখাপেক্ষীহীন। মূলতঃ তিনি এই উপাদান কোথা হতেও আমদানী করে আনেননি। এই উপাদান পরম সত্তার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরীত রূপ। নিরাকারের অসীম ক্ষমতার নির্দশন। তবু আমাদের মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের (আকার তুল্য) যে ধারণা আসে তা মূলতঃ জড়ত্বের গুণ। কারণ প্রতিটি জড় সত্তার কিনার থাকে বিধায় সে আগে পরের চিন্তা করে। আসলেই কিনার বৈশিষ্ট্য রেখার (-) আগে-পরে কিছু আছে বা ছিল বিধায় কল্পনা করার থাকে। অথচ যার কিনার আছে সে জিনিসের পূর্ণতা নেই। সে কারণে সে শুধু ভাবতেই থাকে। আমাদের এই জ্ঞান ইউক্লিডের জ্যামিতিক ধারণার মতো। তিনি ~~মনে~~ করতেন একটি সরলরেখা দ্বারা কোন স্থানকে আবদ্ধ করা যায় না। অথচ দেখা যায় একটি রেখা পূর্ণতা

www.pathagar.com

লাভ করলে সেটি একটি বিন্দুতেই মিলিত হয়। তখন পুরা স্থানটি গোলক আকৃতি মনে হয়। সেজন্য পরিপূর্ণ বিশ্বের কোন কিনার নেই, তাতে সরল রেখা টানা যায় না। ফলে গোলক প্রকৃতির বিশ্বে স্রষ্টার আগে-পরে কি ছিল তা ভাবাই অবাস্তব। এরপরও যদি কেউ মনে করে এক এর আগে শূন্য ছিল। তখনও প্রশ্ন দেখা দিবে শূন্য থেকে 'এক' আসলো কি করে? আমার বিশ্বাস এর কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। আগেই বলেছি শূন্য হলো মূল-্যহীন ও অসার। এর কোন কার্য-কারণ ভিত্তি নেই। সে কারণে আল্লাহর আগে কি ছিল সে ধারণা পরিত্যাগ করে, স্বীকার করতে হবে এই বিশ্বে অনাদি হতে মুখাপেক্ষীহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি বিরাজমান ছিলেন, তিনিই এক আল্লাহ।

সূরা একলাছে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"বল (হে মুহাম্মাদ) আল্লাহ এক- আল্লাহ সমস্ত কিছুর নির্ভর, তিনি জন্ম দেন না; জন্ম গ্রহণও করেন না, তার সমতুল্য আর কেউ নেই।

–(আল-কোরআন)

তিনি বস্তু বা পদার্থ নন। তিনি নিরাকার ও চিরঞ্জীবি। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি শরীরিও নন। বস্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন বাস্তব রূপ নয়। এ বিশ্ব ভুবনে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সকল কিছুই তাঁর ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ বা অভিব্যক্তির ফল। তাঁর ইচ্ছাশক্তির বিচ্ছুরীত সত্তাই 'নূর'। এই 'নূর' প্রকাশ হওয়ার আগে বিশ্ব ছিল অনস্তিত্বশীল। তখন এক আল্লাহর অধীনেই ছিল স্থির মন্ডল। বস্তু ও তার উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির ফল। তাঁর অপার মহিমায় স্থির বিশ্বে 'নূরের' ঢেউ জাগে। এ থেকেই এই বিশ্বের অংকুর গজায়, বিকাশ শুরু হয়। স্রষ্টার মহা মহিমায় বিবর্তনের ধারায় এর মাঝেই প্রাণ মনশীল চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিবর্তন উদ্দেশ্যমুখী চিন্তার ফল। জড় সত্তা ও প্রাণ সত্তার সমন্বয় সৃষ্টির পূর্ণতার বহিপ্রকাশ। সৃষ্টিতে স্রষ্টা ধর্মী চেতনার গুণাগুণ তৈরী করার জন্যই স্রষ্টার এই প্রচেষ্টা। সে সূত্রেই মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি।

মহা প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন- "সব কিছু

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা হয়েছে পরিমাণে ও অনুপাতে।" – (৫৪ - ৫৪)

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" – (২০-৫০)

জগৎ ও দুনিয়ার সকল কিছুতে যখন নিঝুম অবস্থা বিরাজ করতেছিল তখন আকার, গতি, দৃশ্য, অদৃশ্য উপদানের তৈরী জগৎ বলতে কোন কিছুই ছিল না। সে অবস্থায় নিরাকার, চিরঞ্জীব, একক ও অদ্বিতীয় মহা মহিয়ান পরম দয়ালু আল্লাহই ছিলেন সেই অসীম রাজ্যের মালিক। তিনি সৃষ্টিজাত নন কিংবা দৈবক্রমে ও তিনি আর্বিভাব হননি। সেই সাথে এ সৃষ্টি জগৎও কোন দৈব ঘটনা থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি। তখন জগৎ ও দুনিয়া সৃষ্টির কোন উপাদান আদি হতে মওজুদ ছিল না। বিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তি কোন দৈব ঘটনা থেকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি হয়নি এবং পদার্থের আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন নয়। পক্ষান্তরে বিশ্বের মোট শক্তির ও নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। এ বিশ্ব সবর্দাই সম্প্রসারণশীল, কিন্তু এর নিত্য নতুন চাহিদা কোন মওজুদ ভান্ডার থেকে পূরণ করা হয় না। সৃষ্টির অভাববোধ স্রষ্টার নির্দেশেই পূর্ণ হয়। স্রষ্টার নির্দেশ নূরের শ্রেণীভুক্ত। সেজন্য সৃষ্টির সম্প্রসারণের উপাদান কোথা হতেও আমদানী করতে হয় না। সময় ও আকারের (বস্তুর) কোন বাস্তব উপাদান নেই। গতিও ঢেউ এর মৌলিক সত্তা। কিন্তু বিশ্বে আদি অবস্থায় গতি দিয়ে ছেড়ে দেয়ার মতো কোন উপাদানও ছিল না। এই উপাদান নিরাকার আল্লাহর সৃষ্টি প্রেমের জাগ্রত রূপ। তাঁর অভিব্যক্তির প্রকাশ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা-মওদূদী (রহ) লিখেছেন 'ইসলামী মতে আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ অবয়বহীন। তিনি কোন বস্তু বা পদার্থ রূপে নিজকে ব্যক্ত করেন না। এই বিশ্ব তাঁর সত্তার বাস্তব প্রকাশ নয়। তা শুধু তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। কাজেই ইসলামে প্যানথিজমের (Panthesim) স্থান নেই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইসলামের আল্লাহকে কার্পেন্টার গড বলে কটাক্ষপাত করেছেন। কিন্তু কার্পেন্টার বস্তু গড়ে কতকগুলোর উপাদান দ্বারা। যার স্রষ্টা সে নিজে নয়। ইসলামের আল্লাহ শুধু বস্তুর স্রষ্টা নন। তিনি বস্তুর যাবতীয় উপাদানেরও স্রষ্টা। যখন জগৎ বলতে কিছুই ছিল না

www.pathagar.com

কোথাও, সেই নির্ব্যূঢ় অনস্তিত্ব বা শূন্যতা হতে তিনি সবকিছু বিকাশ ঘটালেন, তাঁর বিরাট ইচ্ছাশক্তি দ্বারা। তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন শুধু ইচ্ছা করেন, 'উহা হউক' এমনি তা গঠিত হয় 'কুন ফাইয়াকুন'। এই গঠনের অর্থ অনস্তিত্ব জগৎ থেকে অস্তিত্বের জগতের রূপ লাভ করা।–(ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা)

বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা ও তার আদি অবস্থা কেমন ছিল এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কোন সর্বজন গ্রাহ্য অভিমত নেই। তবে যেগুলো আছে সেগুলো ও অনুমান ভিত্তিক, কল্পনায় সাজানো। আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে সুদূর অতীতে এই বিশ্বের পদার্থ ও শক্তি অতি উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপে ও তাপে একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ ছিল। এই আবদ্ধ ভর-শক্তি প্রচন্ড অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন এক প্রচন্ড আদি বিস্ফোরণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফলে সেই থেকে তা সম্প্রসারণ লাভ হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কারণ তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা যায় প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বের এই পদার্থ ও শক্তি আসল কোত্থেকে? পজেটিভ ও নেগেটিভ আদান সৃষ্টি হলো কি ভাবে? বিজ্ঞানীগণ এর উত্তর দিতে অপারগ। তবে তাদের ধারণা থেকে বুঝা যায় স্থান, কাল ও বস্তু স্বাধীন অস্তিত্ব বিশিষ্ট্য এবং তা পূর্ব থেকে কোথাও ছিল। কিন্তু বস্তু যে মাত্রিক জিনিস, স্থান কালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, ফলে এর স্বাধীন অস্তিত্ব বিশ্বাস করা যায় না। বস্তু মানেই পরমূর্ত। এর কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কারণ বস্তুর আকার ও গতির সম্বন্ধ চিরন্তন নয়। চিরন্তন হলেই নিরাকার ও একক হতে হবে। এরূপ হলে তার আগে পরে কল্পনা করার কিছু থাকবে না। কিন্তু বস্তুর আকার থাকায় তা অনন্ত অসীম নয়। সে সূত্র থেকেই এক অনন্ত অসীম নিরাকার ও চিরঞ্জীব মহা শক্তিমানকেই আমরা আল্লাহ বলি। সুতরাং আল্লাহর আগে কি ছিল তা ভাবার কোন হেতু নেই। এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব।

আল্লাহকে বাস্তবে দেখতে পারি না বলে অনেক অবাস্তব চিন্তা এসে মনে ভীড় করে। যুক্তি প্রমাণের কাছে অনেক সময় অনেক অবাস্তব ভাবনা ও কেটে যায়। আল্লাহ নিরাকার তা চিরন্তন সত্য। কিন্তু আল্লাহকে দেখতে

www.pathagar.com

পাওয়া কি সম্ভব? সত্যি কথা বলতে কোন বাঁধা নেই মানা নেই। তাই বলতে হচ্ছে আল্লাহ্‌র যেহেতু কোন বাড়ী-ঘর নেই অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু আমাদের মতো বাড়ী-ঘর নিয়ে বাস করেন না সুতরাং তাঁকে দেখা খুব রহস্যময়। পৃথিবীর বেলায় তিনি গুপ্ত। কারণ তাঁকে দেখে এখানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু খোদার অস্তিত্ব যে দেখা যাওয়ার মতো তা বাস্তবে প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়। মহা প্রভু কাল হাশরে বেহেশতবাসীদের সামনে তাঁর নূরের পর্দা উন্মোচন করে দেবেন। সে দিন বেহেশতবাসীগণ খোদার পরম সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূত হয়ে খানাপিনা ছেড়ে অচেতন দৃষ্টিতে তন্দ্রায় কাটিয়ে দিবেন এক মহা যুগ। তাই আল্লাহ অদেখার কিছু নয়। পৃথিবীতেই শুধু তাঁকে দেখা কঠিন।

আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব?

আল্লাহকে দেখা যাবে কি, যাবে না, এরূপ চিন্তা অবশ্যই মানুষের মনে জাগতে পারে। কোন অবুঝ শিশু যদি পিতার কাছে প্রশ্ন করে, বাবা, বাঘ দেখতে কেমন? পিতার পক্ষে এর সাদৃশ্যমূলক উত্তর হবে, বাঘ দেখতে অনেকটা আমাদের পোষা বিড়ালটির মতো। কিন্তু ঐ ছেলে যদি প্রশ্ন করে, বাবা, বাতাস দেখতে কেমন? এখন কিন্তু পিতার পক্ষে উত্তর দেয়ার মতো সাদৃশ্যমূলক কোন কিছুই থাকবে না। কারণ বাতাসের তুলনা দেয়ার মতো সাদৃশ্যের কোন উপাদান পৃথিবীতে নেই। বাতাস পদার্থ হলেও একে খালি চোখে দেখা যায় না। ফলে একেও আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার মনে হয়।

মানুষ যখন নিরাকার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তার ধ্যানে নিরাকারের অস্তিত্ব হয়তো আকার তুল্যই মনে হয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন ভাসে। এরূপ হওয়া জড়ত্বের গুণ। কিন্তু নিরাকার আল্লাহ্ এসব গুণ থেকে ও মুক্ত। আমাদের ধ্যানে নিরাকারের অস্তিত্ব যতই অস্তিত্বহীন মনে হউক না কেন, তবু আল্লাহর কুদরতি রূপ অদেখার কিছু নয়। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং জড়ত্ব বোধের জন্য নিরাকারের রূপ ও তাঁর বাহ্যিক দর্শনীয় অস্তিত্ব, রূপ প্রকৃতি বুঝা খুব কঠিন। তাছাড়া আল্লাহর সাদৃশ্যমূলক কোন অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে না থাকায় তাঁর রূপ সম্পর্কে বর্ণনা করা অন্ধের হাতি দেখার মতোই মনে হবে। এতে

www.pathagar.com

করে হাজার জনের কাছে হাজার রকম রূপও গঠন দেখা দেওয়ার সম্ভবনা থাকবে। সে দিকে চিন্তা করেই খোদার রূপ গঠন নিয়ে চিন্তা করার কোন যুক্তিই আসে না। এ রূপ চিন্তা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে আল্লাহকে দেখতে কেমন এ কথা বলা না গেলেও তিনি যে দর্শনীয় হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর দর্শনীয় হওয়ার বিষয়টি বাস্তবেই প্রমাণ করার মতো।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট কোন না কোন কাজ আছে। যেমন চোখ আমাদের দেখার কাজ সমাধান করে তেমনি কান সমাধাণ করে শোনার কাজ।

কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কাজের আছে সীমাবদ্ধতা। সেজন্য চোখ অনেক দূরের জিনিস, আড়ালের জিনিস, অন্ধকারের জিনিস দেখতে পারে না। কোন জিনিস থেকে আলোক প্রতিবিম্ব ফিরে এসে চোখে না পড়লে চোখ থাকা সত্ত্বেও আমরা ঐ জিনিস দেখতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। এরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে কোন দিকেই আমরা পূর্ণ নই। মূলতঃ যে জিনিসের পূর্ণতা নেই, তার বেলায় যেমন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় তেমনি পরিপূর্ণ ভাবে কোন কিছু দেখাও সম্ভব নয়। এ কারণেই মানুষ সসীম। সসীমের ক্ষেত্রে দেখার ও শোনার যে সীমানা দেয়া আছে, সেই সীমানা কিছুটা হলেও চেষ্টার মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব। জ্ঞানী ও অতি মানবগণ সে সীমা অতিক্রম করে থাকেন। তাদের বেলায় উঁচু নীচু সবি সমান। কিন্তু মূর্খের বেলায়, এবং অল্প জ্ঞানীর বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এরা অসীম পর্যন্ত চিন্তা করলে উচু হতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। আসলেই অসীম পর্যন্ত দেখতে হলে শ্রম দিয়ে কৌশলী হতে হয়, ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। হৃদয়ের আরশির উপরের পর্দাটি ঘষে ঘষে তুলে নিতে হয়। তারপর দেখলে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতি মানবদের বেলায় অনেক কিছু দেখা ও বুঝার সীমাবদ্ধতা থাকে না। সেজন্য বলা আছে, সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী স্রষ্টার মারেফাত (তত্ত্ব জ্ঞান) নিয়ে কথা বলতে হয়। এ বিশ্বের প্রতিপালক নিরাকার। তাঁর কোন আকার

www.pathagar.com

নেই। তিনি জড়ত্বের গুণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। পক্ষান্তরে জড় পদার্থ ব্যতীত কোন কিছুর আকার হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, নিরাকার আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে কি? এর উত্তর তালাশ করতে গিয়ে একজন হিন্দু লোকের কথা মনে পড়ে গেল (বর্তমানে সে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী নয়)। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন - ইসলাম ধর্মে বলা আছে আল্লাহ নিরাকার। আবার বলা হয় বেহেশ্‌তে আল্লাহকে দেখা যাবে, এ কেমন কথা? আমি তাৎক্ষণিক ভাবে বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে আকার, নিরাকারের পার্থক্য এবং তার সাথে গতির সম্পর্কের কথা তুলে ধরে ছিলাম। তার সারমর্ম হলো এরূপ , যে জিনিসের আকার আছে, সেটি থাকে গতিশীল। এর ভেতরে, বাইরে সব দিকেই থাকে গতি। পক্ষান্তরে গতিশীল জিনিসের অভাববোধ থাকে। এর মাঝে থাকে মৃত্যু, ক্ষুধা, বিশ্রামের প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহর বেলায় এ সব কোন কিছুরই বালাই নেই। এরূপ গুণ থাকলে তিনি স্রষ্টা হতে পারতেন না। তাই তিনি গতিশীলও নন, ক্ষণস্থায়ীও নন। সে কারণেই তিনি নিরাকার। তবে তিনি নিরাকার হলেও তাঁকে দেখা যাবে, এ কথা ষোল আনাই সত্য। সেদিন হিন্দু লোকটির সাথে গতি ও আকার সম্পর্কে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, যে উদারহণটি দিয়েছিলাম তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আমরা জানি চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ গুলো নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে অবিরত সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে। এমন কি নিউট্রন ও প্রোটনের চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন কনিকা। এতে পরমাণুর অস্তিত্ব যেমন টিকে আছে তেমনি মহাশূন্যের গ্যালাক্সি ও তারকার বহরগুলো টিকে রয়েছে। এদের মাথায় গতির বেরাম আছে বলে তারা টিকে আছে। পক্ষান্তরে এদের যদি গতি না থাকে তাহলে তাদেরকে তো আর মহাশূন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। গতি হারালেই এদের ধ্বংস নেমে আসবে। কিন্তু এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়। এ অবস্থায়ও এদেব অস্তিত্ব বলতে একটা কিছু থাকবে। এখানে গতি ও আকারের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে জিনিসের গতি নেই সেখানে কোন আকার থাকতে পারে না। গতিশীল বস্তুর ক্ষয় আছে, সেটি পরিবর্তনশীল। এর বেলায় ঘুম-নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া, পয়ঃপ্রণালী নিঃষ্কাশনের প্রযোজন পড়ে। কিন্তু খোদার এসব গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

মুক্ত। সে দিক থেকে প্রমাণ হয় খোদার অস্তিত্বে কোন গতি নেই। তিনি চিরন্তন ও স্থির। স্থিরতার সম্পর্কেই তিনি নিরাকার। কিন্তু তিনি যতো নিরাকারই হন না কেন তবু তিনি অদেখার কিছু নয়।

আলোক, বাতাস সহ মহাশূন্যের পাতলা মিহি চাঁদোয়াটি আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার মনে হয়। কিন্তু এদের অন্তর রাজ্যেও গতি আছে। ফলে স্রষ্টা এ রূপ অস্তিত্ব থেকেও মুক্ত। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমাদের কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ অসীমের কুদরতের কাছে সসীম ঠাঁই পাওয়াই দুরূহ। আসলেই সসীম সে ক্ষমতা লাভ করতেও অপারগ। তবু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমণ্ডলের মধ্যে অসীমের সৃষ্টিকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এ থেকেই বুঝা যায় সৃষ্টিকর্তা অদেখার কিছু নয়। সত্যি করে বলতে কি নিরাকার কথাটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। কারণ আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিতার জন্য আমরা মনে করি নিরাকারের মাঝে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। কিন্তু আলোক, বাতাস, ইত্যাদি তো খোদার সৃষ্টি। সেগুলো যদি আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার হয়েও অস্তিত্ব থাকতে পারে, তবে খোদার অস্তিত্ব না থাকার তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পৃথিবীতে এমন এক নিরাকার জিনিসের অস্তিত্ব কঠিন ঢাকনার মতো মনে হয় যার কিছু দূর পর্যন্ত রয়েছে বায়ুর উপাদান। আর এর ওপরেরটা বলতে গেলে ফাঁকা। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গাটা কি আসলেই শূন্য? না এর ভেতরেও কোন কিছু আছে? মাটি নেই, এ কথা বলা যাবে কিন্তু আসমান নেই, এ কথা বলা কঠিন, এই আসমান কখনো নীল, কখনো কালো, কিংবা সাদা, কখনো বা লাল রংগের দেখা যায়। নীল দেখা যায় গ্যাসের কণা হতে ছোট মানের আলোর ঢেউ ঠিকরে পড়ে বলে। লাল দেখা যায় বড় মাপের আলোর ঢেউ ধুলো কণা থেকে ঠিকরে আসে বলে। কালো দেখায় মেঘের ভেতর দিয়ে সূর্য রশ্মি ঠিকরে আসতে পারে না বলে। আবার রাতে ও দেখা যায় কালো। আসমানকে যত রং বেরংগেই দেখিনা কেন, সেটিতে যে কোন ছিদ্র বা ফাঁকা নেই এ কথা সত্য। এই আসমান চারদিক থেকে শামিয়ানার মতো পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এই শামিয়ানার কঠিন প্রাচীর ভেদ করে ওপরে ওঠা যাবে না। আমাদের চারিদিকে সেটিকে এতো কাছে মনে হয় যেন দুরে কোথাও

www.pathagar.com

লেগে আছে। আসলে কি তা সত্যি? বাস্তবে আমরা সেটিকে যেমন মনে করি, আসলে সেটি এমন নয়। একে ছেদ করে যেমন ওপরে ওঠা যায় তেমনি নীচেও নামা যায়। আবার আলোর বেগে সাত বছরের জন্য রকেট যাত্রায় বের হলেও সেটির কূল কিনার পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ একে দেখতে কত সুন্দর, কত সুরম্য মনে হয়। যা ভাবতে অবাক লাগে। এই আসমান সৃষ্টিকর্তার অনুপম সৃষ্টি। তিনিই নিজ ক্ষমতায় একে সৃষ্টি করেছেন। "আর আমি আসমানকে ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি এবং আমি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী।" –(সূরা ৫১)

মহা মহিয়ানেব অসীম ক্ষমতার এই কুদরতি নিদর্শন অশরীরি নিরাকার হলেও তার রূপ-শোভা, ফাটলহীন, ছিদ্রহীন কাঠামো (পৃথিবীর চার পাশে বেষ্টিত চাঁদোয়াখানি) আমাদেরকে কতই না অভিভূত করে। একে না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। এর না আছে আকার আকৃতি, না আছে ছিদ্র করার মতো কোন শরীর। তবু একে আমাদের দেখতে তো কোন অসুবিধা হয় না। এর ওপরের ফাঁকা জায়গাটিতে অবশ্যই কিছু না কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। সেই অদৃশ্য সৃষ্টিও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরূপ অশরীরি সৃষ্টি হতেও মুক্ত। তবে এখানে যে জিনিসটি বিশ্বাসে আনার উপাদান তা হলো এরূপ নিরকার জিনিসটিকে যেহেতু দেখা যায়, এর সুন্দর ও মনোরম একটা অস্তিত্ব ভাসে, সুতরাং খোদা নিরাকার ও অশরীরি হলেও তাঁর কুদরতি রূপ বেহেশতবাসীদের দেখতে অসুবিধা হবে না।

এ আলোচনার ফাঁকে আল্লাহকে কেন এ পৃথিবীতে থেকে দেখা যায় না, সেদিকে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন এ পৃথিবীবাসীর পক্ষে স্রষ্টাকে সরাসরি দেখা সম্ভব হলেই তো সকল ঝামেলার অবসান হয়ে যেত অর্থাৎ আজ যারা খোদাকে অস্বীকার করে কিংবা সন্দেহ করে তারা যদি আল্লাহকে দেখতে পেত, তার কথা শুনতে পারতো তবে তো এরা ঈমানদার হয়ে যেত। এ কথা আমাদের জন্য ভাবা যেমন সহজ কিন্তু খোদাকে এ পৃথিবীতে থেকে সরাসরি দেখে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে তত সহজ নয়। হযরত মূসা

www.pathagar.com

(আ) এর মতো নবীর পক্ষে যেখানে স্রষ্টার কিঞ্চিত নূরের ঝলক দেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, সেখানে আমাদের মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে কি টিকে থাকা সম্ভব? এটি যেমন একটি কারণ অপর দিকে আর একটি অর্ন্তনিহিত কারণ হলো স্রষ্টা সৃষ্টির শাখা প্রশাখার প্রান্তে এসে দেখা দেয়ার মাঝেও রয়েছে সমস্যা। মানব আত্মা যেমন দেহের শিরা-উপশিরায় ঢুকে না, তেমনি স্রষ্টার বেলায় সৃষ্টির প্রান্তে আসাও কোন যৌক্তিকতা নেই। আত্মার শাসন কার্য অনুসরণ করে দেহ যেমন তার আনুগত্যশীল থাকে তেমনি সৃষ্টির বেলায়ও জগতের সুশৃঙ্খলতা দেখে, শুনে, অনুভব করে তার আনুগত্য মেনে চলা প্রয়োজন। অন্য দিকে গতির সীমানার ভেতরে 'স্থিতিমান' প্রবেশ করাও বিপর্যয়ের ব্যাপার। কারণ পূর্বেই বলেছি, বিশ্ব হলো গতিশীল জগৎ আর স্রষ্টা হলেন চিরন্তন ও স্থির। ফলে স্রষ্টা গতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করা যেমন সমস্যার ব্যাপার তেমনি এরূপ কল্পনা করা ও যুক্তিহীন। কারণ গতির ভেতরে 'স্থিতিমান' ঢুকলেই তার কোন কিছু টিকে থাকবে না। একটি চলন্ত গাড়ীর সাথে স্থির কোন কিছুর যদি স্পর্শ বা ছুঁয়া লাগলে যেমন সংঘর্ষ হয়, তেমনি গতির রাজ্যে আল্লাহ দেখা দিলে সবি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সে কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টি সীমার মধ্যে খোদাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এ সব কারণেই খোদা পৃথিবীর নিকটে এসে দেখা দেন না।

প্রত্যেক আকারশীল জিনিসের মধ্যে গতি থাকে এবং তার পাশাপাশি এর কিনার থাকে। অর্থাৎ আকার হলেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা থাকবে । কিন্তু নিরাকারের বেলায় এর একটি ও প্রয়োজন নেই। সে জন্য নিরাকার যদি অসীম হয় তাহলে তাঁর রূপ ও গঠন হয় অশরীরি (জড় কাঠামে-াহীন)। যেমন আসমান দৃশ্যতঃ আকারশীল মনে হলেও এর কোন স্পর্শনীয় কাঠামো নেই। তেমনি নিরাকার অসীম হলে এর কোন স্পর্শনীয় কাঠামো থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ অসীম ও নিরাকার। আমাদের ইন্দ্রিয় চোখে আসমানের অশরীরি অস্তিত্ব যেমন শরীরি মনে হয় তেমনি আমরা যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ধ্যান করি তখন হয় তাঁর অস্তিত্ব শরীরি মনে করি কিংবা তাঁর অস্তিত্ব আছে বলে ভাবতে পারি না। এরূপ হওয়ার কারণ হলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের ধাঁ ধাঁ, অথচ এরূপ শরীরি অস্তিত্ব কোন কঠিন বা শক্ত

www.pathagar.com

কিছু নয়। আমাদের দৃষ্টিতে এটি ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার প্রাচীর মনে হলেও এখানেই খোদার কুদরতের জ্ঞান ভান্ডার লুকায়িত। খোদা আসমান জমীনের ভেতরের সকল নিরাকার (অদৃশ্য) সৃষ্টি থেকেও মুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে যে সব উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা শুধু খোদার অস্তিত্বকে উপস্থাপন করার স্বার্থেই। যে খোদার অদৃশ্য সৃষ্টি এই নিরাকার আসমানকে দেখতে এতো সুন্দর লাগে সেই খোদা যে কতো অসীম সুন্দর তা কল্পনাই করা যায় না। সে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান বলতে গেলেই নেই।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজের সম্পর্কে ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেছেন- "তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন প্রভু নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং স্বশক্তিতে (কারও ওপর নির্ভর ব্যতিরেকে) বিদ্যমান। অন্য সমস্ত অস্তিত্বই তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না। যা কিছু বিরাজমান আসমান জমীনে সমস্ত তাঁরই। কে আছে এমন যে (তাঁর অনু-মতি ব্যতীত) তাঁর নিকট অন্য কারও জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম? তিনি (আল্লাহ) জানেন, তাদের সম্মুখে কি আছে এবং পশ্চাতে কি আছে। তাঁর জ্ঞানের কণিকামাত্রও (তিনি অনুগ্রহ করে যেটুকু জানান তা ছাড়া) কেউ জানতে পারে না। তাঁর সিংহাসন (অবধানতা) আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। এই ভূলোক ও দ্যুলোকের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে তাঁর ক্লান্তি আসে না। তিনি সমস্ত কিছু হতে উন্নত ও মহান।" – (সূরা বাকারা - ২৫৫)

পরম দয়ালু চিরঞ্জীব বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর নেক বান্দাদের সামনে একদিন ওপার জগতে যে দেখা দিবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আজ যারা জড় জগতের খাঁচার ভেতরে থেকে খোদাকে না দেখে লাফালাফি শুরু করছে, তাদের জ্ঞান শূন্য বিবেকের সামনে সে দিন পরকালের যাবতীয় দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে সূর্যের আলোর মতো ভাসবে, সেদিন তারা খোদাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহর আরশের জ্যোতি তারা পাবে না। সেদিন তারা অন্ধকারের অতল সাগরে তলিয়ে হাবুডুবু খাবে। তখন তাদের হুঁশ নামের চেতনার যন্ত্রটি হৃদয় জুড়ে তুফান তুলবে কিন্তু তখন কোন ফল্ল হবে না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ যে পরকালে দেখা দেবেন তার প্রমাণ দেয়া

www.pathagar.com

আছে- নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হলো - "দিনে যখন আকাশে মেঘ থাকে না তখন তোমরা সূর্য দেখ কি? আর রাত্রিতে যখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, তখন চাঁদ দেখ কি? নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে অতি সত্ত্বর দেখতে পাবে। এমনকি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রভু সম্বোধন করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, হে আমার বান্দা "তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার কর? সে বলবে! -"হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেন নাই?" তখন তিনি বলবেন, "আমার ক্ষমার ফলেই তুমি এই পর্যায়ে পৌঁছেছ।" আহমদ এ'টি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।"

"যখন জান্নাত বাসিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদিগকে আরও বেশী কিছু দান করি? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে দেন নাই? আপনি কি আমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন নাই? তখন আল্লাহ তাঁর হিজাব (আলোর পর্দা) খুলে দিবেন। অতপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে অধিকতর কোন প্রিয় বস্তু দেয়া হবে না" তিরমিযী ও মুসলিম এটি সুহাইব (রা) এর সূত্রে সংগ্রহ করছেন।

আল্লাহর দর্শন পাওয়া পৃথিবীর বেলায় সম্ভব না হলেও পরকালে জান্নাতবাসীগণ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় পরিষ্কার ও সন্দেহাতীতভাবে দেখতে পাবেন। তিনি নিরাকার ও অশরীরি হলেও অদেখার কোন সত্তা নন। যেদিন জান্নাতবাসীদের সামনে তিনি নূরের পর্দা খুলে দিবেন, সেদিন জান্নাতীগণ বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামতের কথা ভুলে যাবেন। অতপর তিনি তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করবেন। তখন শুধু তাঁর আলো ও বরকত তাদের ওপর এবং তাদের বাসভবনের ওপর অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতাসীন। তার বেলায় সীমাবদ্ধতার কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। এ বিশ্ব জগতে এমন কোন রেনু দানা নেই, যার খবর তিনি রাখেন না। সকল কিছু তাঁর ক্ষমতার শিকলে বন্দি। তিনি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকলেও নিমীষেই সকল কিছুর খবর পান। আল্লাহ কি করে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে খবর রাখেন সে আর এক সূক্ষ্ম স্নায়ুবিক বিধান। এ বিধানের কার্য ব্যবস্থা এতো কঠিন ও গতিময় যার সম্পর্কে না জানলে কিছুই বুঝে আসবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কি করে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে খবর রাখেন

আল্লাহর রাজ্যের সীমানা কতদূর বিস্তৃত। এ সম্পর্কে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। কোটি কোটি আলোক বর্ষকে পারসেকের পরিমাপে এনেও সেই বিশাল রাজ্যের কিনার পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক আল্লাহ্র হাতেই সেই বিশাল রাজ্যের দ্বায়িত্ব ভার। তিনি এর লালনকর্তা, পালনকর্তা। তাঁর রাজ্যের এমন কোন উপাদান নেই যার খবর তিনি রাখেন না। সমুদ্রের তলদেশের সূক্ষ্মাতীত একটি কণার খবরও তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই। তাঁর সৃষ্টিতে এমন কোন দৃশ্য আর অদৃশ্য সত্তা নেই যার সম্পর্কে খবর নেয়া আল্লাহর পক্ষে কঠিন কিছু। আমরা সীমাবদ্ধ পরিসরে বাস করে যখন আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবি তখন মনে মনে চিন্তা করি, এতো বিশাল রাজ্যের সকল সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ কি করে খবর রাখেন? বলা হয় আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কোন সত্তা নেই, যে সত্তা তার হুকুম ছাড়া চলতে পারে। মাটি ভেদ করে যে বীজ গজায় সেগুলোও তাঁর হুকুম নিয়ে অংকুরিত হয়। নর্দমার একটি সূক্ষ্ম কীট সম্পর্কেও তাঁর খবর থাকে। আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে এ সব কথা শুনে বস্তুবাদীরা উপহাস করে বলে, নিরাকার এক আল্লাহর পক্ষে কি করে এতো হাজার হাজার সৃষ্টি কুলের খবর রাখা সম্ভব? তারা মনে করে এ সব অবাস্তব চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। মানুষ দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে চিত্তের শান্তির জন্য। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে জড়বাদীরা আসলেই মূর্খ ও জড়তার শিকলে বন্দি। তারা জড়তার মোহে পড়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। এই অবাধ্যতা তাদের জড়তার বেরাম। পক্ষান্তরে তারা নিজের সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাদের জানা উচিত চোখ দিয়ে তো আর পিঠ, নাক, মুখ, কান পেটের নাড়ীভুড়ি দেখা যায় না, তাই বলে কি সে সবের খবর আত্মার থাকে না? নিশ্চয়ই এগুলোর প্রতিটি রেণু কণাও তার অজ্ঞাতে কাজ করে না। বস্তুবাদীরা নিজেকে মনে করে প্রকৃতির সৃষ্টি সজীব মেশিন। এই মেশিন বস্তুর উন্নতর প্রজন্মের বিকাশ। আসলে তারা বস্তুর বাইরে কিছুই দেখতে পারে না। মূলতঃ তারা প্রাণ মনহীন বস্তুকেই সবকিছুর 'আদি কারণ' বলে মনে করে। ফলে বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে বলে তারা বিশ্বাস করে না। এ শ্রেণীর লোককে বলা হয় নাস্তিক। তাছাড়া কিছু লোক আছে সন্দেহবাদী। তারা মনে করে আল্লাহ থাকলেই কি, অথবা না থাকলেই বা কি? এতে জীবনের মঙ্গল বা অমঙ্গলের কিছু আসে যায় না। কিন্তু উভয়ের

www.pathagar.com

ধারণা যে একদিন চরম ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে তা তারা চিন্তাও করে না। আমি পাপ পুণ্যের সৃষ্টি রহস্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে একত্ববাদের ঈমানী শক্তি ব্যতীত ভালো পুণ্য সত্তা সৃষ্টি হয় না। সে জন্য আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক জড়িত থাকায়, এর প্রতিফলেরও গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরা কেন অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী হলো, তার মূল শিকড় তালাশ করতে গিয়ে দেখা যায় এরা আসলেই খোদার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা মনে করে বিশ্বাসীগণ যে আত্ম বিশ্বাসে ভাবে তাদের আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন, এগুলো তাদের কল্পনা বৈ অন্য কিছু নয়। আসলে এসব কি করে সম্ভব?

অথচ আমার দৃষ্টিতে তারা যদি একবার নিজকে চেনার চেষ্টা করতো এবং নিজের দেহ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতো, তাহলেই আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারত। পক্ষান্তরে আল্লাহর ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ যারা করতে পারে তারা অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী হয় না। আত্মা ও দৈহিক গঠনের কারুকার্যের সম্পর্ক তলিয়ে দেখলে, সন্দেহবাদীদের সন্দেহ আর নাস্তিকদের ফালতু চিন্তার জবাব অনায়াসেই দেয়া সম্ভব। আমি এক সন্দেহবাদীর কথায় যখন ভাবনায় পড়েছিলাম, তখন এক সত্যের সন্ধান পেলাম। সন্দেহবাদীর কথা ছিল, মরলে পরে কি হবে তাকি কেউ দেখে এসেছে? চাঁদটা যদি সাঁঝে ঢেকে যায় তা কি কেউ দেখতে পারে? রাতে চুরি করলাম, সাক্ষী নেই, আলো নেই, চুরিরও খবর হলো না, তার জবাব খোদা নেবে কি করে? আরও অনেক প্রশ্ন। সাধারণ ভাবে সেদিন জবাব দিয়েছিলাম আল্লাহ সব দেখেন, শুনেন। তারপর তার কথা ছিল দু'চোখে আল্লাহ সব দেখেন কি করে? দু'কানে সব শুনেন কি করে? আসলে আল্লাহ যে আমাদের মতো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখেনও না, শুনেন ও না সে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। এরপর থেকে আমারও স্বপ্ন ছিল প্রশ্নটির আরও সুন্দরভাবে জবাব দেয়া উচিত। কিন্তু আমার তখন এর চেয়ে ভালো কোন ধারণা ছিল না। হঠাৎ একদিন একখানা ধর্মীয় বই পড়তে পড়তে একজন মনীষীর উক্তি আমার দুর্বল মনে রেখা পাত করে।

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছেন সে আল্লাহ তা'আল্লাকে চিনতে পেরেছেন।"

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি নিজ অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব জানতে পেরেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অপার মহিমা এবং অসীম ক্ষমতার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন।"

এই বিশ্বের লালনকর্তা, পালনকর্তার ঘোষণা- "আমি তা'দেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে থাকি; যার ফলে সত্যের গূঢ়তত্ত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হবে।" - (সূরা হামীম আস সি-জদাহ রুকু ৬)

আমরা জানি না, বুঝি না, কোথায় যে আমাদের দেহ ও আত্মার মাঝে খোদার ক্ষমার নির্দশন রয়েছে। আমাদের আত্মার রাজ্য হলো দেহ। সে এটি শাসন করে। আত্মা ও দেহ, এ দু'য়ের পাশাপাশি সম্পর্কের সাথে যেহেতু খোদার ক্ষমতার নিদর্শন অনুভব করা সম্ভব সুতরাং সে সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতে বাঁধা থাকার কথা নয়। তবে এ কথা সত্য যে, বিষয়টি একটু সর্তকতার সাথে তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় বুদ্ধির তারতম্যের জন্য ক্ষতি হতে পারে।

দেহ ও আত্মার সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মার কথা ব্যতীত দেহ এক চুল নড়ে না। দেহ আত্মার এমনি অনুগত ভৃত্য যা কল্পনাই করা যায় না। এর কোন অংশে যদি একটু চুলকানিও ধরে তবু সে তার প্রভুর (আত্মার) নির্দেশ ব্যতীত চুলকায় না। পক্ষান্তরে এর কোথাও যদি কোন রোগ, ব্যাধি, কিংবা যন্ত্রণা দেখা দেয় তখন সে অংশ তার প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করে। গভীর ঘুমেও যদি তার কোন কষ্ট দেখা দেয় তৎক্ষণাৎ সে তার প্রভুর কাছে নালিশ করে। টেলিফোনের সংকেতের মতো ঢেউ-এর বেগে সংকেতগুলো আত্মার দরবারে পৌঁছে। সাথে সাথে আত্মা বাহাদুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ পাঠায়। আত্মা ও দেহের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুমন্ডলী। আমাদের স্নায়ুমন্ডলীর কার্য নীতির সাথে মনের যেমন সম্পর্ক তেমনি বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য কার্য-নীতির সাথে বিশ্ব বিধাতার অনুরূপ সম্পর্ক বিরাজমান। প্রকৃতির কার্যনীতির নিয়ন্ত্রণভার আরশের ওপর। অপর দিকে আরশ আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন। আল্লাহর আরশের কার্য ব্যবস্থা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যনীতির অনুরূপ। আমরা নিজেদের মস্তিষ্কের কার্যনীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান নিতে পারলে মহাপ্রভু কি করে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে খবর রাখেন তা বুঝে আসবে।

www.pathagar.com

আমাদের কেন ক্ষুধা লাগে? কেন আমরা ক্ষুধা লাগলে খেতে চাই? আবার খেলে পরে কেনই বা ক্ষুধা কমে যায়? কে এসব নিয়ন্ত্রণ করে? কি ভাবে করে? সে সম্পর্কে হয়ত আমরা অনেকেই অজ্ঞ। ক্ষুধা লাগলে আমরা অভাব বোধ করি। এটিই এর প্রমাণ। কারণ ক্ষুধা দেখা যাওয়ার কোন বস্তু নয়। জীব দেহের অতি নিখুঁত জৈবিক প্রক্রিয়া সেই অভাব বোধ সৃষ্টি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে খাবার খাওয়ার সময় হলে পেট থেকে প্রথমে একটি afferent Impulse সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কে আসে। একে অন্তর্মুখী তাড়না বলা হয়। মস্তিষ্ক এটি Receive করে মনকে জানিয়ে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে মন, মস্তিষ্কের যে স্থানটুকু খাদ্য খাওয়ার চাহিদা সৃষ্টি করে তাকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য order দিয়ে দেয়। ফলে ঐ স্থান থেকে পাকস্থলীর দিকে efferent Impulse (বর্হিমুর্খী তাড়না) প্রেরীত হয় অতপর পাকস্থলী এ নির্দেশ পেয়ে খাদ্য রস নিঃসরণ করতে থাকে। এ থেকে শুরু হয় পেট জ্বালা বা ক্ষুধার তাড়না। আমাদের অজান্তেই এতো সব সংকেত আদান-প্রদান হতে থাকে। খাদ্য খাওয়ার এই নিখুঁত পদ্ধতি সম্পর্কে মনে হয়, আমাদের কোন খবর নেই কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয় কারণ মনের নিয়ন্ত্রণাধীনেই মস্তিষ্ক কাজ করে। মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্ক মনের হয়ে সব দেখাশোনা করে। তবে সকল অবস্থাতেই সে (মস্তিষ্ক) মনের নির্দেশ (অনুমতি) নিয়ে নেয়। পেট যখন ভরে যায় তখন আর ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু পেট ইচ্ছা করে নিজে নিজে খাওয়ার স্পৃহা নিস্তেজ করে দিতে পারে না। এর জন্যও সে মস্তিষ্কের কাছে সংকেত পাঠায়। তারপর মস্তিষ্ক অনুরূপ ভাবে খাওয়ার চাহিদা কমিয়ে দেয়।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ হতে (হাত, পা, নাক, কান, চোখ) sensony nerve মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে নিয়ে আসে। আমাদের অজান্তে মশা যদি শরীর থেকে রক্ত চুষে খেতে থাকে, তখন ঐ জায়গা থেকে afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না) নামের লাল সংকেত চলে আসে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক মনের সায় নিয়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে করে দেখা যায় শরীরের এমন কোন কোষ নেই যার খবর আমার মনের অধীন হয়ে মস্তিষ্ক না রাখে। কোন কারণে যদি মস্তিষ্ক দেহ রাজ্যের কোন স্থানের খবর না রাখে, তবে ঐ স্থানের উপর দিয়ে কোন বিপর্যয় ঘটলে নিজের কোন খবরই থাকবে না। মূলতঃ মস্তিষ্ক নিজে থেকে কিছুই করে না। সে সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় মনের হুকুম তামিল করে।

www.pathagar.com

আমাদের দৈহিক জড় রাজ্যটি আমাদের মস্তিষ্কের সত্তাধীন এবং মস্তিষ্ক মনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক হলো সমস্ত অঙ্গের নাভী মূল এবং মন তার শাসক। মনের শাসন ব্যবস্থা দেহের প্রতিটি রেণু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মন যাকে দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করে তার নাম স্নায়ু মন্ডলী। এই স্নায়ুমন্ডলীর মূল দপ্তর (মস্তিষ্ক) পরিচালনা করে মন। সেখান থেকেই প্রতিটি অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেহ ভুবনে এমন কাজ নেই, যার খবর মন রাখে না। এর কর্ম ব্যবস্থা এতো তড়িৎ ঘটে, যা কল্পনাও করা যায় না। আমরা অনেক সময় কর্ম থেকে নির্দেশকে আলাদা করে দেখতে পারি না, সেজন্য কর্মের বাইরে আমরা আর কিছু চিন্তা করি না। কোন কোন ক্ষেত্রে মনের নির্দেশ যে প্রয়োজন হয় তা হয়ত আমরা অনুভব করে থাকি। প্রস্রাব, পায়খানায় ধরলে আমরা বুঝি অঙ্গ নিজের ইচ্ছায় কিছু সে করতে পারে না। অন্যান্য বেলায় আমরা বুঝতে না পারলেও সেখানে একই ব্যবস্থায় কর্ম সম্পাদন হয়।

মানুষ অসীম নয়। সে নিজে যেমন সসীম তেমনি তার জ্ঞানের সীমাও সসীম এবং আপেক্ষিক। এই সসীম প্রাণীর সামান্য দেহ রাজ্যের সকল ক্রিয়া কর্ম ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তা মনের খেয়ালেই মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আসলে কোন কাজই মনের ইচ্ছার বিপরীতে হয় না। আমাদের 'মন' নামের অচিন পাখিটি অদৃশ্য সত্তা। আর মস্তিষ্ক এর সংকেত বহন করে। এর মাধ্যমেই দেহের সকল কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহ মনের সত্তাধীন নয় এবং মস্তিষ্ক ও তার সত্তাধীন নয়। কার্যতঃ মস্তিষ্ক দেহের সত্তাধীন। মন মস্তিষ্কের সত্তাধীন না হয়ে সে দেহের সত্তা দিয়েই তাকে শাসন করে। আমাদের অঙ্গ রাজ্য আর মনের কার্য ব্যবস্থা বুঝে আসলে, এর সাথে বিশ্ব বিধাতার বিশ্ব শাসনের কর্মকান্ড বুঝে আসার কথা। একে অল্প কথায় একজন মনীষী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি সে সত্য উপলব্ধি করেই বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের রহস্য জানতে পেরেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অপার মহিমা এবং অসীম ক্ষমতার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন।"

আমাদের মনের কার্য ক্ষমতার সাথে, স্রষ্টার অসীম কার্য ব্যবস্থা ও তাঁর ক্ষমতার নির্দেশনা আংশিক হলেও সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিশ্বের সকল সৃষ্টি কুল আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সত্তার বহির্ভূত নয়। এগুলো তাঁর সৃষ্টি সত্তার বহির্ভূত হলে, বিশ্বের সম্প্রসারণের বেলায় সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন আসতো। অপরদিকে

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষে এ বিশাল সৃষ্টির প্রতিটি রেণু কণার খবর রাখাও সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন দেখা দিত। এতে স্রষ্টার বড়ত্ব বা শানের খেলাপ হতো। যেহেতু এ বিশ্বের প্রতিটি স্থানে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা মওজুদ থাকে সুতরাং সমগ্র বিশ্বই তাঁর সৃষ্টি সত্তাধীন এবং তার মালিকানাধীন। সে জন্যই সৃষ্টির প্রতিটি সত্তাই তাঁর পরিবারতুল্য।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন-

"তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" – (আল-কোরআন)

"তৎপর আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারু রূপে চলতে লাগল। তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করে থাকেন।" – (আল-কোরআন)

"এখন এ সব লোক কি খোদার অনুগত্য করার পন্থা (খোদার দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হউক খোদারই অধীনে হয়ে আছে।" – (আল-কোরআন)

আমাদের দেহ রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের কাজ কর্মের খবর মনের ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তা যেমন মনের হয়ে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তেমনি এ বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি দপ্তর ও তার ভেতরে বাইরে যা কিছু আছে এ সবই 'মহা মনের' (আল্লাহর) মালিকানাধীন আরশ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন চলে।

এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবই মানব মনের শাসনাধীন দেহরাজ্যের গন্ডির মতোই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কব্জায় বন্দি। তাই এর প্রতিটি রেণুকণা ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক খোদার অদেখার বাইরে থাকে না। তার প্রতিটি রেণু কণার খবর রাখা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভবেরও কিছু নয়। কার্যতঃ এর কোন কিছুই আল্লাহর হুকুম ব্যতীত চলতে পারে না। আমাদের দেহের কার্য ভার যেমন মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, এর খোঁজ খবর রাখে তেমনি এ বিশাল বিশ্ব-জগতের কার্যভার আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন আ'রশ ও তার শাখা প্রশাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আল্লাহর আরশ ও তার শাখা প্রশাখা আমাদের

www.pathagar.com

স্নায়ু ব্যবস্থার অনুরূপই ধরে নেয়া যায়। সমস্ত জড় সত্তার অন্তর মূল পর্যন্ত তা বিস্তৃত। কিন্তু সে কাঠামো এতোই সূক্ষ্ম, যা যান্ত্রিক কোন কলকব্জায় ধরা পড়ে না। এই অদৃশ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টির সকল খবরাখবর এতো তড়িৎ বেগে আদান-প্রদান হয় যা কল্পনা করার মতো নয়। এর গতি আলোর বেগের চেয়েও অধিক গতিময়। যখন সৃষ্টি সত্তাতে অভাব বোধের তাড়না (Negative Impulse) সৃষ্টি হয় তখন ঐ তাড়না অন্তর্মুখী (afferent) ধাওয়া করে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহরই নির্দেশে আ'রশ থেকে efferent Impulse সৃষ্টির কাছে ফিরে আসে। এই নির্দেশ পেয়েই সৃষ্টি তার কার্য সম্পাদন করে। মানুষের দেহ রাজ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ sensory and motor nerve এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। Motor nerve (মস্তিষ্ক হতে ইন্দ্রিয়ের দিকে অনুভূতি বহনকারী নার্ভ) বহির্মুখী (efferent Impulse) তাড়না বহন করে। আর Sensory nerve (ইন্দ্রিয় হতে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনকারী নার্ভ) afferent (অন্তর্মুখী) Impulse বহন করে। এই system-এর মাধ্যমে যেমন মন দেহের খবরাখবর রাখে তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির খবরাখবর আল্লাহ অনুরূপ এক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকেন।

বিশ্ব প্রভুর সৃষ্টি সত্তার মাঝে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদের মূল ভিত্তি রচনা করে। যেমন আল্লাহর সৃষ্টি কুলের সকল কিছুর কর্মের আদেশ দাতা তিনি নিজেই। যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে, তাদের কর্ম আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হলেও কর্মের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোক্তা নিজেই তার কর্মফল ভোগ করবে। এতে সুবিধা কিংবা অসুবিধা হলেও তার জন্য আল্লাহর কিছু যায় আসে না। এখানে খোদার বেলায় পক্ষপাতিত্বের কোন অজুহাত আসার পন্থা নেই। কারণ সুখ-দুঃখ ভোগ করার বিষয়টি তার কর্মের প্রতিদান। এতে আল্লাহর কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। কারণ কষ্টবোধ হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায়ই প্রযোজ্য। অর্থাৎ একাধিক্যের বেলায় এক সত্তা অন্য আর এক বৈরী সত্তা দিয়ে কষ্ট পেতে পারে। কিন্তু একক ও অনাধিক্যের বেলায় সকল কিছুই তাঁর মালিকানাধীন। এ বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর রাজ্য ব্যতীত আর কারও রাজ্য নেই। তাই কষ্টের বা বৈরী উপকরণ অন্য কোন রাজ্য হতে এখানে আসার প্রশ্নই আসে না। অতএব আল্লাহর বড়ত্বই অসীম।

www.pathagar.com

ওপরে উল্লেখিত একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া একান্ত প্রয়োজন। যেমন আমি বলেছি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমাদের দেহ রাজ্যে যা কিছু ঘটে সকল কিছুই আমার মনের নির্দেশে চলে। আল্লাহ পাকের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বেলায়ও সে কথাটি প্রযোজ্য। এখানে অনিচ্ছা কথাটি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ অনিচ্ছা কথাটির তাৎপর্য্য হলো, এরূপ যেমন- আমার ইচ্ছা নেই হাতটিকে নড়াই কিন্তু যখন একটি মশা আমার অজান্তে কোথাও রক্ত চুষতে থাকে তখন বাধ্য হয়ে আমি ঐ স্থানের অভাব বোধের তাড়না (সেখানের afferent Impulse) পেয়ে হাতকে অনিচ্ছাতেও ঐ স্থানের মশা তাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকি। এ কাজে আমার ইচ্ছা না থাকলেও ঐ স্থানের সাড়া পেয়ে তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেই হয়। এখানে কাজটি মনের ইচ্ছার বিপরীত হলেও ঐ অঙ্গ মনের নির্দেশ ব্যতীত কাজ করতে পারে নাই। একেই বলা হয় অনিচ্ছায় হলেও সে মনের নির্দেশ নিয়ে চলে। এ উদাহরণ মানুষকে দিয়ে দেয়া হলো। অথচ যে খোদা এতো বিশাল সংসার নিয়ে বসে আছেন, তাঁর বেলায় কি সৃষ্টি কুল তাঁর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তার নির্দেশ না নিয়ে চলতে পারবে? খোদা যত অসীম তাঁর মহিমাও তত অসীম। তিনি অভাবহীন, মুখাপেক্ষীহীন। সকল বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর মহিমার বা ইচ্ছার অধীন। তিনি কোন স্থান-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সকল আসমান-যমীন বেষ্টন করে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করেও তাঁর রাজ্যের বাইরে যেতে পারবে না। কারণ সকল রাজ্যই তাঁর। আমার পা কিংবা হাত যেমন রাগ করে দেহ থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। তেমনি আল্লাহর রাজ্যের কোন কিছুই এখান থেকে বের হতে পারবে না। এ জগতে যারা একাধিক্য তারা ইচ্ছা করলে একটি অঙ্গ ফেলে দিয়েও চলতে পারবে। কারণ একাধিক্যের বেলায় তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অনাধিক্যের বেলায় এর কোনটিও অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া যায় না। আল্লাহর রাজ্য ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাজ্য না থাকায় তা সম্ভব নয়।

এ বিশ্ব জগতের অসীম মাথার নাম আরশ। এই আরশ স্রষ্টার ক্ষমতাধীন। সকল সৃষ্টিকুল সেই আরশের নিম্নে অবস্থিত। এর শিকড় সৃষ্টির কোণায় কোণায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ফেরেশতাগণ আল্লাহর আ'রশ বহনকারী। কিন্তু আল্লাহর আরশ কোন বস্তু নয় বরং তিনি নিজেও কোন শরীরি নন। আল্লাহ আরশের মধ্যে প্রবেশ করেন না, তবু আ'রশ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আরশের সত্তা আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত

www.pathagar.com

নয়। তবু এ সত্তা তাঁর নির্দেশ পালন করে। মানব আত্মা যেমন মস্তিষ্কে প্রবৃষ্ট কিংবা আরোহিত না হয়ে দেহের সকল খবরাখবর রাখতে পারে তেমনি আল্লাহ আরশের আরোহিত না হয়ে এ বিশাল সৃষ্টির খবর নিতে পারেন। আল্লাহ আ'রশে বিস্তৃতি ফেরেশতা জাতির মাধ্যমে সৃষ্টির কোণায় কোণায় অবস্থিত। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন –

"তৎপর আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল। তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করে থাকেন।" – (আল কোরআন)

এ বিশাল সৃষ্টি জগৎটি যে আল্লাহ্ একটি সুচারু পন্থায় বিজ্ঞানময় কৌশলের মাধ্যমে পারিচালনা করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থার কৌশলের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। আছে আলো ও সত্যের সন্ধান পাওয়ার অসীম রহমত। এই রহমতের দরিয়ায় সাঁতার দিতে হলে সঠিক পথে খোদার মহিমার নিদর্শন দেখে তাঁর আনুগত্যশীল হয়ে চলতে হবে। অতপর স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টির অতল গহবরের একটি প্রাণহীন কণারও খবর রাখা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়।

আল্লাহ্র রাজ্য শাসন ব্যবস্থার নমুনা

খোদার রাজ্যের কোন কূল নেই, কিনার নেই। সে জগৎ অসীম আর অসীম। অসীম জগতের বিশালত্বের মাঝে আমাদের সৌরজগৎ একটি বিন্দুর পরিমাণও নয়। বলতে গেলে সেই অসীমত্বের মাঝে আমাদের উপস্থিতিও কোন ধর্তব্যের কিছু নয়। এর চেয়ে যদি আরও নগণ্য কিছু থাকে, তার কাজকর্ম, চলাফেরা, ঘুম-নিদ্রা সবই আল্লাহ্র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। দিনে আমরা কি করি, রাতে কি করবো, আগামী দিন কি হবে, গত দিন কি করেছি, এ সব তাঁর অজানা থাকে না। ভালো আর মন্দ যে যাই করুক না কেন, সকল কর্মই তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কেউ করতে পারে না। আমরা স্রষ্টাকে যতদূরেই ভাবি না কেন, সৃষ্টির সাথে তাঁর এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক খুব রহস্যময়। আমাদের আত্মা দেহের প্রভু। সেটি যেমন আত্মার ক্ষমতার বাইরের কিছু নয় তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির কোন কিছু তাঁর (আল্লাহ্র) ক্ষমতার বাইরে নেই। আগুন, পানি, বায়ু, মাটি আর অদৃশ্য সত্তা বলতে যা কিছু আছে, সে সবের ভেতরেও

www.pathagar.com

খোদার ক্ষমতার জাল বিস্তার করা আছে। এই জালের মিহি সূতা দিয়ে সৃষ্টির সকল খবরাখবর আদান প্রদান হয়।

আমাদের আত্মার সাথে মস্তিষ্কের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। মন যেখানেই যেতে চায় দেহ তাকে সেখানেই নিয়ে চলে। মনের ইচ্ছা ব্যতীত সে এক চুলও নড়তে পারে না। প্রথমে মনের ইচ্ছা শক্তির উদ্দীপনা মস্তিষ্কে আসে। মন যে অঙ্গ দিয়ে কাজ করাবে মস্তিষ্কের ঐ উদ্দীপনাতে সে অঙ্গকে তৈরী রাখে মনের নির্দেশ পালন করতে। অপরদিকে অঙ্গের অভাব বোধের প্রেরণা পেয়ে মনও তার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। এ ভাবে যেমন দেহের সাথে মনের সম্পর্ক বজায় থাকে তেমনি মন এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর পুরা দেহ রাজ্য শাসন করে। এই শাসন কার্য পরিচালনার জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানের এক এক রকমের সৈনিক (দূত) ছুটে যায় অঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। আবার নিম্ন অঞ্চল থেকেও সৈনিকরা খবর নিয়ে ছুটে আসে মস্তিষ্ক নামক মূল সচিবালয়ে। ঐ সচিবালয়ে নিয়োজিত মন্ত্রীগণ তখন খবর রিলে করে রাজার (আত্মার) নিকট। দেহের আত্মা বা রাজাই হলো মূল, তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই। কিন্তু দেহ নামের খোলসটি তার অবর্তমানে বাঁচতে পারে না। দেহ আত্মার প্রকাশের আবরণ। এই আবরণটা ছাড়াও আত্মা চলতে পারে। তবে বাহন ব্যতীত সবার পক্ষে চলা কঠিন। আত্মা এ বাহনটিকে যখন কাজ করায় তখন সে দেহের আনুগত্য কিছু সংখ্যক ভৃত্য দিয়ে একে কর্মতৎপর রাখে। এ দূত বা ভৃত্যগুলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই দূতগুলো বের হয়। প্রত্যেকের আবার নির্ধারিত উপদপ্তর আছে। এক একটি অঞ্চলের কাজ দেখাশোনার জন্য উপদপ্তর প্রধান নিযুক্ত থাকে। আবার দেহের প্রান্ত ভাগ থেকে যে সব দূতগণ খবর নিয়ে আসে তাদেরও বিভিন্ন নাম আছে। এরা সবাই দেহের বিশেষ শৈল্পিক সত্তা। এদের দিয়েই মন দেহ রাজ্যটি শাসন করে। কিন্তু যে বিষয়টি ধর্তব্য তাহলো মন দেহের সত্তাধীন না হয়েও, সে দেহের আনুগত ভৃত্য দিয়ে একে শাসন করে। তাছাড়া মন কোন সময় দেহ ও দেহের শৈল্পিক (মস্তিষ্কের) সত্তার ভেতর প্রবেশ করে না। তবু দেহ তার শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

আমাদের জড় মূর্তিটির আকার, আয়তন ও ওজন আছে। এটি

www.pathagar.com

অবিভাজ্য নয়। কিন্তু মন অদৃশ্য ও অবিভাজ্য। তথাপি দেহ মনের শাসন মেনে চলে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকে। না মেনে যাবেই বা কোথায়? কারণ এর পুরা রাজ্য জুড়েই মনের ক্ষমতা রয়েছে বেষ্টিত। অর্থাৎ মনের শাসন ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে দেহের প্রতিটি স্থানে প্রতি মুহূর্তেই মওজুদ থাকে। ক্ষণিকের জন্যও তার অবর্তমান হয় না। সজাগ অবস্থায় যেমন দেহের প্রতি তার নজর থাকে তেমনি গভীর ঘুমেও তার দৃষ্টির বাইরে থাকে না। কার্যতঃ মনের কখনো ঘুমের প্রয়োজন হয় না। ঘুম, নিদ্রা, আহার, বিশ্রাম দেহের চাহিদা। এর সাথে মনের কোন সম্পর্ক নেই। তাই মন কখনো একে ছেড়ে আড়ালে থাকে না। মৃত্যু না হলে যতই দূরে থাক না কেন সেখান থেকে সে দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তবে মন দেহ ছাড়াও আড়ালে থাকতে পারে। এতে মনের কিছুই অসুবিধা হয় না। বরং দেহ মনের অনুপস্থিতে পচে গলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়।

বিশ্ব প্রভুর রাজ্যে যা কিছু দেখা যায়, আর যা দেখা যায় না এ সকল কিছুতেই আল্লাহ্‌র ক্ষমতা আমাদের দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতো বেষ্টন করে রয়েছে। পুরা রাজ্যটিই যেন তাঁর প্রকাশের আবরণ। তাঁর শৈল্পিক ক্ষমতার প্রকাশ। এর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে আর কারও রাজ্য নেই। মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল সৃষ্টি, সৃষ্টি জগতের মূল সত্তার অংশ বিশেষ দিয়েই একে নিজ ক্ষমতার মধ্যে বন্দি রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতার জালের মধ্যেই সকল কিছু বন্দি। কোথাও ভিন্ন কোন স্বৈরশাসন নেই। কিংবা ক্ষমতা শূন্য স্থান নেই। এ বিশাল জগৎ আল্লাহ পাকের আরশের সত্তাধীন। এবং আরশ তাঁর ক্ষমতাধীন। আরশও যেমন তাঁর সৃষ্টি তেমনি এ জড় জগৎও তাঁর সৃষ্টি। সেই আরশের রজ্জু সৃষ্টির কোণে কোণে অবস্থিত। ফেরেশতাগণ আরশের রজ্জু ধরে সৃষ্টির অন্তর মূল পর্যন্ত ঘিরে আছে। আল্লাহ কখনো আরশে আরোহিত হন না আবার প্রবৃষ্টও হন না। তিনি বস্তু জাতও নন আবার শরীরীও নন। সকল সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের কোন অংশ নয়। এখানে একটি প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হতে পারে, যেমন আমরা মনে করতে পারি, আমাদের এ দেহটা যেমন আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সমষ্টিগত রূপ। তবে এ বিশাল জগৎ কি আল্লাহর অঙ্গ-প্রতঙ্গের রূপ? এ ধরণের ধারণা নেয়া নেহায়েত অমূলক। কারণ আমরা যে দেহটাকে আমি বলে সম্বোধন করে থাকি আসলে ঐ দেহটি আমি বলে কিছু নয়। মূলতঃ আমিই অন্য জিনিস। কারণ দেহ হলো

www.pathagar.com

আত্মার প্রকাশের আবরণ। তাই বিশ্ব রাজ্যটি প্রভুর প্রকাশের আবরণ মাত্র। তিনি নিজকে প্রকাশ করার জন্যেই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। একটি মানুষের দৈহিক স্থুল মূর্তিটির মধ্যে যত ঘাত-প্রতিঘাত আসুক না কেন মন তার সম্পূর্ণ খবর রাখে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশের আবরণ এই বিশ্ব ভুবনের মধ্যে যেখানে যাই ঘটুক না কেন তিনি তার খবর রাখেন। কি ভাবে খবর রাখেন সে বিষয়টি পূর্বেই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- "আমি ছিলাম গুপ্তধন, যখন প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন সৃষ্টি করলাম এ বিশ্ব জগৎ।"

এ বিশ্ব-জগতের কোথাও তিনি আরোহিত হন না, আবার প্রবৃষ্টও হন না। প্রথমে আমাদের মস্তিষ্কের ন্যায় তাঁর নির্দেশ আ'রশ বহন করে। তারপর সে নির্দেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সেখান থেকে তা রিলে করা হয় জড় জগতের দিকে। এ সকল নির্দেশ বহন করে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহর কিছু বিশেষ দূত নিয়োজিত রয়েছে। এদেরকেই বলা হয় ফেরেশতা। কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী যে ধরণের ফেরেশতা আসার কথা সে ধরণের ফেরেশতাই নির্দেশ পালন করে। আবার কিছু সংখ্যক ফেরশতা আছে নিম্ন জগতে, তাঁরাও নিম্ন জগতের সংবাদ নিয়ে যায় আরশে। পবিত্র কোরআনুল মাজীদে আল্লাহ বলেন-

"তিনি মানুষকে (আদমকে) নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।"

এ বাণীর সারমর্ম এই নয় যে, মানুষের জড় দেহের অনুরূপ আল্লাহ্‌র কোন জড় দেহ আছে। এ বাণীর প্রকৃত সারমর্ম হলো দু'রকম যেমন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের শাসন ব্যবস্থার নমুনা মানুষের (মনের) দেহ রাজ্যটির শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। অপরদিকে আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাশীল এবং তাঁর প্রেম ও সৃষ্টি ধর্মী গুণ আছে তেমনি মানুষেরও অনুরূপ কিঞ্চিত গুণ আছে।

আমাদের জড় দেহের হৃৎপিন্ড নামক এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আত্মা বাস করে বলে অনুমান করা হয়। আত্মা দেহটি শাসন করে স্নায়ুমন্ডলী দিয়ে। এর মূল দপ্তর মস্তিষ্ক। এ মূল দপ্তর সহ তার সকল সাব ষ্টেশন, যোগাযোগের সকল পথ সবই আত্মার নিয়ন্ত্রনাধীন। অর্থাৎ পুরা সিস্টেমটি আত্মার অধীনস্ত হয়ে কাজ করে।'এর কাজের কৌশল অতি নিখুঁত ভাবে, তড়িৎ সম্পন্ন হয়। মনের সংকেত (Impulse) মস্তিষ্ক হয়ে, সেখান

www.pathagar.com

থেকে নিউরন হতে নিউরন (Neurone to Neurone) হয়ে চলে যায় Nerve ending-এ। এ সময় স্নায়ুতন্ত্রের Neurone-এর কার্যকরী কোষ হতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ঐ স্থানে নিঃসৃত হয়, যা কার্য সম্পাদন করার জন্য ঐ স্থানের মূল অঙ্গকে উদ্দীপনা যোগায়। এই প্রক্রিয়ায় মন দেহ রাজ্যটি শাসন করে। মনের দেহ রাজ্য শাসন ব্যবস্থার সাথে মহা প্রভুর এ বিশাল জগৎ শাসন ব্যবস্থার কৌশল অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। দেহ রাজ্যের মূল দপ্তর হলো মাথা বা মস্তিষ্ক। তেমনি এ বিশাল জগতের 'মহা মস্তিষ্ক' হলো আরশ। এই আরশের শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি জগতের নিম্নাংশ পর্যন্ত ছড়ানো। আমাদের দেহ রাজ্যের স্নায়ু তন্ত্রের মতোই এর সূক্ষ্ণ জাল সর্বত্রই ছড়ানো। এখানে বৈষম্য হলো এতোটুকু, যেমন আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মূল দপ্তরসহ এর সকল শাখা-প্রশাখা হলো দৃশ্যমান কিন্তু নিরাকার আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ুমন্ডলী হলো অদৃশ্য। এ অদৃশ্য স্নায়ুমন্ডলী ফেরেশতাদের দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। জড় সত্তার কার্য ব্যবস্থার জন্য মনের মধ্যে যখন অভাববোধের তাড়না (Negative Impulse) সৃষ্টি হয় তখন ঐ তাড়না আলোর চেয়েও অসীম বেগে সৃষ্টি জগতের প্রধান দপ্তরের দিকে ছুটে যায়। এটি হলো afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না)। এই প্রধান দপ্তরের নামই হলো আরশ। তারপর সেখান থেকে ছুটে আসে কর্মের নির্দেশ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিটি সৃষ্টি কুলের কর্ম সম্পাদন হয়। অপরদিকে মহা প্রভুর ইচ্ছার প্রেক্ষিতে আরশ থেকে যে Impulse আসে, একে বলা যায় afferent Impulse। তাই এই বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর অজানা থাকে না। অদেখা থাকে না, অবাধ্য হয়ে কাজ করতে পারে না। এ ব্যবস্থার কোন কিছুই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না বলে আমাদের বোধগম্য হয় না।

আমাদের স্নায়ুমন্ডলীতে যেমন বিভিন্ন ষ্টেশন (Junction) থাকে, যার নাম Ganglion। আবার দু'টি ষ্টেশন এর সংযোগকারী পথকে যেমন বলা হয় Synapse। অনুরূপভাবে এই বিশ্ব-জগতের স্নায়ুমন্ডলীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ষ্টেশন। এর নাম মঞ্জিল বা ছাদ। এবং একটি মঞ্জিল হতে অপর মঞ্জিলের মধ্যবর্তী স্থান হলো আসমান। এটি আমার দর্শন মনের অনুমান। আল্লাহ হাফেজ। তিনিই তা ভাল জানেন। সৃষ্টিকে জানা, বুঝার মধ্যে খোদার অস্তিত্ব, খোদার বড়ত্ব জানা বুঝা যায়। তাই আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে এক মিনিট চিন্তা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়েও

www.pathagar.com

উত্তম। গভীর ধ্যানে যখন মহা প্রভুর কুদরতের সাগরের দিকে নজর দেয়া যায় তখন দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার পায়ের ধ্বনিও তাঁর অজানা থাকে না। মহা প্রভুর অসীম স্নায়ু মন্ডলীর নিখুঁত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সে খবর তাঁর কাছে পৌঁছে। এ জগৎময় যা কিছু ঘটে, সবই এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। মানুষের একটি অঙ্গ যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় তবে ঐ স্থানের স্নায়ু ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। এতে তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ব্যহত হয়। জীবনের গতি থেমে যায়। সে অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে। এই জগতের গতিও তার সৃজনশীলতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এটি যেমন স্নায়ু ব্যবস্থাহীন নয় তেমনি তা বিকলাংগও নয়। এটি সচল ও মহা নিয়ন্ত্রণের অধীন। এ জগতের অনুরূপ দৃশ্য দেখে মনে হয়, এই জগৎ মৃত নয় বরং জীবিত। এ জগতের আড়ালে থেকে যিনি একে জীবিত রেখেছেন তিনিই 'আল্লাহ'।

আল্লাহ আছেন বলেই এ জগৎ জীবিত আছে। এ জগতের স্নায়ু কাঠামো আছে বলেই এর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র জানার বাইরে থাকে না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর আদেশ নিয়েই এর কার্য ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাই সমুদ্রের অতল পানির নীচের একটি সূক্ষ্ণ প্রাণীর খবরও তাঁর অজানা থাকে না। মহা মস্তিষ্ক বা আরশের প্রেরীত দূতগণের মাধ্যমেই এই বিশাল জগৎ পরিচালিত হয়। আ'রশের বিস্তৃত পরিসীমার মধ্যে থেকে এ বিশাল জগতের কার্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য (বিভিন্ন অঞ্চল থেকে) ভিন্ন ভিন্ন দূত প্রেরীত হয়। তাদের নাম, কাজ-কর্ম ও ক্ষমতার সীমা দেয়া আছে। এরা প্রভুর অনুগত ভৃত্য। যখন যা আদেশ করা হয় তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাই এই জগৎ কখনো বিকল হয় না। থেমে থাকে না।

আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার খুবই ক্ষুদ্র। তাই আখ আর মরিচের খাদ্য মান কেন এমন হলো সেটিই বলতে পারি না। সেই তুলনায় এই বিশাল জগৎ তো অসীম। এ অসীম জগৎ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যখন জ্ঞানের ভান্ডার খালি হয়ে যায় তখন এমনিতেই নিদ্রা আসতে থাকে। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি জানার স্পৃহায় নিদ্রাকে দেয় বনবাস। যাঁরা যুগে যুগে নিদ্রার সাথে বিরহ করে খোদার কুদরতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা অনেকেই সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছেন। এক কালের

www.pathagar.com

যুগশ্রেষ্ট জ্ঞান সাধক ইমাম গাজ্জালী (র) বলেছেন, "প্রত্যেক ইচ্ছার প্রভাব যেমন প্রথমে আমাদের মনে আরম্ভ হয়ে ক্রমে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তারিত হয় তেমনি জড় জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনার মূল আল্লাহর ইচ্ছা আরশে সূত্রপাত হয়।" (সৌভাগ্যের পরশ মনি-৬১) আল্লাহ বলেন- "তৎপর আ'রশকে আল্লাহ্ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারু রূপে চলতে লাগল।" –(আল-কোরআন)

আমাদের দেহ রাজ্যের ওপর মনের যে শাসন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তার সাথে আল্লাহ্র রাজ্য শাসন ব্যবস্থার যে উপমা তুলে ধরা হলো, তা নিতান্তই দুর্বল ও কিঞ্চিত উপলব্ধি মাত্র। কারণ পরম করুণাময়ের রাজ্য শাসন ব্যবস্থার উপমা তুলে ধরার মতো আর কোন রাজ্য না থাকায়, এর বিকল্প কিছু চিন্তা করা যায় নাই। তবে আমাদের অঙ্গ রাজ্যের সাথে খোদার রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অনেকাংশে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান ও বোধশক্তির মধ্যে তা তুলে ধরা অনেকাংশে মঙ্গলদায়ক। অন্যথায় তা বুঝাই কষ্টকর হবে।

এ বিশ্ব আল্লাহ্র কোন বাহ্যিক রূপ.কাঠামো নয়। এ জগৎ তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ চিত্র। এর সকল কিছুই তাঁর পোষ্য বা ক্ষমতাধীন। তাঁর নির্দেশ আরশ বহন করে। অতপর সেখান থেকে বিভিন্ন মঞ্জিল হয়ে তারপর আসমান হয়ে যমীনে পৌছে। কিন্তু আল্লাহ্র আরশ, কুর্সী, লওহ, কলম, আসমান, যমীন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির Impulse-ই নূর। তাই খোদার অভিব্যক্তিই এই বিশাল জগতের অস্তিত্বের কারণ। যখন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না তখন এ বিশ্বের বস্তু ও তার উপাদান কোন গোপন ভান্ডারে মওজুদ ছিল না। আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরিত সত্তাই হলো নূর। সেই নূরের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের সার্থক রূপ হলো এই জড় জগৎ। পক্ষান্তরে এই জগতের কার্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নূরের তৈরী ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। তাঁরা অদৃশ্য। এঁদের কোন আকার, আকৃতি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, বিজ্ঞানের এ দিকে কোন নজর নেই। কিন্তু ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব যতই রহস্যময় মনে হোক না কেন, সূক্ষ্ম চিন্তা করলে এঁদেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি সঠিক ধারণা পাওয়া যায় তবে আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সুমতি লাভ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব

ফেরেশতা হলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট অদৃশ্য ভৃত্য। এঁরা আল্লাহর হুকুমে বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। গায়েব বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে আমরা একেবারেই অন্ধ। যিনি আলেমুল গায়েব, তিনি সে জগৎ সম্পর্কে জানেন, শুনেন। আল্লাহ রাববুল আলামীন হলেন আলেমুল গায়েব। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে খবর রাখা আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। দ্বীন ইসলামের মূল শর্ত হলো অদৃশ্যে বিশ্বাস করা। অদৃশ্য জিনিস দেখেই বিশ্বাস করতে হবে সেটি ঈমানের শর্ত নয়। কারণ অদৃশ্য জিনিস দেখা মানুষের ক্ষমতার বর্হিভূত। তাই আল্লাহ যে জিনিস বিশ্বাস করতে বলেছেন। তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করার নাম ঈমান। ঈমানের শর্তের মধ্যে ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এই ফেরেশতা জাতি অদৃশ্য জগতে বিরাজ করে। এঁদের অস্তিত্ব বিশ্বাসীগণ না দেখেই দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ সমাজে এমনও অনেক লোক আছে যারা অদৃশ্যের কিছু বিশ্বাস করতে নারাজ। এ ছাড়াও আর একদল আছে সন্দেহবাদী। না দেখে যারা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের কথা হলো বিজ্ঞানের যুগে অনুমানের ওপর অন্ধ বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। বিশ্বাসের জন্য সকল কিছু, বিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্ভর হতে হবে। অন্যথায় সে বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। অপরদিকে সন্দেহবাদীদের ধারণা হলো অদৃশ্য সত্তা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে জীবনের কল্যাণ অকল্যাণের কিছু আশা করা যায় না।

যে জিনিস দেখা মানুষের দৃষ্টি ক্ষমতার বর্হিভূত। সে সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্ব দেয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যের দ্বার প্রান্তে পৌছতে হলে প্রথমে অনুমানকে ধার নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। বিজ্ঞান যে একেবারে কল্পনা আর অনুমান থেকে মুক্ত তা কেউ বুক ঠুকে বলতে পারবে না। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই অনুমানকে হাতিয়ার না করে, কোন তত্ত্বকে বিজ্ঞানীগণ সঠিকভাবে সংগা দিতে পারেনি। যেমন 'মনে করি' কিংবা 'ধরি' এরূপ কল্পনার ভিত্তি ধার করেই বিজ্ঞান শুরু থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সিঁড়ি পাড় হয়ে এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছে। রবোটের যুগেও বিজ্ঞান অনুমানের ওপর ভিত্তি করে চলা বাদ দিতে

www.pathagar.com

পারেনি। তাই অনুমানের কাঁধে ভর না করে বিজ্ঞানের পথ চলা যেমন কঠিন তেমনি অনুমানকে অবিশ্বাস করাও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন। আধুনিক বিজ্ঞানের কণাতত্ত্ব, ঢেউ তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, পরমাণুবাদ, এ সবই অনুমানের ওপর ভর করেই অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞান যে অনুমানকে ধার নিয়ে পথ চলে, প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান সত্য হওয়ার মূলে কিছু অকাট্য যুক্তি নির্ভর বাহন তার মধ্যে লুকায়িত থাকে। যার ফলে সেই অনুমানের বস্তুটি পরবর্তিতে সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যখন আমরা অনুমানের ওপর নির্ভর করি তখন একে যেমন ইন্দ্রিয় চোখে দেখা সম্ভব হয় না, তেমনি এর বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ বের করা জ্ঞানে ধরে না। জ্ঞানের আপেক্ষিকতার জন্য তার মূল কারণ বের করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যারা না দেখে বিশ্বাস করতে রাজি নয়, তারা মূলতঃ এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করেন। আমরা যে সব জিনিস দেখতে পারব, কিংবা সকল কিছুর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারব, এ কথা ভাবা মোটেও উচিত নয়। কারণ জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারে সীমাবদ্ধ। তাই অনুমানকে যদি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে তা বিশ্বাস করতে বাধা থাকার কথা নয়।

কর্মের প্রথম শর্ত হলো বিশ্বাস। একজন লোক যদি বিশ্বাস করে, এক মাস চাকুরী করলে সে বেতন ভাতা পাবে, তবে সে কাজে লেগে থাকবে। কিন্তু তার যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, বেতন ভাতা পাওয়া যাবে না, তাহলে সে কাজ করবে না। তবে এ কথাও সত্য, কাজ না করে কেউ মজুরী পাওয়ারও আসা করতে পারে না। সে জন্য বিশ্বাসকে যাচাই করতে হলে একাগ্রচিত্তে কর্মে লেগে থাকতে হবে। আমরা যদি ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব বিশ্বাসের বেলায়, বিজ্ঞানের অনুমান নির্ভর বাহনের মতো অবলম্বন ধার করে অগ্রসর হতে থাকি তখন ঐ বিশ্বাস যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইস্‌লামের কতিপয় মূলনীতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের মূল শর্ত হওয়ায়, এই বিশ্বাসের সাথে কর্ম সর্ম্পকিত। কেউ যদি বলে ঐ রাস্তায় রাতে ডাকাত থাকে, যারা একথা বিশ্বাস করবে তারা এই পথে না গিয়ে হয়ত অন্য পথে যাবে নতুবা রাতের বেলায় ঐ রাস্তা দিয়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না, তারা

www.pathagar.com

তো যাবেই। বিশ্বাসের সাথে কর্ম যখন এক হয় তখন বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বা উপাদান দেখা না গেলেও যদি এই ধারণার মাধ্যমে সাময়িকভাবে এ দুনিয়াতেই কিছু সুফল লাভ পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে বিশ্বাসের উপাদান অদৃশ্য হলেও তার অস্তিত্ব বিরাজমান। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীর কর্মের মাধ্যমে যদি দুনিয়ার জীবনেই কুফল বয়ে আনে তবে বুঝতে হবে তাদের অবাধ্যতা ও কর্ম ভুল পথে হচ্ছে। কার্যতঃ দুনিয়ার জীবনেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর কাজকর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ চরিত্রের গুণাগুণ এবং তার সুফল আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। এতে বিশ্বাসের গুরুত্বের সাথে কর্মের শর্ত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ জড় জগতের আঁড়ালে ফেরেশতা জাতির পদাচরণ বিরাজমান।

আমরা আল্লাহ্‌কে নিরাকার হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি এ জাহানের প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা। কেন আমরা না দেখে তাঁকে বিশ্বাস করি? এর মূল কারণ হলো এই বিশ্বাসের পেছনে অগণিত যুক্তি আছে। এসব যুক্তি এমন অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যা বাদ দিলে মানুষের বিবেক বুদ্ধির অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়। বিবেক বুদ্ধি দিয়েই মানুষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। যে সত্য ভুলের উর্ধ্বে সেখানেই মানুষের বিশ্বাস নঙ্গর করে। দুনিয়ার যমীনে মানব জাতির পদাচরণা থেকে নিয়ে মানুষ এ বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি না তা খুঁজে ফিরেছে। দিনে সূর্যকে দেখে মনে করেছে এটিই বিশ্বের প্রতিপালক। কিন্তু যখন সূর্য ডুবে গেলে চাঁদকে আকাশে দেখেছে তখন ভেবেছে এটিই খোদা। কিন্তু যখন চাঁদ, সূর্যকেও আকাশে দেখে নাই তখন তাদের ভুল ভেঙ্গেছে। এভাবে সন্ধান করতে করতে এক সময় আদি থেকে শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে যখন ঠেকে গেল, তখন দেখল এর আর কোন আদি থাকতে পারে না। তখন ভাবল, এই বিশ্বে অনাদি হতে যিনি বিরাজ করছিলেন তিনিই এক আল্লাহ। পক্ষান্তরে শূন্য থেকে এ বিশ্ব সৃষ্টি হওয়া অবাস্তব। কিন্তু একের বেলায় কিনার বা মাত্রা থাকে না বলেই তিনি নিরাকার। কারণ কিনারের প্রশ্ন আসলেই একাধিক্য প্রমাণ হয়ে যাবে। যিনি এই বিশ্বের সচলতা বজায় রেখেছেন তিনিই আল্লাহ 'খালেক'। বিজ্ঞানের বেলায় যখন সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেখানে বিজ্ঞান ধার করেছে বাহনের। এই বাহনগুলো হলো 'মনে করি', কিংবা

www.pathagar.com

'ধরি' অথবা কোন ধ্রুব সংখ্যা। এর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কার্যতঃ প্রথম বাহনকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তবে সম্পূর্ণ তত্ত্ব বা সূত্রই ভুল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসব তত্ত্ব বা সূত্রের সুফল দেখে কেউ এর বাহনকে অস্বীকার করে না। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং দ্বীন ইসলামের কতিপয় মূলনীতির ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে কর্মের মাধ্যমে তার শর্ত পূরণ করলে যে সুফল পাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে কোন লোক এই সত্যের বিপক্ষে বহাছ করতে পারবে না। কিন্তু এরপরও যারা সে সত্যের বিপক্ষ পথ ধারণ করে আমি এদেরকে জ্ঞান শূন্য জড় বস্তুই মনে করি। বর্তমান চন্দ্র বিজয়ের যুগেও মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে অবজ্ঞা, অবহেলার বিষয় মনে করে না। আমার মতে বিজ্ঞান যেখানে অচল সেখানেই দর্শনের স্বার্থকতা ও মূল্য বেশী। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে অনেক সময় মৃত্যু পথযাত্রীদেরকে বার বার চোখ ঢাকতে দেখা যায়। কেন তারা চোখ ঢাকে তা আমরা ধরতে পারি না। নিশ্চয়ই তাদের চোখে সামনে তখন কিছু অদৃশ্য সত্তা মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়, পার্শ্বে বসে আত্মীয় স্বজনরা তা টের করতে না পারলেও সে তা দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলার এক ফেরেশতা ('মৃত্যু দূত') প্রাণ কেড়ে নেয়। প্রাণ কেড়ে নেয়ার সময় সে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির কাছে আসে। তখন হয়ত সে তাঁকে লক্ষ্য করে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার চন্দ্র জয় করতে পারলেও মৃত প্রায় ব্যক্তির চোখের সামনে কি ভাসে তার সন্ধান দিতে ব্যর্থ। আসলেই বিজ্ঞানের যন্ত্রে তা ধরা পড়ার কথাও নয়। কিন্তু দর্শনের যুক্তির মাধ্যমে আজ বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে জানার জন্য আকাশেও ঘুরতে হবে না, পাতালেও নামতে হবে না। নিজের দেহ রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্তর চোখে সন্ধান করতে পারলেই সৃষ্টি সম্পর্কে জানা যাবে বলে পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়া আছে।

মহা জ্ঞান ভান্ডার কোরআনুল মাজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "আমি তাদেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) দেহ ও আত্মার

www.pathagar.com

মধ্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকি। যার ফলে সত্যের গুঢ়তত্ত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হবে।"

- (সূরা হামীম আস সাজদা পারা -২৫ রুকু-৬)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।"

- (আল- কোরআন)

"তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নির্দশন, তুমি কি তা দেখ না।" - (আল-কোরআন)

পরম কুশলী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার বাণী আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বুঝা খুব কঠিন। আমাদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও বুযুর্গ তাঁরা এ থেকে অনেক সত্য খুঁজে পেয়েছেন। সে জন্যই বুযুর্গগণ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রভু আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পেরেছে। এ বিষয়টি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। যেহেতু নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই সৃষ্টির গুঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়ার মতো ইঙ্গিত দেয়া আছে, তাই ফেরেশতাগণ সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় আকাশে কিংবা পাতালে না ঘুরে নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ফেরেশতা হলো খোদার আদেশ নির্দেশ পালনকারী দূত। এ বিশ্ব মুলুক আল্লাহর রাজ্য। এ জগৎ খোদার প্রকাশের আবরণ। এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য খোদার কিছু কর্মচারী প্রয়োজন। প্রয়োজন অতি আজ্ঞাবহ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ভৃত্যের। বিশ্ব ব্যবস্থার কাজের ধারা ও তার প্রকৃতি এক রকম নয়। সেই সাথে সবার বেলায় একই দ্বায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এদিকে কাজের ভিন্নতা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ক্ষমতার প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য এই দূতগণ এক রকম নয়। এদের দ্বায়িত্ব, ক্ষমতা ও সার্বিক প্রকৃতি যেমন ভিন্ন তেমনি তাদের আঞ্চলিক দপ্তর ভিন্ন। তার মাঝে ভিন্ন দপ্তর থেকেই বিশ্ব ব্যবস্থার ভিন্ন দ্বায়িত্ব কর্তব্য পালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব ব্যবস্থার সার্বিক কর্মকান্ড মানব প্রকৃতির স্থূল দেহ রাজ্যটির শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। মানব আত্মা দেহ রাজ্য শাসন করার জন্য যেমন বাইরে থেকে কোন কর্মচারী আমদানী বা নিয়োগ দিতে হয় না তেমনি এ বিশাল বিশ্ব কাঠামো শাসন করার জন্য খোদাও বাইরে থেকে কোন কর্মচারী নিয়োগ করেননি। মানব দেহের মূল সচিবালয় যেমন মস্তিষ্ক

www.pathagar.com

তেমনি বিশ্ব প্রকৃতির মূল সচিবালয় আল্লাহর আ'রশ। মস্তিষ্ককে ঘিরে তার যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে- এ সকলকে বলা হয় স্নায়ুমন্ডলী। তেমনি এ বিশাল জগতেরও রয়েছে এক অদৃশ্য স্নায়ু মন্ডলী। এই স্নায়ুমন্ডলীর সকল কার্যধারা যেমন মনের অধীন, অনুরূপভাবে বলা যায় বিশ্বের মহা স্নায়ু ব্যবস্থা আল্লাহর অধীন। আমাদের কাজের প্রকৃতি প্রথমে যেমন স্মৃতিতে অংকিত হয় তেমনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব আ'রশে পতিত হয় এবং তাঁর মানসার (অভিব্যক্তির) প্রতিচ্ছবি লওহে মাহফুজ অংকিত হয়।

আমাদের দৈহিক কাঠামোর মধ্যে এমন কতকগুলো দূত আছে যারা স্নায়ুমন্ডলীতে বিরাজ করে। এসব দূত আমাদের মনের নির্দেশ সরাসরি সংশ্লিষ্ট অঙ্গে রিলে করে। মনে যখন কোন কাজের প্রেরণা বা অনুভূতি জাগে তখন ইচ্ছার প্রভাব মস্তিষ্কে আরোপিত হয়। তখন মনের ইচ্ছার প্রকৃতি অনুযায়ী মস্তিষ্ক হতে এক ধরণের প্রবাহ বা সংকেত কার্য সম্পাদনকারী অংগের দিকে চলে যায়। ঐ সংকেত পেয়ে তৎক্ষণাৎ কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুর কোষ থেকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বা জৈব রস নিঃসৃত হয়। এই জৈব রসের উদ্দীপনাতে অঙ্গটি কাজ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে অঙ্গ প্রতঙ্গের অগ্রভাগ থেকেও এক ধরণের দূত অঙ্গের অভাববোধের সংকেত নিয়ে মস্তিষ্কে ছুটে আসে। তারপর সেটি রিলে হয় মনের কাছে। এতে মন তার প্রয়োজন মেটানোর আবদার পালন করে। তড়িৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ দেয়া তার নীতি বিরুদ্ধ নয়। বরং পরোক্ষভাবে দেহ তার আনুগত্য থাকায় তার আবদার রাখে। অন্যথায় দেহের যে কোন অংশ অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যাবে।

আমাদের 'মন' নামক শাসকের নির্দেশে মস্তিষ্ক হতে যে সংকেত বের হয় আসলে তা কি? মূলতঃ এটি এক ধরণের Impulse বা চেতনা শক্তি। তার প্রকৃতি ঢেউ সাদৃশ্য। এতে মনের অভিব্যক্তি পুরে থাকে। তাই সেটি মনের ইচ্ছা শক্তি বা অভিব্যক্তির প্রতিধ্বনি বা নির্দেশ। আসলে মনের চেতনা শক্তি বা ঢেউ এর কম্পাংক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে। পরিশেষে এর ক্রিয়া ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী মূল স্নায়ুমন্ডলীর অগ্রভাগের কোষ থেকে যে রাসায়নিক শক্তি বা জৈব রস

www.pathagar.com

নিঃসৃত হয় এটিই দেহের সংশ্লিষ্ট অংশকে কাজ করাতে সাহায্য করে। মানব দেহের এই রাসায়নিক শক্তির নাম Nor-adrinaline এবং Acetailcholine (Ach) অন্যতম। এগুলো কাজের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আমাদের দেহের স্নায়ুমন্ডলীকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন Para sympathatic এবং sympathatic। এর মধ্যে Para sympathatic স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হলো Imspiratory Impulse (উত্তেজনাকর তাড়না) প্রেরণ করা। এবং Sympathatic স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হলো Inhibitory Impulse প্রেরণ করা। একটি অঙ্গকে উত্তেজিত করে অন্যটি নিবৃত্ত করে। আমাদের দেহের শৈল্পিক সত্তার মধ্যে Nervous System এর কাজ খুব জটিল। তবু তা দেহেরই অংশ। এটি মনের অংশ নয়। তাই এটি অদৃশ্য নয়। অন্যদিকে Nerve enduing (স্নায়ুর অগ্রভাগ) থেকে যে জৈব রস নিঃসরণ হয় সেগুলোরও যেমন অস্তিত্ব আছে তেমনি এর প্রকৃতিগত অস্তিত্ব ও অন্যত্র খুজে পাওয়া যায়। আমাদের আত্মার শাসিত দেহ রাজ্যটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা এই বিশাল বিশ্ব-জগতের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। আত্মার নির্দেশ পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলে পৌছতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, একে সময়ের শিকল দ্বারা পরিমাপ করা খুব কঠিন। সে রূপেও এই বিশ্ব জাহানের প্রভুর নির্দেশ প্রতিটি জড় আর অজড় সত্তাতে পৌছতে কোন বিলম্ব হয় না। একে সময়ের শিকল দ্বারা পরিমাপ করাও কঠিন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ বিশাল সৃষ্টি জগতের একটি মহা স্নায়ুমন্ডলী আছে। সে স্নায়ু মন্ডলীর শৈল্পিক সত্তা অদৃশ্য। এটি ফেরেশ্‌তা জাতির মাধ্যমে সৃষ্টির অন্তর মূল পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাপ্রভু আল্লাহর নির্দেশ এই মহাস্নায়ুমন্ডলীর মাধ্যমেই প্রেরীত হয়। প্রথমে এই নির্দেশ আমাদের মস্তিষ্কের মতোই আল্লাহর আ'রশ বহন করে। তারপর সেখান থেকেই তা ছুটে যায় সৃষ্টির বিভিন্ন অংশে। এই নির্দেশ কাজের উদ্দীপনা দিতে বা নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে। মূলতঃ এই নির্দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী মহা স্নায়ুমন্ডলীর প্রান্তভাগ বা অগ্রভাগে এসে যে সত্তা রূপ নেয়, সেই সত্তাই হলো প্রধান প্রধান ফেরেশতা। এদের অস্তিত্ব জড় প্রকৃতির বাইরে। তাই আমরা একে দেখি না। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণে সেই পরপারের যাত্রী তার

www.pathagar.com

অস্তিত্ব দেখে চোখ ঢাকে। তখন তার সব কিছু অবসন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে সে জড় প্রকৃতির জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই তার সামনে ঐ সত্তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হয়।

আমাদের মনের নির্দেশের ঘাড়ে চড়ে যে অভিব্যক্তি অঙ্গ প্রতঙ্গের দিকে ছুটে আসে একে তত্ত্ব কণাও বলা যায়। এই তত্ত্ব কণা ঝাকুনি বা তরঙ্গের মতোই। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা হলো, বস্তু কণার আকারেও থাকতে পারে আবার ঢেউ এর আকারেও থাকতে পারে। আমরা নিজেদের দেহের ভেতরে যেমন এই তরঙ্গের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি না, তেমনি অন্যের দিকে লক্ষ্য করেও তার কোন লক্ষণ বুঝি না। কিন্তু কাজের প্রেরণা পাই বলেই তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে পারি না। তবে স্নায়ুর অগ্রভাগে এসে ঐ সত্তার উদ্দীপনাতে যে উত্তেজনাকারী সত্তা নিঃসরণ হয় তার অস্তিত্ব দেহ কোষের অন্যত্রও খুজে পাওয়া যায়। এগুলো স্থায়ীভাবে কখনো দেহ কোষের অগ্রভাগে মওজুদ থাকে না। মনের নির্দেশের ঝাকুনির মাধ্যমে সেটি বের হয়। সেদিক থেকে মহা প্রভুর নির্দেশ অতি সূক্ষ্ম ধরণের এক পরম সত্তা। তাঁর নির্দেশের ঝাকুনি থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য যে সত্তা রূপ ধারণ করে, তাও খুব সূক্ষ্ম জিনিস। এঁদের অস্তিত্বও যত্রতত্র মওজুদ থাকে না। প্রয়োজনের সময় তা অস্তিত্ব ধারণ করে আবার মিলিয়ে যায়। যার ক্ষেত্রে এবং যেখানে সে অস্তিত্ব লাভ করে, সেই শুধু বিশেষ মহূর্তে তাঁর অস্তিত্ব টের করতে পারে।

এ বিশ্ব-জাহানের অদৃশ্য স্নায়ু মন্ডলীর গঠন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফেরেশতাগণের কাফেলায় গাঁথা। তাঁর নির্দেশের অস্তিত্ব ফেরেশতাতুল্য। পক্ষান্তরে এই নির্দেশের ফলে যে সত্তা মূর্তি ধারণ করে এঁরাও ফেরেশতা। এঁরা কার্য সম্পাদনকারী দূত বা সৈনিক। অর্থাৎ মহা প্রভুর ইচ্ছার প্রভাব যে সত্তার ওপর আরোপিত হয়, এর ফলে ঐ সত্তা থেকে যে নতুন সত্তা অস্তিত্ব লাভ করে, তার নামই ফেরেশতা। বিশ্ব প্রভুর স্নায়ুমন্ডলীর সকল কিছুই অদৃশ্য বলে এর কোন অংশই আমরা দেখি না। কার্যতঃ তা দেখার কথাও নয়। যাঁরা অতি মানব তাঁরাই শুধু এদের অস্তিত্ব দেখে থাকেন। কিন্তু না দেখলেই যে বিশ্বাস করা যাবে না এমন তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আমাদের দেহের স্নায়ু ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিলে দেখা যায় পুরা সিস্টেমটি

www.pathagar.com

অকেজো হয়ে পড়ে, হাঁটা চলা সম্ভব হয় না, পথ চলার গতি থেমে যায়, শরীরে ভারসাম্য ঠিক থাকে না। যদি এ বিশ্ব-জগতের কোন স্নায়ু ব্যবস্থা না থাকতো তবে এটির গতি ও অস্তিত্ব অনেক আগেই ঘুমিয়ে যেত। তখন আর পাখিরা গান করত না, আকাশে চাঁদ সূর্য উদয় হতো না। সুদূর আকাশে তারার মেলা বসত না। বস্তু স্বীয় মূর্তিমান অবস্থায় টিকে থাকতে পারত না। যারা পৃথিবীর অদৃশ্য স্নায়ু ব্যবস্থার কথা, ফেরেশ্‌তার কথা অস্বীকার করে তারা যদি একটি প্যারালাইসিস রোগীর দিকে লক্ষ্য করে আকাশের দিকে তাকায়, তবে এর সত্যতা স্বীকার না করে উপায় থাকবে না। পক্ষান্তরে এ বিশ্বের কোন স্নায়ু মন্ডলী না থাকলে এই আকাশ ও জমিন বিচলিত হয়ে পড়ত।

আল্লাহ বলেন- "তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তার অফুরন্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করে রেখেছেন। অথচ একদল লোক কোন রূপ জ্ঞান, হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনকারী পুস্তক ব্যতিরেকই আল্লাহর বিষয়ে ঝগড়া করে।" -(৩১-২০)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন যেন তারা বিচলিত না হয়।" - (৩৫- ৪১)

" ফেরেশ্‌তাগণ ও আত্মা সেদিন তাঁর দিকে অধিরোহণ করবে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।" - (৭০ ঃ ৪)

ঈমান বিল গায়েব কথাটির অর্থ, অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু অনেক সময় ধরা, ছুঁয়ার বাইরে থাকে। তবে বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক ঠিক থাকলে, এক সময় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু অদৃশ্য হলেও তার গুপ্ত সন্ধান ও অস্তিত্ব জ্ঞান অতীইন্দ্রিয় স্তর থেকে ইন্দ্রিয়ের স্তরে নেমে আসে। তাই ঈমান বা বিশ্বাস ব্যতীত সত্যের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

মৃত্যু কি? এ সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, আমাদের মস্তিষ্কের Imhibitory Impulse এর কার্য ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব প্রভুর স্নায়ু ব্যবস্থার আজরাইল (আ) এর কার্য নীতির যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের প্রেরীত Imhibitory Impulse দেহের অনেক অংশকে

www.pathagar.com

সাময়িকভাবে কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখে। অর্থাৎ মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি শরীরের কোন অংশ দুর্ঘটনায় পড়ে যায়, তখন মন থেকে যে নির্দেশ পাঠানো হয় একে রক্ষা করার জন্য, এর নাম Imhibitory Impulse। এর মাধ্যমে nerve ending (স্নায়ুর অগ্রভাগ) থেকে যে রাসায়নিক রস বা জৈবরস নিঃসৃত হয়, সেটিই শরীরের দুর্ঘটনা কবলিত অংশকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে আনে বা নিবৃত্ত করে। আমাদের দেহে জৈব শক্তির কাজ সাময়িকভাবে স্থায়ী থাকে। পুনরায় যখন ঐ অংশের স্বাভাবিক কাজকর্ম করার প্রয়োজন হয়, তখন Inspiratory Impulse তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এতে ঐ অংশটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। শরীরের ঐ অংশে এই দু'ধরণের শক্তির ক্রিয়া অতি কাছাকাছি ব্যবধানের মধ্যে ঘটে বলে এতে তার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নিবৃত্ত করার পর যদি উদ্দীপনা সৃষ্টি করার শক্তি অচল হয়ে যেত তবে ঐ অংশ চিরদিনের জন্যেই অচল হয়ে পড়তো।

মহা প্রভুর বিশ্ব-জাহানের অদৃশ্য স্নায়ু মন্ডলীর Inhibitory Impulse এর ক্রিয়ায় যে অদৃশ্যসত্তা মূর্তিধারণ করে দুনিয়ার জীবনের ব্যস্ততম প্রাণীর প্রাণ বায়ু বের করে নিয়ে, তাকে স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে কিছু সময়ের জন্য নিবৃত্ত রাখে; একে আমরা মৃত্যু হিসেবে গণ্য করলেও আসলে এ মৃত্যু চির মৃত্যু নয়। এ মৃত্যু একটা কালের বিশ্রাম। পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে (মৃত্যু কি?) উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

আমরা যখন খেতে খেতে পেট ভর্তি করে ফেলি তখন পেট থেকেই না খাওয়ার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মস্তিষ্কে সংকেত পাঠানো হয়। এ কাজটি একটি System এর মাধ্যমে ঘটে। এই System টিকে বলা হয় Feed back machanism। এ ব্যবস্থাপনায় খাওয়ার তৃপ্তি নিবৃত্ত হয়ে যায়। এতে খাওয়ার কাজ যেমন সাময়িক সময়ের জন্য নিবৃত্ত (বন্ধ) থাকে তেমনি মৃত্যুর বেলায় জীবন গতির স্পন্দন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। যখন দুনিয়ার কারও আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন Feed back machamism এর ন্যায় অনুরূপ ভাবে Life back machanism এর ক্রিয়া শুরু হয়। এতে মহা স্নায়ু ব্যবস্থার Imhibitory Impulse এর কাজ শুরু হয়ে যায় ফলে যার আয়ু থাকে না; তার কাজকর্ম

www.pathagar.com

সাময়িকের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সাময়িক সময়ের জন্য আত্মার অবর্তমানের ফলে তার বাহন (দেহ) পচে গলে নিজ অস্তিত্বের গুণগত কাঠামো নিয়ে অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। তারপর কালের ব্যবধানে যখন আবার Inspiratory Impulse এর সাড়া পাবে তখন দেহের ঐ অদৃশ্য সত্তাগুলো নিয়ে আত্মা আবার অস্তিত্ব ধারণ করবে। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কার্যধারা এ রূপই ঘটবে বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। আসল সত্য যিনি এর পুরো খবর রাখেন, তিনিই ভাল জানেন। আমরা শুধু জানার জন্য, বুঝার জন্য, পরম স্রষ্টার মহা সৃষ্টির কার্যাবলী আমাদের অস্তিত্বের (দেহের) অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বের কার্যাবলীর সাথে মিলিয়ে একটা মহা সত্যের কিনার খুঁজার চেষ্টা করছি। এর থেকে গায়েবের অস্তিত্ব স্বীকার করার মতো অনেক যুক্তি নির্ভর বাহন ও বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে মহা প্রভুর বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার নিগূঢ় রহস্য আঁচ করতে পারব, এটিই ধারণা। এই বিশ্বাস একটা জটিল বিষয়ের অনুভূতি বা সত্যের স্বাক্ষী মাত্র। এর কোন হাত, পা, কিংবা কোন কাঠামো নেই। ব্যথার অনুভূতি যেমন দেখা যায় না, ধরা যায় না তবু যেমন ব্যথিতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝতে পারি তেমনি এই বিশ্বাসের উপাদান হিসেবে এই জড় জগতের সকল কাঠামো দেখে তা স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে। মানতে হবে, এই বিশ্বের একজন চালক আছেন। তিনিই তাঁর অদৃশ্য দূতগণের মাধ্যমে একে পরিচালনা করেন। এঁদের কোন ইচ্ছা বা নিজস্ব কর্মক্ষমতা নেই। এঁরা শুধু খোদার নির্দেশ পালন করে। এঁদের কোন বেতন ভাতার প্রয়োজন নেই। খানাপিনার দরকার পড়ে না। তাঁরা ঘুম-নিদ্রা-আরাম-আয়েশের মুখাপেক্ষী নয়। আমাদের আত্মা যে দেহ রাজ্য শাসন করে সেটি যদি বর্তমান কাঠামোর ন্যায় না হয়ে আরও বৃহৎ হতো, তবু আত্মার পক্ষে তার খবর নেয়া কঠিন কিছু ছিল না। এই বিশ্বের যিনি শাসক তিনি অসীম ও অতিশয় পরাক্রমশালী, তাই তাঁর বেলায় এর খবর নেয়া বা রাখা অসম্ভব কিছু নয়।

কোন জিনিসকে বিশ্বাস করতে হলে সে জিনিসের অনুভূতি বা সত্যের সাক্ষী ঠিক করার জন্য প্রথমেই কোন না কোন মাধ্যম বা গাইড লাইন অনুসরণ করে, ঐ বিশ্বাসের পক্ষ ঠিক করতে হয়। তা না হলে যত তন্ত্রমন্ত্র

www.pathagar.com

দিয়েই বুঝানো হোক না কেন সঠিক বুঝ পয়দা হবে না। শিং মাছের কাঁটার দংশনের ব্যথা যে পায়নি, সে যেমন শিং মাছে দংশনের ব্যথা কেমন তা বুঝতে পারবে না, তেমনি যে শিং মাছের ভাজা খায়নি, সে তার স্বাদও বুঝবে না। সে জন্য প্রত্যেক জিনিসের ব্যথা কিংবা স্বাদ বুঝতে হলে তার একটা নুন্যতম অনুভূতি বা বিশ্বাস মনে প্রাণে ধারণ করতে হয়। ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব দেখা যায় না। সেজন্য এঁদের কার্যাবলীর কোন ধারণা আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। মহা প্রভুর এই অদৃশ্য সত্তাকে বিশ্বাস করতে হলে, প্রথমেই কোরআন হাদিসের তত্ত্ব বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। কোরআন এমনি এক মোজেযার বস্তু যা বিশ্বাস করে পথ চলতে থাকলে, শেষ পর্যন্ত গায়েবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করার মতো এমন এক সুমতি ও অনুভূতি মনে স্থির হয়, যা থেকে সেই মহা সত্যের পরিচয়ের সুন্দর চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হবে। তখন সেই অনুভূতি বা সত্যের সাক্ষীই হবে বিশ্বাসের উপাদান। ইলমে মারেফাত বা তত্ত্ব জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি সেটিও এক ধরণের সজাগ অনুভূতি। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনার প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বাস ঠিক না করে এর জটিল বিষয় বুঝা খুব দায়।

এ জগতে আল্লাহ তা'আলার অনেক নেক বান্দার মধ্যে ঈমাম গাজ্জালী (রহ) ফেরেশতাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য লিখে গিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মানুষের প্রত্যেক কার্যের প্রথমে তার ইচ্ছা যেমন মনে উদয় হয় তদ্রুপ আল্লাহর প্রত্যেক কার্যের আরম্ভ ও তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় মনের মধ্যে উদয় হয়ে থাকে। দেখার ইচ্ছা যেমন প্রথমে তোমার মনে উদ্ভব হয়ে ক্রমে তৎপথে অন্যান্য স্থানে পৌছে। সেরূপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে আ'রশে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে অন্যান্য স্থানে পৌছে থাকে। তেজস্ব সাদৃশ্য যে সূক্ষ্ম পদার্থ তোমার ইচ্ছার প্রভাবকে হৃৎপিন্ড থেকে স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে পৌছিয়ে থাকে। তাকে যেমন জীবনী শক্তি বলা হয় তদ্রুপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাবকে যে পরমশক্তি আ'রশ হতে কুর্সী পর্যন্ত পৌছিয়ে থাকে; তাকে ফেরেশতা ও রুহুল কুদুস বলে। হৃৎপিন্ডের প্রভাব যেমন মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয় তেমনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে আ'রশে উৎপন্ন হয়ে পরে কুর্সীতে বিস্তৃত হয় বলে কুর্সী আ'রশের আজ্ঞাধীন। মানুষ যে কাজ করতে ইচ্ছা

www.pathagar.com

করে তার ছবি পূর্ব হতেই মস্তিষ্কের খেয়াল কুঠুরীতে অঙ্কিত থাকে এবং পরে তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন হয়। যে বিস্‌মিল্লাহ্ শব্দটি লেখা তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তার ছবি পূর্ব হতেই তোমার মস্তিষ্ক অঙ্কিত ছিল। লেখা হয়ে গেলে দেখা যায় যে, লিখন মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছবির ন্যায়ই হয়ে থাকে। এই প্রকারে যা কিছু এ জগতে প্রকাশ পায় তার ছবিও পূর্ব হতেই লওহে মাহফুজ অঙ্কিত থাকে। যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে থেকে স্নায়ু সমূহকে আলোড়িত করে এবং তৎ সাহায্যে হাতের আঙ্গুলী ও অবশেষে কলম পরিচালিত করে তদ্রুপ এক প্রকার শক্তি আ'রশ ও কুর্সীতে অবস্থিত থেকে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে পরিচালিত করে এবং এদের প্রভাব নিম্ন জগৎ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। শেষোক্ত শক্তিকে ফেরেশতা বলে। (কিমিয়ায়ে সা'আদত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফেরেশ্‌তা জাতি তাঁর নূরের তৈরী। পৃথিবীর মানুষ আলোক পর্যন্ত সূক্ষ্ম সত্তাকে দেখতে পারে। কিন্তু নূর দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নূর এবং আলোক যদি এক জিনিস হতো তবে নূর দেখাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো। এই নূর যেহেতু আমরা দেখতে পারি না সুতরাং নূর ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। অতএব প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে নূর কি? এই নূর সম্পর্কে সঠিক ধারণা না নিতে পারলে ফেরেশ্‌তাগণ সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান পরিষ্কার হবে না। অতপর নূরের ধারণাই আমাদেরকে ফেরেশ্‌তাগণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারে।

www.pathagar.com

নূর কি এবং তা কি ভাবে পয়দা হলো

এ বিশ্ব জগৎ চিরন্তন নয়। চিরন্তন ছিলও না। এতে যা কিছু আছে তার উপাদানও অনন্তকাল থেকে কোথাও মওজুদ ছিল না। এমন একসময় ছিল যখন না ছিল চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী, না ছিল অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র কিংবা আকাশ মন্ডল। এ রূপ এক শূন্য আর শূন্য অস্তিত্বের মাঝেই এই বিশ্ব ও তার সকল কিছু জন্ম হয়েছে। সেই শূন্য পরিবেশে সর্বত্রই পরমস্থিতি বিরাজিত ছিল। এ রূপ অনন্তহীন শূন্য পরিবেশে অনন্তকাল থেকে যিনি বিরাজমান ছিলেন, তিনিই এই সুন্দর সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টিকর্তা। এ বিশ্বে এখন আর কোথাও শূন্য পরিবেশ নেই। তবে কোথা থেকে এল এই জগতের সকল কিছু? আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি কোত্থেকে হবে? আলো নেই অন্ধকার দূর হবে কিভাবে? কিন্তু সে সময় কোন কিছু না থাকলেও বিশ্বের পরম সত্তা (আল্লাহ) বলে একজন তো অবশ্যই ছিলেন। তিনি নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় ছয় দিবসে এ জগতের সকল কিছু পয়দা করলেন। অথচ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কোথাও যখন কোন কিছু ছিল না, তখন তিনি এর উপাদান কোত্থেকে আনলেন? এ সব প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে বিব্রত করতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন এর উপাদানও আদি থেকে বিরাজমান ছিল। খোদা একেই শুধু পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়েছেন। পক্ষান্তরে কেউ মনে করে এর উপাদান শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এদের কিচ্ছা কাহিনীর কোন যুক্তি নেই। এদের ভাবনার বিষয়বস্তু নিজেদের কল্পনার ফসল হলেও ধর্মীয় বিধানে এর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। ধর্মের মূল ব্যাখ্যা হলো, খোদা এ জগৎ সৃষ্টি করার আগে "নূর" সৃষ্টি করেছেন। এই নূর থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক জানতে গিয়ে প্রশ্ন আসে, যেখানে কোন কিছুই ছিল না, সেই শূন্য পরিবেশে খোদা কি ভাবে, কিসের মাধ্যমে, 'নূর' সৃষ্টি করলেন? এবং এই নূর কি জিনিস?

সহি হাদীসে আছে, রাসূল (স) বলেছেন-

"আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন-

www.pathagar.com

"আল্লাহ সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা আমার নূর।"

রাসূল (স) এর এসব হাদীস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পরোক্ষ ভাবে এ জগতের সকল কিছু আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদিতে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আ'লা প্রথমে নূর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এতেও মূল প্রশ্নের সমাধা হয় না। কারণ অনেকে মনে করেন 'নূর' আল্লাহর বাহ্যিক সত্তা। আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে নূরের আবরণ রয়েছে। এ ধরণের চিন্তা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসারই বর্হিপ্রকাশ। বাস্তবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যদি 'নূর' কোত্থেকে এল, কি ভাবে এল, এর বাস্তব একটা সমাধান পাই, তাহলে 'নূর' যে কি জিনিস তা উপলব্ধি করতে পারব।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে গিয়ে শুধু বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। অর্থাৎ 'কুন ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এ ক্ষেত্রে বাইরের কোন উপাদানের সংযোজন, সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয় না। অনস্তিত্বময় এক শূন্য পরিবেশেই তা পয়দা হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নতুন যা অস্তিত্ব লাভ করে এর ভেতরটা শূন্য থাকে না। এর উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তি থেকেই বিচ্ছুরীত হয়ে আসে। সেজন্য শূন্যে কিছু জন্ম হলেও তা শূন্য থাকে না। একে ভাংতে ভাংতে যতই গভীরে যাওয়া যায় সেখানেও শূন্য বলতে কিছু পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে এই উপাদান আসল কি ভাবে এবং কোত্থেকে? 'কুন ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে যখন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে সুতরাং এর মধ্যেই দেখা প্রয়োজন কিছু আছে কি না। মূলতঃ পরম দয়ালু ও মহান দাতার ইচ্ছা বা অভিব্যক্তির বিচ্ছুরীত সত্তার মাঝেই সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল উপাদান চলে আসে। রাজমিস্ত্রি যেভাবে ইট, বালি, সিমেন্টের মিশ্রণে দালান তৈরী করে; মহা প্রভুর সৃষ্টি কৌশল এমন নয়। বরং তিনি অনস্তিত্বের মাঝেই অস্তিত্ব দাঁড় করান। আমরা যখন হাত দিয়ে কোন কিছু লিখার চিন্তা করি তখন এর চিত্র আগেই মনে মনে স্থির করি। তারপর লিখার কাজ শুরু করলে ঐ জিনিসটিই প্রকাশ পায়। তেমনি আল্লাহর মানসে সৃষ্টির যে পরিকল্পনা ছিল, সেটি যখন বিচ্ছুরীত হয়ে প্রকাশ হলো তখন সৃষ্টির আদি উপাদান অস্তিত্ব লাভ করলো। আমাদের মনের ইচ্ছার প্রভাব মস্তিষ্কে

www.pathagar.com

আরোপিত হয় Impulse বা ঢেউ এর ন্যায়। তদ্রূপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রাথমিক অবস্থায় কি পরমস্থিতির সাগরে ঢেউ জাগিয়ে তুলেছিল? এই সূক্ষ্ম তাড়না বা চৈতন্যশক্তি কি ঢেউ সাদৃশ্য? যার ভাঁজে ভাঁজে মহাপ্রভুর অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম ছাপ লেগে ছিল?

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো কলম। তৎপর বললেন 'লেখ' কলম বলল, "হে আমার প্রভু কি লেখব? আল্লাহ বললেন, ত'কদীর লেখা যা ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা ঘটতে থাকবে।"

আকাশে মেঘমালা থাকলে বৃষ্টি একদিন হবেই, মাটি সিক্ত হলে বীজ গজাবে। তরুলতায় প্রকৃতি ভরে উঠবে। ফুলফল হবে, বীজ হবে। তা থেকে আবার গাছ উঠবে। পরমস্থিতির সাগরে সৃষ্টির অস্তিত্বের আদি উপাদান প্রকাশ হয়ে, তা থেকে এ জগৎ উত্তরোত্তর নতুন সাজে ভরে উঠল, যেভাবে স্রষ্টা সাজাতে চাইলেন এটিকে। এই বিশ্ব পরিকল্পনাহীন, দৈব ক্রমে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে, অনেক বিবর্তন-আবর্তন, অনেক ধাপ, অনেক প্রক্রিয়ার পথ মাড়াই দিয়েই এটি চূড়ান্ত স্তরে এসে পৌঁছেছে। কত যুগ, কত কাল যে লেগেছে সে হিসেব আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক অবস্থায় পরমস্থিতিময় শূন্য স্থান ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভরে গিয়েছিল। বর্তমানের বিজ্ঞানও ঢেউ চলার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন অনুভব করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, মাধ্যম ব্যতীত ঢেউ চলতে পারে না। কিন্তু সেই শূন্য স্থানে কিভাবে ঢেউ ছড়েছিল, তা আমাদের চিন্তায় ধরে না বলে আমাদের মাঝে অনেকই বিশ্বের আদি ভর-শক্তিকে Constant ও চিরন্তন মনে করেন। কিন্তু শূন্য স্থানটিকে যদি পরমসত্তার নিথর রাজ্য মনে করি অর্থাৎ পরমস্থিতির রাজ্যটি যদি তাঁর অধীনস্ত হয় তবে এতে ঢেউ উঠা বা গতি জাগা অসম্ভব কিছু নয়। পরমসত্তার প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছাতে তা গতি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব এতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুকে এখন আর শক্ত কিছু মনে করে না। এখন বস্তু হলো তরঙ্গের পুটলা। সেদিক থেকে, আলোকও ইলেক্টোন তরঙ্গের পুটলা জাতীয় জিনিস। কিন্তু সব যদি তরঙ্গ হয় তাহলে এই তরঙ্গ আসল কোত্থেকে? বিজ্ঞান এর কি উত্তর দিবে তা বলতে পারি না। তবে এ কথা সত্য যে তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি হওয়ার জন্য

www.pathagar.com

যেমন বাহ্যিক কারণ থাকে, তেমনি এর একজন উৎসক বা স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। এ কথার সমাধান পেতে হলে বাধ্য হয়ে ধর্মের বন্ধনে এসে বিশ্বাস করতে হবে, এ জগৎ দৈবক্রমে জেগে উঠেনি। এ বিশ্বের অসীম শূন্য মন্ডলী অনাদিকাল থেকে পরমসত্তার অধীনেই ছিল। তিনি যখন গুপ্ত না থেকে প্রকাশ হতে চাইলেন, তখনি এ জগৎ তরঙ্গময় হয়ে উঠলো। তা থেকেই আজকের এই বিশ্ব। আজকের বিজ্ঞানের যুগে বেতার তরঙ্গ ও টিভির বিদর্শন বিন্দু (তরঙ্গ) হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও অন্য রাজ্যের আকাশ পথে উড়ে এসে প্রচার যন্ত্র বা গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে এসে তরঙ্গের বাস্তব রূপ প্রকাশ হয়। এগুলি শূন্য·সাগরে (যাকে আমরা শূন্য বলি) ঢেউ খেলে খেলে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে আসে। আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেলেও আমরা তা দেখি না। এই সূক্ষ্ম ঢেউ এর ভাঁজে ভাঁজে কত বিচিত্র কথা, কত দৃশ্য যে লেগে থাকে তা কল্পনাই করা যায় না। এ সব তরঙ্গের গায়ে থাকে সুখের চিত্র, থাকে দুঃখের ছাপ, থাকে রং বেরংগের বিরহ, বেদনা আর আহাজারীর ছবি। কিন্তু গ্রাহক যন্ত্রে ধরা না পড়া পর্যন্ত তার বাস্তব রূপ প্রকাশ হয় না। অথচ ঐ তরঙ্গের ভাঁজের মধ্যেই বাস্তবের কর্মলিপির ছোবল লেগে থাকে। কিন্তু প্রেরক যন্ত্রের চার দেয়ালের ভিতর থেকে যেরূপ দৃশ্যের প্রতিবিম্ব প্রেরীত হয়, সেটিই এসে গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্র ইচ্ছা করে এর কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারে না। দুনিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রচার যন্ত্রের সাথে শুধু প্রেরক যন্ত্রের সম্পর্ক থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রচার যন্ত্র হতে প্রেরক যন্ত্রে কোন খবর প্রেরণ হয় না। কিন্তু স্রষ্টা আর সৃষ্টির সম্পর্ক ভিন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে যেমন খবর রিলে হয় স্রষ্টার দিকে তেমনি স্রষ্টা থেকে ও সৃষ্টি পায় কার্য ব্যবস্থার আদেশ-নির্দেশ।

যখন সৃষ্টি বলতে কোন কিছুই ছিল না, না বস্তু, না তরঙ্গের পুটলী, না তরঙ্গ তখন যে উৎসক বা স্রষ্টা হতে তরঙ্গের জোযাড় উঠে তার নাম দার্শনিকদের ভাষায় পরম সত্তা। সেই মহান সত্তার নাম আল্লাহ। তাঁর নূর বলতে এমন কিছু নয় যে, এই নূর নামের কোন মৌলিক জিনিস তাঁর গায়ে মাখা ছিল। অপর দিকে আল্লাহর 'কুন' বলা মানবীয় ইন্দ্রিয়ের ভাষার শব্দের সাথে সম্পর্কীত নয়। আল্লাহ দেখেন, শুনেন একথাগুলি ও আমাদের

www.pathagar.com

ইন্দ্রিয়ের দেখাও শুনার সাথে সম্পর্কীত নয়। আমাদের মনের পরিকল্পনা প্রকাশ হয়, অঙ্গের গতিশীল কার্যব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু অঙ্গে যে শক্তি গতি সৃষ্টি করে তার নাম চৈতন্য শক্তি বা তেজ তরঙ্গ। সেভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সৃষ্টির আদি সত্তা কোথাও মওজুদ ছিল না। স্রষ্টার প্রকাশের ব্যগ্রতার তেজ তরঙ্গ সৃষ্টির আদি সত্তা। আমরা নূরের যে আবিধানিক অর্থ পাই তাতে লিখা আছে নূর অর্থ আলোক বা জ্যোতি। কিন্তু নিখুঁত ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে 'নূর' আলোক বা জ্যোতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কীত নয়। এর কারণ হলো আলোকের দ্বৈত প্রকৃতি আছে কিন্তু নূরের বেলায় এরূপ গুণ থাকার প্রশ্নই আসে না। নূরের তৈরী ফেরেশতাগণ দ্বৈত রূপের সাথে সম্পর্কীত নয়। তাঁরা পুরুষ ও নয় নারী ও নয়। সেজন্য নূর ও আলোক একি বৈশিষ্ট্যের হতে পারে না। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, নূরের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আলোকের জন্ম হয়েছে। আলোকের উৎস বা জন্ম দ্বৈব ক্রমে ঘটেনি। এতে রয়েছে স্রষ্টার পরিকল্পনাময় বিধান। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানতে জানতে যত মূলের দিকে অগ্রসর হব, সেখানে গিয়ে পাব সৃষ্টির অস্তিত্বের আদি সত্তাতে রয়েছে পরম সত্তার অভিব্যক্তির ছুঁয়া। এই সত্তা স্রষ্টার এরাদার বিচ্ছুরীত চৈতন্যশক্তি। তাই সৃষ্টির আদি সত্তা কোথাও মওজুদ ছিল না। এই সত্তা সৃষ্টি করতে খোদার পক্ষে কারও সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। তিনিই খালিক ও মালিক, তিনিই পরম স্রষ্টা যিনি অনস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

মহা করুণাময়, পরম কৌশলী আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করবেন এটিই ছিল তাঁর পরম বাসনা। সেজন্য সৃষ্টির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ প্রেম, ভালবাসা ও করুণা। আল্লাহর প্রেম সাগর করুণার আতিশয্যে ভরপুর।

তাই তিনি বলেছেন-"লাওলাকা লানা খালাকতুল আফলাক।" অর্থ্যাৎ "আপনাকে (নূর-এ মুহাম্মদী (স) সৃষ্টি না করলে আমি ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করতাম না।"

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি থেকেই নূর-এ-মুহাম্মদী (সঃ) এর প্রতি তাঁর প্রেমের আতিশয্যই ফুটে ওঠে। সেই প্রেম, সেই ভালবাসার গন্ধ

www.pathagar.com

এখনও সৃষ্টির প্রতিটি রেণু-কণার মাঝে লেগে আছে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি প্রেমের কুদরতি ছুঁয়ায় ঐ 'নূর' হতে তেজদীপ্ত যে সত্তা সৃষ্টি হলো, তা দিয়ে সৃষ্টির আ'রশ, কুর্সী, লওহ, কলম, আসমান, জমীন, ফেরেশতাসকল পয়দা হলো। আকাশের মেঘমালা শীতল বায়ুর স্পর্শে বৃষ্টি রূপে নেমে আসে পৃথ্বীতলে। এর স্পর্শে মরু ভূমিও সবুজে ভরে ওঠে। অসীম শূন্যে যে নূর ছড়িয়ে ছিল, সেখানটিতে খোদার কুদরতি প্রেম দৃষ্টি পড়ে তাতে আ'রশ কুর্সী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। কিন্তু খোদার ইচ্ছা এখানেই থেমে যায়নি। তিনি জাতি প্রেমের ব্যগ্রতার মোহে নিজের অনুরূপ প্রেম প্রবৃত্তি বোধ সম্পন্ন সত্তা সৃষ্টির বাসনায় সৃষ্টির প্রতি কুদরতি প্রেম খেলা শুরু করলে নূরে-এ-মুহাম্মদীর (স) নূর থেকে প্রকাশ হয় নতুন এক জাতের। এই জাত আদমী বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা। সে জাত নির্বোধ নয়, প্রেমহীন নয়। সে ভাবতে পারে। কল্পনা করতে পারে। নিজের অভাবের তাড়না প্রকাশ করতে পারে, এ জাতও ফেরেশতাদের মতো নূরের তৈরী। তবে আদমী জাতের বৈশিষ্ট্য ফেরেশতাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। কারণ এ জাতের অভাববোধ আছে, আছে স্বাধীন চিন্তাশক্তি, আছে প্রেম-ভালবাসা, আছে বিবেক-বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে এ গুণ নেই। তাঁরা ভাবতে পারে না, তাঁদের কোন অভাব বোধ নেই, তাঁরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না। নিজে থেকে কিছুই জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যতটুকু তাদেরকে জানান ততটুকুই তাঁরা জানেন। এর বেশী কিছু ভাবার শক্তি তাদের নেই। মূল কথা এদের থেকে কোন Sensory Impulse স্রষ্টার কাছে প্রেরীত হয় না। কিন্তু আদমী বুদ্ধির ব্যপারটি সৃষ্টির Sensory গুণ পয়দা হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। ওপরে উল্লেখিত তত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শনের কথা।

আদমী বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তার অভাববোধ আল্লাহর নির্দেশই পূর্ণ হয়। তার জীবন যৌবনের সমস্ত কামনা, বাসনাসহ সকল ক্রিয়া কান্ড আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। মানব আত্মা নিজ রাজ্যের খবর রাখার বেলায় যেমন তার অভাব-অনটন দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করে, সাথে সাথে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যেমন দেহের অভাব পূরণ করতে সাহায্য করে, তেমনি এ জগতের প্রতিটি সত্তার খবর নেয়া সহ তাদের অভাব অনটন পূরণ করতে পরমসত্তা (আল্লাহ) আদেশ-নির্দেশ প্রেরণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

সেজন্য আল্লাহর নূর অনেক ভাবে সৃষ্টিতে পতিত হয় যেমন হেদায়েত, বরকত, আদেশ, নির্দেশ, এগুলোও আল্লহর নূর। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদির প্রভাব সৃষ্টিতে ঢেউ এর ন্যায় বিকশিত হয়। সেজন্য এ বিশ্বের ভর-শক্তির পরিমাপকে নির্ধারিত মনে করা ঠিক নয়। যারা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের রূপান্তর বিশ্বাস করেন, তারাই শুধু বিশ্বের ভর-শক্তি constant মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্ব প্রকৃতি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এই বিশ্ব যতদিন টিকে থাকবে ততদিন এতে অভাব বোধ ও বাঁচার প্রেরণা থাকবে। সাথে সাথে 'মহামন' তাদের অভাব ও বাঁচার খোরাক পূরণ করে যাবেন। এতে বিশ্বের ভর-শক্তির পরিমাণ প্রতি নিয়তই বাড়তে থাকবে। যতদিন এই বিশ্ব প্রকৃতির বর্তমান কাঠামো ঠিক থাকবে ততদিনই এর পরিমাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে। যারা বিশ্বের ভর-শক্তিকে constant মনে করেন, তারা মূলতঃ আল্লাহর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে ভাবেন (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপ বিশ্বাস করা মোটেও ঠিক নয়। আলোকের দ্বৈত রূপ থাকলেও নূরের কোন দ্বৈত রূপ নেই। এ বিশ্বে যা কিছু আছে এ সবি পরোক্ষ ভাবে আল্লাহর নূরের তৈরী। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুর নাড়ীভূড়ি ছিড়ে এর মাঝে পেয়েছে শুধু তরঙ্গ আর তরঙ্গ (ঢেউ)। সৃষ্টির আদি সত্তা পরম স্রষ্টার মনের অভিব্যক্তির প্রকাশ চিত্র বিধায়, তার প্রকৃতি যে ঢেউ সাদৃশ্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মানব আত্মা বা আদমী জাতের প্রকৃতি হলো স্রষ্টার কিঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। আমাদের মনের প্রেরণা বা আদেশ-নির্দেশ যেমন মস্তিষ্কে ঢেউ এর ন্যায় পতিত হয় তেমনি খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতা, তাঁর আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি সৃষ্টিতে ঢেউ এর ন্যায়ই প্রভাব বিস্তার করে। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ বিশ্বের আদি সত্তা ঢেউ সাদৃশ্যই ছিল। অনুরূপ ভাবে আল্লাহর নূর হলো এমনি এক ঢেউ সাদৃশ্য সত্তা যা আল্লাহর থেকে সৃষ্টিতে পতিত হয়। এ বিশ্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রকাশের আবরণ। মানব আত্মার প্রকাশের আবরণ যেমন এই মাটির দেহ তেমনি এই বিশ্ব-জাহান পরম স্রষ্টার প্রকাশের আবরণ। এতে যা কিছু আছে সবি আল্লাহর পরিবার ভুক্ত। মাটির দেহ যেমন মানুষের (আত্মা) আসল পরিচয়ের কিছু নয় তেমনি এ বিশ্ব খোদার অস্তিত্বের কিছু নয়। দেহ যেমন আত্মাকে স্পর্শ

www.pathagar.com

করতে পারে না তেমনি এ বিশ্ব-ভুবন আল্লাহর অস্তিত্বের ধারে কাছেই যেতে পারে না।

এরূপ স্পর্শহীন অবস্থায় থেকে আত্মা যেমন দেহকে শাসন করে, তার অভাব-অনটন দূর করতে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করে তেমনি এ বিশ্ব-ভুবন আল্লাহর অস্তিত্বের স্পর্শ না পেলেও তাঁর শাসনের অধীন আছে। এর অভাব-অনটন তাঁর আদেশ-নির্দেশের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- "আল্লাহ আকাশ মন্ডল ও যমীনের নূর। তাঁর নূর এর দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এইরূপ যেমন মোতির মত ঝকমক করা তারকা। আর সেই চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়। যা না পূর্বের না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি উথলিয়ে পড়ে। আগুন যদি নাও লাগে। (এই ভাবে) আলোর ওপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত)। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা আন-নূর)

আল্লাহ তা'আলার এ সব জ্ঞানগর্ভ বাণী বুঝা খুব কঠিন। কারণ এই আয়াতগুলো অর্থের দিক থেকে একটি রূপক উদাহরণ মাত্র। এর সারমর্ম যে কি তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে অনেক জ্ঞানবীর মনীষীগণ এই সকল আয়াতের কিঞ্চিত তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাফহীমুল কোরআনের তাফসীরকারীক উল্লেখ করেছেন, আভিধানিক অর্থে নূর অর্থ আলোক বা জ্যোতি হলেও এখানে আলোক বা জ্যোতি বলতে এমন এক উজ্জ্বল জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা অন্য জিনিস হতে সরাসরি বের হয়ে চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। তবে আল্লাহর নূর সম্পর্কে এইরূপ (আলোক) ধারণা করা সংকীর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিরই পরিচয় বহন করে। এই বিশ্বলোকে তিনিই একমাত্র প্রকাশ কারণ। তিনি ছাড়া এখানে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নেই। আর যে সব জিনিস এখানে আলো দেয়, তাও তাঁরি দেয়া আলোকে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা দানকারী। অথচ আলোক দানকারী জিনিসের নিজের মধ্যে এমন কিছু নেই, যার দ্বারা এই কাজ সম্পাদন করতে পারে।"

- (সংক্ষেপিত)

www.pathagar.com

আমরা পৃথিবীতে যত কাজ করি সে সব কাজের জন্য আমরা সরাসরি খোদার নির্দেশ উপলব্ধি করতে না পারলেও কার্যতঃ তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছুই করতে পারি না। আমাদের মনে কার্যের অভাববোধের তাড়না সৃষ্টি হলেই বিশ্ব প্রভুর শাসনতান্ত্রিত ব্যবস্থার অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমে আমাদের কাছে আদেশ-নির্দেশ প্রেরীত হয়। খোদার অনিচ্ছাতেও অর্থাৎ খোদার মর্জি বর্হিভূত কাজেরও তিনি নির্দেশ দান করেন। সে জন্য খোদার অনিচ্ছাতেও তাঁর আদেশ-নির্দেশ আপনা আপনি সৃষ্টিতে পতিত হয় বা উথলিয়ে আসে। অতপর সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষী কামনা করুক আর নাই করুক; কিংবা কাজ আল্লাহর মর্জি মতো হোক আর নাই হোক অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় হউক, সকল ক্ষেত্রেই যখন সৃষ্টির মধ্যে কর্মের অভাববোধের তাড়না সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব সৃষ্টির চাহিদার প্রেক্ষিতে কিংবা খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতায় তাঁর পক্ষ থেকে সৃষ্টিতে যে সংকেত পতিত হয় সে সবের নামই 'নূর'।

পূর্বের প্রশ্নগুলো ছিল খোদা কিভাবে, কিসের মাধ্যমে নূর সৃষ্টি করেছিলেন এবং নূরই বা কি জিনিস? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে এ কথা বলা যায়, নূর সৃষ্টির জন্য খোদা কোন যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করেননি, এর জন্য কোন মাধ্যম দরকার হয়নি। এ নূর খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রকৃতি ঢেউময়। এতে পরমস্থিতির জগৎ অবস্থান্তর হয়ে পরমগতি লাভ করে। সাগরে জলরাশিতে তরঙ্গ বা ঢেউ যেমন আপন মনে ওঠানামা করে তেমনি স্থিতির সাগরটি ঢেউময় হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় সেখানে কোন দ্বৈত রূপ ছিল না। খোদার কুদরতি প্রেমের ডোরে ছিল সে জগৎ বাঁধা। এই অবস্থায় এসেও ভাবনার উদয় হয় তাহলে বিশ্ব প্রভু এতে দ্বৈত রূপ (Posative ও Negative) কি করে সৃষ্টি করলেন? প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞানিক পন্থায় এর যদি কোন সত্যতা তুলে ধরা যায় তাহলে সৃষ্টির মূলে যে, একমাত্র খোদাই ছিলেন বিরাজমান তা প্রমাণ করা সহজ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ধ্বণাত্মক ও ঋণাত্মক সত্তার জন্ম তথ্য

যুগে যুগে মানবকুল সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আসছে। হাজারো ভাবনা আর চিন্তা থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শন নিজ নিজ পরিসরে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। এগুলোর মাঝে যেগুলো সত্য ও অকাট্য সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বস্তুবাদী কিছু অতি প্রগতিশীল অন্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সবাই বিশ্বাস করে, এ বিশ্ব-অনন্তে অনাদি ও অনন্তকাল থেকে পরম সত্তা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কিছু চূড়ান্ত পর্বে আসতে ছয়টি ধাপ পাড় হতে হয়েছে। একি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় সে ধাপগুলো অতিক্রম করেছে। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে আমরা ভাবতে পারি, পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রথমেই নূরের কথা, তারপর Posative জাত, এরপর Negative জাত, চতুর্থ পর্যায়ে আসে বস্তুর উপাদান ও বস্তু, পঞ্চম পর্যায়ে নিম্ন স্তরে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ, ৬ষ্ঠ পর্যায়ে পৃথিবীতে মানবজাতির পর্দাপণ। এই অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয় স্ত্রী ও পুরুষজাত কি করে সৃষ্টি হলো? প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীদের ধারণা, অনস্তিত্বশীল বিশ্বে কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ ভর-শক্তির জন্ম হলে, সেখানে ঘনায়ন ও রূপায়ণের মাধ্যমে প্রবল অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন এক প্রচণ্ড আদিম বিস্ফোরণ নামের এক কেলেঙ্গারী ঘটে যায়, এতে ঘূর্ণীভূত ভর-শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই এ বিশ্বের সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ধারা চলতে থাকে। কিন্তু তাদের এই ব্যাখ্যায় সৃষ্টির অনেক কিছুই উহ্য। তম্মধ্যে নারী-পুরুষের মতো জোড়া বন্ধন কিভাবে সৃষ্টি হলো, এর কোন ব্যাখ্যা নেই। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন ভর শক্তির উদয় হলো? কে করলেন? এর ব্যাখ্যা তারা দেননি। এদের ব্যাখ্যায় অনন্তে কি ছিল, তার কোন জবাব নেই। যে জিনিস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা চলে এবং যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় সেই জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। এ কথা জানা থাকার পরও এসব অসার তত্ত্ব আজ বিজ্ঞানের বইয়ে পড়ার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। এসব অসার তত্ত্ব পড়ে অনেকেই বড় বড় ডিগ্রী নিচ্ছেন। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবির খাতায় নাম লিখাচ্ছেন। কিন্তু যে জ্ঞান অন্ধ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যে জ্ঞান যখন মূল্যহীন প্রমাণ হবে। তখন ডিগ্রীর অবস্থাও খালি কলসির মতো অল্প বাতাসেই নড়তে

www.pathagar.com

শুরু করবে। মূলতঃ অনন্তের ব্যাখ্যা দেয়া মানবীয় চিন্তা শক্তির বহির্ভূত। কিন্তু মানব চরিত্র যেহেতু অনন্তের আগেও কিছু ছিল কি না তা জানতে চেষ্টা করে, সেজন্য অনন্তের মালিকের পক্ষ থেকে সকল বিষয়ের সমাধান এসেছে। যে কিতাবে সেই সমাধান দেয়া আছে তার নাম আল-কোরআন। যুগ যুগ ধরে নবী, রাসূল (আ) গণের মাধ্যমে অনেক ঐশী গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রেরীত হয়েছে। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মে, সুবিধাবাদীদের ফাঁদে পড়ে আজ অনেক ঐশী গ্রন্থই আর আগের মতো অকাট্য নেই। সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থে অনেক রদবদল, সংশোধন-সংযোজন করে নিয়েছে প্রায় সবক'টি ঐশী গ্রন্থই। একমাত্র বাকি আছে আল- কোরআন।

আল কোরআন বিশ্ব বিধাতার বাণী। যিনি সৃজন করেছেন এই বিশ্ব-জাহান তাঁর কথাই সেই মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বস্তু অবস্তু বলতে যা কিছু আছে এসবি তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর রয়েছে জোড়া। অর্থাৎ জীব জন্তু গাছ-পালার যেমন রয়েছে জোড়া তেমনি বস্তুর মূল আদান পরমাণুরও রয়েছে জোড়া। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা ইলেক্ট্রোনের গতিবিধি ঋণাত্বক, অপরদিকে প্রোটনের রূপ ও গতিবিধি ধ্বণাত্বক। এমন কি স্বয়ং আলোর কণায়ও রয়েছে দ্বৈত রূপ। বলতে গেলে মহাপ্রভুর ফেরেশতা জাতি ব্যতীত বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছু রয়েছে জোড়ায় জোড়ায়। এ বিশ্বের পরম সত্তা পুরুষও নন নারীও নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনি অনাদিকাল থেকে এই রাজ্যের খবর রাখেন। বৈজ্ঞানিকগণ Posatsive এবং Nagative কি করে উৎপত্তি হলো তা বলতে না পারলেও তিনি আল্লাহ এর সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। স্রষ্টার Posative এবং Negative সৃষ্টির কৌশলটি আমাদের কাছে বিচিত্র মনে হলেও, এ বিশ্বে কোন কিছুই কার্য-কারণ নীতির বাইরে সৃষ্টি হয়নি। তিনিই সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার মধ্যে তার সম্প্রসারণ ও বিকাশের প্রক্রিয়া জুড়ে দিয়ে সৃষ্টিকে তিনি (আল্লাহ) চূড়ান্ত শিকড়ে নিয়ে এসেছেন। সৃষ্টির বিকাশের এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণের বাইরের কিছু নয়। আমরা জগতের অনেক ঘটনাকে প্রকৃতির লীলাখেলা মনে করি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মনীতি কার্য কারণেরই ফল। সেজন্য কারণ ব্যতীত যেমন কার্য হয় না, তেমনি কর্তা ব্যতীত কারণ বলতে কিছু থাকে না। তাই কর্তার ইচ্ছাতে কারণ সৃষ্টি হয়। এখানে কারণ মূল প্রক্রিয়ার উপাদান। এই উপাদান কর্তাই সৃষ্টি করেন। কার্যের উপাদান 'কারণ' যখন

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় তখন কারণ থেকেই কার্য প্রকাশ হয়। সেজন্য আমরা 'কারণ'কেই অনেক সময় ঘটনার জন্য দায়ী করি। আসলে কারণের নিজস্ব কোন শক্তি নেই কোন ঘটনা জন্ম দেয়ার। মূলতঃ কারণের ভেতরে যে গুণ থাকে সেটি ঘটনার জন্ম দিলেও এই গুণ তার সৃষ্টি নয়। 'গুণ' হলো অজড় এক প্রকার অনুভূতি। সকল অবস্থায় 'গুণ' মনের সাথে সম্পর্কীত। আবার গুণের সাথে চরিত্র সম্পর্কীত। কিন্তু এতো সব বিষয় বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে মাপা খুব কঠিন। বিশ্ব প্রভু নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতাই সৃষ্টি অস্তিত্ব পাওয়ার মূল কারণ। প্রত্যেক কাজের আগে এর পরিকল্পনাই হলো মূল বিষয়। তা না হলে এর ভিত্তি শক্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। এ বিশ্বে যখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না তখন খোদা 'নূর' সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই আদি উপাদানের মধ্যেই এর সম্প্রসারণ ও বিকাশের কারণ খোদার পক্ষ থেকেই জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এই নূর কি? তা কোত্থেকে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'নূর' বলতে আমরা সে জিনিসকে বুঝি, সে সত্তার মাঝে নারী-পুরুষের মতো কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর ফেরেশ্‌তাকুল সরাসরি নূরের তৈরী। এঁদের মাঝে কোন নারী-পুরুষ নেই। নেই কোন প্রবৃত্তির ঝুড়ি। এরাঁ কোন সময় আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। এঁরা ভাবতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বলা যায় এঁদের মাঝে কোন Sensory ব্যবস্থা চালু নেই। এর ফলে এঁদের প্রবৃত্তি বা অভাবের তাড়না উদয় হয় না। সৃষ্টির বিকাশ ও তার খবরাখবর রাখা Sensory ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন মতেই সম্ভব নয়। মানব আত্মা যেমন তার দেহ রাজ্যের প্রতিটি রেণু কণার খবরাখবর রাখে Sensory ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। তেমনি আল্লাহর ইচ্ছায় যখন সৃষ্টিতে Sensory ব্যবস্থাপনা চালু হয় তখন এর মাঝে প্রবৃত্তি ও অভাবের তাড়না জাগে। যে সত্তার মাঝে এই গুণ পয়দা হয়, দর্শনের ভাষায় একে বলা হয় আদমীয়াত বা আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা। এই সত্তার মাঝে যে গুণ পয়দা হয় এই গুণ খোদার কিঞ্চিত গুণের বহির্প্রকাশ। খোদার যেমন ইচ্ছা শক্তি ও প্রেম প্রবৃত্তি এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে, সেই রূপে এই সত্তার মাঝেও সেই গুণ ছিল। এতে ছিল Sensory বোধ। সেজন্য এই সত্তা থেকে স্রষ্টার কাছে তাঁর কামনা, বাসনা, অভাবের তাড়না ইত্যাদি রিলে হতো। ফেরেশ্‌তাগণ যখন আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

আপত্তি চেয়েছিলো, তখন খোদা তাঁদের সামনে আদমের জ্ঞানের মহত্ত্ব প্রকাশ করে তাক লাগিয়ে দিলেন। সেই জ্ঞান ছিল প্রকাশের ব্যগ্রতা। যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না। এই Sensory বোধের অভাবে ফেরেশ্তাদের থেকে আল্লাহ্‌র কাছে কোন তাড়নাই রিলে হয়নি। তাই তাঁরা 'নাম' বলতে পারেনি। তারা ভাবতে পারেনি, পারেনি ইচ্ছার ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে। 'নাম' বলার বিষয়টি আদমী জ্ঞানের সাথে সম্পর্কীত। এই জ্ঞান এই সত্তার নিজের কোন কামালিয়াত নয়। স্রষ্টার ইচ্ছার ওপরই সে এই গুণ লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো এই আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তাকে কেন আমরা posative (নর) জাত হিসেবে চিহ্নিত করি? আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো নর ও নারী কি এবং এ সত্তাকে এ নামে কেন ডাকা হয়। নর (posative) হলো প্রত্যক্ষ সত্তা। ইংরেজীতে Posative কথাটির অর্থ হলো বাস্তব বা প্রত্যক্ষ। এখানে স্রষ্টার নির্ব্যূঢ় ইচ্ছার প্রেক্ষিতে যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ (Posative) সত্তা। আর নারী হলো এমনি এক সত্তা যা posative বা নর এর অভাববোধ বা Nagative তাড়না থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজীতে Negative এর বাংলা অভাববোধও করা হয়। খোদার ইচ্ছায় যখন ফেরেশ্তার পরিবেশে আদমী বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা আত্মপ্রকাশ লাভ করলো তখন তাঁর সমমনা আর কোন জাত সেখানে ছিল না। এ অবস্থায় সে একাকিত্ব বোধ করছিল। তাঁর ব্যগ্রতা ছিল সমমনা কাউকে পাওয়ার। এই ব্যগ্রতা তার অভাববোধ। এই অভাববোধের তাড়নাকে বলা যায় Nagative তাড়না। পূর্বেই বলেছি আদমী জাত থেকে অভাববোধের তাড়না খোদার কাছে রিলে হয়। এতে করে যখন তাঁর থেকে খোদার কাছে অভাববোধের তাড়না রিলে হলো, তখন পরমকৌশলী আল্লাহ্ তাঁর অভাব পূরণ করার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। খোদার এই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই আদমী সত্তার অস্তিত্ব হতেই তার সমমনা বিপরীত জাত প্রকাশ লাভ করে। সৃষ্টির বিকাশের এই প্রক্রিয়া খুব সুন্দর। নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিউট্রন যখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তখন মূল পরমাণুটি দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় তারপর পর্যায়ক্রমে উত্তরোত্তর তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে চলে। নর থেকে নারী সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিও তেমনি উদাহরণযোগ্য এক মহাকৌশল। যখন আদি নর (আদম (আ)) থেকে অভাবাধের তাড়না, সৃষ্টির Sensory ব্যবস্থাপনায় স্রষ্টার নিকট পৌছে দেওয়া হয়ে ছিল তখন স্রষ্টা তাঁর সমমনা জাত সৃষ্টি করার প্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

ঐ নরের দিকে নির্দেশ (impulse) প্রেরণ করেছিলেন। এতে ঐ নরের আত্মিক সত্তা থেকেই তার অভাব পূরণ হয়। কাজেই নরের অভাববোধে বা Nagative তাড়নার প্রেক্ষিতে যে সত্তা পয়দা হলো তার নামই নারী বা Nagative জাত। হাদীসে কুদসীতে আছে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু সরাসরি স্বীয় হস্তে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যাবতীয় বস্তুকে বলেছেন, 'হও'। তখন তা হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ যখন আদম ও ফিরদাউসকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাকে (ফিরদাউসকে) বলেছেন ; আমার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কোন কৃপণ আমার সান্নিধ্যে বাস করতে পারবে না। আর কোন নির্লজ্জ ব্যক্তি তোমার সুগন্ধ পাবে না।" দায়লামী এই হাদীসটি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

কোরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন - "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একমাত্র মানব হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সে মানব হতে তার জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জনের মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নরনারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।" - (৪ : ১)

মহা প্রভুর সৃষ্টি কৌশল আমাদের মতো নয়। নর-নারীর মিলন প্রক্রিয়ায় যেভাবে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়; আল্লাহ সেভাবে আদমকে জন্ম দেননি। কারণ আল্লাহর কোন সঙ্গিনী কিংবা সমজাতীয় দ্বিতীয় কিছুই নেই।

সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এ বিশ্ব বিধাতা কিভাবে আদমকে পয়দা করলেন? এবং তার মাঝেই বা কি করে ইচ্ছা শক্তির উদয় হলো? এ জগতের প্রতিটি রেণু-দানার মধ্যে প্রেমের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রেমের বাহ্যিক প্রকাশ এক ধরণের নয়। পিতার প্রতি পুত্রের প্রেম, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রেম, গোত্রে-গোত্রে প্রেম, মানুষে-মানুষে প্রেম, বর্ণে বর্ণে প্রেম, এসবকে সৃষ্টি প্রেম বলা চলে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর প্রেম একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নরের প্রতি নারীর প্রেম, কিংবা নারীর প্রতি নরের প্রেম কাছে পাওয়ার এক প্রবল ব্যগ্রতা। এই ব্যগ্রতার মাঝে থাকে নিজের পরিচয় ও সানিধ্য প্রকাশের প্রবল আগ্রহ। সৃষ্টির মাঝে এই প্রেমবোধ কি করে আসলো? স্রষ্টার যদি সৃষ্টির প্রতি প্রেমবোধ না থাকতো তাহলে এই গুণ সৃষ্টির মাঝে আসার প্রশ্নই দেখা দিত না। একটি লোহ খন্ডকেও চুম্বক

www.pathagar.com

প্রেমের ডোরে আকর্ষণ করে। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় লোহ খন্ডের মাঝেও চুম্বকের গুণ পয়দা হয়। তখন ঐ লোহ্ খন্ডটিও কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত হয়। সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার বিচ্ছুরীত সত্তার প্রতি ছিল খোদার প্রেমবোধ। এই প্রেমবোধ হয়তো এক রকম ছিল না। আল্লাহর ছিল সৃষ্টি প্রেম ও জাতি প্রেম। আল্লাহর জাতি প্রেমের সান্নিধ্যে সৃষ্টিতে প্রবৃত্তির গুণ পয়দা হয়। এই প্রেমখেলা নর-নারীর প্রেম খেলার সাথে সম্পর্কীত নয়। মহা প্রভুর কুদরতি দৃষ্টির স্পর্শেই সৃষ্টিতে এই গুণ পয়দা হয়। সৃষ্টি যখন এই গুণে গুণান্বিত হয় তখন সে ভাবতে শেখে, প্রকাশ করতে জানে। তার আক্ল ফেরেশতাদেরকে চম্‌কিত করে। এই সত্তা প্রত্যক্ষভাবে খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতার কুদরতি প্রেমের স্পর্শেই সৃষ্টি হয়। তাই একে posative (প্রত্যক্ষ বা নর) জাত বলা হয়। সৃষ্টির ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া শুধু জড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুতঃ অজড় সত্তা রূহানী জগতে অন্তর্গত। জড় চিরন্তন নয় কিন্তু অজড় সত্তা বা আত্মা চিরন্তন। আত্মা আর দেহের নিবিড় সম্পর্ক থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, আত্মা যে আবরণ (জড়দেহ) দিয়ে নিজকে প্রকাশ করে, এটি সেই সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর প্রতিটি রেণু দানার মধ্যে রয়েছে জোড়া সম্পর্ক। মানব জাতির জন্য পৃথিবীর বাস্তব ক্ষেত্রটি অভাব পূরণ করার ক্ষেত্র। এখানে তাকে অভাব মেটানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যের জন্য দেহ নৌবহরটি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

তাই এ জগতটি ও মানব জাতির জন্য বাস্তব ক্ষেত্র বা Posative ভূমি। এখানে যা কিছু সে উপার্জন করবে সেগুলোই Negative ভূমিতে ভোগ করবে। সে আলোকেই বলা যায় সুদূর অতীতের জগতটি এ জগতের দ্বৈত প্রকৃতির জগৎ। তাকে Negative dimenssion- এর জগৎও বলা চলে। কারণ সৃষ্টির অভাববোধ বা Nagative তাড়না থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয় সেটি Negative বস্তু। আদম (আ) -এর বাম পাঁজরের হাড় দিয়ে বিবি হাওয়াকে পয়দা করা হয়েছে। বিবি হাওয়া Negative প্রকৃতির সাথে সম্পর্কীত। আদমের অভাববোধ থেকেই তার জন্ম। পরম কৌশলী আল্লাহ্ তা'আলার এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া আমাদের কাছে রহস্যময় মনে হলেও বাস্তব জীবনে তা প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়। আমাদের দেহের কার্য-পদ্ধতি থেকেই Nagative এর উৎপত্তির ধারণা দেয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

আমাদের আত্মা নামের পরম বস্তু দেহের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এই আত্মা কোন সময় দেহের কোন অংশেই প্রবেশ করে না। দেহ রাজ্যের এক গুপ্ত সিংহাসনে বসে আত্মা ফরমান বা নির্দেশ জারী করে। দেহ আত্মার নির্দেশ ব্যতীত কিছু করার অধিকার রাখে না। আত্মার কার্য ব্যবস্থা দেহের স্নায়ু-কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মনের নির্দেশ বা Impulse প্রথমে মস্তিষ্ক বহন করে। তারপর মস্তিষ্ক মনের নির্দেশের সূত্র ধরে দেহকে সে মোতাবেক কাজ করার বার্তা প্রেরণ করে। এ নির্দেশ ঢেউ এর ন্যায় কার্য সম্পাদনকারী অংগে পৌছে। কখনো আবার দেহের অগ্রভাগ থেকে মনের কাছে অংগের অভাববোধের তাড়না প্রেরীত হয়। এই সংকেত বহন করে Sensory nerve। অংগের তাড়না পেয়ে মন তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এতে করে কার্য সম্পাদনকারী অংগ হতেই তার ব্যবস্থা নেয়ার উপকরণ বের হয়। এ উপকরণ হলো বিশেষ ধরণের জৈবরস। তম্মধ্যে এসিটাইল কোলিন ও নরইপিনিপাইরিন উল্লেখযোগ্য। এসব জৈব রস মূলতঃ ঐ সব অংগের স্নায়ুকোষ থেকেই নিঃসৃত হয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে তা নিঃসৃত হয় মনের নির্দেশেই। অংগের অভাববোধের তাড়না না হলে মন কখনো নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। পক্ষান্তরে মন থেকে কখনো জৈব রসের উপাদান আসে না। মন শুধু তড়িৎ বার্তা প্রেরণ করে। কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ তৈরী হয় তাড়না প্রেরণকারী অংগের স্নায়ুকোষের অগ্রভাগ থেকেই। আমাদের দেহের Sensory ব্যবস্থার কার্য প্রণালীর সাথে বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টির প্রক্রিয়ার নীতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ জগতের আদি উপাদান নূর। এ নূরের সৃষ্টি ফেরশতার পরিবেশে, স্রষ্টা আদম (আ) কে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির এই ধাপে জগৎ লাভ করে Sensory শক্তি। তাই আদমী জ্ঞান ছিল ফেরেশতাদের উর্ধ্বে। খোদা এই জাত প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করেছেন বলে একে Posative বা ধ্বণাত্মক হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এই সত্তার মাঝে ছিল অভাববোধের তাড়না, ছিল সমমনা সাথী পাওয়ার ব্যগ্রতা। ছিল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভাব। ছিল নিঃসঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকুল আগ্রহ। প্রেমালাপ করার ছিল ব্যগ্রতা। কিন্তু তাঁর অভাব বোধের উৎকণ্ঠা সে গোপন রাখতে পারেনি। বিশ্ব প্রভুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মহাস্নায়ু ব্যবস্থার Sensory সংকেত সে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। এতে করে আল্লাহ থেকে ফরমান জারী হয় তাঁর দিকে। তখন আদম ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে দেখতে পেল হাওয়াকে। আদমের অভাবপূরণ হলো। এই নতুন জাতি খোদার নির্দেশেই আদমের অস্তিত্ব থেকেই পয়দা হয়।

www.pathagar.com

খোদার পক্ষ থেকে আসলো শুধু নির্দেশনামা। কিন্তু আদমের অভাববোধ থেকে জন্ম হওয়ায় তাকে দেখা হয় Negative বা ঋণাত্মক জাতি হিসেবে। আমাদের দেহের স্বায়ু কোষের অগ্রভাগ থেকে মনের নির্দেশে যেভাবে তার অভাব পূরণ হয় তদ্রুপ এই ঋণাত্মক জাতি পয়দা হলো। ঐশী বিধান জীবন সমস্যার সকল দিক তুলে ধরেছে। আমাদেরও জানার আগ্রহ হয় কি করে ধ্বণাত্মক ও ঋণাত্মক এর উৎপত্তি হলো। তাই ঐশী বিধানে রয়েছে সে সমস্যার সমাধান। কিন্তু বিজ্ঞান এর কোন সঠিক তত্ত্বই তুলে ধরতে পারেনি। এই না পারার মূল কারণ হলো বিজ্ঞানী বলে আমরা যাদেরকে চিন্তা করি তারা আসলেই বাস করে দ্বৈবের রাজ্যে। তারা বিশ্বের মৌল উপাদান ও এর গতিকে চিরন্তন মনে করে। তাই এর আগের বিষয় নিয়ে তারা চিন্তাই করে না।

আমরা বাস্তব জীবনে স্রষ্টার নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ করতে পারি না। দুনিয়ার জীবনে অভাব আমাদেরকে বার বার তাড়িত করে। কর্মের মাধ্যমে আমরা অভাব পূরণ করি। এতে বিকীর্ণ হয় দৈহিক কর্মশক্তি। এই জগৎ বস্তু জগৎ। বস্তু থেকেই আমরা শক্তি নেই। দুনিয়ার অভাববোধের তাড়নার থেকে যদি কিছু সৃষ্টি হয় তবে তা হবে প্রতিবস্তুর সত্তা। আর এ জগৎ যদি Posative dimenssion এর জগৎ হয়, তবে আমরা একদিন চলে যাব Negative dimenssion এর জগতে। মনের তাড়নায় খোদার নির্দেশে যেহেতু Negative এর উৎপত্তি হয় নিজ অস্তিত্ব থেকে। সুতরাং আমাদের কর্মফলের সত্তা এই মাটির দেহ থেকেই যে পয়দা হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই বিশাল জগৎ আল্লাহ একাই পরিচালনা করছেন। সষ্টির অন্তর মূল পর্যন্ত এক অদৃশ্য স্নায়ু জাল বিস্তার করা আছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টির খবরাখবর প্রেরণ হয়। এই স্নায়ু জালে অনেক দপ্তর আছে। প্রত্যেক দপ্তরের একজন দপ্তর প্রধান আছেন। তাঁরাই খোদার নির্দেশে সৃষ্টিকে দেখাশুনা করেন। এদেঁর প্রত্যেকের কার্যনীতি মোতাবেক নামকরণ করা হয়েছে খোদার পক্ষ থেকে। এদের কার্য নীতির সাথে আমাদের মস্তিষ্কের কার্য নীতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। আমরা যদি সে আলোকে নিজের মধ্যেই জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করি, তবে কোথাও আল্লাহর রাজ্য ছাড়া আর কিছুই পাব না। তখন আর আমাদের প্রত্যক্ষ (Posative) ও পরোক্ষ (Negative) সৃষ্টি উৎসমূল ও জানার বাকি থাকবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জু

একটি গতিশীল গাড়ীকে চালক ডানে বামে ঘূরায়, তার হাতের স্টৈয়ারিং ডান-বামে ঘূরিয়ে। আবার থামানোর প্রয়োজন হলে চেপে ধরতে হয় ব্রেক। মানুষের তৈরী যন্ত্রযানের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এরূপ হতে পারে আবার কম্পোটেরাজ গাড়ীকে চালক ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় দূর থেকে বোতাম বা সুইছ টিপেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে যন্ত্রে সুইছ টিপলে সেটি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই যন্ত্র থেকে শুধু বের হয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ বাতাস ভর্তি ফাঁকা শূন্য দিয়েই উড়ে যায়। পক্ষান্তরে ঐ গাড়ীতে থাকে এই তরঙ্গ বহন করার মতো একটি যন্ত্র, এই যন্ত্র তরঙ্গ বার্তার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। গাড়ীর গতিবেগ কমানো বাড়ানোসহ যাত্রা বিরতি ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ দূরের চালকের হাতের ঐ যন্ত্রের তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিও এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

আমাদের দেহ যন্ত্রটিকে আত্মা এক ধরণের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করে। দেহের প্রধান দপ্তর বা সচিবালয় হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দেহ সত্তার বিশেষ উপাদান। এই সত্তা মনের অংশ নয়। মূলতঃ দেহ আত্মার প্রকাশের আবরণ। সেই হিসেবে মস্তিষ্ক ও দেহের অংশ এবং তার প্রকাশ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ভান্ডার। মনের যাবতীয় কাজকর্মের সংকেত মস্তিষ্ক বহন করে, অঙ্গের মাধ্যমে সে মোতাবেক কাজ করায়। মস্তিষ্কের পুরা অংশটি একি ধরনের কাজ করে না। এতে কাজ করার বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। যে অংশ চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম Optic centre. আবার যে অংশ শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম Heat regulating centre। এমনি করে এতে অনেক দপ্তর রয়েছে। তাছাড়া যে শাখাটি মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে মেরুদন্ডের ভেতর দিয়ে গিয়েছে তার নাম Spinal cord। পরিশেষে এখান থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের হয়ে একেবারে দেহের অগ্রভাগে এসে শেষ হয়েছে। এ শাখা-প্রশাখা গুলোরও নাম আছে। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন মঞ্জিল (Junction) আবার একটি স্টৈশন বা মঞ্জিলের সাথে অন্য মঞ্জিলের যে সংযোগকারী পথ রয়েছে তার নাম Ganglion। আমাদের দেহের পুরা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি মনের আওতাধীন। এর সম্পূর্ণ কোষকলায় মনের সংকেত বহন করার মতো শক্তি সংরক্ষিত আছে। তাই মন দেহকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে

www.pathagar.com

পারে। মন দেহের গতিবেগ কমানো বাড়ানোসহ নিথর অথবা কর্মচঞ্চল করে তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমে। মনের পক্ষে বোতাম টিপে তরঙ্গ বের করতে হয় না। তার এরাদার চৈতন্য প্রবাহই মস্তিষ্ক হতে তরঙ্গ বের করে। পক্ষান্তরে এই তরঙ্গ বার্তা পেয়েও সে সরাসরি কাজে লেগে যায় না। মূলতঃ এই তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমে কোষকলায় যে জৈব রস নিঃসৃত হয়, এতে অঙ্গ কর্ম প্রেরণা লাভ করে। দেহের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াতে এরি মাঝে যেমন রয়েছে বিভিন্ন দপ্তর তেমনি বিশ্ব-জগতের মহা মস্তিষ্ক বা আ'রশেরও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। আমাদের মস্তিষ্কের কার্য প্রণালী অনুযায়ী এতে যেমন রয়েছে বিভিন্ন নামের মন্ত্রণালয় তেমনি আলাহ তা'আলার আ'রশ এর কার্যনীতি অনুযায়ী তারও আছে বিভিন্ন নামের মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে লওহ, কলম, আসমান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর যমীন আমাদের দেহের মতো এক নিথর ভূমি। এর মধ্যে গতির বার্তা প্রেরীত হয়। আমাদের আত্মার সিংহাসন হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আত্মা কখনো এর গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে না। এই সিংহাসন কখনো আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে হৃৎপিণ্ডের চার দেয়ালের মধ্যেই সে গুপ্ত আসন নিয়ে বিরাজ করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেই স্থান খুব সংকীর্ণ মনে হলেও সে এখান থেকে গোটা দেহ রাজ্যের খবর রাখতে পারে। এতে তার কোন ক্লান্তি বা তন্দ্রাও আসে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সিংহাসন হলো কুর্সী। কিন্তু আল্লাহ কখনো এর গায়ে হেলান দিয়ে থাকেন না এবং কুর্সী কখনো আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে না। এই গুপ্ত আসন থেকে আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে আ'রশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের মস্তিষ্কের শাখা-প্রশাখা যেমন দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত তেমনি আ'রশের শাখা-প্রশাখা যমীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শাখা-প্রশাখা আ'রশের রজ্জু হতে ফেরেশ্তার বহর মাত্র। মূল আ'রশ যেমন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত তেমনি মূল বহরের শাখা প্রশাখা ও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। কয়েকটি শাখা-প্রশাখার সংযোগ স্থল হলো আসমানের মঞ্জিল। আর আসমান হলো একটি মঞ্জিল হতে আর একটি মঞ্জিলের মধ্যবর্তী সংযোগ পথ। এই পুরা সিস্টেমটি অদৃশ্য বলে আমরা এর কোন কিছুই দেখি না।

জ্যোতির্বিদগণ ভাবছেন, মহাআকর্ষক নামের এক বিশাল ছায়া পথের সমারোহ তার শক্তিশালী মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা বিশ্ব-জাহানের ছায়া পথগুলোকে তার দিকে টানছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন- "তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। নিজ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না— একমাত্র তাঁর পছন্দনীয় রাসূল ছাড়া। অতপর তিনি তাঁর চারদিকে তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত করেন- যাতে করে এ প্রতীতি জন্মে যে, বাণী বাহকগণ আপন প্রভুর বাণীসমূহকে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর পরিব্যপ্ত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গণনা করে থাকেন।

- (আল-জ্বিন - ২৬-২৮)

জ্যোতি বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত পর মহাকাশে মহা জাগতিক রজ্জু সৃষ্টি হয় এবং তার বরাবর বিপুলায়তন গ্যালাক্সি গুচ্ছ গড়ে ওঠে। এসব অদৃশ্য রজ্জু আদি ব্রহ্মান্ডকে আবেষ্টন করেছিল এবং এগুলোই বস্তুর পুঞ্জিভূত হবার নাড়িমূল হিসেবে কাজ করে। টাফট বিশ্ব বিদ্যালয়ের জ্যোতি পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ভিলেনকিন এসব রজ্জুকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা করে বলেন, এগুলোর কোন আদি বা অন্ত নেই, অসীমে গিয়ে ঠেকছে।

এই অসীম রাজ্যটি যে মহাস্নায়বিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাড়ীমূল হলো আল্লাহ তা'আলার আ'রশ। মহামহিয়ানের এই দরবার (আ'রশ) থেকে তাঁর হুকুমে বিভিন্ন শ্রেণীর মহা শক্তিশালী দূত বা ফেরেশ্তাগণ বিশ্বের কার্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কাজের ভিন্নতায় তাঁদের নাম ও কর্মশক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁরা আলোক তরঙ্গের চেয়েও উর্ধ্বগতিতে নিম্ন জগতে নেমে আসেন। আবার সৃষ্টির নিম্ন জগৎ থেকেও অদৃশ্য সৈনিকগণ খবর রিলে করেন মূল দরবারে। জড় প্রকৃতির বাইরের সেই অদৃশ্য জগতের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বলে আমাদের কাছে তা রহস্যময় মনে হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন আমরা কোন অদ্ভুত কান্ড ঘটতে দেখি তখন একে বলি অপ্রাকৃতিক ঘটনা। আসলেই অপ্রাকৃতিক কান্ড অদৃশ্য জগতের মাধ্যমেই ঘটে। এই অদৃশ্য মাধ্যমটি মহা নিয়ন্ত্রকের স্নায়ু রজ্জু। সুতরাং অপ্রাকৃতিক ঘটনাই প্রমাণ করে যে, এ জগৎ এক অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কার্যতঃ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সকল ঘটনাই এই স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

হয়। এর মাধ্যমে পৃথিবীর নেক বান্দা এবং পাপীর কথাও রিলে হয়। পাপী যখন পাপ মোচনের আশায় অনুশোচনা করে (তওবা করে) তখন এক বিশেষ ব্যবস্থায় তার পাপ সত্তা রূপান্তরিত হয়ে যায়। মনের অনুশোচনার মাধ্যমে পাপ মোচন হলেও এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানের যুক্তি নির্ভর এবং তা বাস্তবে প্রমাণ দেওয়াও সম্ভম। আমরা যদি পাপ মোচনের অপ্রাকৃতিক কৌশলটি সম্পর্কে জানতে পারি, তবে সকলের পক্ষে তওবার গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তারপর বিশ্বাস ও কার্য এক হলে মূল সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ কিভাবে মাফ হয়

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর করুণা ও মহত্ব বুঝা খুব কঠিন। তিনি পরম কৌশলী পরম বিজ্ঞানী। তাঁর কোন কাজ অবৈজ্ঞানিক নয়। সৃষ্টির আদি, অন্তে যা কিছু ছিল বা আছে বা সৃষ্টি হবে, এ সব তিনি দৈব প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেননি। সকল কিছুতে রয়েছে বিজ্ঞানের সত্যসিদ্ধ প্রক্রিয়া। আমরা যা বুঝি এতেও যেমন রয়েছে বিজ্ঞান সম্মত উপাদান তেমনি যে জিনিস বুঝি না তাতেও রয়েছে বিজ্ঞানের কৌশল। মূলতঃ না বুঝার বিষয়টি আমাদের জ্ঞানের স্থূলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করতে পার না। এটা সসীমের দেয়াল। এই সীমা পার হওয়া খুব কঠিন। আমরা জানি পাপী ব্যক্তি তওবা করলে তার গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলার গোনাহ মাফের প্রক্রিয়া কি আমাদের বিচার ব্যবস্থার মতো?

রহিম করিমের গালে চড় মারল। বিচারের সময় রহিম করিমের হাত ধরে বলল, আমি ভুল করেছি- আমাকে ভাই মাফ করে দাও। করিম সন্তুষ্ট হয়ে বলল, যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম। গোনাহগার বান্দা গোনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইল, আল্লাহ কি করিমের মতো বলবে, যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম? এরূপ ভাবে মাফ হলে গোনাহর সত্তা আছে বলে প্রমাণ হওয়া কঠিন। কারণ গোনাহ সত্তাধিকারী হলে এভাবে মাফ করার মধ্যে বিজ্ঞানের কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে না। কিন্তু

www.pathagar.com

আল্লাহর কোন কাজ বিজ্ঞানের বাইরের কিছু নয়। তাছাড়া গোনাহ তো সত্তাহীন কিছু নয়। যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে; একে বিলুপ্ত বা নষ্ট করতে হলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করা প্রয়োজন ।

আল্লাহ বলেন, - "প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।" - (আল-কোরআন-১৩২)

"সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতপর যার আমলের ওজন ভারী হবে, সে-ই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।" - (আল-আ'রাফ ৮-৯)

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি মানুষের নেক ও বদ আমল সত্তাধারী হবে। এরূপ না হলে ওজন করার কোন প্রশ্নই আসতো না। তাই আমাদের বিচার ব্যবস্থার মতো মুখের উক্তির মাধ্যমে গোনাহ মাফের প্রশ্নই আসে না। তওবাকারী সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে - "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও অত্যাধিক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন। " - (আল-কোরআন)

মহানবী (সা) বলেছেন-"পাপ হতে তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় বটে; বাস্তবিক পক্ষে পাপানুষ্ঠানের পর অনুতপ্ত হলে পাপ সমূলেই বিনষ্ট হয়।" - (আল-হাদীস)

গোনাহ করে তওবা করার পর তা বিনষ্ট বা মাফ হয়ে যায় এ কথা সত্য। কিন্তু কি ভাবে তা বিনষ্ট হয় এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। পাপ মাফ হওয়ার শর্ত হলো তওবা করা। কিন্তু তওবা করলে কিভাবে তা বিনষ্ট হয় তাঁ আমরা জানতে পারি না। মুরব্বীদের মুখে শুনেছি, পাপী যখন তওবা করে কাঁদতে থাকে তখন আল্লাহর আরশের কাছে একটি খুঁটি নড়তে থাকে, তখন আল্লাহ ঐ খুঁটিকে জিজ্ঞেস করেন, হে খুঁটি তুমি থামছ না কেন? তখন খুঁটি থেকে গায়েবী আওয়াজ হয়, তোমার এক গোনাহগার বান্দা পাপ করে মাফের আশায় কাঁদছে , তাকে মাফ না করা পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? খুঁটি জবাব দিবে, না আল্লাহ তারা না দেখে তোমার আযাবের ভয়েই কাঁদছে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি থাম, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এ ব্যাখ্যাটি আমার দৃষ্টিতে একটি রূপক বর্ণনা। আমাদের মতো সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য রূপক বর্ণনাই যথেষ্ট। কিন্তু এই

www.pathagar.com

সমাজে অনেক জড়বাদী আছেন যারা একে আজগুবি মনে করেন। তাদের কথা হলো এসব যুক্তি অন্ধকে হাতি দেখানো ছাড়া কিছু নয়। এর পেছনে বিজ্ঞানের কোন তাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই। আমি পূর্বেই বলেছি অপ্রাকৃতিক বিষয় বুঝা খুব কঠিন। তবে অনেক সময় কঠিন জিনিস যুক্তি দিয়ে সত্যের কাছাকছি এনে সহজভাবে মূল্যায়ণ করা যায়। প্রত্যেক রূপক বর্ণনার সারতত্ত্ব থেকে সূক্ষ্মাতীত যে সত্য খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানেই থাকে বিজ্ঞানের সারাংশ। তাই এই রূপক বর্ণনাটির সারাংশ বের করলে গোনাহ্ বিনষ্ট হওয়ার মতো এক বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যাবে। যা কিনা জড়বাদীদের হুশ এনে দিতে পারে । আমরা কোন ব্যক্তির অন্যায়ের অস্তিত্ব খুজে পাই না বলে সাধারণতঃ মৌখিক ভাবে বলি তোমাকে মাফ করা হলো। কিন্তু যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে তাকে আমাদের মতো মাফ করে দিলে চলবে না। কারণ অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে হলে প্রযুক্তির মাধ্যমেই করতে হবে। যেমন একটি গুণ নষ্ট বা বিনাশ কিংবা পরিবর্তন করতে হলে যেমন আর একটি গুণাধার সত্তার সাথে সংমিশ্রণ করতে হয় তেমনি গোনাহ্কে বিনষ্ট করতে হলে কিংবা উত্তম মানে পরিবর্তন করতে হলে আর একটি উত্তম সত্তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। অন্যথায় অস্তিত্ব বিনাশ বা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বর্জ্য পদার্থের দুর্গন্ধ বায়ুর পরতে পরতে মিলে এক সময় তার অস্তিত্ব আর থাকে না। বায়ুর পরতেই তা লুকিয়ে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। আতর, পারফিউম সুগন্ধি জাতীয় জিনিস। এ জিনিস ব্যবহার করলে দুর্গন্ধ লাঘব হয়। পাপ সত্তা সংক্রামক জাতীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাকরী উপাদান। এর মান নিকৃষ্ট দুষ্কৃতিপূর্ণ। এই সত্তাকে বিনষ্ট করতে নিশ্চয়ই কোন গুণাধার সত্তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। তাছাড়া এর মান পরিবর্তন হওয়ার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকতে পারে না। সাদা কাপড়ে ময়লা লেগেছে, মুখে যদি বলি ময়লা দূর হয়ে যা, এতে যেমন কোন ফল হবে না, তেমনি গোনাহের উপাদান নষ্ট করতে গিয়ে, এ রূপ বাক্য ব্যবহার করলে হবে না। এবং সাবান দিয়ে যেভাবে ময়লা দূর করতে হয়, তেমনি গোনাহ্কে বিনষ্ট করতে হলে সাবানের মতো কোন উপাদান দিয়ে একে পরিষ্কার করতে হবে। আসলে গোনাহ্ যে উপাদানের মাধ্যমে বিনষ্ট হয় সে জিনিস খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। একারণে আল্লাহ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাপের অস্তিত্বকে বিনাশ করেন, সেই প্রক্রিয়াতে তওবা করার মাধ্যমে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে এক ধরণের নীতিগত সম্পর্ক স্থাপিত

www.pathagar.com

হয়। এই সম্পর্ক থেকে খোদার পক্ষ থেকে যে হুকুম বা নির্দেশ প্রেরীত হয় এর মাধ্যমেই গোনাহের সত্তার মান বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ বা হুকুম আমাদের বাক্যালাপের মতো নয়। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আ'রশের স্নায়ু মূল থেকে তরঙ্গের যে বহর নেমে আসে, এর নামেই নির্দেশ । পক্ষান্তরে এই তরঙ্গের ঝাঁকুনির মাধ্যমেই গোনাহের সত্তার মান বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বলা হয় আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির গোনাহ মাফ করেন তখন তিনি গোনাহের সত্তাগুলোকে নেকে বা পুণ্যে পরিণত করে দেন। অথবা গোনাহের সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা স্থুল চোখে গোনাহ কিংবা নেক নামের কোন সত্তার অস্তিত্ব দেখি না। আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ, পুণ্যের যে অস্তিত্বগত সত্তা তুলে ধরেছি, তাতে সকল যুক্তি ও ব্যাখ্যার সারাংশ হলো, পাপ ও পুণ্যের অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির ঢেউ বা তরঙ্গ। এর মাঝে পাপ সত্তা কৃষ্ণকায়া ও ধূম্র প্রকৃতির । আর নেক সত্তা আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রকৃতির। এই উভয় ধরণের সত্তা আমাদের আহার্য্য শক্তির বিকীর্ণ কর্মশক্তি। দৈনন্দিন কাজ কর্মের মাধ্যমেই তা নিঃসৃত হয়। পাপ নামের কৃষ্ণকায়া তরঙ্গ দানাগুলো এই অনন্ত অসীম জগতেই জড় হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা যখন ব্যক্তির গোনাহ মাফ করে দেন তখন এর অস্তিত্ব একেবারে শূন্য হয়ে যায় না। মূলতঃ শক্তির বিনাশ না থাকায় এই সত্তা পুনঃ বন্টন হয়ে যায়। আমাদের অঙ্গের অগ্রভাগের আবেগ আর আবেদন নিবেদনের প্রেক্ষিতে মস্তিষ্কের কোন অংশ আলোড়িত হয়ে যেমন সেখান থেকে তার অভাব পূর্ণ করার জন্য তরঙ্গ বার্তা প্রেরীত হয়। তেমনি তওবা কারীর আবেদন নিবেদন এর প্রেক্ষিতে অসীম বিশ্বের মহাস্নায়ু মন্ডলীর মূল দপ্তর আরশ নামের সচিবালয় থেকে যে তরঙ্গ বার্তা আসে এর মাধ্যমেই পাপ সত্তা পুনঃ বন্টন হয়ে যায়। হাদীসে কুদসীতে আছে-

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন- "(হে ফেরেশতাগণ!) যখন আমার বান্দা কোন গুনাহ করতে মনস্থ করে কিন্তু তখনও তা করেনি, তারপর যদি সে তা করে বসে তবে তার জন্য একটি গুনাহ লেখ। তারপর যদি সে তা হতে তওবা করে, তবে তা মুছে দাও। আর যখন আমার বান্দা কোন সওয়াব কাজ করতে মনস্থ করে কিন্তু এখনও তা করেনি তবে তার

www.pathagar.com

জন্য একটি সওয়াব লেখ। অতপর যদি সে তা সম্পাদন করে তবে তার জন্য দশ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখ।" ইবনু হাববান আবু হুরায়রা (রা) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের রহস্য বুঝা খুব কঠিন। তওবাকারীর পাপ মুছে যায়, বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে হয়, এ ধারণা আমাদের নেই। এই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মনীতিতে শৃঙ্খলাবোধ বিজ্ঞানের নীতিমালার যুগান্তকারী নমুনা। বীজ মাটির স্পর্শ না পেলে গাছ হয় না, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে স্তনে দুধ আসে না, কি বিচিত্র নিয়ম। তাই পাপ সত্তা, অন্য প্রকৃতির (গুণাধার) সত্তার সাথে মিলন না ঘটলে বিনাশ হওয়া চিন্তা করা যায় না। সেজন্য পাপ নামের তরঙ্গ দানার সাথে আর এক প্রকার উত্তম তরঙ্গ দানার মিলন ঘটা আবশ্যক। তওবাকারীর আবেদন নিবেদনের প্রেক্ষিতে এই উত্তম তরঙ্গ দানা প্রকৃতির বিধানেই আ'রশ থেকে খোদার নির্দেশে প্রেরীত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, দুই ধরণের তরঙ্গের মিলনের ফলে কি উত্তম সত্তা সৃষ্টি হতে পারে কিংবা তা বিনাশ হতে পারে? এই প্রক্রিয়াটি কি বিজ্ঞান সম্মত? এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার খেয়ালে শব্দ বা তরঙ্গের ব্যভিচার ক্রিয়ার কার্যাবলীর কথা স্মরণ হয়। দু'টি শব্দের বা তরঙ্গের উপরিপাতন ঘটে যে ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাকে বলে ব্যভিচার ক্রিয়া। এই ব্যভিচার ক্রিয়ার ফলে তরঙ্গ দু'টির অবস্থা দু'রকম হতে পারে। এখানে হয়তো তরঙ্গ ধ্বংসকারী ব্যভিচার ক্রিয়া ঘটতে পারে (Destractive Interferance) অথবা গঠনমূলক সত্তা সৃষ্টির ব্যভিচার ক্রিয়া (Constractive Interferance)ও ঘটতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় মূল শক্তি বিনাশ হয় না। বরং শক্তি পুনঃবন্টন হয় অথবা তার মান বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ যখন নিকৃষ্ট বা দুষ্কৃতি গুণ সম্পন্ন সত্তার সাথে উৎকৃষ্ট গুণাধারের সংমিশ্রণ বা ঘনায়ন ঘটে তখন মন্দ সত্তাটি রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তরঙ্গের ব্যভিচার ক্রিয়া পরীক্ষিত সত্য ঘটনা। এই সূত্র থেকে এ কথা বলা যায় যে, পাপ সত্তা মোচন বা বিনষ্ট হওয়া কিংবা পুণ্যে পরিণত হওয়া অবাস্তব কিছু নয়। খোদা তা'আলার আ'রশকে যদি আমরা সৃষ্টি জগতের মস্তিষ্ক মনে করি তাহলে মূল ঘটনাটি বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। পাপ দানা তরঙ্গ প্রকৃতির। পক্ষান্তরে ব্যক্তির আবেদন-নিবেদন প্রেরীত হয় তরঙ্গের ন্যায় বা ঢেউ আকারে। তারপর আ'রশ থেকে খোদার নির্দেশে যে শক্তি বা নির্দেশ

www.pathagar.com

প্রেরীত হয় তার প্রকৃতিও ঢেউ বা তরঙ্গের মতো। এর সাথে ব্যক্তির পাপ তরঙ্গের ঘটে উপরিপাতন। ফলে তা হয়তো পুনঃ বন্টন হয়ে যায় অথবা উত্তম মান সম্পন্ন হয়। এ জগতের সকল কিছু আ'রশের ছাদের নীচে অবস্থিত। এ অনন্ত অসীম বিশ্ব-জগতের কোন তলা নেই। কিনারহীন এই বিশাল জগতের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ একটি পরমাণুর মতোও নয়। সে তুলনায় আমাদের অস্তিত্ব কত যে নগণ্য তা কল্পনা করার মতো নয়। এরপরও দেখা যায় আমাদের মস্তিষ্ক মনের আজ্ঞাধীন হয়ে দেহের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দেয়। অঙ্গের চাহিদা মতো তার কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে মনের কোন গোলাভান্ডার নেই। সে শুধু তরঙ্গবার্তা বা নির্দেশ প্রেরণ করার জন্য মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে। কিন্তু অভাব পূরণ হয় নিজ দৈহিক সত্তার মাধ্যমে। বিজ্ঞানীগণ শূন্যমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। তারা বলেন, এ বিশ্বের শূন্যমন্ডল তরঙ্গ ধারণ করতে পারে। এটি তার বিশেষ গুণ। মূলতঃ আমাদের দৃষ্টিতে যা শূন্য মন্ডল, সেই পরিসরটিতে অপ্রাকৃতিক যে অতি সূক্ষ্ম আবরণ আছে, এটিই বিশ্ব-জগতের স্নায়ুতন্ত্রের স্তর। বিজ্ঞানের দৃষ্টি এখনও সেই স্তরে পৌঁছতে পারেনি বলে তাকে শূন্য মন্ডল মনে করে। আমরা যদি ড্রি-বগলীর মতো চিন্তা করি যে, তরঙ্গই বস্তু, তাহলে আমাদের আত্মাও দেহের বিকীর্ণ সত্তার সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক যে নিহিত রয়েছে এ কথা অস্বীকার করতে পারব না। তরঙ্গে তরঙ্গে যদি ব্যভিচার ক্রিয়া ঘটতে পারে তবে পাপ তরঙ্গের সাথে তওবাকারীর আবেদন নিবেদন এর প্রেক্ষিতে আ'রশ থেকে তরঙ্গ বার্তা প্রেরীত হলে এ দু'ইয়ের মিলনেও ব্যভিচার ক্রিয়া সংঘঠিত হবে। এ রূপ এক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পাপীর পাপ মোচন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ মোচনের যে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছি, তা কোন হাদীস গ্রন্থে পাইনি। এমন কি আল- কোরআনের কোথাও হুবহু এভাবে বর্ণনা করা হয়নি। মূলতঃ পুরা বিষয়টি আমার গবেষণার বিষয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। আসলে যিনি পাপ মাফ করেন তিনিই তা ভাল জানেন। আমি এতটুকু চিন্তা করেছি এ কারণে যে, যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আলেম সমাজের কথা, ইসলামী গবেষক বা চিন্তাবিদগণের

www.pathagar.com

কথা, এবং কোরআনের বাণী কিছু অজ্ঞ লোক না বুঝে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর নয় বলে মন্তব্য করে উপহাসের দৃষ্টিতে বর্ণনাকারীগণকে 'মৌলবাদী' বলে তিরস্কার করেন, সে কারণে আমি আমার গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে এর বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, আমার যুক্তি আপেক্ষিক। কিন্তু আজ যারা বিজ্ঞান নিয়ে হৈ- চৈ করেন তাদের জানা উচিত যে, আল- কোরআন বিজ্ঞানের বৈরী কোন গ্রন্থ নয়। বিশ্বাসের সাথে এর প্রতিটি বাণী গবেষণা করলে দেখা যাবে কোরআন এক নির্ভুল মহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

এতে রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক পূর্ণতার বিধান। যা ইহকাল ও পরকালের মুক্তির দিশারী।

বিশ্ব-জগতের অসীম রহস্যের অন্তরালে অপ্রাকৃতিক নিয়মে কত কিছু যে ঘটছে তারা ইয়ত্তা নেই। আমাদের স্থূল দৃষ্টি সব কিছু দেখতে পারলে হয়তো বা পথ চলা হতো অসম্ভব। কখনো থমকে দাঁড়াতে হতো মাঝ রাস্তায় অথবা আহার-নিদ্রা সবি বিসর্জন দিতে হতো। অপ্রাকৃতিক নিয়মের বিস্ময়কর কাজ দেখি না বলেই আমরা ভয়হীনভাবে বেঁচে থাকতে পারছি। সেজন্য কখনো যদি কোন অপ্রাকৃতিক দৃশ্য আমরা দেখি তখন একে বিচার বুদ্ধি দিয়ে মাপতে পারি না। তখন এক কথায় বলি সেটি অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বের কার্য-কারণ নিয়মের কাছে অলৌকিক বলতে কিছু নেই। যা কিছু ঘটে সকল কিছুই বিজ্ঞান সম্মত। রাসূল (সা)-এর মি'রাজ যাত্রা এবং তাঁর বাহনের ব্যাপারটিও আমরা অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক কাজ মনে করি। কিন্তু এই ঘটনাটি যদি বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলেও সেখানে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পাপ মাফের ব্যাপারটি যদি লৌকিকতার মধ্যে আনা যায়, তবে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রাও লৌকিকতার বিষয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বোরাক ও রফরফ

মহা বিশ্বের পৃথিবী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রহ থেকে মানবীয় গুণ সম্পন্ন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) রজব মাসের ২৭ তারিখ সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য দেখার জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমায় তাঁর আমন্ত্রণে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করেন। সেদিন পৃথিবীর ধুলিময় জগতের বাসিন্দাকে নিয়ে যাওয়া হয় বোরাক ও রফরফ এর মাধ্যমে। পৃথিবী থেকে আল্লাহর আ'রশ পর্যন্ত যাত্রাকেই বলা হয় মি'রাজ। রাসূলের (সা) এই মি'রাজ যাত্রা কি সশরীরে হয়েছিল, না স্বপ্ন যোগে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন, রাসূলের মি'রাজ হয়েছিল সশরীরে। আবার অনেকেই মনে করেন, এই মি'রাজ ছিল আত্মিক। অন্যদিকে কেউ মনে করেন তা ছিল স্বাপ্নিক। কিন্তু রাসূল (সা) বলেছেন, তিনি সশরীরেই গিয়েছেন এবং সবকিছু স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন। কিন্তু এরপরও যারা বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন, আমি বলব তাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টি প্রসন্ন নয়। আমার যুক্তিতে তিনি সশরীরেই গিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে আ'রশ মহলে সশরীরে ঘুরে আসা বিচিত্র কিছু নয়। যারা বির্তক সৃষ্টি করেন, তারা মূলতঃ বোরাক ও রফ্রফ্কে স্থূল বাহন মনে করেন অথবা সময় সম্পর্কে তাদের ধারণা নগণ্য। সে যাই হোক আমরা যদি বোরাক ও রফ্রফ্কে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কৌশল মনে করি তবে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রা যে সশরীরে হয়েছিল তা বুঝে আসবে। তাই বোরাক ও রফ্রফে্র যান্ত্রিক কৌশল ও রাসূলের (সা) মানব প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানব দেহ জড়ধর্মী। এর আয়তন আছে, ওজন আছে। একে ভাগ করা যায়, ধরা যায়। তাই মানুষ শূন্যে হাঁটতে পারে না। আকাশের দিকে সাঁতার কেটে উড়তে পারে না। কিন্তু রাসূল (সা) কি জড়ধর্মী মানুষ ছিলেন? যেহেতু বলা হয় রাসূলের (সা) দেহের কোন ছায়া ছিল না; তিনি ছিলেন অতি মানব। তাই তিনি জড়রূপী মানুষ হলেও তিনি আমাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। আমি রাসূলের দেহ জড়, অজড় এ বির্তকে না জড়িয়ে বলতে পারি, তিনি জড়ধর্মী হলেই বা কি? তাতেও সশরীরে মি'রাজ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। নবীজি (সা) যদি স্বাপ্নিক অথবা আধ্যাত্মিকভাবে মি'রাজে গিয়ে থাকতেন এবং সেভাবে বর্ণনা করলেও তো যারা বিশ্বাসী তারা সকল ঘটনাবলী সেভাবেই বিশ্বাস করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি তা না বলে যা সত্য তাই বলেছেন। মি'রাজের যেসব ঘটনাবলী

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের কাছে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, তাহলো রাসূল (সা) কি করে সশরীরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাঁধা অতিক্রম করে এতো অল্প সময়ে সুদূর পথ অতিক্রম করে আবার সেই রাতেই নিজ বাসভবনে ফিরে এসেছেন?

মি'রাজ যাত্রার দূরত্ব যতই হোক না কেন কিন্তু সময়টা এতো অল্প ছিল যে, রাসূল (সা) ফিরে এসে দেখলেন তখনো দরজার শিকল নড়ছে এবং অযুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। এই রহস্য থেকে সত্যের সন্ধান করতে না পেরে সন্দেহবাদীরা আরও সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা রাসূলের (সা) কথাকে উপহাসের দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সামনে অনেক প্রমাণাদি তুলে ধরলেও তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। এ যুগেও যারা মি'রাজ যাত্রার বাহনকে স্থূল প্রকৃতির কিছু মনে করেন এবং সময় সম্পর্কে নিতান্তই ধারণা কম, তারা অবাক হওয়ারই কথা। তবে সে যুগে যাঁরা একবাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা আল্লাহর নবীকে সত্যবাদী জেনে নবীজির প্রতি আল্লাহর বিশেষ মো'জেজা হিসেবে ধরে নিয়েই বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের ঈমান আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সা) প্রতি এতোই প্রসন্ন ছিল যে, তাঁরা একে বাস্তবধর্মী কিনা তা যাচাই বাচাই করারও চিন্তা করেননি। কিন্তু বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারের ফলে আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় মি'রাজ যাত্রা আসলেই বাস্তবধর্মী। তাই এ যুগের সন্দেহবাদীদের সকল বিতর্কের মূল শিকড় অবসান করার জন্য মি'রাজ-এর ঘটনাবলীর বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি তুলে ধরেছি।

সশরীরে মি'রাজের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঃ

পৃথিবী ও আ'রশে মহল বহু দূরের পথ। কত দূরে হবে তা মানবীয় চিন্তার বাইরে। এতো দূর কি রাসূল (সা) এই দেহ নিয়েই গিয়েছিলেন, না অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় গিয়েছিলেন, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি রাসূল (সা) আমাদের মতো জড়দেহী মানুষ হলেও তিনি ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারী। জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন কঠিন, তরল ও বায়বীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সংগায় জড় পদার্থ এই তিন অবস্থা ছাড়াও শুধু ঢেউ বা তরঙ্গের আকারেও থাকতে পারে। পদার্থের কঠিন আবরণের ভেতরে থাকে বিদ্যুত ও জ্যোতি। শত কোটি বিদ্যুতের পুটলা একত্রিত হয়েই সৃষ্টি হয়েছে জড় দেহ। তাই স্থূল দেহকে জড়দেহ বলা চলে। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম দেহকে জ্যোতির দেহও বলা চলে। মূলতঃ একই জিনিস ভিন্ন প্রকৃতিতে প্রকাশ হলেও শরীরি অস্তিত্ব

www.pathagar.com

পাল্টে যায় না। সুতরাং যে প্রকৃতির দেহ নিয়েই রাসূল (সা) মি'রাজ ভ্রমণ করুক না কেন, সকল অবস্থায় বলা চলে রাসূল (সা) সশরীরেই মি'রাজে গিয়ে ছিলেন। বোরাক নামক যন্ত্র রাসূলের (সা) মানব প্রকৃতির দেহকে 'জ্যোতির দেহ' বানিয়েই সেই সুদূর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ছিলো।

মহানবী প্রথমে যে দ্রুতযানে চড়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার নাম 'বোরাক'। এ দ্রুতযান জিব্রাইল (আ) নিয়ে এসেছিলেন। নবীজি এতে চড়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছে তা পরিবর্তন করেছিলেন। বোরাক থেকে নেমে যে দ্রুতযানে চড়েছিলেন তার নাম রফ্রফ্। এখন প্রশ্ন হলো এই দ্রুতযানগুলো কি? এগুলো কিসের তৈরী? এর গতিসীমা কত? কারণ এগুলোর যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রার শারীরিক সম্পর্ক জড়িত। এ দ্রুতযানগুলো কিসের তৈরী এর জবাবে বলা যায়, জিব্রাইল (আ) যেহেতু এগুলো আঁনা নেয়ার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন সুতরাং তিনি যেহেতু নুরের তৈরী অতএব সেগুলোও নূরের তৈরী। এগুলোর গতির তুলনা করতে গিয়ে বলা যায় এর গতি যদি আলোর গতির সমানও হয় তবেও দেখা দেবে বড় ধরণের সমস্যা। কারণ এ গতিতে গেলেও শুধু সাইরিয়াস গ্রহে যেতে সময় লাগবে ৯ (নয়) আলোক বর্ষ। কিন্তু পৃথিবী ও সাইরিয়াস গ্রহের দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে তো আর আল্লাহর আ'রশ মহল অবস্থিত নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বোরাক ও রফ্রফ্ এর গতি আলোর গতিরও উর্ধ্বে ছিল। আমরা আলোর গতি জানি কিন্তু নূরের গতি জানি না। পক্ষান্তরে আলোক আর নূর এক জিনিস নয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় নূরের গতি যা সেই দ্রুতযানগুলোর গতিও তাই ছিল। এর চেয়ে বেশি বলা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এর গতি নির্ণয় করা মানবীয় জ্ঞানের উর্ধ্বেই বলা চলে। এই দ্রুতযানগুলোর কাজের প্রক্রিয়ার সাথে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রার সার্বিক ঘটনাবলী জড়িত। তাই সেগুলোর কাজের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বোরাক ও রফ্রফের যান্ত্রিক কৌশল কেমন হতে পারে ঃ

বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত যানবাহনের মধ্যে রকেটই সবচেয়ে দ্রুতগামী। এর গতি যত বেশীই হউক আলোর গতির উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া আলোর গতিতে মি'রাজ যাত্রা হলেও সময় এতো অল্প হওয়ার কথা নয়। এ আলোকেই ধরে নেয়া হয়েছে মি'রাজ যাত্রা হয়েছে নূরের গতিতে। মানুষ অক্সিজেন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। তাই দেখা গেছে চাঁদের মতো

www.pathagar.com

জায়গায় যেতে নিতে হয়েছে অক্সিজেন। কিন্তু বেশীক্ষণ অক্সিজেন ব্যতীত না থাকতে পারলেও অল্প কিছু সময় দম বন্ধ করেও থাকা যায়। এই ক্ষণিক সময় অক্সিজেন না হলেও চলে। আমরা যানবাহনে সশরীরে চড়ি আবার সশরীরেই ফিরে আসি। স্থুল যানবাহনের মধ্যে যেগুলো মাটি দিয়ে চলে সেখানে যেমন সময় ও পথ চলার ঝক্কি ঝামেলা থাকে তেমনি আকাশ যানেও একি অবস্থা। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও অল্প সময়ে ভ্রমণের জন্য এখনো যা আবিষ্কার হয়নি তাহলো এমনি এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি পুরা মানবদেহকে তরঙ্গায়িত করে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি যন্ত্র দ্বারা ঐ তরঙ্গকে পূর্ণ মানুষে রূপ দিয়ে দেয়া যায়। এ ব্যবস্থায় টিভির বিদর্শন বিন্দু কিংবা বেতার তরঙ্গের মতো শূন্য দিয়ে উড়ে গিয়ে গ্রাহক যন্ত্রের কাছে আগের মতো রূপ নিয়ে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যাবে। মি'রাজ যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অল্প সময়ের ভ্রমণ। তাই দুনিয়ার প্রচলিত যানবাহনের কৌশলের মধ্যে একে চিন্তা করা ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে আমরা একই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসে দূরের মানুষের ছবিসহ তার মুখের কথা শুনে থাকি। সাত সাগর তের নদী পাড় হয়ে নিমিষেই তা ধরা পড়ে গ্রাহক যন্ত্রে। বিশ্বকাপ খেলা চলছে সিউলে আমরা বাংলাদেশে বসে গ্যালারির দর্শকদের মতোই দেখছি। সময়ের সামান্যতম ব্যবধান নেই। এ ব্যবস্থায় প্রেরক যন্ত্রের পর্দায় দৃশ্যের বা ব্যক্তির ছবি ফটো টিউবে নিয়ে তা বিভিন্ন আলোকের জোড়ালো বিদ্যুৎ ঝলককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা বিন্দুতে বিভক্ত করে প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় স্কানিং বা বিদর্শন। অন্যদিকে শব্দকেও রেডিও ওয়েভে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে গ্রাহক যন্ত্র সরাসরি বাতাস থেকে এই বিদর্শন বিন্দুও রেডিও ওয়েভকে জড় করে বাস্তবের মতো প্রকাশ করে।

এই ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি তার নিজস্ব অবস্থানে ঠিক অবিকলই থাকে কিন্তু পাঠানো হয় শুধু তার ছবির বিদর্শন বিন্দু। এভাবে যাত্রা হলেও পুরাপুরি সশীরের যাত্রা বা ভ্রমণ হয়েছিল তা বলা যায় না। কিন্তু ছবিকে যেভাবে স্ক্যানিং করা হয় সেভাবে যদি পুরা মানুষটির দেহ স্ক্যানিং করা সম্ভব হয়, তবে ব্যক্তি তার পূর্বের জায়গায় অবিকল থাকার প্রশ্নই আসে না। তার পুরা জড় অস্তিত্বই স্ক্যানিং হয়ে যাবে। আবার গ্রাহক যন্ত্রের কৌশল তাকে নিয়ে আসবে বাস্তবের মতো পূর্বের অবস্থায়। তবেই হবে সশরীরে ভ্রমণ। এরূপভাবে চলতে পারলে অল্প সময়েও নিরাপদে ভ্রমণ সম্ভব। দুনিয়ার মানুষের পক্ষে এখনো এরূপ প্রযুক্তি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। হয়তো বা একদিন তা সম্ভব হতেও পারে। মানুষ না পারলেও খোদার পক্ষে এরূপ

www.pathagar.com

প্রযুক্তিতে রাসূল (সা) কে মি'রাজ ভ্রমণে নেয়া অসম্ভব কিছু নয়। এখন যদি ধরে নেই বোরাক ও রফ্‌রফ্‌ এমনি দু'টি কৌশলের নাম। যার একটির মাধ্যমে রাসূলের (সা) পবিত্র দেহ মোবারকে নূরের বিন্দুর ন্যায় স্ক্যানিং করা হলো। অপরদিকে দ্বিতীয়টির মাধ্যমে ঐ নূরের স্ক্যানিং বিন্দুগুলো জড় করে বাস্তবের মতো রূপ দেয়া হলো। তাহলে সশরীরে ভ্রমণ অসম্ভব কোথায়? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কি একে টেনে রাখা সম্ভব? এর গতি যদি আলোর গতির চেয়ে উর্ধ্ব গতির হয় (কোটি কোটি গুণ বেশী) তবে চোখের পলকে পূর্বের গন্তব্যে ফিরে আসা অসম্ভব হবে কি? অন্যদিকে চোখের পলকের মতো সময়ের জন্য অক্সিজেন নেয়ারই বা প্রয়োজন কি? আমার দর্শন মি'রাজ যাত্রার ব্যবস্থাপনা এমনি একটি উন্নতর কৌশল। যে আল্লাহ এই বিশ্ব-জগতসহ মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এরূপ কৌশল তৈরী করা অসম্ভব কিছু নয়? আল্লাহর পক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করতে কারিগরেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি শুধু 'কুন ফাইয়াকুন' বললেই সব কিছু হয়ে যায়। আজকের বিজ্ঞান পদার্থ বলতে ঢেউকেও স্বীকার করে নিয়েছে। মানবদেহের স্থূল আকার ঢেউ-এর ন্যায় ধারণ করলেও সেটি ব্যক্তির অস্তিত্বরই সত্তা। তাই রাসূল (সা) যেভাবেই যাক না কেন সেই ভ্রমণ তাঁর সশরীরেই হয়েছিল। মি'রাজ ভ্রমণের ক্ষণিক সময় তিনি পূর্বের অবস্থায়, আগের স্থানে অবিকল ছিলেন না। সেই সময় এতো নগণ্য ছিল যা খন্ড করে দেখানো সম্ভব নয়। মূলতঃ গতির পাল্লা সময়কে করেছে ছোট। তাই তিনি ফিরে এসে দেখলেন দরজার শিকল নড়ছে, অযুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) যখন দিনের বেলা জনসমক্ষে মি'রাজ যাত্রার ঘটনাবলী এবং উল্লেখিত দৃশ্যাবলীর কথা প্রকাশ করলেন, তখন অনেক অজ্ঞ লোক তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আসলে এদের গতির সাথে সময়ের যে বন্ধুত্ব আছে জানা ছিল না। গতি বাড়লে সময় যে খাটো হয় এ ধরণের বুদ্ধি বিবেচনাও তাদের ছিল না। মহানবীর (সা) এই ভ্রমণ এতো দ্রুত গতিতে হয়, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। সেই যাত্রার গতি সময়কে এতোই খাটো করেছিল যার মধ্য থেকে স্থান-কালের বাইরে নতুন করে ঘটনাকে আলাদা প্রমাণ করা ছিল দুর্বোধ্য। বাস্তবে দেখা গেল সময় যখন ঘটনার ওপর চড়ে বসেছে, তখন সময়ের ক্ষীণতায় রাসূলের (সা) দেখে আসা ঘটনাবলীর সাথে যোগ বিয়োগ করে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া কষ্টই ছিল। তাই এ যুগেও অনেকে বলে থাকেন, রাসূল (সা) উর্ধ্ব রাজ্যে যাওয়ার সময় যাবতীয় জিনিস স্থির ছিল। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলে আবার সকল কিছু চলতে থাকে। কিন্তু শূন্যের মধ্যে

www.pathagar.com

পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বাস্তবে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার মতো কোন যুক্তি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক। কিন্তু সব কিছু গতিশীল অবস্থায় থাকার পরও তিনি ফিরে এসে যেসব দৃশ্য চলতে দেখে ছিলেন, তা যে দেখা অবাস্তব কিছু নয় সে কথা বিজ্ঞান সম্মত উপায়েই প্রমাণ করা যায়।

গতি থেকে ঘটনার উৎপত্তি হয় এ কথা যেমন সত্য তেমনি দু'টি ঘটনার গতি যদি দু'রকম হয়, তাহলে দুই স্থানের দু'জন ব্যক্তির নিকট সময় জ্ঞান এক রকম মনে হবে না। যেমন পরস্পর দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি যদি দ্রুত গতিতে ঘটে আর অন্যটি যদি ধীর গতিতে ঘটে তবে যে ব্যক্তি দ্রুত গতির ঘটনার সাথে জড়িত থাকবে, সে এই গতির পাল্লা শেষ করে ধীর গতির কাছে এসে মনে করবে ঐ ঘটনাটি যেন স্থির হয়ে আছে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়, ধরুন দু'জন লোক এক সাথে দাঁড়িয়ে আছে, তম্মধ্যে একজন ক্ষণিকের জন্য দু'চোখ বুঝে কি যেন ভাবছে, এরি মাঝে অন্য লোকটি তার সামনে থেকে আলোর বেগে উধাও হয়ে হাজার হাজার মাইল ঘুরে ফিরে দেখে এক সেকেন্ডের মধ্যেই পুনরায় সেখানে এসে হাজির হয়ে বললো, কি ব্যাপার! তুমি কত যুগ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছ? আমি ইতিমধ্যে কত দেশ ঘুরে ফিরে দেখে আসলাম, আর তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছ! তখন দাঁড়ানো লোকটির যদি স্থান কাল ও গতির সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে বলবে ওতো গাজাখোরির কথা। এ কি করে সম্ভব! তুমি না আমার সাথেই চলছ, তুমি এতো দূর গেলে কি করে? হ্যাঁ সেদিন নবীজির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, গতি কি করে সময়কে খাটো করে দেয়। ধরুন কোন এক লোক বাজার থেকে মাছ কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, মাছটি তাড়াতাড়ি কুটে রান্না কর। আমি গোসল করে আসছি। এই বলে সে ঘর থেকে বের হল। রাস্তায় এসে দেখল একটি দ্রুতযান দাঁড়ানো। তাকে নিতে এসেছে। সে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সেটিতে চড়ে বসল। অমনি দ্রুতযানটি আলোর গতিতে (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে) তাকে দুনিয়া ঘুরিয়ে নিয়ে আসল। সে এর মধ্যে বসেই বাইরের অনেক দৃশ্যাবলী লক্ষ্য করল। চলার পথে তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কাছ দিয়ে গেল। তার শশুর বাড়ী হয়ত এক হাজার মাইল দূরে। সেদিন ঐ বেলায় তার শাশুরীকে পুকুরে গোসল করতে দেখে গেল। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিও হচ্ছিল। এরূপ অনেক দৃশ্যই সে দেখল। তারপর দ্রুতযান থেকে নেমে খাওয়ার কথা মনে হল। এবার সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, আমাকে

www.pathagar.com

জলদি খাবার দাও। আমার প্রচন্ড ক্ষিদে লেগেছে। এ কথা শুনে স্ত্রী জবাব দিল কি বলছ! এখনো তো মাছ কাটার জন্য দাটিই হাতে নিতে পারলাম না। তোমাকে খাবার দেব কি দিয়ে? তখন স্বামী যদি জানায় আরে বোকা আমি সারা দুনিয়া ঘুরে আসলাম, আর তুমি মাছ কাটতে পারনি? এ কথা শুনে স্ত্রী যদি দূরদর্শী না হয় কিংবা স্বামীর প্রতি আস্থা না থাকে তাহলে তার অবাক হওয়ারই কথা। মনে করুন স্ত্রী বিশ্বাস করল না তখন স্বামী বলল, তোমার মার কাছে জেনে দেখ তিনি এ সময় পুকুরে গোসল করছিলো, তখন প্রচন্ড বৃষ্টিও হচ্ছিল। এবার স্ত্রী খবর নেয়ার চেষ্টা করল। জেনে দেখল, আসলেই ঘটনা সত্য। তবু সে বিশ্বাস করতে পারল না। কারণ স্বামীর প্রতি তার আস্থা ছিল না। কিন্তু লোকটির ছোট ভাই জ্ঞানী লোক এবং ভাইয়ের প্রতি আস্থাশীল, সে এ কথা শুনে বিশ্বাস করে নিল। রাসূল (সা) এর ক্ষেত্রেও সেদিন এমনি ঘটনা ঘটে ছিল। যাঁরা বিচক্ষণ ও রাসূলের (সা) প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় রাসূলের (সাঃ) সকল কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সন্দেহবাদীরা সন্দেহের বেড়াজালেই ছিল নিমজ্জিত। তাই অসংখ্য যুক্তি প্রমাণের পরও তারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু গতি সময়কে খাটো করে ফেলায় রাসূল (সা) ফিরে এসে পূর্বের দৃর্শ্যাবলীকে চলতে দেখেছিলেন। গতি থেকে সময়ের উৎপত্তি হলেও সময় এক আজব জিনিস। গতি ও স্থান কাল পরস্পর নির্ভরশীল হলেও সকলের বেলায় সময় জ্ঞান এক রকম থাকে না। কারণ রাতের ক্ষণিক সময় কারও যদি দুঃখে কাটে, তবে তার কাছে সময় লম্বা মনে হবে। অপরদিকে পুরা রাতটাই যদি অন্যজনের সুখে কাটে তবে তার কাছে সময় নগণ্য মনে হবে। তাই কৃত্রিম ঘড়িতে যে সময় ধরা পড়ে তা প্রকৃত সময় নয়। সেজন্য রাসূল (সা) এর কাছে মি'রাজের যে সময় জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছিল সেটিই প্রকৃত সময়। চলমান অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য অবলোকন করলে অনেক ক্ষেত্রে সময়কেও লম্বা মনে হয়। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য ক্ষণিকেই অবলোকন করা যায়। সেজন্য বিশ্বে সময়ের কোন স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ নেই। সময় যেন সর্বত্রই লোকাল ও ব্যক্তিনির্ভর। মূলতঃ সময়ের সাথে বস্তু বা বিশ্বের জন্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সময় ব্যতীত বস্তুর কল্পনা করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি বস্তু ব্যতীত সময়ের অস্তিত্ব পাওয়াও কঠিন। তাই বার বার আমাদেরকে সময়ের ধাঁধায় পড়তে হয়। সময়ের এই গোলক ধাঁ-ধাঁ কাটতে হলে যার দ্বারা প্রতিক্রিয়া হয় সে পথ পরিহার করতে হবে। পরম স্থিতিশীল অবস্থায় শূন্য থেকে দোলক পিন্ডটি ঘুরতে শুরু করলেই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। তাই

www.pathagar.com

যখন কিছুই ছিল না তখন সময় বলতে কোন কিছু জন্ম হয়নি। এই কঠিন অনস্তিত্বের মধ্যে কি করে এই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি হলো তা এখন জানার বিষয়। যিনি শূন্য পরিবেশে অস্তিত্বশীল জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার পক্ষে ক্ষণিকেই মি'রাজ ভ্রমণ করানো অসমম্ভব কিছু নয়।

বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নাস্তিক আস্তিক ও কোরআনের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা

একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে দোলনায় দুলতে থাকে তখন থেকে শিশুটি অবাক দৃষ্টিতে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে যেন পৃথিবীর সব কিছু রহস্যময় মনে হয়। আমরা বুঝি না শিশু এমনিভাবে তাকি ি দেখে। কিন্তু জ্ঞানী লোকের অন্তর দুরবীনে অবশ্য শিশুর তাকিয়ে থাকার রহস্য ধরা পড়ে। তারা মনে করেন শিশুটির ভাবনার বিষয়বস্তু হল, সে কিছু দিন পূর্বে ছিল না। তারপর কে তাকে জন্ম দিল, অন্ধকার রক্ষণশীল এক কুঠুরীতে? সেখান থেকে কেন আবার চলে আসতে হলো? কেনই বা কোলাহলময় এই পরিবেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো? মায়ের উদরে জরায়ু নামক রাজ্যের পরিসীমা খুবই স্বল্প। সেখানে হাঁটা চলার কোন ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের জন্য ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। সে জগৎ সব দিক থেকে ছিল ঝামেলা মুক্ত। এই পৃথিবী তার তুলনায় অনেক বড়, অনেক রহস্যময়, অনেক ঝামেলাপূর্ণ। জন্মের পর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যা শিশু অবস্থায় ভাবা হয়েছে, এর কোনটিও আমাদের স্মৃতিতে নেই। কিন্তু ৫/৬ বছর হলেই শিশু যখন পিতা মাতাকে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন ধরে নেয়া যায়, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুটিও ভাবনাহীন ছিল না। সেই থেকে দিনে দিনে পৃথিবীর রহস্যময় সকল কিছু তাকে ভাবিয়ে তুলে। বয়স বৃদ্ধির পালা বদলে পৃথিবীর প্রতিটি রহস্য তাকে করে প্রশ্নের সম্মুখীন। একদিন পুব আকাশে উদীয়মান লাল টকটকে সূর্যটা দেখে ভাবে, এর উদয়ের রহস্যের কথা। রাতের বেলায় চাঁদকে দেখেও তার ভাবনার অন্ত থাকে না? তাই দুলনার বয়স থেকেই তার মাথায় ভাবনার দানাগুলো জমতে থাকে। এ ভাবেই শিশুরা হাজার রকম প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে

www.pathagar.com

বড় হয়। এই ফাঁকে সে হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, আস্তে আস্তে পাঠাশালার পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝ পথে এসে সবচেয়ে জটিল যে প্রশ্ন তাদের মাথায় কিলবিল করে তাহলো কিভাবে এই বিশ্বের সূচনা হলো? কে সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দর জগৎ? কেন সৃষ্টি করেছেন? তাকে যে দেখা যায় না, এর কারণই বা কি? ইত্যাদি... ইত্যাদি। অথচ পাঠশালার শিক্ষাক্রমে তারা এসব প্রশ্নের যে উত্তর পায়, এতে তাদেরকে আরও সমস্যায় পড়তে হয়। দেখা যায়, মানব রচিত পুস্তকে এ সম্পর্কে যে তত্ত্ব দেয়া আছে; এর সাথে ধর্মীয় পুস্তকের তত্ত্বের অনেকাংশেই থাকে দ্বন্দ্ব। কিন্তু যারা ধর্মীয় শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে তারা ভুল তত্ত্বের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়ে। ফলে আজীবন ভুলের মধ্যেই ডুবে থাকে। তারা কোন সময়ই আলোর সন্ধান পায় না। পরিশেষে ভুলের অমানিশায় তাদের মৃত্যু হয়। কারণ মানব রচিত গ্রন্থাবলীর তত্ত্বে থাকে অসংখ্য যুক্তিহীন কথা। যার কোন উৎস পাওয়া যায় না। এগুলো মনের খেয়াল থেকেই রচিত হয়। যেমন তারা মনে করে এই বিশ্ব-জগতে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন এর কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ দৈবক্রমে ভর-শক্তির জন্ম হয়। এই ভর-শক্তিতে প্রবল অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি হলে, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সেই ভরশক্তি বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই বিশ্বের সূচনা ও সম্প্রসারণ শুরু হয়।

এ যেন কেমন কথা?

যেখানে কোন কিছুই ছিল না সেখানে ভর-শক্তি সৃষ্টি হলো কি করে? আকাশে মেঘ নেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এরূপ উদ্ভট আবির্ভাবের মাঝে যেমন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না তেমনি কোথাও কিছু নেই এর মধ্য থেকে ভর-শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল, এরূপ উদ্ভট আবির্ভাবের কথাও যেন আজব মনে হয়। এসব দৈব চিন্তার মধ্যে কোন কিছুরই আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। যে তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ হয় না তার মধ্যে যে থাকে ভুল তথ্য এটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই প্রকৃতির তাড়নায়ই এর আসল সত্য খুঁজে বের করা অনেকের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা জানি পারমাণবিক শক্তির বিস্ফোরণে সৃষ্টির ধ্বংসতা আসে। অপরদিকে সমযোজী ও তড়িৎযোজী বন্ধনে নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়। পক্ষান্তরে পরিকল্পনাহীন কোন কিছু সঠিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। ৩ বছরের শিশুকে আদর করে হাতে কলম দিয়ে লিখতে বললে, সে যে কি লিখবে তা যেমন বুঝা কঠিন তেমনি বিস্ফোরণ ধর্মী তত্ত্ব দিয়ে এই

www.pathagar.com

সুন্দর বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার ধারণা বিশ্বাসে আনাও কঠিন মনে হয়। দশতলা ভবন তৈরী করার আগে যেমন ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এর নক্সা তৈরী করে নিতে হয়। তেমনি এই বিশ্ব সৃষ্টির আগেই এর পরিকল্পনা করতে হয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করতে হবে। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের সুশৃঙ্খল পরিভ্রমণ সেই সত্যেরই স্বাক্ষী। পৃথিবীতে পাঁচটি গাড়ী এক সাথে চললেই দেখা দেয় সমস্যা কিন্তু কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র আপন আপন গতিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে অসীম শূন্যে যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা দেখে অবাক হওয়ারই কথা। এরা ভুল করেও কোন দিন অন্যের স্থানে আসে না। কি সুন্দর এই বিশ্ব-জগতের সুষম গতির খেলা। এর কোথাও নেই কোন উচ্ছৃঙ্খলতা। নেই কোন আক্রোশ কারও প্রতি। কে এই গতির ধারক? কে এই গতির স্রষ্টা? যেখানে কিছুই ছিল না সেখান থেকে কার কথায় এই সুশৃঙ্খল গতির ঝরণা সৃষ্টি হলো? একটি মারবেলকে সরল পথে গতি দিয়ে ছেড়ে দিলে, সেটি সরল পথেই চলতে থাকবে যদি কোন বাঁধা না থাকে। কিন্তু একে তো কেউ না কেউ গতিশীল করার জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। এই বিশ্বে যা কিছু গতিশীল সে সবের গতি কি চিরন্তন? এই প্রশ্নের উত্তরের সাথে এ বিশ্ব-জগৎ কোত্থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, তার সত্যতা গেঁথে রয়েছে। যারা জড়বাদী তারা বিশ্বাস করে, এ বিশ্বের বস্তু ও তার গতি চিরন্তন। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তিতে এ বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। তাই আল্লাহতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ এ বিশ্বের সূচনা নিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এদের ব্যাখ্যা ধর্মের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কশীল। কিন্তু জড়বাদীরা বিশ্বের স্রষ্টাকে আঁড়ালে রেখে পিতার অবাধ্য সন্তানের ন্যায় এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলতঃ বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যাতে উভয়ের মধ্যে যতটুকু বেমিল তা শুধু বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীগণের মারামারি কাটাকাটির বিষয়টি ধর্মীয় আলোকে দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তি তর্ক দিয়ে সমাধান করতে পারলে চরম অবিশ্বাসীরা পথে না আসলেও যারা উভয় সংকটের ধাঁধাঁয় পড়ে মানসিকভাবে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, তারা হয়তো আলোর সন্ধান পাওয়ার আশা করতে পারেন। তাই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি কোত্থেকে হলো এ সম্পর্কে কে, কি বলেছেন, তা তুলে ধরে সত্যের সন্ধানে আলোর মশাল জ্বালিয়ে ভুলক্রটি ফারাক করে আসল তত্ত্ব বের করতে চেষ্টা করা দরকার।

www.pathagar.com

বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জড়বাদীদের ধারণা

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ : ১৭৯৬ সালে ফরাসী গণিতবিদ পিয়ের লাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৭) এই তথ্য প্রচার করেন যে, সুদূর অতীতে বিশ্বে ছিল উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জের সুবিস্তৃত নীহারিকা। এই বস্তুপুঞ্জ অনবরত পাক খেতে খেতে মাঝখানে জমে ওঠে, এর খানিকটা বস্তুর ঘন পিণ্ডে রূপ নেয়। তারপর এক সময় এই ঘন পিন্ডটি সূর্যে পরিণত হয়। পরবর্তিতে সেটির চারপাশের বস্তুপুঞ্জ ঠাণ্ডা হতে শুরু করলে, বস্তুপুঞ্জের আকার ছোট হয়ে আসে। কিন্তু ঘুরার বেগ বাড়তে থাকলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ঘুরন্ত খোলস পৃথক হয়ে পড়ে এবং সেগুলো জমাট বেঁধে নানা গ্রহ-উপগ্রহে রূপ নেয়।

জীনসের আকস্মিক নৈকট্যবাদ : ১৯১৭ সালে বিশিষ্ট গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬) মহা বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় বলেন, দু'টি নক্ষত্রের এক আকস্মিক নৈকট্যের ফলে সৌরজগতের উৎপত্তি হয়। এই দু'টি নক্ষত্রের মধ্যে একটি ছিল সূর্য এবং অন্যটি অতি বিশাল নক্ষত্র। সেটি সূর্যের কাছ দিয়ে ঘুরে যাবার সময় আকর্ষণের টানে সূর্যের বুক হতে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ পটলের আকারে বিছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। এই বস্তুপুঞ্জ সূর্যের চারপাশে চক্রাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে খন্ড খন্ড হয়ে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়।

ভাইত সেকার ও স্মিটের সংশোধিত নীহারিকাবাদ :

১৯৪৩-৪৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ভাইত সেকার ও সোভিয়েট গণিতবিদ অটোস্মিট পৃথক পৃথক ভাবে মত প্রকাশ করেন যে, উত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তু সূর্য হতে নয় বরং শীতল বস্তু কণিকা পুঞ্জের নিরন্তর গতিশীলতার ফলে অসংখ্য ছোট বড় পাকের সৃষ্টি হয়। তার চারপাশে ঘুমন্ত অন্যান্য বস্তু কণিকার সমাবেশ নানা আকারের শীতল আদি গ্রহ কণিকার পিণ্ড সৃষ্টি করে। শীতল সূর্যের ক্রমান্বয়ে বস্তুর সংকোচনে সংঘাতের সৃষ্টি হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে তাপের উদ্ভব ঘটে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সংকোচনের ফলে অন্যান্য গ্রহ পরবর্তি পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই মতবাদটিই বর্তমানের বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমাদৃত।

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা এই বিশ্বে যখন কোথাও কোন কিছু ছিল না তখন হঠাৎ একটা বিন্দুতে ভর-শক্তির সমাবেশ ঘটে। এই ভর-শক্তি অতি উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপে ও তাপে একটি ক্ষুদ্র এলাকায় ঘূর্ণীভূত আকারে সাবানের বুদবুদের ন্যায় অস্থিতিশীল সাম্যাবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল। এক সময় প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ চাপে এক প্রচণ্ড আদিম বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘূর্ণীভূত ভর-শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এখনও ক্রমবিকাশ ধারায় এই সৃষ্টি সম্প্রসারণ লাভ করতে থাকে। এই ছিল জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের বিশ্ব সৃষ্টির সম্পর্কে নিছক ধারণা। তাদের বর্ণনার স্বপক্ষে বিজ্ঞানের কোন প্রমাণ নির্ভর তত্ত্ব নেই। এটি এক প্রকার দূরভিসন্ধি চিন্তা। এই চিন্তা মনের খেয়ালে উদ্ভটনীয় ধারণা। এর মধ্যে অনেক কিছু উহ্য। তাদের বর্ণনায় কোথাও স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জগতে ধ্বণাত্মক ও ঋণাত্বকের যে জুটি আছে, এই জুটি কিভাবে সৃষ্টি হলো এর কোন সমাধান নেই। শীতল কিংবা উষ্ণ বস্তুপুঞ্জ অথবা ভর-শক্তি কিসের থেকে সৃষ্টি হলো এর কোন জবাব নেই। কোন কিছুই নেই, সেখান থেকে যদি এতো সব সৃষ্টি হতে পারে, তবে এখন হয় না কেন? কে বন্ধ করে দিল এই প্রক্রিয়া? তারা এ সব প্রশ্নে উত্তরের ধার না ধেরে বলেন, দৈবক্রমেই এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও দ্বৈবের নিয়মে তা চলছে । তারা আদিকাল থেকে এ বিশ্বে পরম সত্তা বলতে যে একজন ছিলেন একথা বিশ্বাস করতে নারাজ। কিন্তু স্রষ্টায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ এই দৈব নিয়মের পক্ষপাতী নয়। তারা মনে করেন, প্রাণ মনশীল চৈতন্য শক্তির ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত এ বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। আল্লাহ্তে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণের ধারণা ঃ—

তারা মনে করেন, এ বিশ্ব-জগৎ কোন সময় দ্বৈবের থেকে সৃষ্টি হয়নি। এর আইন-কানুন দ্বৈবের কথা বিশ্বাস করে না। এ জগৎ সুপরিকল্পনাধীন ও নিয়মের বশীভূত।

বিজ্ঞানী জন ক্রীডল্যান্ড কথব্যান (গণিত ও রসায়ণবিদ পি, এইচ, ডি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়) বলেছেন- শক্তি যখন নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়

www.pathagar.com

তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত আইনানুগ ভাবে অগ্রসর হয় এবং রূপান্তরের ফলে নুতন যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে বিদ্যমান পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব আইনেরই অধীন হয়। সে জন্য তিনি মনে করেন অনুভূতিহীন, প্রাণহীন জড় পদার্থ আপনা আপনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে অতপর দৈবক্রমে নিজেরাই নিজেদের ওপর আরোপিত হয়েছে তারপর দৈবক্রমেই তারা তাদের ওপর আরোপিত আছে এ কথা সত্য নয়। নিসন্দেহে এই মহাবিশ্ব রীতি ও ক্রমের জগৎ, বিশৃঙ্খলার জগৎ নয়। এটি আইনের জগৎ। দৈব ও লক্ষহীনতার জগৎ নয়।

অন্য আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন, সকল পদার্থের পর্যায়বৃত্ত সারণীতে তার অন্তর্নিহীত ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলো ইলেক্ট্রোন, প্রোটন, নিউটন যেভাবে সুসামাঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সংগঠিত আছে তাতে প্রমাণ হয় এই বিশ্ব জগৎ কোন দৈবের সৃষ্টি নয় বরং এর সুশৃঙ্খলতা এক মহা প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার বিচার বুদ্ধিরই বহির্প্রকাশ।

এলমার ডবলিউ মরার (রিসার্চ কেমিষ্ট) বলেছেন, একটা বিরাট চুল্লীতে আমাদের পক্ষে যদি অগণিত সংখ্যক প্রোটন, নিউটন, ইলেক্ট্রোন এবং আণবিক গ্লু (যা পরমাণু গুলোকে এক সংগে ধরে রাখে) একত্র করে উত্তপ্ত করা সম্ভব হয় তাহলে পর্যায়বৃত্ত সারণীতে ঠিক যেমনি ভাবে তারা সৃশৃঙ্খলার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ একশত অথবা তার কাছাকাছি সংখ্যক নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম সম্পন্ন পৃথক পৃথক মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে, সেভাবে আমাদের পক্ষে সেগুলো সৃষ্টি করার পথে অসুবিধা কি? কিন্তু আদো কোন বৈজ্ঞানিক সে ধরণের বস্তুর অণু অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কোন একটি বিশেষ ধরণের বস্তুর অণু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? বরঞ্চ পারবে না এটিই সত্য। সুতরাং এ সব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে মহা পরিকল্পকের সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

www.pathagar.com

বিশ্ব-জগৎ উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা ঃ

ধর্ম এমনি এক মূলনীতি যা মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। যে ধর্মের মূলনীতিতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নেই সেটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়। শিশু থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত যে সব বিষয় নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোরও সমাধান ধর্মের বাণীতে থাকা প্রয়োজন। শিশুর মুখ থেকে শুনেছি, বাবা ঐ চাঁদটা কি? ঐ সূর্যটা কি? এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? চাঁদটা কেন আমার সাথে সাথে যায়? সূর্যটা কেন আলো দেয়? এগুলো ক'দিন ধরে এভাবে ঘুরছে? শূন্যের মধ্যে এরা থাকে কি করে? এগুলো বানাল কি দিয়ে? ইত্যাদি ... ইত্যাদি ... অনেক প্রশ্ন। তাদের মাথায় আবার পরিণত বয়সে প্রশ্ন উদয় হয়, এ বিশ্ব কি আদি হতেই এরূপ অবস্থায় ছিল? এ কথা ভাবতে গেলেই নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। যার কারণ হলো অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণার সীমাবদ্ধতা। কখন এই বিশ্বে প্রকৃতি নামক সুষমনীতির খেলা শুরু হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। বরং তা জানার কথাও নয়। এর মূলে হলো প্রকৃতির সুষমনীতির বিবর্তন খেলায় পৃথিবীতে মানুষের খেলাফত শুরু হয়েছে অনেক অনেক বছর পর। এর কোন সঠিক হিসেব আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার আগে যে কত কোটি কোটি বছর চলে গেছে তাও আমাদের অজানা। সেজন্য আমাদের পক্ষে বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেয়া যেন মার পেটে থেকে দুনিয়ার খবর বলা বৈকি? তাই এতে সত্যের লেশমাত্র আছে কিনা সন্দেহের ব্যাপার। পক্ষান্তরে আমাদের জানার স্পৃহা প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার। মানুষকে সেই স্বভাব জাত প্রবৃত্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাই আমরা ভাবনাহীন বসে থাকতে পারি না। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে হলে যিনি এর স্থপতি তাঁর কারিকুলাম, তাঁর পরিকল্পনার নীতি-নক্সা অনুসরণ করেই সন্ধান করতে হবে। আল কোরআন বিশ্ব স্থপতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানুষের জীবন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ বিধান। এঁর বাণী কোন মানুষের কথা নয়। যিনি এই বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন সেগুলো তাঁরই কথা। স্রষ্টার সেই অমীয় বাণী মনোযোগের সাথে হজম করতে পারলেই সত্যের আলো হৃদয় রাজ্যকে

www.pathagar.com

করবে আলোকিত। তখন বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে দৈব চিন্তার হবে অবসান। কারণ এতে জীবন জিজ্ঞাসার রয়েছে সার্বিক প্রশ্নের যুক্তি নির্ভর উত্তর। জড়বাদীরা যে সব প্রশ্নের সমাধান আজো দিতে পারেনি, যেখানে তারা ঠেকে গিয়ে বলে, এ সব প্রশ্ন এতোই জটিল যার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আল কোরআনে এ সব প্রশ্নেরও সমাধান রয়েছে। জড়বাদীরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ আসলেই তারা তা নিজে থেকে জানার কথা নয়। এর উত্তর জানতে হলে যিনি চিরঞ্জীব আদি ও অনন্তে বিরাজিত ছিলেন তাঁর কথাই বিশ্বাস করতে হবে। এ বিশ্বে যখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না তখন পরম স্থিতিশীল পরিবেশে পরম সত্তা আল্লাহ্ ছিলেন আদি ও অনন্তের মালিক। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি এবং তিনি মানব প্রজন্মের রীতিতে কাউকে সৃষ্টি করেননি। বস্তু ও বস্তুর উপাদান সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্ কোন কারখানা স্থাপন করেননি।

সূরা ইখলাসে আল্লাহ্ অনন্তের খবর জানিয়ে দিয়েছেন ঃ 'বল (হে মুহাম্মাদ) আল্লাহ্ এক ও একক আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর নির্ভর, তিনি জন্ম দেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না; তাঁর সমতুল্য আর কেউই নেই।"

তিনি কি প্রক্রিয়ায় এই সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন তার জবাব ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন- "আল্লাহ্ যা খুশি তাই সৃষ্টি করতে পারেন; যখন তিনি কোন কিছু ঘটাতে চান; তখন তাকে বলেন 'হও', আর অমনি হয়ে যায়।" — (৩ ঃ ৪৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে- "আমি যে জিনিসের এরাদা করি সেজন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় 'হয়ে যাও' তাহলেই তা হয়ে যায়।"

— (সূরা আন-নাহল— ৪০)

তারপর আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-

"তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা" - (৪২ ঃ ১১)

এ জগৎ তিনি কত দিবসে সৃষ্টি করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, তিনি ছয় দিবসে ভূমণ্ডল ও নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ তার আদেশের আনুগত্য করছে। - (৭ ঃ ৫৪)

www.pathagar.com

"তুমি বল, তোমরা কি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করছ যিনি দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর অংশীদার খাড়া করছ? তিনি বিশ্ব-জগতের রব।" - (৪১ ঃ ৯-১২)

আল কোরআনের ঐশী বাণী থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ জগৎময় যা কিছু আছে, সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক পরম চিরঞ্জীব আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সৃষ্টি কৌশলের মাঝে নিজের প্রচন্ড ক্ষমতার বলিষ্ঠ প্রমাণ নিহিত রয়েছে। হুকুম করলেই হয়ে যাওয়া বলিষ্ঠ ক্ষমতারই নির্দশন। আল-কোরআনের বাণীতে রয়েছে নৈতিক বিশ্বাসের বীজ। এঁর আলোচ্য বিষয়যস্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবনের বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু শুধু পদার্থ ও শক্তি নিয়েই লেখা। বিজ্ঞানের পুস্তকে রয়েছে বৈজ্ঞানিক থিওরী। যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল। সেদিক থেকে কোরআন বৈচিত্র্যমন্ডীত ও সার্বজনীন এবং চির অপরিবর্তনীয়। এতে রয়েছে প্রচুর গবেষণার উপাদান। কারও পক্ষে গবেষণা করার সুযোগ না হলে বিশ্বাস করলেও তার দায়িত্বের ত্রুটি হবে না। তবে যারা গবেষণা করবে তাদের জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত বেতন বা পুরস্কার যে থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই গবেষণার পথ হতে হবে কোরআন হাদীসের অবলম্বনে। প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন একটি আত্মিক ও মানসিক জ্ঞানের সার অংশ। যখন বস্তু কিংবা বস্তুর উপাদান অথবা প্রাণী কিংবা প্রাণের কোন উপাদান ছিল না, সেই সময়ের কথা আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি কোরআনের মাধ্যমে। যিনি সকল কিছুর অনন্ত, তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছে এই কিতাবের বাণী। আমরা সে কিতাবের মাধ্যমে জানলাম এ জগৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি 'হও' বললেই তা হয়ে গেছে। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর ভেতর-বাইরে শুধু শূন্য আর শূন্য নয়। একে ভাঙ্গলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো বস্তুর সার অংশ বা এর উপাদান কিসের তৈরী? এগুলি আসলো কোথেকে? অস্তিত্বহীন শূন্যের মধ্যে এই উপাদান কি করে সৃষ্টি হলো? জড়বাদীরা বলেন দৈবক্রমে হঠাৎ একটি বিন্দুতে ভর-শক্তির আবির্ভাব হয়। কি করে হলো, কে সৃষ্টি করলো, এর জবাব তারা দিতে পারেন না। ধর্মীয় বিধানের রীতিতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় আল্লাহর ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে। তিনি

www.pathagar.com

নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তাই সৃষ্টির অস্তিত্বের পেছনে খোদার অভিব্যক্তিই হলো জগৎ সৃষ্টির প্রথম ধাপ। এর সত্যতার প্রমাণ রয়েছে হাদীসে কুদসীতে যেমনঃ "আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন, আমি প্রকাশ হতে চাইলাম তাই সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টিকে। ইচ্ছা আমি পরিচিত হই।"

আল্লাহ নিজকে প্রকাশ করার জন্য প্রথম যে জিনিস সৃষ্টি করেন, তার মাধ্যমে এ বিশ্বকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। সে জিনিস হলো আল্লাহর 'নূর'।

কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে ঃ

"আকাশ-পৃথিবী সমস্তই আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি।" - (আলকোরআন)

মহানবী (সা) বলেছেন- "আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা আমার নূর।" তিনি আরও বলেছেন- "আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।"

'নূর' নামের পবিত্র সত্তা আল্লাহর সৃষ্টির আদি উপাদান, এ কথা আমরা জানতে পারলেও, এই পবিত্র সত্তা যে কি ভাবে পয়দা হলো এ সম্পর্কে আমরা এখনও সমাধানে আসতে পারিনি।

এই সত্তা তো কোন অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করা হয়নি, তাহলে এ জিনিস আসলো কোত্থেকে? মূলতঃ স্রষ্টার অভিব্যক্তি বা ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে যে জিনিস বিচ্ছুরীত হয়, সেটিই এই পবিত্র সত্তা। আমাদের মনের অভিব্যক্তি যেমন দেহ রাজ্যের শিরা উপশিরায় ঢেউ এর ন্যায় জাগরণ তুলে তেমনি খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতায় পরম স্থিতিশীল শূন্য বিশ্বে ঢেউ জাগিয়ে দেয়। ঢেউ নামের এই গতিশক্তিই (পরম গতিশক্তি) বিশ্বের আদি সত্তা। মহা মনের আবেগের তাড়নায় অসীম শূন্য স্থান তরঙ্গের দোলায় দোল খেয়ে উঠলে পরম গতি নামের এক বিশ্ব সৃষ্টি হয়। বিশ্বের সমস্ত উপাদানের ভেতরে এখনও তরঙ্গের জোয়ার বয়। তাই এ কথা প্রমাণ হয় যে, অচেতন জড় বস্তুর উপাদানও প্রাণ-মনশীল চৈতন্য শক্তি হতে উদ্ভব হয়েছে। আদি অবস্থায় পরম গতিশীল সে জগৎ খন্ডিত ছিল না। সাগরের ঢেউ এর ন্যায় এর কোথাও কোন ফাঁক বা বিরতি ছিল না। সেটি ছিল স্তূপের মতো অনড়। যার প্রমাণে বলা যায় আজ অবধি শূন্য মন্ডল সেই গুণ হারায়নি।

www.pathagar.com

এটি বর্তমান কালেও বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। তাঁরা বলেন, শূন্য মন্ডলের রয়েছে তরঙ্গ ধারণ করার বিশেষ গুণ। এটি তার ব্যতিক্রমধর্মী গুণই বলা চলে। জড়বাদীদের অন্তসার শূন্য দ্বৈব চিন্তার জগৎটিতে কি করে ঋণাত্মক ও ঋণাত্মক যুগল জুটি পয়দা হলো এর কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু মহা প্রভু এই দ্বৈত রূপ কি করে সৃষ্টি করেছেন তারও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হলো আদম (আ)। তাঁর ইচ্ছার ব্যগ্রতার থেকে স্রষ্টার নির্দেশে তাঁর অস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয় তাঁর কামনার সমমনা বিপরীত সত্তা নারী জাত। তাঁর নাম হলো হাওয়া। আদম (আ) ও হাওয়ার বৈধ প্রণয়ের মাধ্যমে আত্মিক জগতের সকল আত্মাকুলসহ স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় 'নূর' থেকেই আলো ও তরঙ্গে পুটলি ইত্যাদি সহ জড় জগৎ, ফেরেশতার জগৎ, আ'রশ, কুর্সী, লওহ, কলম সবই তৈরি হয়। বস্তুর মৌল উপাদান হলো তরঙ্গের পুটলি। এখানেও ঋণাত্মক ও ঋণাত্মকের প্রণয় জুটি রয়েছে। আত্মা ও জড়দেহ দু'টি ভিন্ন জিনিস হলেও সুদূর অতীত পেরিয়ে এ দুইয়ের মধ্যে মিলন ঘটলে সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে। তবে দর্শনের দৃষ্টিতে জড় উপাদানেও যেহেতু দ্বৈত রূপের সত্তা রয়েছে সে আলোকেই বলা চলে আত্মিক জগতের জ্যোতির কিরণ থেকেই এই জড় উপাদানের মৌল সত্তা সৃষ্টি হয়েছে। আল কোরআনে জগতের সকল কিছু সৃষ্টির মূল তত্ত্ব যুক্তি ভিত্তিক কথায় প্রমাণ দেয়া হয়েছে। এতে বিরাট বিরাট বিষয়গুলো স্বল্প কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের মর্জি ও প্রকৃতিতে এর অনুসন্ধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করার দরজা খোলা আছে। মূলতঃ কোরআনেই রয়েছে বিজ্ঞানের মাল-মসলা। যা মানুষকে জানার স্পৃহায় উজ্জীবিত করে। এদিক থেকে বিজ্ঞানের আলোচনা দীর্ঘ ও ব্যবহারিক কলা কৌশল সম্পন্ন হলেও কার্যত বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আসলে যারা কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্ধ সৃষ্টি করেছেন তারা হলো জড়বাদী ও নাস্তিক। কালক্রমে এরা বিজ্ঞানেরও শত্রু। যাদেরকে বিজ্ঞানের জনক বলা হয় তাঁরা ছিলেন পরম আস্তিক। তাঁরা এ জগৎকে সৃষ্টার রহস্যময় অভিপ্রায়ের জগৎ হিসেবেই কল্পনা করেছেন। তাঁরা কখনো দ্বৈব চিন্তার ধার ধারেনি। আস্তিক বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে এক

www.pathagar.com

অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্তার এক রহস্যময় অভিপ্রায়। বিজ্ঞানীদের সূদূর প্রসারী চিন্তা ও জিজ্ঞাসা এখানে বিমূঢ় হয়ে যায়। বিজ্ঞানের চূড়ান্ততম অগ্রগতিও সেখান থেকে তুচ্ছ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সেই অন্তহীন মহাজাগতিক উদ্ভাস বিজ্ঞানীদের এই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের দিকেই পরিচালিত করে যে, এই মহা বিস্ময়কর সৃষ্টির একজন নিয়ন্ত্রক আছেন, যিনি অলৌকিক জ্ঞানময়। তাঁর সৃষ্টিকেই শুধু অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁকে মানব কল্পনায় বিধৃত করা যায় না।"

স্যার জেমস জীনস বলেছেন, "মহাবিশ্ব আমাদের সকলের মনের অতলে অবস্থিত এবং সকল মনের সমন্নয় সাধনকারী কোন এক মহান মহাবিশ্বজনীন মনের সৃষ্টি—মনে হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন সেদিকেই প্রধাবিত হচ্ছে।"

এই বিশ্ব যেহেতু মহা মনের অভিপ্রায়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল এবং এর মূল উপাদান 'নূর' যেহেতু কোন কোষাগারে রক্ষিত ছিল না যেহেতু স্থির বিশ্ব-ভুবনের শূন্য পরিবেশটিতে তাঁর অভিপ্রায়ের স্পন্দনময় তরঙ্গ গতিই এ জগতের আদি সত্তা। কালক্রমে ধ্বণাত্মক, ঋণাত্মক ও নৈব্যক্তিক এবং নিউট্রোনোর সমন্বয়ে তৈরী হয় জড় পদার্থের মৌল কণা। আমরা যদি সৃষ্টির অন্তরের sensory বোধকে Posative হিসেবে ধরে নেই, তখন দেখা যাবে তাঁর আবেগ তাড়নার ফলে মহামন থেকে যে নির্দেশ আসলো এটি নৈব্যক্তিক হলে এর ক্রিয়ায় Posative হতে সে সত্তা বিচ্ছুরীত হয়, সেটি Negative সত্তা। এ সম্পর্কে ঋণাত্মক ও ঋণাত্মক কি করে সৃষ্টি হলো, সেখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সার্বিক দিক বিচার করলে কোরআন হাদিসে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া আছে, এতে কোন দিক অপূর্ণ নেই। এতে যেমন রয়েছে বস্তু ও আত্মার কথা তেমনি রয়েছে ঋণাত্মক, ঋণাত্মক, নৈব্যক্তিক (Neutral) ও এদের বৈরী সত্তা শয়তানের কথা। এতো সুন্দর বর্ণনা থাকার পরও ধর্মজ্ঞানহীন অন্ধ বুদ্ধিজীবি জড়বাদীগণ বিশ্বের উৎপত্তিতে নিয়ে এসেছে দৈব চিন্তা। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, হঠাৎ একটি বিন্দুতে ভরশক্তি উৎপত্তি হলো কি ভাবে, অভ্যন্তরীণ চাপ, ঘনায়ন, রূপায়ণ, আকর্ষণ নৈকট্যবাদ ইত্যাদি হওয়ার

www.pathagar.com

কারণ কি? মূলতঃ এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো কোন শক্তি তাদের বুদ্ধির ঝুড়িতে নেই। এদের বর্ণনায় নেই কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সুষমনীতির স্বাক্ষর। সব জাগায় আছে শুধু বিস্ফোরণ- আর বিস্ফোরণ। এরা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ। কিন্তু আল কোরআনের দৃষ্টিতে যারা বিশ্বের সূচনার কথা চিন্তা করেন, তাদের কথা হয় সুষমনীতির পক্ষে, আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসের আলোকে তার অভিপ্রায়ের ফসল হিসেবে। এর জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে হয় না। তাই যেটি অপূর্ণ নয় সেটিই সত্য ও সুন্দর।

আল্লাহ বলেন- "তারা কি পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে না? খোদা যে বস্তু পয়দা করেছেন তার ওপরও কি তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না? - (আল-আরাফ-১৮৫)

"অবশ্যি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।"

- (আলে-ইমরান —১৯৯)

আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও রাত-দিনের ঘূর্ণন এ সব কোন কিছুই পরিকল্পনা বিহীন সৃষ্টি করা হয়নি। এ জগতে প্রকৃতির নিয়মনীতি বলতে একটি বাঁধা ধরা সুষম নীতি আছে। প্রকৃতির এই নিয়মনীতি পর্যবেক্ষণ করলে এর কোথাও কোন দৈবের আক্রমণ চলতে দেখা যায় না। আকাশে মেঘ না থাকলে যেমন আকাশ সাঁঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না, তেমনি মেঘপূর্ণ আকাশের মেঘের কণাগুলো শীতল না হলে বৃষ্টি হয় না। মেঘহীন বৃষ্টি হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি কিছুই ছিল না এমন অনস্তিত্ব থেকে বিশ্বের এই সুন্দর কাঠামোর মূল উপাদান সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব। পক্ষান্তরে স্রষ্টা বিহীন সৃষ্টি অস্তিত্বে আসাও অসম্ভব। নজরুল না হলে যেমন নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি হতো না। সে আলোকেই বলা যায় স্রষ্টা বিহীন বৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের কথা ভাবা অবাস্তব। এরূপ ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা চেতনাহীন জড়বস্তুর মতো সীমাবদ্ধ ও কুটিলতার মধ্যেই বন্দি। এদের অন্তর দৃষ্টিতে জড়তার ছানি ধরেছে। কিন্তু আমরা আজ যে জড় প্রাচীরে বন্দি এই জড় উপাদানের মূল স্তূপ নিয়ে চিন্তা করার আগে আমাদেরকে ভাবতে হবে এর

www.pathagar.com

মৌল উপাদান আসলো কোত্থেকে। যারা এই মহাবিশ্বের মূল উপাদান গ্যাসীয় পিন্ডের ন্যায় ছিল বলে ভাবেন, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, এই গ্যাসীয় পিন্ডের মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামের যে মৌলিক উপাদান রয়েছে, এগুলো সৃষ্টি হলো কি করে? মহাবিশ্বের আদি সুবিশাল নীহারিকা বা নেবুলা যা দিয়ে তৈরী ছিল তার মধ্যে যে ভিন্ন ধরণের আদান ছিল এগুলো তৈরী হলো কি ভাবে? মূল নীহারিকা থেকে যে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে অসংখ্য ছায়াপথের সৃষ্টি হলো, সেখানে কি পানি ছিল? পানি যদি না থাকে তবে পানি সৃষ্টির প্রক্রিয়া উদ্ভব হলো কি করে? অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে কি একসাথে লাগিয়ে দিলেই পানি তৈরি হয়ে যাবে? এর জন্য কি কোন সুষম বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই? আসলেই পরিকল্পনা ও আইনানুগ নীতি ও কর্মপন্থা ব্যতীত কোন কিছু সৃষ্টি হওয়ার কথা যারা চিন্তা না করেন তাদের পক্ষে দৈব চিন্তা না করে যে উত্তর দেয়ার কোন পথ নেই। তাই বিবেক বুদ্ধিকে এরা নড়াচড়া না করেই বলে দেন, এই জগৎ দৈব ক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মের ঐশী বাণীতে ধর্মের ভাষায় স্থূল অর্থে, কিংবা রূপক ইঙ্গিতে আত্মিক দ্বৈত রূপ সহ আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সে সব কি ভাবে পয়দা হয়েছে তার সুন্দর জবাব দেওয়া আছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থূল অর্থকে কিংবা রূপক উদাহরণকে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে কোরআন থেকেই সকল যুক্তি পাওয়া সম্ভব। মানব আত্মা আত্মিক জগতের সূক্ষ্ম উপাদান। এক আত্মা থেকেই তার সহর্ধমিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দু'জনের মাধ্যমেই আরও অসংখ্য জন। এই পৃথিবী, আসমান, জমিন সবই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। এই পৃথিবী ও আসমান জমিনের বাহ্যিক সত্তার সকল উপাদান আমাদের বৈরী নয়। এর সাথে রয়েছে আমাদের পবিত্রতম সম্পর্ক। তাই সূক্ষ্ম চিন্তায় এ জগতের সকল উপাদানের মধ্যে যে দ্বৈত রূপ দেখা যায় এগুলোও এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রথম পুরুষ ও তার যুগল সম্পর্কের সহধর্মিনীর বৈধ প্রেমাবেগের মাধ্যমেই পয়দা হয়েছে। তারপর মর্তের জগৎ আদমের বাস উপযোগী হলে তাঁরা দু'জন নেমে আসেন নিম্ন জগতে। এখানে সে বাণিজ্য করে ফিরে যাবে সেই অনন্তের দিকে। এ সব কিছুই স্রষ্টার পরিকল্পনার সার্থক রূপ। তাই ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা দৈব ভূতের কথা চিন্তাই করে না। লিভ

www.pathagar.com

টুগেদার নামের কাল স্বপ্ন তাদেরকে গ্রাস করতে পারে না। এ ধরণের ফিৎরাত বা স্বভাব দিয়েই মানব আত্মাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার সহর্ধর্মিনীকে এবং সেই দু'জন (আদম এবং হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" - (সূরা নেসা, আয়াত-১)

"এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।" - (৫১ ঃ ৪৯)

"এবং তিনি সমস্ত জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছেন।" - (৪৩-১২)

মানব আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা। এটি রহস্যময় অবিমিশ্র সত্তা। একে ধরা যায় না, দেখাও যায় না। এটি অবিনশ্বর ও পরিবর্তনহীন। এর অস্তিত্ব অনুভব করার মতো। অপর দিকে দেহ সত্তা বা জড় সত্তা যৌগিক জিনিস। এর আকার আকৃতি আছে। একে ভাগ করা যায়; ধরা যায়। এর ওজন নেয়া যায়। এটি নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। এ ধরণের জিনিস পরমূর্ত। এ জিনিস কখনো স্রষ্টার ভূমিকা নিতে পারে না। তাই সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বস্তুর আদি উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে শুরু হয়নি। কারণ বিবর্তনের ক্রমধারা এক ধাপে গড়ে উঠেনি। প্রথম ধাপের সিঁড়ি বেয়েই নিম্ন ধাপে নামতে হয়েছে। কিন্তু জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ উর্ধ্ব জগতের প্রাণ-মনশীল চৈতন্য শক্তির সুমহান ধাপটিই সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখাতে নিয়ে আসেননি। সে কারণেই তারা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ। মূলতঃ আত্মার প্রকাশের আবরণ বা খোলস হলো জড়দেহ। এর উপাদান আত্মার যুগল সম্পর্কের ন্যায় দ্বৈত গুণের সম্বন্ধশীল। তাই এটি নারীও নয় পুরুষও নয়, এমন কোন উপাদান থেকে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হয়নি। জড়বস্তুর কণাকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যে সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাকে আর ভাঙ্গা সম্ভব নয় এমন পর্যায়ের উপাদানটিই হয়তো আত্মার যুগল পথ ধরেই নিম্নে নেমে এসেছে।

www.pathagar.com

এর ঘনায়ন ও রূপায়ণের মাধ্যমেই হয়তো আদি নেবুলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকল কিছুর আদি উপাদান হলো 'নূর'। এর মৌলিক রূপ এখনো বৈজ্ঞানিকদের অজানা রয়েছে। কারণ নূর ও আলোকের ধর্ম বিশ্লেষণ করলে যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় তাহলো, আলোকের দ্বৈত রূপ আছে কিন্তু নূর এ গুণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দ্বৈত গুণহীন প্রত্যক্ষ সত্তা দিয়ে যদি এ জগতের মৌলিক সত্তা জন্ম হতো কিংবা অচেতন দু'টি দূর সম্পর্কের সত্তার মিশ্র সংস্পর্শের মাধ্যমে যদি এ জগৎ গড়ে উঠত, তবে সেই পথ এখনো খোলা থাকত অথবা প্রাণ-মনশীল চৈতন্য শক্তির সংশ্রব ব্যতীত যদি এ বিশ্ব সৃষ্টি হত তবে সুষম নীতির পরিবর্তে এখনও সর্বত্রই দ্বৈব লীলা চলতে থাকত। যেহেতু এরূপ কোন দ্বৈব লীলার কথা ইতিহাসের কোথাও ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই জড়বাদীদের তত্ত্ব সুষমনীতির বিরুদ্ধে সত্যের অপলাপ মাত্র। সেজন্য সত্য ও আইনানুগ ব্যাখ্যা পেতে হলে ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েই গবেষণা করা প্রয়োজন।

জড় উপাদান কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে। এর সব ক'টি উপাদান কি একই সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে? আমরা মন থেকে কল্পনার দুয়ার খুলে এর যত উত্তরই দেই না কেন তার কোন সঠিক সূত্র দিতে পারব না। এটি যেহেতু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির জিজ্ঞাস্য বিষয় সুতরাং ঐশী বাণী তালাশ করলে এরও সমাধান পাওয়া যাবে আশা করি। তাছাড়া এই মর্তের মায়া ভূমিতে স্বর্গের আদম (আ) ও হাওয়া ফিরে এসে কি পুরুষ ও নারীর মডেলের রেডিমেট দু'টি পুতুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিলেন? তাঁরা দু'জন দুনিয়াতে আসার মাধ্যমেই যেহেতু বর্তমান বিশ্ব পূর্ণতার দিকে ফিরে যাচ্ছে, তাই এটিও আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির জিজ্ঞাস্য বিষয়। এসব প্রশ্নের যদি ধর্মীয় সূক্ষ্ম নীতি তালাশ করে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তবে সবদিকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক ফলাফল

কম্যুনিজম ও বস্তুবাদের যখন জোয়ার উঠে ছিল তখন চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ পৃথিবী জুড়ে ঝড় তুলে ছিল। তখন অনেকেই মনে করে ছিলেন, বিবর্তন সর্ম্পকে চার্লস ডারউইনেই শেষ কথা বলে ফেলেছেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল এতে বহু ভুল রয়েছে।

এই তথ্যের উপর গবেষণা করতে গিয়ে জার্মান বিজ্ঞানী অগাষ্ট ওয়াইজম্যান লেজবিহীন ইদুঁর উৎপন্ন করতে, ইঁদুর জোড়ার যৌন মিলনের আগেই তাদের লেজগুলো কেটে দেন। এভাবে বিশতম প্রজন্ম পর্যন্ত চেষ্টা করেও দেখা গেল, লেজবিহীন কোন ইদুঁরের বাচ্চা জন্ম হয়নি বরং শেষের প্রজন্মের বাচ্চাগুলির ও লেজ তাদের পূর্ব পুরুষদের মতোই লম্বা হয়। এতে প্রমাণ হয় যে, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের ফলে তার প্রভাব বাচ্চার উপর সংক্রামিত হয়নি। তাছাড়া আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, জীবকোষের ক্রোমোজমের মধ্যে যে অসংখ্যক অদৃশ্য জীন কণিকা থাকে, এর মাধ্যমে বংশগতির ধারা বজায় থাকলে ও কোন কারণে প্রকৃতি তার বৈরী হয়ে উঠলেও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রেরণায় চেষ্টা প্রসূত এতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। অর্থাৎ এতে জীনের মূল স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়না। পক্ষান্তরে বেশী পরিমাণ জীন বিকল হলে অঙ্গহানি বা পঙ্গত্ব দেখা দেয়। কিন্তু গুটি কযেকটি জীন বিকল হলে ও তাতে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। একই সাথে দেখা যায় পানির মাছ ডাঙ্গায় পড়ে লাফালাফি করলে ও তার অঙ্গের কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না।

কিংবা ডাঙ্গার মানব শিশু পানিতে পড়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে থাকলেও সেই শিশু সন্তান মাছ কিংবা অন্যান্য জলজ প্রাণীর আকৃতি লাভ করে না। এতে বুঝা যায় জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার তাগিদে নিজের ইচ্ছা বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। কার্যতঃ বেঁচে থাকার অভিব্যক্তিতে কোন প্রাণীই প্রাকৃতিক নির্বাচনের যোগ্যতম হয়ে গড়ে উঠেনি।

অন্যদিকে প্রত্যেক প্রাণীর স্বভাব বা আচরণ গতির সাথে সম্পর্কিত

www.pathagar.com

বিধায় গতির নিয়মে আদি গতি বা আদি আচরন থেকে যদি নব গতি বা নব আচরণের প্রাণীর উদ্ভব হয়, তবে পূর্বের গতি বা আচরণ হয়তো বা সম্পূর্ণ লোপ পাবে, না হয় সে গতির ধারা থেকে প্রতিনিয়তই নবগতি বা নব আচরণের জীব সত্তা উদ্ভব হতে থাকবে। আবার যে প্রক্রিয়ায় এই গতির ধারা বা আচরণের পরিবর্তন আসবে তার উল্টো প্রক্রিয়ায় পূর্বের গতি ধারায় বা আচরণে ফিরে যাওয়া ও সম্ভব হবে। যেহেতু কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সতন্ত্র গতিধারা বা আচরণের কোন পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। সুতরাং বিবর্তবাদের যুক্তি কাল্পনিকই মনে হয়।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক রূপ পানি। এই পানিকে বিদ্যুত শক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে আবার সেই অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। এ মৌল দু'টির মধ্যে অক্সিজেনের আচরণ হলেও সে দহনে সাহায্য করে। অপর দিকে হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে। কিন্তু নব আচরণ বিশিষ্ট যৌগিক রূপ (পানি) গঠন হওয়ার পর তাতে ঐ আচরণ না থাকলে ও মৌলগুলি এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। ফলে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে আবার সেই মৌলগুলি ফিরে পাওয়া যায়। সেই কারণেই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও পানি চক্র বিদ্যমান আছে। যদি প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের থেকে পুরা বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতর গতিধারায় এসে পৌছত তবে এই চক্র এখনো চলতে থাকত অথবা পূর্বের অবস্থায় ফিরে না গেলে আদি অবস্থা সম্পূর্ণ লোপ পেত। যেহেতু এখন আর কোথাও কোন বিবর্তন ঘটে না আবার কোন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রকৃতির চাপে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় না, সুতরাং এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, বিবর্তন হয়ে থাকলে তা ডারউইনের কাল্পনিক তথ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্য দিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে না যাওয়াতে যেহেতু আদি অবস্থা লোপ পায়নি সুতরাং পুরা বিবর্তনের কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। তবে শ্রেণী বা গোত্র ভিত্তিক বিবর্তন হওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির কল্পনায় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ ও বানরের অঙ্গ প্রতঙ্গের মিল দেখে। মূলতঃ অঙ্গ প্রতঙ্গ সর্বস্ব মিল দেখে বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির কথা চিন্তা কর, বিচার বুদ্ধির সকীর্ণতারই প্রমাণ। কারণ বানর ও মানুষের শারীরিক দিক এক হলেও মানসিক দিক বিবেচনা করলে বানর ও মানুষের বৈষম্য আকাশ পাতাল ব্যবধান। কার্যতঃ

www.pathagar.com

মানুষের মনের গঠন ও বিচার বুদ্ধির কথা চিন্তা না করে শুধু শারীরিক গঠনের কথা চিন্তা করা অযুক্তিক। হঠাৎ একটা বানর বানরী কিসের প্রভাবে এতো জ্ঞানের অধিকারী হলো বিবর্তনবাদীগণ এর কোন যুক্তি দেখাতে পারেনি। জড়বাদী ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষ বানরের বংশধর। কিন্তু পৃথিবীতে এখনো বানর বানরীরা জীবিত আছে এবং তাদের বংশবৃদ্ধির রীতিও বন্ধ হয়ে যায়নি, তবু যেহেতু আর কোন বানর বানরী বিবর্তনের ধারায় মানুষ হয় না সেজন্য এই তথ্যের উপর অনেক সন্দেহ রয়েছে।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে দু'ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন সাধা-রণ আচরণ ও জটিল আচরণ। পাখির মধ্যে কাক কোন মৃত জিনিস পেলে মাটির নীচে কিংবা ঝোপঝাপে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু অন্য পাখিরা তা করে না। মানুষ ভাবুক প্রাণী। তারা চিন্তা ভাবনা ছাড়া কিছুই করে না। কিন্তু অন্য প্রাণীরা ভাবনা চিন্তার ধার-ধারে না। কাক ও মানুষের এ দু'ধরনের স্বভাব জটিল প্রকৃতির আচরণ। সাধারণতঃ একই প্রাণীর মধ্যে দু'টি জটিল প্রকৃতির আচরণ এক সাথে বিরাজ করে না। মূলতঃ আচরণ গতির সাথে সর্ম্পকিত বিধায় প্রকৃতিগত ভাবেই একের মধ্যে একই সঙ্গে দু'ধরনের গতি বা আচরণ থাকতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একি মডেলের গতিযানের মধ্যে একই সময়ে দু'রকমের গতি রাখা যেমন সম্ভব নয় তেমনি একি মডেলের গাড়ীতে দু'ধরনের গতি সীমা দেওয়া ও যায় না। যে গাড়ী ৫০ মাইল বেগে চলছে, তার গতি ১০০ মাইল করতে হলে একি সাথে পূর্বের গতি রাখা সম্ভব নয়। কারণ একই জিনিস এক সময়ে দু'ধরনের গতির নিয়ে চলতে পারে না।

আবার ৫০ মাইল গতিসীমাধারী ইঞ্জিন বিশিষ্ট গাড়ীকে ১০০ মাইল বেগে চালানো ও সম্ভব নয়। এর জন্য তার মডেল আকৃতি প্রকৃতি ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা উন্নতর করতে হবে। কিন্তু কোন ক্রমেই পূর্বের মডেলের গাড়িটিকে একি টাইমে দুই পর্যায়ের গতিসীমার মধ্যে রাখা যাবেনা। যদি নিম্ন পর্য্যায়ের গতি সম্পূর্ণ মডেলের গাড়িটিকে একি টাইমে দু'পর্য্যায়ের গতি দিয়ে উন্নতর বিবর্তন লাভ সম্ভব হয় তবে একাধারে হয় সেই রীতি চালু থাকবে, নয় তো তার পূর্বের মডেল ও গতি দিনে দিনে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম । যেহেতু বানর থেকে এখন আর মানুষ হয়

www.pathagar.com

না এবং এখনো বানরের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়নি তাই ডারউইনের মতবাদের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যা হউক বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইন যা বলে গেছেন, সেটাই শেষ কথা নয়। তবে এ কথা সত্য যে, বিবর্তন অবশ্যই সংঘটিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডারউইন যে ভাবে চিন্তা করেছেন, সেভাবে বিবর্তন না ঘটলেও হয়ত অন্যভাবে তা ঘটেছে। সেই বিবর্তন অবশ্যই মহামনের স্পর্শহীন অন্ধভাবে ঘটেনি। আল-কোরআন উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের মহামূল্যবান দলিল। তাই কোরআন থেকেই আমাদেরকে বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা নেওয়া উচিত।

জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তনবাদ

বর্তমান পৃথিবীর আনাচে কানাচে আজ যে সব প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর উপাদন রয়েছে, তা পূর্ব থেকেই এভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপে সাজানো ছিল কি?

আসলে এর কোন কিছুই পূর্ব হতে এভাবে সাজানো ছিল না। একে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করে জীবের বাস উপযোগী করা হয়নি। নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে কোটি কোটি বৎসর চলে যাওয়ার পর এই ধরার বাসভূমি বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন এতে প্রাণী ও উদ্ভিদ বলতে কিছুই ছিলনা। তখন পৃথিবীটা ছিল জলময়। তারও আগে ছিল এটি ধোঁয়ার ন্যায়। এই ধোঁয়ার গ্যাসীয় উপাদানগুলি যৌগিক রূপ লাভ করে পানি হয়। এর পরবর্তি পর্যায়ে চিন্তা করলে পানিই হলো সবকিছুর উৎপত্তি স্থল। কিন্তু কি করে পানি থেকে জীবের উৎপত্তি হলো? মানুষ তা জানার আগ্রহে ঠিকানাহীন সূদূর অতীতের কথা চিন্তা করছে। এই চিন্তা বেরাম মানুষকে করেছে সাগর মুখী। কিন্তু সাগর থেকে এখন যেহেতু কোন স্থলচর প্রাণী উঠে আসেনা তাই অনেক পণ্ডিতবর্গ কোনরূপ সহায়ক কিতাবাদির সাহায্য ছাড়াই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। নিজের বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে দৈব ভূতের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছেন। তাদের তথ্যে সৃষ্টির আইনে স্রষ্টার পরিকল্পনার কোন ছুঁয়া নেই। সব কিছু দৈবক্রমে হঠাৎ করে আপনা থেকেই যেন অস্তিত্ব

www.pathagar.com

লাভ করেছে। তাদের ধারণা আদি জীব কণার আধার সাগরের লোনা পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যেক জীবের দৈহিক উপাদানের মূল অংশ হলো কোষ-প্রোটোপ্লাজম। দালানের সারিতে যেভাবে ইটের পর ইট সাজানো থাকে তেমনি বহু কোষী প্রাণীর জীব দেহে জীব কোষগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। জীব দেহের প্রতিটি কোষ এক একটি একক (Unit)। স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত। এই প্রোটোপ্লাজমে রয়েছে আর, এন, এ (Ribonucleic acid ও ডি, এন, এ (de-oxyribonucleic acid) নামক জৈব অণুর প্রোটিন। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, এ সব জৈব অনুগুলি উষ্চ তাপে ও চাপে এবং অনুঘটকের প্রভাবে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আদি প্রোটোপ্লাজম।

তাদের ধারণা আদি প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত এক কোষী প্রাণীর বংশাণুক্রমিক ধারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ। সাগরের সেই আদি এক কোষী সরলতম প্রাণীর নাম অ্যামিবা। এখান থেকেই দু'টি শাখা দু'দিকে ধাবিত হয়েছে। তারা আরও মনে করেন উন্নতর প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ তার পূর্ববর্তী নিম্ন শ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ হতে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। জীবের ধারাবাহিক আঙ্গিক পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অভিব্যক্তির প্রকাশমাত্র। যেমন পানির মাছ ডাঙ্গায় পড়ে বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাত পা প্রভৃতি গজিয়ে উঠলে তারা উভচর ও সরীসৃপে রূপ নেয়। খাবি খেতে খেতে জলজ প্রাণীর ফুলকা স্থলচর প্রাণীর ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়। পরিবেশের চাপে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার চেষ্টা প্রসূত অর্জন ভিত্তিক ক্রমবিকাশের নাম বিবর্তনবাদ। বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার উৎস থেকে বিবর্তনবাদের জন্ম। সেজন্য বিবর্তনবাদে মহামনের উদ্দেশ্যের কোন ছুঁয়া লাগেনি। কিন্তু তবু তারা বহু কল্পনার ও দৈব অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছে। বিবর্তনবাদের জনক চালর্স ডারউইন ছিলেন একজন নাম করা নাস্তিক। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর বেলায় প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকাকে বলেছেন যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। জীবন সংগ্রামে জীবগুলো যে সমস্ত গুণ অর্জন করে তার ধারা বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারগণের মাঝে সংক্রামিত হয়। প্রকৃতির দ্বারা যোগ্যতমের

www.pathagar.com

নির্বাচন নীতিকে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি প্রজাতি অন্য একটি প্রজাতিতে রূপ নেয়। কালক্রমে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন সংগ্রামের ফলে ধাপে ধাপে তাদের বিকাশ লাভ হয়। সেদিক থেকে সরল এককোষী জলজ উদ্ভিদ থেকে তার চূড়ান্ত বিকাশ গিয়ে ঠেকে জটিল সপুস্পক উদ্ভিদে। অন্য দিকে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী, বানরে উন্নীত হয়ে মানুষে রূপ নেয়।

এই ছিল জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে মানুষের অন্ত জিজ্ঞাসার কাল্পনিক ধারণা। কাল্পনিক বলেছি এই কারণে যে, আজ বিবর্তনবাদের এই তথ্য বৈজ্ঞানিক ভাবেই নিগৃহীত হয়েছে।

এর মধ্যে ধরা পড়েছে অসংখ্যক ভুল-ত্রুটি। তাছাড়া এতে মহামনের পরিকল্পনার কোন ছুঁয়া নেই। যা বলা হয়েছে সবি কল্পনায়ও দৈব চিন্তায় সাজানো, সেজন্য বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান নতুনভাবে চিন্তা করছে। কিন্তু এর পরও প্রশ্ন থাকে, বিবর্তন কি আল-কোরআনের যুক্তিতে সমর্থন যোগ্য? অনেক অনভিজ্ঞ লোক মনে করেন, বিবর্তন নিয়ে চিন্তা করাটাই অযুক্তিক। এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার কোনটিও বিশ্বাস করার মতো নয়। কিন্তু সত্যকে আড়াল না করলে বলতে হবে, বানর থেকে মানুষ কিংবা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব, অর্জন ভিত্তিক আঙ্গিক বিকাশ ইত্যাদি ভুল হলেও স্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের ছুঁয়া ছিল। জীবের আঙ্গিক বিকাশের প্রতিটি ধাপে মহামনের ইচ্ছার প্রভাব বিরাজমান। জীবের উৎপত্তির সাথে সম্পর্কিত আল-কোরআনের ভিন্ন আয়াত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে এর সত্যতার স্বাক্ষর বা নমুনা খুজে পাওয়া যায়, যা আমাদেরকে বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা করতে পথ দেখায়।

www.pathagar.com

কোরআনে বিবর্তনের ইঙ্গিত

আল-কোরআন এমন একটি সার্বজনিন দলিল যার মধ্যে রয়েছে মানব জাতির জীবন সমস্যার সমস্ত দিকের সমাধান। মানুষ অতীতে যা ভেবেছে ও বর্তমানে যা ভাবতে পারে এবং ভবিষ্যতে যা ভাববে তারও সমাধান দেওয়া আছে এই পবিত্র গ্রন্থে। সে দিক থেকে কোরআন কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়নি। তাই কোরআনে পাওয়া যায় বিজ্ঞানের তথ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও হেদায়েত এবং জীবন ব্যবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ। আরও রয়েছে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে কঠিনতম বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা। সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে এ আলোচনা উদ্দেশ্য মুখী বিবর্তনেরই সারাংশ। কিন্তু জড়বাদী চিন্তাবিদদের বিবর্তনবাদ তথ্যে যে ভাবে অর্জনমূলক কার্যধারার মাধ্যমে আঙ্গিক বিকাশের বর্ণনা রয়েছে, তা কিন্তু আল-কোরআনের ব্যাখ্যার আলোকে মোটেই ঠিক নয়। তবে এ কথা সত্য যে, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ বির্বতন সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরেছেন, এর ফলেই কোরআনের বিবর্তনের আলোচনা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

কারণ বিবর্তন যে ভাবেই ঘটুক না কেন তা কিন্তু 'মহামনের' পরিকল্পনা বিহীন অন্ধভাবে ঘটেনি। প্রত্যেক বস্তুর বা প্রাণীর গঠন, আকার ও প্রকৃতি নিজের সাজানো কিছু নয়। এর সব কিছুই নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকারও প্রকৃতি দান করেছেন।" -(২০-৫০)

দুনিয়ার সব কিছুর আকার ঠিক করা হয়েছে পরিমাণে ও অনুপাতে। অনুপাতের হেরফের হলেই আকারের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন মানবদেহে যে, ২৩ জোড়া ক্রোমোসম থাকে এগুলি পিতা-মাতার মিলনে মাতার ডিম্বাণু ও পিতার শুক্রকীটের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়ে নতুন যে ভ্রূণের সৃষ্টি করে তাতে এসে সঞ্চিত হয়। এখানে লিঙ্গ রূপান্তর হয়। xx ও xy নামক জীনের মাধ্যমে। মাতার x ও পিতার x জীন মিললে মেয়ে সন্তান হয়। আবার মাতার x ও পিতার y জীন মিললে হয় ছেলে সন্তান। কোন কারণে যদি এর মধ্যে কোন বিশৃংখলা দেখা দেয় তবে সন্তানের লিঙ্গান্তরে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এই পরিমাণ কারও নিজের ইচ্ছার উপর ঠিক হয় না। কিংবা এই প্রক্রিয়াটি কেউ নিজের থেকে পরিবর্তন করতে পারে না। এর পিছনে রয়েছে স্রষ্টার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ছুঁয়া।

যেমন- কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন-

"সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে পরিমাণে ও অনুপাতে।" - (৫৪-৪৯)

আজকের পৃথিবীর কোন কিছুই রেডিমেট তৈরী হয়ে আকাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে এখানে নেমে আসনি। আবার এগুলি অন্ধভাবে মাটি থেকে হঠাৎ জেগে উঠেনি। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকল কিছুই বিশ্ব বিধাতা পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির ধারা ও বংশগতির ধারা আল্লাহ্ই প্রবর্তন করেছেন।

"আল্লাহ্ই সৃষ্টির ধারা শুরু করেন আর পুনরাবৃত্তি করেন।"- (১০-৪)

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির ধারা কোথা হতে শুরু করেছেন - তা বিবর্তনবাদ তথ্য জন্ম হওয়ার অনেক অনেক বছর পূর্বেই মানব জাতির হেদায়েতের ভান্ডার আল কোরআনে প্রকাশ করেছেন।

যেমন - কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

"সব জীবকে আল্লাহ্ পানি হতে সৃষ্টি করেছেন;

এদের কোনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে- কোনটি চলে দু'পায়ে আর কোনটি চলে চার পায়ে।" - (২৪-৫৪)

"আল্লাহ্ মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেন- পরে তিনি বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন।" - (২৫-৫৪)

"তিনি মানুষকে (রাসায়নিক) ক্রিয়াশীল কাদা (জাতীয় জিনিস) হতে সৃষ্টি করে আকার দান করেছেন।

আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুন জাতীয় জিনিস হতে।- (১৫-২৬)

"নিশ্চয় আমি মানবকে নির্বাচিত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি; তৎপর আমি তাকে এক সুরক্ষিত স্থানে শুক্র বিন্দুরূপে সংস্থাপন করেছি; অনন্তর শুক্র বিন্দুকে আমি ঘূর্ণীভূত শোণিত (রক্ত পিন্ড) করেছি; তৎপর ঘূর্ণীভূত মাংসপিণ্ড করেছি; তৎপর অস্থিপুঞ্জকে মাংসমণ্ডিত করেছি; অবশেষ আমি

www.pathagar.com

তাকে চরম সৃষ্টিতে পরিণত করে দিয়েছি; অতএব ধন্য সেই আল্লাহর যিনি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা।" - (সূরা মোমেনুন আয়াত ১২-১৪)

আল-কোরআনের উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ হিসেবে চরম পূর্ণতা ও চূড়ান্ত আকৃতি লাভ করতে মানব কুলের আদি বংশধরের অনেক সময় লেগেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানব কুলের আদি বংশধারা গঠিত হতে তাঁর মৌল উপদানের মধ্যে নানা পরিবর্তন পরিবর্ধন ও রূপান্তর সাধিত হয়েছে। চূড়ান্ত আকৃতি ও চরম পরিণত রূপ লাভ করার আগের কালকে মানব কুলের ভ্রূণ কাল ও বলা চলে। আদি ভ্রূণ মানবের শুক্র প্রাথমিক অবস্থায় কোন জীব থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেই ভ্রূণ মানবের শুক্র পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যখন পৃথিবীতে নির্বাচিত মৃত্তিকার স্তর সৃষ্টি হয় তখনি একে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করেন। তাই বলা যায় ভ্রূণ মানবের শুক্র উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবকুলের মাধ্যমে এই স্তরে এসে পৌছেছে। প্রকাশ থাকে যে, নিম্নে নর-নারীর জীন কণিকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিভাজন ও মিলনে যে ত্রুটি দেখা দেয় তা দেখানো হলো এখানে শুধু মানব কুলের আদি বংশধরের দৈহিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হযেছে। আত্মার সৃষ্টি ও বিকাশ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি।।

পৃথিবীতে যত জীব ও উদ্ভিদ আছে সবি পানি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেগুলি জলে বাস করে তাও এবং যা স্থলে বাস করে তাও। পানির আদি সরল জীবের বংশানুক্রমিক ধারাই স্থলচর জটিল বহু কোষী জীবে পরিণত হওয়ার পিছনে কোরআনের সমর্থন রয়েছে। কারণ মাটি থেকে মাটির জীব উৎপন্ন হলে পানি থেকে সৃষ্টি হওয়ার ধারাবাহিকতা থাকে না। অন্যদিকে সরাসরি পানি থেকে স্থলচর জীব সৃষ্টি হয়ে উঠলে, মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গটির ও ধারাবাহিকতা থাকবে না। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদে মানুষকে পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং মাটির জীবের আদি বংশধর যে পানি থেকেই এসেছে এ কথা অস্বীকার করার কিছু নেই। সেই সাথে এও প্রমাণ হয় যে, বিবর্তন ব্যতীত পানির সরল জীব জটিল রূপ ধারণ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু জীবের আঙ্গিক বিকাশ এদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। কারণ অর্জিত গুণাগুণ বংশানুক্রমিক রীতিতে সংক্রামিত হয় এরূপ প্রমাণ পরীক্ষিত ভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়নি। কিন্তু এর ফলে বির্বতন সম্পর্কে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কারণ ভ্রূণ মানবের শূক্র চরম পূর্ণতায় আসার ক্ষেত্রে ফাঁকা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে প্রশ্ন দেখা দেয় মানবকুলের আদি বংশধর কোন প্রক্রিয়ায় বির্বতিত হয়ে চরম পূর্ণতা পেল? বর্তমান যুগে ডারউইনের বিবর্তন তথ্য অসার প্রমাণ হয়েছে এ কথা সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্তন যে হয়নি একথা অস্বীকার করেনি। কোন কোন বৈজ্ঞানিক একে সৃষ্টি ধর্মী বিবর্তনবাদ বলেছেন। কেহ আবার উদ্দেশ্যমুখী বির্বতনবাদ বলেছেন। কেহ আবার বিবর্তনকে বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্ব নাম দিয়েছেন। এদের মূল কথা হলো প্রত্যেক জীব সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় ভিত্তিতে। গোত্র বা জাতীয় ভিত্তিতে শংকরায়নের মাধ্যমেই উন্নতর বিকাশ ঘটেছে। তাঁদের বিশ্বাস বিবর্তন অন্ধভাবে বিনা পরিকল্পনায় ঘটেনি। বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপে রয়েছে মহামনের চিন্তা ও পরিকল্পনার ছাপ। আল-কোরআন সামনে নিয়ে বিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে পানির সরল জীব জটিল আকারের জীবে রূপান্তরিত হওয়া স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনেরই চরম পূর্ণতা।

সত্যকে যাচাই বাচাই না করে একেবারে অন্ধভাবে কোন কিছু বিশ্বাস করা যেমন ঠিক নয় তেমনি অন্ধভাবে কোন কিছুকে অবিশ্বাস করার ও কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সে কারণে হলেও বিবর্তন সম্পর্কে কোরআন ভিত্তিক গবেষণা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ভাবনা

এই বিশাল বিশ্ব জগত কি এক দিনে, বিনা পরিকল্পনায়, অন্ধভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? মহাকাশের অগণিত তারকাগুলো কোত্থেকে এল? এদের কি কোন নিয়ন্ত্রক নেই? এই পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিদ আর প্রাণীগুলো কি যার যার মত সাগর কিংবা মাটি থেকে উঠে এসেছে? কিংবা এগুলো কি আকাশ থেকে উড়ে এসে মাটির ভুবনের বাসিন্দা হয়েছে? আদিকাল থেকে মানুষ এসব প্রশ্নের জবাব বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বের করার চেষ্টা করেছে। প্রাণী আর উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্পর্কে অদ্যাবধি যত তথ্য বের হয়েছে, তন্মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার উৎস থেকে জন্ম হয় ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদ। এই তথ্যের সার অর্থ হলো বস্তুই বস্তুর প্রয়োজনে বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ বস্তুই বস্তুর গড। এ সবের কোন স্রষ্টা নেই। আর মানুষ বস্তুরই উন্নততর বিকাশ। এই বিশ্বের অন্যান্য সব কিছুর উপাদান (বস্তুর) চিরন্তন। অপরদিকে মানুষ নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর (অ্যামিবার) বংশধর। পরিবেশের সাথে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার ফলেই এরা বুদ্ধিমান ও উন্নততর হয়েছে। এই তথ্যের জনক ছিলেন চার্লস ডারউইন। তিনি একজন নামকরা বস্তুবাদী ও নাস্তিক। সে জন্য তিনি সৃষ্টির পেছনে কারও হাত ছিল একথা বিশ্বাস করতেন না। কালক্রমে বিবর্তনের এই বিশ্বাস আমাদেরকেও প্লেগের মতো সংক্রামিত করে। ফলে মুসলমানের ঘরের সন্তান হয়ে আমরাও নিজেদেরকে বানরের বংশধর মনে করতে থাকি। কিন্তু যখন ডারউইনের তথ্যের সত্যতা যাচাই বাছাই করা শুরু হল, তখন এতে অসংখ্য ভুল ধরা পড়ে। এর ফলে পৃথিবীবাসী আবারও বিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে। এরি মধ্যে অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে কিছু কথা কাট-ছাঁট করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিবর্তন হয়ে থাকলেও তা অন্ধভাবে হয়নি। একজন মহাপরিকল্পকের ছোঁয়া অবশ্যই তার মধ্যে রয়েছে। এসব বলার পরও আমরা ডারউইনের বলয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এর কারণ হলো এ বিষয়ে কেউ উপযুক্ত দলিলের ভিত্তিতে পুরা বিষয়টির কোন সমাধান দেননি। মূলতঃ কোরআনের আলোকে বিবর্তন সম্পর্কে একটা পুরা ব্যাখ্যা দেওয়া গেলে এর প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া

www.pathagar.com

সম্ভব ছিল। কারণ আল-কোরআনের আলোর মাধ্যমেই কুসংস্কার ও ভ্রান্ত অনুমান আন্দাজ দূর হতে পারে। সেই সাথে কোরআনের আলোর স্নিগ্ধ পরশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হলে অনন্ত অসীমের ঠিকানা খুঁজে পাওয়াও সম্ভব। তাই তো সৃষ্টি সম্পর্কে সামান্যতম সময় চিন্তা করা দিনের পর দিন নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। সেই মহা মূল্যবান সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্রষ্টা কোরআনের আলোকে জগতকে জানার জন্য জ্ঞানীদেরকে আহবান করেছেন। নিম্নের আয়াতটিতে তার প্রমাণ ফুটে উঠেছে–

"পৃথিবীতে বহু জমিন; আঙ্গুর বাগান ও শস্যক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ রয়েছে যা একটি বা বহু শিকড় থেকে উৎপন্ন যদিও সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত; তবুও কোন ফল অন্য ফল থেকে সুস্বাদু করেছি, নিশ্চয়ই এইগুলোতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (১৩ ঃ ৪)

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষলতা একই মাটি থেকে খাদ্য ও পানি গ্রহণ করলেও তাদের ফলমূলের স্বাদ ও গন্ধ এক রকম হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক বৃক্ষলতার শ্রেণী বিন্যাস এই পৃথিবীর মাটির বাইরে হয়নি। একটি বা বহু শিকড় থেকেই এই শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন জাগে কিভাবে এই শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি হলো? আমাদের মতো অজ্ঞ মানুষের পক্ষে এর উত্তর দেয়া কঠিন। যাদের বুদ্ধির শিকড় অনন্তের সাথে বন্ধুত্ব করতে পেরেছে, তাদের পক্ষেই উত্তর দেয়া সম্ভব। বুদ্ধিমান লোকদের থেকে অজ্ঞরাও পায় আলোর পথ, মুক্তির পথ। কারণ এ পথ ধরে এগুলোই স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার নির্দশনাবলীর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

এ পৃথিবীতে নানা রং বেরংগের জীব ও উদ্ভিদের আর্বিভাব এবং এদের মধ্যে দৈহিক সুশৃঙ্খলতা, দেহের শৈল্পিক কারুকার্য স্বভাবতই আমাদেরকে এর রহস্য তালাশে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ জানার আগ্রহে এ ব্যাপারে অনেক চিন্তাও করেছে। কিন্তু বহুমন বহু মতি-এর ফলে চিন্তার উৎস থেকেও অনেকের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য। এ পর্যন্ত যত তথ্য বের হয়েছে এর সব কথাই যে মূলহীন একথা বলা ঠিক নয়। কারণ অনেকের কথার সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল কোরআনেরও রয়েছে মিল। কিন্তু তারা কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ প্রমাণ করার জন্য এ কথা বলেননি। আসলে তারা

www.pathagar.com

ঘমালার দিকে তাকিয়ে পথ চলতে চলতে যেন বিজলীর ঝলক লেন। কিন্তু বিজলী তালাশ করা তাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কোরআনে বলা আছে, পানি থেকে সমস্ত জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ ও এ কথার সাথে একমত। এ পৃথিবী শুরুর দিকে শুধু পানি আর পানিই ছিল। কালক্রমে এর বিশাল জলরাশিতে ঢেউ সৃষ্টি হয়ে উৎপন্ন হয় 'ফেনা'। পর্যায়ক্রমে 'ফেনার' উপরিভাগ সূর্যের তাপে কঠিন শিলায় রূপ নেয়। এভাবে জলরাশির ওপর গড়ে ওঠে স্থলভাগ। প্রাথমিক অবস্থায় স্থলভাগের কঠিন আবরণ শক্তই ছিল। তখন বর্তমানের মতো উর্বর ও নির্বাচিত মৃত্তিকা ছিল না। এ ধরনের মাটি তৈরী হতে অনেক যুগ, অনেক আবর্তন-বিবর্তনের প্রয়োজন থাকা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে সাগরের লোনা পানির প্রবাহ থেকে সৃষ্টি হয় জীবকণার আধার প্রোটোপ্লাজম। এই প্রোটোপ্লাজমের মৌল ও যৌগগুলো হলো- অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস। তাদের ধারণা এই প্রোটোপ্লাজমের বংশধর দিয়েই উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ প্রসার লাভ করেছে। এদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন সংগ্রামের ফলে তাদের আঙ্গিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাকেই বলে ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি।

কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এ রূপ অর্জন ভিত্তিক রূপান্তর সম্ভব নয়। তাদের এই অর্জন ভিত্তিক রূপান্তরে স্রষ্টার কোন নাম গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এর কোন সঠিক দলিল তারা দিতে পারবে না। তাই কিছু কাল পরই ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজতে থাকে। ফলে এই তথ্য অসার প্রমাণ হয়। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবের আকার ও প্রকৃতি বা স্বভাব কে দান করেছেন, তা কোরআন মাজীদে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন- "আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (২০-৫০)

জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের আকার ও প্রকৃতি যে আল্লাহর দান এ কথা ডারউইন অস্বীকার করলেও সে মহা সত্য এই অন্ধ যুক্তির দ্বারা বেশী কাল চাপা পড়ে থাকেনি। মহান স্রষ্টাই তাদের দ্বারা বাতিলের ওপর সত্যকে বিনা বাঁধায় জয়ী করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সত্যের ভিত্তি আরও

www.pathagar.com

মজবুত ও দৃঢ়তা লাভ করে।

আমরা মাটির মানুষ হলেও আমাদের মনে 'ইচ্ছা' নামের প্রবাহ অনন্ত পর্যন্ত সাঁতার কাটতে চায়। কিন্তু শূন্যে এই মাটির দেহ নিয়ে ওড়া সম্ভব হয় না। প্রথমই দেখা যায় পৃথিবীর বাতাস আমাদের ভর রাখতে পারে না। অন্যদিকে হামাগুড়ি খেতে খেতে পাখির মতো ডানাও আমাদের গজায় না। কিংবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও আমাদের থেকে ঘুষ নিয়ে খাতির করে না। তাই আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি না। মূলতঃ নিজের অভিব্যক্তি বা ইচ্ছার মাধ্যমে কোন দিক থেকে আমাদের আঙ্গিক পরিবর্তন না হওয়াতে, যা ইচ্ছা তা আমরা করতে পারি না। এর মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ হয় যে আঙ্গিক পরিবর্তন নিজের ইচ্ছার মাধ্যমে হয়নি বরং তা স্রষ্টার ইচ্ছাতেই হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের যাত্রা শুরু করেছেন পানি হতে। এখানে কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নেই। দেখা যায় বিজ্ঞান অন্ধভাবে হলেও কোরআনের সাফাই গেয়েছে। এতে বিনা চেষ্টায় যেন সত্যের আলো জ্বলে উঠেছে।

আল কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

"সব জীবকে আল্লাহ পানি হতে সৃষ্টি করেছেন; এদের কোনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোনটি চলে দু'পায়ে, আর কোনটি চলে চার পায়ে।" (২৩-১৩, ১৪)

বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টিতে জীব ও উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ শুরু হয় পানির সরলতম এক কোষী জীব থেকেই। তাদের ধারণা জীব ও উদ্ভিদের স্বতন্ত্র অঙ্গগুলো হলো প্রত্যেক জীব ও উদ্ভিদের জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার হাতিয়ার। এই পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। এদের মধ্যে এককোষী অঙ্গহীন অণুবীক্ষণিক প্রাণী থেকে নিয়ে উন্নততর প্রজাতির সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ প্রোটোপ্লাজমের সাদৃশ্য বিবেচনা করেই এই ক্রমবিকাশ তথ্যের উৎপত্তি। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহলো প্রাণী ও উদ্ভিদের গ্যাস বিনিময় চক্র। এতে দেখা যায় উদ্ভিদের জন্য যা বিষ সেটিই আবার প্রাণীর জন্য খাদ্য। যেমন উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে অথচ এই গ্যাস প্রাণীর

www.pathagar.com

জন্য বিষতুল্য। আবার উদ্ভিদ যে অক্সিজেন নির্গত করে তা প্রাণীর জন্য খাদ্য। অপরদিকে নাইট্রোজেন চক্রে নাইট্রোজেন মাটি হতে উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ হতে প্রাণীতে আসে, আবার প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ বিধ্বংসী পাতন ও পচনের ফলে সেই মাটিতেই ফিরে আসে। এর ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আবার গাছপালা সেখান থেকে খাদ্য নিয়ে সজীব হয়ে ওঠে। অতপর ঐ সব উদ্ভিদের ফলমূল কান্ড ইত্যাদি প্রাণী আহার করে জীবন রক্ষা করে। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের পরিপূরক। কি বিচিত্র এই বিনিময় লীলা খেলা। কিন্তু কেউ যদি কারও বর্জ্য গ্রহণ না করতো তবে পৃথিবীতে জীবন ধারণই ছিল অসম্ভব। কিন্তু ডারইউনের বিবর্তনবাদের তথ্যের কথা অনুযায়ী একি আদি অণুজীব থেকে এ ধরনের বিনিময় ও প্রত্যাবর্তনশীল দু'টি ভিন্নমুখী প্রজাতির সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রহস্যাবৃত মনে হয়। তবে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন নীতির ধাপগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বিবর্তনবাদের প্রথম চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক তথ্য সে রহস্যের দুয়ার খুলে দেয়।

পৃথিবীর আদি এক কোষী সরলতম অণুজীব শ্রেণীগতভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের। এরা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ হিসাবে আলাদা আলাদাভাবে পরিচিত নয়। এই শ্রেণীর আদি সরলতম জীব থেকে যদি একাধারে দু'টি শাখা দু'দিকে বিকশিত হতো তবে প্রত্যাবর্তন ও বিনিময় চক্র সৃষ্টি হলো কিসের তাগিদে? আমার মতে এর সঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া কঠিন। যার জন্য শুরুতেই পুরা বিবর্তনবাদের যুক্তি অর্থহীন মনে হয়। তবে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, বিবর্তন সম্পর্কে প্রথম ধাপেই দু'টি ভিন্ন প্রজাতির কল্পনা থেকেই।

আমরা জানতে পেরেছি, পৃথিবীর আদি সরলতম জীব (এককোষী) হলো অ্যামিবা। এই অ্যামিবাকে নতুন চিন্তায় ধরা হলো প্রাণীর পরোক্ষ আদি গোষ্ঠী। এই পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। জন্ম হলেই মৃত্যু হয়। এটি দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। এই অ্যামিবাদের বেলায়ও আদি থেকে মৃত্যুর বিধান চালু ছিল এ কথা সত্য। তখন থেকেই মৃত অ্যামিবার দেহ পচন ধরাতে ভিন্ন ধরণের আর এক প্রজাতির জন্ম হয়। যার সাথে

www.pathagar.com

ব্যাকটেরিয়ার রয়েছে সম্পর্ক। তারপর এই অ্যামিবাদের পচনশীল দেহের সারবস্তু পৃথিবীতে অকেজ পড়ে থাকেনি। আমার মতে এ থেকে জন্ম হয় উদ্ভিদের আদি পিতা ইউগ্লেনার। এই ইউগ্লেনাও এককোষী উদ্ভিদ। পর্যায়ক্রমে প্রাণী ও উদ্ভিদের এই দুই প্রজন্ম বিকাশ লাভ করে। প্রাণীর বর্জ্য থেকে উদ্ভিদের জন্ম হওয়ার বিষয়টি মেনে নিলে, বিনিময় ও প্রত্যাবর্তন খেলা শুরু হওয়ার বেলায় কোন সমস্যা থাকবে না। প্রসঙ্গতঃ দেখা যায়, পাতন ও পচন ক্রিয়ায় যে গ্যাস তৈরী হয় সেখানে কার্বন-ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি আছে। উদ্ভিদ যেহেতু এই গ্যাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, সেই আলোকেই বলা চলে উদ্ভিদের আদি পিতার জন্ম অ্যামিবার বর্জ্য থেকেই।

আল্লাহ তাআলা এমনি ক্ষমতার অধিকারী যিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করতে পারেন। তাঁর পক্ষে মৃত থেকে জীবিতের বহির্গমন কোন কঠিন কাজই নয়।

আল কোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

"নিশ্চয়ই আঁটী ও বীজ অঙ্কুরণকারী তিনি মৃত হতে জীবিতের উদ্ভব করেন এবং তিনি জীবিত হতে মৃতের বহির্গমনকারী। এইত আল্লাহ।"

(আল-কোরআন ৬-৯৫)

যাদের দৃষ্টিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী একি আদি জীবসত্তার বংশধর, তাদের কাছে প্রশ্ন হলো কেন এবং কিসের প্রভাবে একি জীব বা উদ্ভিদ সত্তা থেকে এই বিনিময় ও প্রত্যাবর্তন খেলা শুরু হলো? উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদি পিতা পাওয়া গেলো ঠিকই কিন্তু এদের থেকে কিসের মাধ্যমে বা কিসের প্রভাবে বহুকোষী প্রাণী ও উদ্ভিদের আর্বিভাব হলো? আমরা যদি ডারইউনের বিবর্তন তথ্য নির্ভুল পেতাম তাহলে বিবর্তন সম্পর্কে আর ভাবনার কোন প্রয়োজন ছিল না। যা হোক বস্তুবাদী বিবর্তন তথ্যতে যেহেতু ভুল রয়েছে সুতরাং বিবর্তন সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমে উদ্ভিদের কথায় আশা যাক। এই উদ্ভিদের আদি পিতা কোন বীজ বা কান্ড থেকে জন্ম হয়নি। একি পর্যায়ের শ্যাওলা বা ছত্রাকও কোন বীজ থেকে জন্ম হয়নি। এদের কোন ফুল ও ফল নেই। স্যাঁত স্যাঁতে

www.pathagar.com

আর্বজনাময় পঁচা ময়লা স্থানে বীজহীন, মূলহীন, উৎস থেকে এখনও যেভাবে এদের জন্ম হয়, সে ভাবেই অতীতে খোদার হুকুমে মৃত থেকে এই শাখা জেগে ওঠে। ডায়াটম জাতীয় এক শ্রণীর শ্যাওলার দ্বারা মাটির সৃষ্টি হয়। কারণ এদের কোষাবরণীতে এক ধরণের বালি থাকে। এককোষী শ্যাওলার দল থেকে কি করে বহুকোষী উদ্ভিদের জন্ম হলো, এর উত্তরে বলা যায় শ্যাওলার কোষাবরণীর বালি থেকে যেহেতু মাটির স্তুপ তৈরী হতে পারে, হয়তো সেভাবেই এককোষী শ্যাওলার দল গায়ে গায়ে লেগে বহুকোষী শ্যাওলায় রূপ নিল। উদ্ভিদের কান্ডে কান্ডে মিলে কিংবা দেহে দেহে মিলে রূপান্তর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের দেশে পুকুরের পানিতে পাটের আঁশের ন্যায় এক প্রকার পাতলা শ্যাওলা বা শৈবাল আছে, এগুলো বহুকোষী। এদের পরবর্তি স্তর ছত্রাক। যেমন ব্যাঙের ছাতা। এই দু'শ্রেণীর উদ্ভিদকে বলা হয় সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদ। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। তারপর ছত্রাক ও শৈবালে মিলে হয়েছে লাইকন জাতীয় উদ্ভিদ। এ ক্ষেত্রে পরজীবি ও পরগাছা শ্রেণীর উদ্ভিদ দেহে দেহে মিলে এই রূপান্তর হয়েছে। এদের পরে জন্ম নেয় কান্ড ও পাতাশীল উদ্ভিদ। কিন্তু এদের কোন মূল নেই। এই পর্যায়ে মূল না থাকারও কারণ থাকতে পারে, হয়তো সে সময় মাটির পর্যাপ্ত বিস্তার ঘটেনি। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম বাইয়োফাইটা। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের (অপুষ্পক) মধ্যে ঢেঁকিশাক হলো এদের মধ্যে উন্নততর স্তরের প্রজাতি। এর পরবর্তি পর্যায়ে যে প্রজাতি পয়দা হয় তার নাম টেরিডোফাইটা। এদের মূল, কান্ড ও পাতা আছে। কিন্তু নেই শুধু ফুল ও ফল। এর পরবর্তি স্তর থেকেই উদ্ভিদের মধ্যে শুরু হয় প্রজননের রীতি। যাদের মধ্যে প্রজনন হয় এগুলোই সপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল ও ফল আছে। আছে বংশগতির ধারা বজায় রাখার জন্য বীজ। এখন প্রশ্ন হলো, উদ্ভিদের এই ক্রমবিকাশ কি তাদের শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, নাকি সমগোত্রীয়ের মধ্যে শংকরায়নের মাধ্যমে উন্নততর বিকাশ লাভ হয়েছে? উদ্ভিদের বেলায় যেহেতু পুরাবর্তন হওয়া অসম্ভব সেহেতু বিবর্তনবাদের ক্রমবিকাশের গন্ধ আর না হলেও উদ্ভিদের গায়ে লাগেনি। কারণ উদ্ভিদ তো পরিবেশের চাপে হাঁটা চলা কিংবা নড়াচড়া করতে পারে না। তাই পুরাবর্তন হওয়া অসম্ভব।

www.pathagar.com

তবে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে উদ্ভিদের বিকাশ না ঘটলেও সমগোত্রের মধ্যে শংকরায়নের মাধ্যমে উন্নততর ধাপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এবং দেহ ও কান্ডে কান্ডে মিলে বহুকোষী উদ্ভিদে পরিণত হওয়াও স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে গোত্রের বাইরে যেহেতু শংকরায়ন হয় না এ থেকে বলা যায় শ্রেণী বা গোত্র আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি। মূলতঃ গোত্র বা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।

আল কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

"আল্লাহ সৃষ্টি ধারা প্রবর্তন করেন তারপর পুনরাবৃত্তি করেন।" (৩০-২৭)

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ যেভাবে হতে পারে তার একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

পানি → অ্যামিবা → অ্যামিবার পচনশীল বর্জ্য থেকে জন্ম হয় ইউগ্লেনা → এদের দেহে দেহে মিলে যে বহুকোষী উদ্ভিদ গঠিত হয় তার নাম শ্যাওলা → কান্ডে কান্ডে মিলে হয় ছত্রাক → ঢেঁকিশাক → গোত্রীয় শংকরায়নের মাধ্যমে সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলেছি পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়েরই বেলায় যে ক্রমবিকাশ হয়েছে এ ব্যাপারে ডারউইন যা বলেছিলেন তা সত্য হলে নতুন করে আমাদের আর চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ডারইউনের বিবর্তনবাদ পুরাটা সত্য না হলেও বিবর্তন যে ঘটেছে, এ কথা সত্য। সাগরের সেই ছোট্ট জীবের ধারাবাহিক বংশধরই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর উন্নততর প্রাণী। এর সত্যতার প্রমাণ রয়েছে আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে। যেমন ঐ পবিত্র গ্রন্থে সকল জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং পানির জীবের বংশগতির ধারাই যে আজকের উন্নততর প্রাণী সে কথা বিশ্বাস করতে আমাদের বাঁধা থাকার কথা নয়। কিন্তু সাগরের ঐ ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীটির আঙ্গিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কিভাবে ঘটেছে সেটিই আমাদের জিজ্ঞাসা।

এ ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও তার বিস্তার দু'ভাবে হয়ে থাকে। যেমন একই জিনিস বার বার ভাগ হয়ে সংখ্যাধিক্য হওয়া। এ পর্যায়ের জীবসত্তার বংশ বৃদ্ধির মূল ধারা ছিল কোষ-বিভাজন।

www.pathagar.com

এতে ঐ জীব সত্তার ক্রোমোসমের জীন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধির রীতি চালু থাকতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় প্রজনন রীতি। এতে নর ও নারীর মিলনের ফলে জীব সত্তার বংশ বৃদ্ধির রীতি চালু হয়। বংশ বৃদ্ধির এই নিয়মরীতি এখনও চালু আছে। অপর দিকে পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির প্রাণীর উদ্ভব হওয়ার রীতি হলো তিনভাবে। এক- মাতাপিতা ব্যতীত জন্ম লাভ (আদি জীব সত্তার আধার পয়দা হওয়াই এর প্রমাণ)। দুই- প্রজনন রীতিতে। তিন- পিতাহীন মাতৃ গর্ভে সন্তান জন্ম হওয়া (ঈসা (আ) এর জন্ম)। কিন্তু অঙ্গ সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের রীতি ব্যাখ্যা করাই জটিল ব্যাপার।

আদি জীব সত্তা নর-নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে বিভক্ত ছিল না। কোষ বিভাজনের রীতিতেই তাদের বংশ বৃদ্ধি হতো। হয়তোবা এই শ্রেণীর জীবের কোষ বিভাজনের এক পর্যায়ে মূল জীন ভেঙ্গে দুই বৈশিষ্ট্যের দু'টি আলাদা জীন (নর ও নারীর জীন) সৃষ্টি হয় বলা যায় এই নারী জিনের অস্তিত্ব এই আদি সত্তার মধ্যেই লুকানো ছিল যা পরে আলাদা হয়। এরা এককোষী হলেও এদের দেহ কোষ কোষ বিভাজনের রীতিতেই ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হতে থাকে। কিন্তু ভাগ হওয়ার পর বংশ বৃদ্ধি আর কোষ বিভাজনের রীতিতে চলেনি। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদেরও খুব সূক্ষ্ম যৌন সান্নিধ্যের মাধ্যমে বংশ বিস্তার ঘটে। এ পর্যায়ে জীবনের তাগিদে ক্ষয়পূরণ ও বংশবৃদ্ধির খেলায় এই শ্রেণীর প্রাণীরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এককোষী উদ্ভিদকে বা উদ্ভিদ উপাদানকে। এভাবে খাদ্য গ্রহণের ফলে বর্তমান প্রক্রিয়ায় যেভাবে খাদ্যের-সার অংশ প্রোটোপ্লাজমে রূপ নিয়ে জীব কোষের কলেবর বৃদ্ধি করে সেভাবেই সৃষ্টিধর্মী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এককোষী প্রাণীর বংশধর বহুকোষী প্রাণীতে রূপ নিতে থাকে। প্রাণী উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষের মধ্যে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রাণী ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে উদ্ভিদ নির্ভর এবং উদ্ভিদ হয়ে ওঠে প্রাণীর বর্জ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর থেকে সৃষ্টি হয় প্রত্যাবর্তন ও বিনিময় চক্র।

www.pathagar.com

কোন জীবের স্বভাব প্রকৃতি নিজের ইচ্ছায় পয়দা হয় না। হাঁসের বাচ্চা পানিতে সাঁতার কাটে, পানি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, এটি কেউ ছোট বাচ্চাদেরকে শিখায়নি। প্রত্যেক জীবের স্বাভাবের প্রকৃতির সাথে তার অঙ্গ সম্পর্কীত। প্রাণীর স্বভাব বা আচরণ সাধারণ ও জটিল উভয় প্রকৃতিরই হয়। এর মধ্যে আহার, পয়ঃপ্রণালী, ঘুম- নিদ্রা, যৌন ক্রিয়া ইত্যাদি সাধারণ আচরণ। অন্য কিছু আচরণ আছে জটিল প্রকৃতির। যেমন মানুষ ব্যতীত কোন প্রাণী সরাসরি কপাল দিয়ে স্রষ্টাকে সেজদাহ করে না কিন্তু মানুষ প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করতে গিয়ে সেজদাহ করে কপালে। তাই অন্য কোন প্রাণীরই সেজদাহর উপযোগী অঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও গঠন সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যেক জীবের স্বভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী তার অঙ্গ গঠিত হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত কিছুর আকার ও প্রকৃতি আল্লাহর দান। তাই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিকে সেজদাহর উপযোগী অঙ্গ-প্রতঙ্গ দান করেছেন।

আল্লাহ বলেন- " আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (২০-৫০)

এ দুনিয়ার কোন কিছুই খোদা বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। যে প্রাণীগুলো বোঝা বহন করে তাকে সেই প্রাকৃতিই দান করেছেন। লাঙ্গল টানার পশুগুলোর আকার ও প্রকৃতি সেই কাজের উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার মহৎ চিন্তা যে কাজ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণীর আকার ও গঠন যদি নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে গঠিত হতো তাহলে ঘোড়া নিজের ইচ্ছেতে বোঝা বহন করার মতো অঙ্গ নিতে যেতো না। তাই সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় কোন সৃষ্টিই একজন মহা পরিকল্পকের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি। সে সত্যের স্বাক্ষী হিসেবে আল কোরআনে এ মর্মে ঘোষণাও দেয়া হয়েছে।

"যা-তা খেলার জন্য নয়- একটা মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

(৪৪-৩৮, ৩৯)

রাসূল (সা) বলেছেন- "প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাত (স্বভাব) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।"

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে তার স্বভাবের অনুকূলে চলার জন্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ দান করেছেন। এখানে মানুষ চিন্তা করতে পারে স্বভাবের সাথে কিসের উদ্দীপনায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের আবির্ভাব হলো। এ বিষয়টি খুব জটিল। পৃথিবীর সমস্ত জীব ও উদ্ভিদের আঙ্গিক পরিবর্তন নির্ভর করে জীন কণিকার ওপর। আসলে এই জীন কি? এর উত্তরে বলা যায়, জীন এক প্রকার তথ্য কণা। সব জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল একক সত্তা হল কোষ। এ কোষে রয়েছে ডি, এন, এ, অণু। এই অণুলোতেই থাকে জীবন্ত সত্তার সাংকেতিক বার্তা। এই বার্তাতে রয়েছে অনেক তথ্য নিহিত। একটা অণুর ভেতর যে পরিমাণ তথ্য নিহিত থাকে তা লিখলে একটা বৃহৎ লাইব্রেরীতেও জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। এই ডি, এন, এ, অণুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশই হলো জীন। মানুষের একটি কোষ প্রোটোপ্লাজমের জীন সংখ্যার পরিমাণ হলো দশ হাজার থেকে এক লক্ষ। এই জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় জীবের বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাতা-পিতার মিলনে সিক্ত ডিম্বানুতে জীন কণিকা যে বার্তা নিয়ে আসে এর ফলেই তার কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীনের মধ্যে সংরক্ষিত বার্তার কাজ এক সাথে শুরু হয় না। কোন কোন জীনের কাজ বয়স বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌবনে পদার্পণ করলেই শুরু হয়। তাই শিশুদের যৌন স্পৃহা থাকে না। আবার দেহকে বহির্শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই জীন কণিকা এন্টিবডি জন্ম দিয়ে থাকে। সার্বিক অর্থে জীনের ভেতর নিহিত বার্তার মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অংশ সৃষ্টি হয়। এমন কি তার হাত, পা, মাথা, চক্ষু, নাক, কান, ইত্যাদিসহ নর-নারীর পার্থক্যও এর মাধ্যমেই ঘটে। সন্তানের আকৃতি, গঠন, পরিমাপ ইত্যাদিও জীন নির্ধারণ করে থাকে। হাঁসের বাচ্চা পানিতে সাঁতার কাটবে এটি তাকে শেখাতে হয় না। এটি তার আচরণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত জীন কণিকারই বার্তা বা সংকেত। পুরুষের মুখে দাড়ি গজাবে, মেয়েদের দাড়ি থাকবে না, এটি নারী পুরুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এ সবি কোষ-কণিকার জীন নামক তথ্য কণার ইঙ্গিতেই বিকাশ লাভ হয়। তাই নারী চাইলেই তার যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করতে পারবে না কিংবা পুরুষ চাইলেই নারী হয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারে না। এখন প্রশ্ন হলো একটি জীব কোষ এতো তথ্য পেলো কোথেকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এসব তথ্য বা সাংকেতিক বার্তার ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি হয় কিভাবে?

আদি কোষ- প্রোটোপ্লাজম থেকে নিয়ে সকল জীবের জীন কণিকা যদি পরিবেশের চাপে কিংবা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার অভিব্যক্তির মাধ্যমে সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতো তবে যে জীবগুলোর হাত, পা নেই সেগুলো হাত, পা ওয়ালা অন্য প্রাণীর রক্ত চুষে হলেও ঐ জীন কণিকা সংগ্রহ করতো। প্রকৃত বাস্তবতায় জীব কোষের মধ্যে এই সাংকেতিক বার্তা (জীন) নিজে থেকে বা দৈব ক্রমে পয়দা হয়নি। দুনিয়ার কোথাও যদি বার্তা বা তথ্য প্রেরক ষ্টেশন না থাকে তবে গ্রাহক যন্ত্র থাকলেই কি তাতে সংবাদ শুনা যাবে? কিংবা টিভির গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় কি ছবিসহ সংবাদ শুনা সম্ভব? এরি মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, জীবের জীব কোষে সংরক্ষিত বার্তা বা জীন পৃথিবীর বাইরের কোন ষ্টেশন থেকে একজন বার্তা প্রেরক সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাময় প্রযুক্তির মাধ্যমেই তা প্রেরণ করেছেন। আর প্রাণীর কোষ-কলা হলো বার্তা (জীন) প্রাপক ও তা সংরক্ষণকারী এবং সে মোতাবেক পুনঃবিন্যাস লাভ হওয়া আর যোগ্য উত্তরাধিকার তৈরী করার মতো মাধ্যম। পৃথিবীর আদি এক কোষী প্রাণী থেকে নিয়ে সকল জীবকুল বার্তা ধারক ও প্রাপক। এখন কোন জীবের অঙ্গ পরিবর্তন না হলেও অন্যান্য ক্রিয়াকান্ড বার্তা প্রেরকের ইচ্ছাতেই (সংকেতেই) সংঘঠিত হয়। সাগরটা ধরে নিলাম একটা বিরাট টিভির পর্দা। এর ভেতরে প্রয়োজন সংখ্যক প্রাকৃতিক উপাদান একত্র হলে জীবকোষের কাঠামো সৃষ্টি হলেই, তাতে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। লোহার রেলিং এর সাথে পেতলের আংটা একত্র হলে যেভাবে চলবিদ্যুত উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে স্রষ্টার নির্দেশে প্রয়োজন সংখ্যক প্রাকৃতিক উপাদান একত্র হলেই কোষ প্রোটোপ্লাজম গঠিত হয়। এটিই পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণী। এর কোন হাত পা নেই। সাগরের বিশাল পর্দায় ক্রমে ক্রমে ঐ এক কোষী প্রাণীতে পর্যায়ক্রমে সাংকেতিক বার্তা (জীন) সংযোজন ও পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে তা ডাঙ্গার উপযোগী হয়ে উঠে, উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

www.pathagar.com

পুরা ব্যবস্থাটি আল্লাহর রিমোট কন্ট্রোল-এর ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল। টিভির পর্দায় যেভাবে প্রেরক যন্ত্রের প্রেরীত অগণিত স্ক্যানিং বিন্দু একত্রিত হয়ে একটি পুরা কাঠামো গঠিত হয়, মূলতঃ সৃষ্টির ক্রমবিকাশ হওয়ার পেছনে বার বার বার্তা (জীন) সংযোজনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে একটি বিশ্ব কাঠামো তথা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। যতদূর ভাবা যায়, একটি প্রজাতি থেকে যখন কোন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন পুরুষ জাতের যৌন সংক্রামণ ব্যতীতই মাতৃগর্ভে কিংবা ডিমের ভেতরেই নতুন জীন বা বার্তা সংযোজিত হয়ে নতুনের আগমন ঘটতে থাকে। এভাবেই এক-দুই করে করে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। এই বার্তা প্রেরীত হয়েছে মহা পরিকল্পকের পক্ষ থেকেই। জীব কোষের জীন কণিকা বা তথ্য কণা যে পৃথিবীর বাইরের থেকে প্রেরীত হয়েছে তার প্রমাণ হলো, পৃথিবীর আদি সরলতম জীব যে পানির তৈরী, সেই পানিকে খন্ড বিখন্ড করলে যেহেতু ঐ জীনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, এটিই তার বড় স্বাক্ষী বা প্রমাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন কিছু সৃষ্টি করলে শুধু বলেন 'হও' আর এমনি তা হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিসের গঠন প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করে খোদার অভিব্যক্তির ওপর।

এখানে খোদার অভিব্যক্তির স্বরূপ 'হও' এর সাংকেতিক বার্তার সাথে তথ্য কণা বা জীন এর নিগূঢ় সম্পর্ক থাকার পক্ষে যুক্তি রয়েছে। আল-কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত থেকে আল্লাহই যে সকল কিছুর আকার ও প্রকৃতি এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করেছেন তা উপলব্ধি করা যায়।

"(আর তিনিই) সৃষ্টিকর্তা আসমান সমূহের ও যমিনের; যখন কোন কিছুর (সৃষ্টি কার্যের) পূর্ণতা সাধন করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু উহাকে (এতটুকুই) বলে দেন যে, 'হইয়া যা' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।"

—(সূরা বাকারাহ ১১০)

"আল্লাহ তার ইচ্ছামত সৃষ্টিতে যোগ করেন।" — (৩৫-১)

"সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক পরিমাণে ও অনুপাতে।" (৫৪-৪৯)

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তার "কুন ফাইয়াকুন" বলার সাথে তথ্য প্রেরণ বা সাংকেতিক বার্তা প্রেরণ অথবা জীন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কীত। পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পুনরাবর্তন হওয়া সবি নির্ভর করে খোদার ইচ্ছার ওপর। তাঁর ইচ্ছাতে হাত-পাহীন প্রাণীর শুক্ররেণুর ভেতরে হাত-পা তৈরী হওয়ার মতো তথ্য বা জীন সংযোজিত হওয়া বা যোগ হওয়া কঠিন কিছু নয়। অর্থাৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন হওয়া স্রষ্টার আদেশের ওপরই নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল জীব ও উদ্ভিদের কোষ-প্রোটোপ্লাজমের সুসম্পর্ক এ কথাই প্রমাণ করে যে, কোন না কোন সময় একটা সুশৃঙ্খল বিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে পৃথিবীর সব কিছু আমাদের অধীন বা আমাদের কোষ কলার সাথে সম্পর্কশীল। তাই এদের দেহ বা দেহ উপাদান আমরা গ্রহণ করলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। তবে এ পৃথিবীতে আমাদেরও কিছু বৈরী সত্তা আছে। সেগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো হলো, বিভিন্ন রোগ জীবাণুর কণিকা ও ক্যান্সার সেল ইত্যাদি। এগুলোর কোষকলার গঠনের সাথে আমাদের দেহ কোষের কোন না কোন দিক থেকে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে। যার জন্য এগুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করলেই দেহ বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। সুতরাং এগুলো আমাদের অধীন নয়। এরা আনুগত্যশীল নয় বলেই তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু যাতে আমাদের অধীনস্ত থাকে সেজন্যই এই বিবর্তন। এরপরও যেগুলো আমাদের বৈরী সত্তা সেগুলো দেহ ও আত্মার কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকেই জন্ম হয়। এর প্রধান সহায়ক হলো মানুষের বৈরী সত্তা (শয়তান)। একে আত্মিক বর্জ্যও বলা যায়।

যে জীবের হাত পা নেই এমন জীবের ভ্রূণ শিশু যখন জন্ম নেয় তখন এর মধ্যে যদি হাত-পা সৃষ্টি হওয়ার মতো জীন নামক সাংকেতিক বার্তা বা তথ্য কণা যোগ করে দেওয়া যেত তবে হাত-পাহীন জীবের মাতৃগর্ভ থেকে হাত-পা, ওয়ালা জীব সৃষ্টি অসম্ভবের কিছু নয়। বর্তমানের প্রচলিত প্রজনন রীতিতে এমন ঘটনা সচরাচর না ঘটলেও বিবর্তনের সময় স্রষ্টা হয়তো হাত-পা ওয়ালা জীব পয়দা হওয়ার জন্য সেই রীতি চালু রেখে ছিলেন। এই পুরা প্রক্রিয়ার বিষয়টি স্রষ্টার পরিকল্পনাধীন। তাই এখন আর এমন কিছু ঘটে না। এ যুগের জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর শাখা যদি আরও উন্নততর শিখড়ে আরোহণ করে, তখন যদি জীন পৃথক করা সম্ভব হয়

www.pathagar.com

তাহলে হাত-পা হীন জীবের শুক্র রেণুতে ঐ জাতীয় জীন সংযোজন করে দিয়ে তা থেকে হাত, পা ওয়ালা জীব পয়দা হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করাও যেতে পারে। তবে নতুন করে অণু বা পরমাণু সৃষ্টি করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি নতুন কোন জীন সৃষ্টি করাও অসম্ভব।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সাংকেতিক বার্তা বা জীন কণিকার মাধ্যমে কিভাবে জীবদেহের পরিবর্তন সাধন সম্ভব? আমরা যদি ধরে নেই, জীব কোষ (আদি জীব সত্তা) এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হলো, ফ্যাক্স বার্তা ধারণ করার মতো বৈশিষ্ট্যশীল একটি সত্তা। এতে যে তথ্য লিপিবদ্ধ হয় সেই তথ্য প্রেরক বা হুকুমদাতা হলেন আলাহ তা'আলা। ফেক্সবার্তা গ্রাহক যন্ত্র যেমন তথ্য দাতার তথ্য ধারণ ধরে তার অনুলিপি হুবহু প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রেরকদাতা যদি 'ম' লিখার সংকেত বা তথ্য প্রেরণ করেন তবে ঐ যন্ত্র তার নিজস্ব অস্তিত্ব ঠিক রেখে তার ভিতর থেকে 'ম' লিখাটিই প্রকাশ করবে। এতে 'ম' এর আকার আকৃতি মাথা, মুখ সবি প্রেরক দাতার তথ্য সংকেত এর ফলেই গঠিত হবে। কিন্তু এখানে 'ম' তার নিজস্ব আকল কাটানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তারপর 'ম' জন্ম দিবে 'মা'। এখানে আকারটি যোগ হওয়ার মতো তথ্য প্রেরণ করেন তথ্যদাতা। এভাবে বার বার একের ভেতর থেকে নতুন একটা কিছু সংযোজিত হয়ে নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম হয়ে তা এগিয়ে চলে চূড়ান্তের দিকে। সেই সূত্র ধরেই পরিশেষে আসল 'মানুষ'। আসলে এই মানুষ আর বেহেশ্তী আদম, হাওয়া, এক শ্রেণীর মানুষ নয়। সেই মানুষের জন্মই আর এক রহস্যময় ইতিহাস। সেই রহস্যের কথা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীব দেহের জীন বা তথ্য কণাগুলো কোষ প্রোটোপ্লাজমে জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়াচড়া করে। ক্যাসেটের সূক্ষ্ম ফিতা ঘুরে ঘুরে যেভাবে তথ্য রিলে হয়, সেভাবে প্রাণী ভ্রূণ সন্তানের ভেতরে জীন বা তথ্য কণাগুলো বার বার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এতে পরিবর্ধনের মাধ্যমে তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। ফলে ছোটরা বড় হয়। পক্ষান্তরে তার সাথে যোগ হয় দেহের অন্যান্য সার অংশ বা উপাদান।

আল কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

www.pathagar.com

"আল্লাহই সৃষ্টির ধারা শুরু করেন আর পুনরাবৃত্তি করেন।" (১০-৪)

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কেন এক প্রজাতির জীবের থেকে বার বার জীন পরিবর্তন ও সংযোজন এবং পরিবর্ধনের মাধ্যমে উন্নততর প্রজাতির সৃষ্টি করা হলো? সব কিছু আলাদা আলাদা করলে অসুবিধাই কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কণা ও জীব সত্তার মধ্যে একি গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। সাথে সাথে মানুষের দেহ সত্তার সাথে সাদৃশ্যশীল করে সকল কিছু পয়দা করাই বিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তা নাহলে আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারতাম না। এতে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর আমাদের প্রভুত্ব বজায় থাকত না।

সুতরাং বিবর্তনের মূল সমাধান হলো জীন বা তথ্য কণা সংযোজন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এর ফলেই নতুনের আবির্ভাব। অপরদিকে গোত্রভিত্তিক শংকরায়নের মাধ্যমে উন্নতর জাতের সৃষ্টি হয়।

বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ভাবনার শেষ প্রান্তে এসে যে সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাহলো পৃথিবীতে কোন পথে প্রথম মানব, মানবী পদার্পণ করেছেন। কারণ এখানেই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের তত্ত্বের কিছুটা বৈরী সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের এই দ্বন্দ্ব বা বৈরী ভাবের অবসান করতে পারলে জড়বাদী চিন্তার মূল শিকড় কেটে দিয়ে ভ্রান্ত চিন্তার উৎস মূল মানুষের স্মৃতিপট থেকে দূর করা সম্ভব।

www.pathagar.com

আদি মানব মানবীর জন্ম রহস্য

পৃথিবীর মানচিত্রে মানব-মানবীর আবির্ভাব নিসন্দেহে রহস্যময়। মাটির ভূবনের প্রথম মানব, মানবী হলেন হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া। পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাঁরা ছিলেন বেহেশতে। দু'জনকেই একি কারণে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। পৃথিবীতে তাদের পদচারণা নিয়ে ঘিরে আছে অনেক কিংবদন্তি, অনেক রূপ কথা। আছে বিশ্ব বিধাতার পক্ষ থেকে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণের অমীয় বাণী। তাদের জন্ম বর্তমান প্রজনন রীতিতে ঘটেছিল কি না এর যেহেতু সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে কারণে তাঁদের জন্ম রহস্য নিয়ে অনেক গল্পের সূচনা হয়েছে। আসলে তাঁরা দু'জনেই কি আকাশ থেকে মাটির দেহ নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন?

আল্লাহ বলেন- "মাটি হতে আমরা মানুষকে পয়দা করেছি। প্রথমে একটি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু গড়েছি এবং তাকে অতি নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তারপর সেই জীবাণুকে ক্রমে একটি রক্তের গুটিকায়, পরে একটি গোশত খন্ডে পরিণত করেছি। তারপর তাতে অস্থিসমূহ সৃষ্টি করে গোশত ও পেশী দ্বারা সেগুলো আবৃত করেছি। তারপর তাকে একটি স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত করেছি। এরপর একদিন অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু আসবে এবং মহাবিচারের দিন তোমাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে।"

—(সূরা মু'মিনুন ঃ ১-৯)

"আমি মাটির পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মাটি দ্বারা (যা আঘাতে শব্দ করে) মানুষ সৃষ্টি করেছি।" —(৫৫ ঃ ১৪)

"নিশ্চয়ই আমি পচা-কাদার শুষ্ক মূর্তি তৈরী করে মানুষ সৃষ্টি করেছি।"

—(১৫ ঃ ২৬)

আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত কথার মাধ্যমে এ কথাই বুঝা যায় যে, আদম (আ) ও বিবি হাওয়া আকাশ থেকে মাটির দেহ নিয়ে নেমে আসেননি। কারণ তারা দু'জন তো মানুষই ছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো তাদের জড় আকার কে, কোথায়, কিভাবে তৈরী করে ছিলো? কিংবা এদের

www.pathagar.com

জন্মের জন্য কি কোন মাতৃথলির প্রয়োজন পড়েছিল? এসব জিজ্ঞাসা মানুষের মনে যে ভাবনার সৃষ্টি করে তা থেকে ধর্মের পরিসরেও রূপক গল্প তৈরী হয়েছে। সাথে সাথে জড়বাদী চিন্তায় ও মানব সৃষ্টির রহস্য কথা আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোনটি যে ঠিক তা বের করা খুব কঠিন। এর সত্যিকার সমাধান পেতে হলে ঐশীগ্রন্থ, ইতিহাস, দর্শন এবং নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত উপায় নেই। কারণ মাটির দ্বারা মূর্তি তৈরী করে মানুষ সৃষ্টি করা প্রচলিত প্রজনন রীতিতে নেই। এমন কোন ইতিহাসও পাওয়া যায়নি যে, কোথাও কোন মূর্তি মানুষ হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অনুর্বর মাটি, গাছপালা, ব্যাকটেরিয়া ও জীবজন্তুর মৃত দেহ পচে-গলে উর্বর ও আঠালো হয়। এই পঁচা মাটির মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার ইত্যাদি। মানুষের দেহ কোষেও রয়েছে এসব উপাদান। প্রচলিত প্রজনন রীতিতে মার গর্ভে যখন সন্তানের মূর্তি (জড় দেহ) তৈরী হতে থাকে তখন এই উপাদানগুলো মা থেকেই সন্তানে আসে। মা খাদ্যের মাধ্যমে সেগুলো আহরণ করে। এই প্রক্রিয়ায় মাতা-পিতার মিলনে খুব সূক্ষ্ম দুই সত্তা (শুক্রকীট ও ডিম্বানু) একত্রে মিলিত হয়ে মানুষ সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাছাড়া আল্লাহ এই প্রচলিত নিয়মের বাইরেও মানুষ সৃষ্টি করে ইতিহাসে স্বাক্ষী রেখেছেন।

ঈসা (আ) এর মাতা বিবি মরিয়ম কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই সন্তানবতী হয়েছিলেন। এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। এই ইতিহাস আদমের (আ) ও সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর বললেন 'হও' ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।" —(সূরা আলে-ইমরান-৫৯)

"তিনি পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" —(২৫-৫৪)

ঈসা (আ) এর মাতা মরিয়মের গর্ভে আল্লাহর আদেশেই, মাটির বিভিন্ন উপাদান দিয়ে গঠিত শুক্রকীট কোন পুরুষ মানুষের মাধ্যম ছাড়াই

www.pathagar.com

জরায়ুতে প্রোথিত হয়। আল্লাহর আদেশ বার্তা প্রেরীত হয় ফেরেশতাদের মাধ্যমে। ফেরেশতাগণের কাজের প্রকৃতি ও তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে না পারলে, এ ব্যাপারে তাদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানের মাটি জমা করে আদমের মূর্তি তৈরী করার মতো ধারণা জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তবে ফেরেশতাগণ এভাবে কাজ করার কোন প্রমাণ নেই। আদম (আ) এর জড় গঠন যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হতো তবে আল্লাহ সেই জন্ম রহস্য ইতিহাস থেকে আঁড়াল করে রাখতেন না। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হলো, যুগে যুগে নবী, রাসূল (সা) গণের মাধ্যমে কিংবা স্রষ্টা নিজে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, সঙ্গত কারণে আল্লাহ সেগুলো ইতিহাস থেকে আঁড়াল করেননি। এর কারণ অনেক থাকতে পারে তবে মানুষ যাতে কুসংস্কারের আশ্রয় না নেয় তার জন্যই হয়ত তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেছেন। এবং তা বাস্তবে প্রমাণ ও প্রকাশ করেছেন। তম্মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদাহরণে আনা যায়, ফেরআউনের মৃত দেহের সন্ধান, চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার আলামত আবিষ্কার, বাপ ছাড়া মরিয়মের গর্ভধারণও ঈসা (আ) এর জন্ম। সাগরের লোনা পানির গর্ভে মাতা-পিতা ব্যতীত আদি জীব সত্তার জন্ম ইত্যাদি। এখানে দর্শনের যুক্তি হলো প্রতিটি ঘটনা অলৌকিকভাবে ঘটলেও তার সাথে পৃথিবীর বস্তুর উপাদান বা জড় অস্তিত্বের কোন না কোন ভাবে জড়িত ও যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ করে মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ) জন্ম নেয়াটা অলৌকিক এবং সাগরের লোনা পানিতে আদি জীব সত্তার জন্ম হওয়াও অনুরূপ। কিন্তু এদের আকৃতি গঠন পৃথিবীর বাইরের উপাদান দিয়ে হয়নি। এখানে বিবি মরিয়ম ছিলেন কুমারী। বিবাহ বন্ধনের সূত্র ছাড়াই ঈসা (আ) মায়ের গর্ভে অলৌকিকভাবে জন্ম নিয়ে ছিলেন। এই জন্ম রহস্যে খোদার কুদরতের অসীম শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটেছিল। এই সত্যতা থেকে আমাদের মনের বিশ্বাস প্রখর হয়েছিল যে, আল্লাহ বাপ ছাড়াও মাতৃগর্ভে সন্তান জন্ম দিতে পারেন। আবার আদি জীব সত্তার জন্ম হওয়ার সূত্র থেকে তাও প্রমাণ হয় যে, পিতা-মাতা দু'জন ব্যতীতও তিনি জন্ম দিতে সমর্থ। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর উপাদান ছিল এই দুনিয়ার ভেতরের। শুধু ঘটনাটি ঘটার আদেশটিই আল্লাহ দিয়েছিলেন। আল্লাহর আদেশ বা হুকুমের মধ্যে যে বার্তা বা তথ্য

www.pathagar.com

কিংবা জীন থাকে এর মাধ্যমেই সেটি পৃথিবীর উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ঘটনাগুলো বিনা প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না।

আদম (আ) ও বিবি হাওয়া বেহেশত থেকে নিম্ন জগৎ পৃথিবীতে নেমে আসেন। বেহেশত জড় জগৎ নয়। সে জগৎ পরম পূত পবিত্র, সেখানে পদার্থ বলে কিছু নেই। পক্ষান্তরে জড়দেহ মাটির উপাদানে তৈরী। এটি এই ধূলির ধরা ব্যতীত উর্ধ্ব জগতে তৈরী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ উর্ধ্ব জগতে মাটির দেহ থাকা অসম্ভব।

মূলতঃ আত্মা ও দেহ দু'টি পৃথক জিনিস। এরপরও কথা থেকে যায় পশুর আত্মা হলো জড় আত্মা আর মানব আত্মা হলো পরম আত্মা। যে আদম (আ) ও বিবি হাওয়া বেহেশত থেকে নেমে এসেছিলেন-তাঁদের আত্মা ছিল পরম আত্মা এবং তাঁদের রুহানী অস্তিত্ব ছিল বেহেশতের উপাদানের তৈরী। কিন্তু আমরা তাদের আত্মিক জন্ম তথ্য দিয়ে যত না ভাবি তার চেয়ে বেশী ভাবি তাদের জড়দেহ তৈরী নিয়ে।

বর্তমানে মানব দেহে যেভাবে আত্মা আসে সেভাবে যদি আদম (আ) ও বিবি হাওয়া ধরণীতে নেমে আসার মতো কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে প্রথম মানব-মানবীর আবির্ভাব নিয়ে কোন দ্বন্দ্বই দেখা দিত না। এ পৃথিবীতে বর্তমান প্রজনন ধারায় মাতা-পিতার যৌন মিলনে পুরুষের শুক্রকীট ও মাতার ডিম্বাণু সিক্ত হয়ে মায়ের জরায়ুতে তা জড় মানুষের আকৃতি লাভ করে। এর মধ্যে আঙ্গিক বিকাশের এক পর্যায়ে রূহ (পরম আত্মা) চলে আসে। মায়ের জরায়ুর অন্ধকার কুঠুরীতে ৪০ সপ্তাহ পূরণ হলে সেই মানব শিশু পৃথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে ফিরে আসে। এভাবেই চলে বংশানুক্রমিক প্রজনন ধারা। যেহেতু আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী সে কারণে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাদের জড় আকৃতি কিভাবে কোথায় তৈরী হলো? আসলেই কি তাদের জড় গঠন পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে হয়েছে? না-কি রেডিমেড তৈরী করে রেখে দেয়া হয়েছিল? অথবা অন্য কোন উন্নততর মানবেতর প্রাণীর মাতৃগর্ভে পিতা ছাড়াই ঈসা (আ) মতো জন্ম দেয়া হয়? দেখা যায় ঈসা (আ)-এর রূহ পৃথিবীতে রেডিমেড কোন জড় আকৃতি তৈরী করে তাতে

www.pathagar.com

ঢুকিয়ে দেয়া হয়নি। পিতা ছাড়া তাঁর আকার মাতা মরিয়মের জরায়ু নামক ডাইছেই পয়দা হয়। পিতা ব্যতীত মাতৃগর্ভে সন্তান জন্ম হওয়া দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম বর্হিভূত।

তাই আল্লাহর এই কুদরতের খেলা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। স্বভাবের বিপরীত কিছু ঘটানো আল্লাহর পক্ষে অসম্ভবের কিছু নয়। যেহেতু ইতিহাসের আলোকে এমন কোন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা পৃথিবীতে ঘটেছে অথচ তা এখনও উহ্যই রয়েছে কিংবা দর্শনের আলোকেও বলা যায় রূহানী আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার জড়দেহ পৃথিবীর বাইরের থেকে নিয়ে আসেনি। তাঁদের জড় দেহের উপাদান এই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং জড় দেহ গঠনের প্রক্রিয়াসহ সবি এখানেই হয়েছে। তাদের চূড়ান্ত গঠন এখানেই হয়েছে। তাঁরা যদি ঐ দেহ আকাশ থেকে নিয়ে মাটিতে পদার্পণ করতেন তবে সেই ইতিহাসকে সাক্ষী করার জন্য হলেও তিনি (আল্লাহ) পুনরায় আকাশ থেকে দুই/একজন মানুষ সেভাবে প্রেরণ করে এ যুগেও তার সত্যতা প্রমাণ করে দেখাতেন। অপরদিকে ধর্মের সূত্র ধরে এ কথা বলা যায়, যদি এভাবে আকাশ থেকে তাঁরা জড়দেহ নিয়ে আসতেন তবে পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্তিকার মাধ্যমে পূর্ণ রূপ দান করেছেন এ কথার মধ্যে শূন্যতা দেখা দেয়া বা ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং আমরা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার জড়দেহ এই পৃথিবীতেই পয়দা হয়েছে। ঈসা (আ) জড় গঠন কুমারী মাতা বিবি মরিয়মের জরায়ু নামক ডাইছেই আল্লাহর হুকুমে যেমন পয়দা হয় এবং যেহেতু সূরা আলে-ইমরানের ৫৯নং আয়াতে ঈসার (আ) দৃষ্টান্ত আদমের (আ) অনুরূপ বলা আছে, তাই সে আলোকের সূত্র ধরে বিচার করে দেখতে হবে, আজকের মানব গোষ্ঠীর অনুরূপ কোন মানবতর জাতি পৃথিবীতে আদম (আ) এর জন্মের আগেও ছিল কি-না। সে জাতি হয়ত আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার উপযোগী ছিল না। তবে তারা বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে আজকের মানুষের চেয়ে কম হলেও দৈহিক গঠনের দিক থেকে কোন রূপ সাদৃশ্যহীন ছিল না। এরূপ মানুষের সন্ধান জানতে হলে নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্যের সন্ধান নেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এই পৃথিবীর অনেক ধরনের প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা গেছে মানুষের মত গঠন প্রকৃতির কিছু মানবেতর প্রাণী আদিকালে পাহাড় পর্বতের গুহায় বাস করত। এদের উচ্চতা আধুনিক বিশ্বের মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশী ছিল। তারা কিছু কিছু চিত্র কর্মের কাজও জানত। তাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল এখনকার মানুষের চেয়ে কিছুটা ছোট। সেই পর্যায়ের মানবেতর প্রাণী এখন আর পৃথিবীতে নেই। তাদের কেন বিলুপ্তি ঘটেছিল, সে ইতিহাস জানা যায়নি। তবে আদম সৃষ্টির কথার ওপর ফেরেশতাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, আদমের (আ) পৃথিবীতে পদার্পণের আগেও একটা জাতি পৃথিবীতে বসবাস করত। এবং তারা মারামারি ও কাটাকাটি করত। গোত্রভিত্তিক রক্তারক্তির ফলেই কি তারা বিলুপ্ত হয়েছে কি না তাই বা কে জানে?

আল্লাহ বলেন- "হে রাসূল, (স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাচ্ছি। তখন তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনাখুনি করবে? আমরাই তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস করছি। তখন আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" —(সূরা আল-বাকারাহ)

বলা বাহুল্য ফেরেশ্‌তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত নতুন 'ইলম' জানার উপায় নেই। যেহেতু তারা এ কথা বলেছে, সুতরাং এর মাধ্যমে ধরে নেয়া যায় ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাহীন এক শ্রেণীর জড় আত্মার মানুষ পৃথিবীতে ছিল। সেই আদিম মানুষের অস্তিত্ব মাটি হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ভূ-গর্ভ খননের মাধ্যমে তাদের ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষ পরম আত্মার মানুষ ছিল না।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা বর্তমান মানুষের চেয়ে এক ধাপ নীচের হোমো-স্যাপিয়ানস গোষ্ঠীর এক ধরণের আদিম মানব থেকে বিবর্তনের ফলে আজকের মানুষের পূর্ব পুরুষ জন্ম লাভ করে। নৃ-বিজ্ঞানীগণ মাটির নীচের ফসিল গবেষণা করেই এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এখানেই বিজ্ঞানের সাথে আল কোরআনের বৈরী ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান বেহেশত থেকে

www.pathagar.com

'আদমের পদার্পণ' হওয়ার ব্যাপারে কোন যুক্তিই মানতে রাজি নয়। তারা জড় আকৃতিটাকেই প্রকৃত মানুষ মনে করে। কিন্তু কোরআনের কথা হলো আদম (আ) এবং বিবি হাওয়া বেহেশ্তে ছিলেন। তারা শয়তানের প্ররাচনায় পড়ে 'গন্দম' খেয়ে বেহেশ্ত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন। কিন্তু নিম্ন জগতে এসে তাঁরা দু'জন মাটির দেহ পেল কোথায়? যেহেতু ঈসার (আ) দৃষ্টান্ত আদমের (আ) অনুরূপ তাহলে এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, হোমো-স্যাপিয়ানস দুই কুমারী মাতার গর্ভে আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার জড় গঠন আল্লাহর হুকুমেই পয়দা হয়। আর এখন যে প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে পরম আত্মা উর্ধ্ব জগৎ থেকে চলে এসে তাতে প্রোথিত হয়, সেভাবেই হয়ত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার রূহানী রূপ এ রকম দুই কুমারী মাতার গর্ভের জড় গঠনে এসে প্রোথিত হয়। সেই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন হযরত আদম (আ) আর অপরজন হলেন বিবি হাওয়া। কিন্তু তাঁরা যেহেতু ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাই তাঁরা যে বেহেশ্ত থেকে নেমে এসেছেন, সেই জ্ঞান তাদের ছিল। এর ফলে হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাঁরা অতীতের শিক্ষার আলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছেদ জনিত অনুশোচনায় ও ভুলের জন্য অনুতাপ করতে থাকেন। পক্ষান্তরে একজন আর একজনকে পাওয়ার জন্যও ছিলেন ব্যাকুল। পরিশেষে আল্লাহ তাঁদের একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। এরপর থেকে শুরু হলো তাদের দুনিয়ার কর্মজীবন। আস্তে আস্তে এই দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে মানব জাতির।

আমি আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার জড় গঠন পয়দা হওয়া নিয়ে যা চিন্তা করেছি, সে ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেম সমাজের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভেবে দেখা প্রয়োজন। ঘটনাটি যদি এভাবে ঘটেছিল এ রূপ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় তবে বৈজ্ঞানিকভাবেও তা স্বীকৃতি লাভ করবে। এতে সকল কুসংস্কারেরও হবে অবসান।

www.pathagar.com

প্রমাণ্য গ্রন্থপঞ্জী

এ গ্রন্থখানি প্রণয়নে আমি অসংখ্য লেখকের মহামূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে যে সব গ্রন্থের নাম আমার স্মৃতিতে ছিল না সেগুলোর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তবে যেগুলো স্মৃতিপটে গাঁথা ছিল সেগুলোর নাম পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। কোরআনুল মাজীদ – মৌলানা আবু আলা মওদুদী
২। আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন – গোলাম ছোবীহান
৩। মৃত্যু যবনিকার ওপারে – আব্বাছ আলী খান
৪। বিশ্ব নবী – গোলাম মোস্তফা
৫। বাইবেল, কোরআন, বিজ্ঞান – ডঃ মরিস বুকাইলী
৬। কোরআন, মুহাম্মদ (সঃ), বিজ্ঞান – তাইফুর রহমান
৭। ইস্‌লামী দর্শন – আল্লামা শিবলী নু'মানী
৮। বিজ্ঞান, সমাজ ধর্ম – প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম
৯। আদম ও শয়তান – মওলানা আঃ মতিন
১০। চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত – জন ক্লোভার মোনজমা
১১। কিমিয়ায়ে সা'আদাত – ইমাম গাজ্জালী
১২। সৌভাগ্যের পরশমণি- – ঐ
১৩। ইস্‌লামী সংস্কৃতির মর্মকথা – আবু আলা মওদুদী
১৪। হাদিসে কুদসী – আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (রাঃ)
১৫। জীবন সমস্যার সমাধানে ইস্‌লাম- –অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
১৬। বিজ্ঞান না কোরান – মুহাম্মদ নুরুল ইস্‌লাম
১৭। স্নাতক পদার্থ বিজ্ঞান – মুসলেম উদ্দীন
১৮। উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান – ইসহাক ও নুরুন্নবী
১৯। আধুনিক বিজ্ঞান – আবদুল্লাহ আল মুতী সরফুদ্দীন
২০। Antomy and Physilogy for nurses – Shella M. Jackson
২১। Pharmacology – B. N. Ghosh.
২২। ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে ও পরে –মওলানা মোঃ আমিনুল ইস্‌লাম
২৪। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী –ফরিদ ওয়াজদী আফিন্দী
২৩। সাময়িকী – মাসিক মদিনা, পৃথিবী, ঢাকা ডাইজেষ্ট, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংবাদ

www.pathagar.com